ইউরোপের ইতিহাস

(1740—1919)

অধ্যাপক—কে, এন, মল্লিক

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

প্রকাশক ঃ

অরুণ পুরকায়স্থ

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা—৯

আগষ্ট—১৯৫৮

মুদ্রক ঃ

শ্রীতুলসী চরণ বক্সী

ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৩৩ডি, মদন মিত্র লেন

কলিকাতা—৬

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইতিহাসের দ্বিতীয় পত্রের পাঠ্যসূচী অনুসারে বইখানি লেখা হল।

বইখানিতে বিষয়সমূহ প্রশ্নোত্তরে অলোচিত হয়েছে যাতে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লেখবার সময়ে কোন প্রকার অসুবিধায় না পড়ে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বইটি প্রশ্নোত্তরে লেখা হলেও এটিকে Text Book হিসেবে অনায়াসে গণ্য করা যেতে পারে। কারণ প্রত্যেকটি সম্ভাব্য প্রশ্নের বিস্তৃত ও বিশ্লেষণ-মূলক উত্তর এটিতে পাওয়া যাবে এবং বইটি লিখবার সময়ে প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক, প্রামাণিক ও আধুনিক গ্রন্থসমূহের ওপর নির্ভর করেছি। এই বইটি ইতিহাসের অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের নিকটও বিশেষ প্রয়োজনীয় হবে বলে আশা রাখি।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

কলিকাতা
১লা আগস্ট, ১৯৪৮

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পূর্বকথা

ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন; এর বৃত্তান্তে পূর্ণচ্ছেদ কোথাও পড়ে না। এ কারণে ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা চলে না। ইতিহাসকে অখণ্ড, অবিভক্ত, অবিভাজ্য মনে করে আমাদের আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস পড়তে হবে।

মানুষ তবুও ইতিহাসের মধ্যে বিভিন্ন ধারা দেখেছে। যুগ থেকে যুগান্তরে ইতিহাসের রূপান্তর যা ঘটেছে তা বুঝতে চেষ্টা করেছে। পরিবর্তনময় জগতে পরিবর্তন যখন বিশেষভাবে দেখা যায় তখনই সূচনা হয় নবযুগের। ইউরোপে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এরূপ নবযুগের সূচনা দেখা গেল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের চিন্তা ও কর্মের ধারা যখন রেনেঁসার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত হয়ে মানুষের মহিমা কীর্তিত হয়েছিল এবং বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল, মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থার নাভিশ্বাস যখন উঠেছিল, বিভিন্ন ভাষাভাষী দেশে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব যখন হচ্ছিল, ভৌগোলিক আবিষ্কারকরা যখন জলপথে নানা দেশ আবিষ্কার করল, তখন ইউরোপে দেখা দিল আধুনিক কাল।

ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা

রেনেঁসার অর্থ নবজন্ম বা নবজাগৃতি। আমরা একে ব্যক্তিমানুষের নবজন্ম বলতে পারি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ব্যক্তি-মানুষের দেহ-মন-আত্মার যে জোয়ার এসেছিল তার ব্যাপক ও বিচিত্র প্রকাশের নাম দেওয়া হয়েছে রেনেঁসা।

রেনেঁসার অর্থ

রেনেঁসা প্রথমে ইটালীতে শুরু হয়, কারণ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এর অনুকূল ছিল। ইটালীতে রেনেঁসা বেশিদিন টেকেনি। বিদেশী শক্তি যখন ইটালী দখল করল তখন এটি পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে চলে গেল। জার্মানীতে রেনেঁসা আলাদা রূপ নিল। ইটালীবাসীদের অনুসন্ধিৎসা প্রাচীন সাহিত্যের ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দেয় কিন্তু এই নতুন দেশগুলির পণ্ডিত ব্যক্তিরা ধর্মগ্রন্থ সমূহের প্রতি লোকের কৌতূহল জাগাল। ইরাসমুসের তীক্ষ্ণ পাণ্ডিত্য তৎকালীন

রেনেঁসার প্রসার

বাইবেলকে অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত ধারণায় ভর্তি বলে প্রমাণ করল। ইংল্যাণ্ডের উইক্লিফ ও ফ্রান্সের লেঁভা নিজ নিজ মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দিলেন। এঁরাই সংস্কার আন্দোলনের (Reformation Movement) পুরোধা।

ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন: রিফরমেশন বা ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন কথাটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সংকীর্ণ অর্থে সংস্কার আন্দোলন বলতে আমরা ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ষোড়শ শতাব্দীতে যে ধর্ম বিপ্লব ঘটেছিল সেটি বুঝি আর ব্যাপক অর্থে হল ইউরোপীয় সমাজ এবং চার্চের সংস্কারের জন্য যে বিরাট এবং জটিল আন্দোলন ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হয় সেটি।

এর অর্থ

সংস্কার আন্দোলন ও রেনেঁসার সাথে সম্পর্ক খুবই নিকট এবং বড়ই নিবিড়। একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। জার্মানীতে রেনেঁসাই রিফরমেশনের রূপ নেয়। রিফরমেশন মানুষের বিচার শক্তির ওপর জোর দেয় যেটি রেনেঁসারই অবদান। পর্যবেক্ষণ, তুলনামূলক আলোচনা, সমালোচনা, মূল উপাদান এবং অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি যেমন রেনেঁসা দৃষ্টিভঙ্গিরই অভিব্যক্তি, আবার রিফরমেশন অন্দোলনেরও বৈশিষ্ট্য।

সংস্কার আন্দোলন ও রেনেঁসা

সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল: সংস্কার আন্দোলনের ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। প্রথমত, পোপ ও চার্চের প্রভাব রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মের ক্ষেত্রে কমে যায়। ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচারশক্তি বলে যে কিছু আছে চার্চ তা মানত না। সংস্কার-আন্দোলন এ ধারণাকে ভেঙে দেয়। দ্বিতীয়ত, সংস্কার আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টান জগৎ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এবং এই ভাগ হয়ে যাবার ফলে কালক্রমে ইউরোপীয়দের মনে ধর্ম-সহিষ্ণুতা দেখা দিল এবং আধুনিক সভ্যতাকে উন্নত করল। তৃতীয়ত, সংস্কার আন্দোলন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে এল এবং ব্যক্তি-মানুষকে তার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করল। বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নিজের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার-গুলির জন্য মানুষ লড়াই শুরু করল। চতুর্থত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার-আন্দোলন পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের ধারণার ওপর প্রবল আঘাত হানল। প্রোটেস্টান্ট রাজন্যবর্গ এই সাম্রাজ্যের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং নিজ নিজ রাজ্যের চার্চের ওপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করল। উপসংহারে বলা যায় যে ধর্মের মূল উপাদান

ধর্ম-সংস্কারের ফল

যে অন্তরের গভীর আবেগ এবং প্রধান লক্ষ্য যে নৈতিক পবিত্রতা এমন বোধ সংস্কার-আন্দোলনই মানুষের মনে জাগায়। ফলে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্ধ মোহ কেটে গিয়ে চিন্তাক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে গেল।

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উপনিবেশ বিস্তার: ইউরোপে রেনেঁসার দান অপরিসীম। এর প্রভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক বিস্তারে মনোযোগী হয়। নতুন বাণিজ্যপথের সন্ধান এবং নব নব ভৌগোলিক আবিষ্কারে **পর্তুগাল** অগ্রণী হয়। পর্তুগালের মত স্পেনও জলপথে ভৌগোলিক আবিষ্কারে মনোযোগী হয়। কালক্রমে স্পেন ও পর্তুগাল নিজ নিজ আবিষ্কৃত দেশ সমূহে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইউরোপের ব্যবসা এই দুই দেশের বণিকদের হাতে চলে যায়। স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে যাতে নবাবিষ্কৃত দেশগুলি নিয়ে বিরোধ না বাধে সেজন্য ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু মহামান্য পোপ এক নির্দেশ দেন যে ৫০° পশ্চিম দ্রাঘিমার পূর্বদিকের অর্ধ পৃথিবী পর্তুগালের আর পশ্চিম দিকের অর্ধ পৃথিবী স্পেনের হবে। ফলে এসিয়া আফ্রিকা প্রভৃতিতে পর্তুগালের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল এবং আমেরিকা মহাদেশ স্পেনের আওতায় এল। বলাই বাহুল্য যে উভয় দেশেই পোপের বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলে দুই দেশের মধ্যে আবিষ্কৃত দেশগুলির অধিকার নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়নি। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই দেশের মধ্যে **টর্ডিসিলাসের** সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে পোপের নির্দেশের কিছু রদবদল করা হয়; এবং ব্রেজিলের ওপর পর্তুগালের অধিকার স্পেন মেনে নেয়। পরবর্তীকালে ফরাসী, ইংরাজ ও অন্যান্য জাতি পোপের এই নির্দেশ মানতে রাজী হয়নি।

পোপের লাইন

তারা স্পেন ও পর্তুগীজদের পরাজিত করে বিভিন্ন মহাদেশে নিজ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। সতের শতকের শেষভাগ হতে উপনিবেশ নিয়ে ইংরেজদের সাথে হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সংগ্রাম শুরু হয়। এই সংগ্রাম আঠারো শতকে বিশেষ ভাবে দেখা দেয়। প্রধানতঃ তিনটি যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ (১৭০১-১১); অষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩)। এই যুদ্ধ তিনটি স্থির করে দিল যে জলপথে এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে ফ্রান্সকে পিছনে রেখে ইংল্যাণ্ড এগিয়ে যেতে থাকবে।

১৭৪০-এর পূর্বে ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা: রেনেঁসার পরে, প্রায় দুশো বছর উত্থান-পতনময় পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র এগিয়ে যায় নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির পথে। এই সময় ইউরোপে জাতীয়

রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটে। এই রাষ্ট্রগুলি ধর্মীয় বন্ধুত্ব ও একতাবোধ ত্যাগ করে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছিল। রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেই রাজতন্ত্র শক্তিশালী হয়। জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ব্রাডেনবার্গ-প্রাশিয়া এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। ইটালীতে ছোট ছোট রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এই সব রাজ্যের ওপর প্রাধান্য স্থাপন করবার জন্য স্পেন ও ফ্রান্স বিশেষ চেষ্টা করে এবং পরিশেষে এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে আপস হয়। হল্যাণ্ড একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণতি হয় এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও উপনিবেশ বিস্তারে মনোযোগী হয়।

ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা

বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই অবশ্য হল্যাণ্ডের পতন শুরু হয়। বেলজিয়াম অষ্ট্রিয়ার অধীনে চলে যায় এবং অষ্ট্রিয়ান নেদারল্যাণ্ড নামে পরিচিত হয়। সুইডেন এককালে ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র থাকলেও দ্বাদশ চার্লসের রাজত্বকালে এর পতন ঘটে। রোমানফ বংশীয় রাজা প্রথম পিটারের রাজত্বকালে (১৬৮২-১৭২৫) রাশিয়া শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয় এবং দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারলাভ করতে থাকে। পিটার তুরস্ক ও সুইডেনের মধ্যে সংগ্রাম করে রাশিয়ার উন্নতির পথ প্রশস্ত করেন। পোল্যাণ্ড এককালে পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল। কিন্তু সতের শতকে এর ক্ষমতা একেবারে কমে যায়। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ক্ষমতা এককালে অপ্রতিহত ছিল। তবে ষোল শতক হতেই অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বাঁধন শিথিল হয়ে গেল। ষোল ও সতের শতকে স্পেনীয় শক্তির উত্থান হয়েছিল। সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে স্পেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু তাঁর অদূরদর্শী ধর্মনীতি স্পেনীয় সাম্রাজ্যের ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করল। পর্তুগাল এককালে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক শক্তি ছিল। ষোল শতকে পর্তুগালের শক্তির অবসান ঘটে। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল স্পেনের অধীনে চলে যায়। ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল যদিও স্বাধীনতা ফিরে পায়, তবুও তার আগেকার গৌরব আর ফিরে এল না। ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্য সতের শতকে সর্বাধিক ব্যাপ্তি লাভ করে। কিন্তু এর পর হতেই এই সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু হয়।

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপ: এই যুগে ইউরোপে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং সমাজের রূপ পাল্‌টাতে থাকে। অবশ্য এই যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সমাজ ছিল শ্রেণী-ভিত্তিক

সমাজ; অভিজাতরাই এই সমাজে মধ্যমণি ছিল। অবশ্য এক এক রাজ্যে তাদের ক্ষমতা ও প্রভাবে তারতম্য ছিল। রাজনীতিতে ক্ষমতাশীল পোল্যাণ্ড, সুইডেন, হাঙ্গেরী এবং ইংল্যাণ্ডের অভিজাতদের সাথে ফ্রান্স, ডেনমার্ক বা স্পেনের অভিজাতদের তুলনা চলে না। শেষোক্ত দলের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিশেষ ছিল না। প্রাশিয়ার অভিজাতদের রাষ্ট্রের নানাকার্যে সাহায্য করতে হত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কৃষকদেরও অবস্থায় তারতম্য ছিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স-এর কৃষকদের কিছুটা স্বাধীনতা ছিল কিন্তু অন্যান্য দেশে তাদের অবস্থা মধ্যযুগের ভূমিদাসদের মত ছিল। এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সমাজে শহরের মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রভাব। সামুদ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা এবং সম্পদ বৃদ্ধি পেল। মধ্য ইউরোপে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ মধ্যবিত্তশ্রেণী হতেই হত। এই যুগের সাহিত্যে ও চারুকলায় পরিবর্তনশীল সমাজের রূপ ও প্রকৃতি ফুটে ওঠে। সাহিত্যে রোমান্টিক চিন্তাধারা দেখা দিল। শহরে শহরে পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হল। নতুন পদ্ধতিতে শহর তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হল। গদ্য সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায় এবং যে চিন্তাধারা এর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হল তাকে Enlightenment বলা হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানুষের প্রজ্ঞা বা বিচার শক্তিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া। সব কিছু পরীক্ষা সাপেক্ষ বলে মনে করা হল। ফলে অঙ্কশাস্ত্রের চেয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বেশি কদর হল। পূর্ববর্তী শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাগুলি এই যুগে জনপ্রিয় হয়। নিউটনের জ্যোতির্বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা, ভোলটেয়ার ব্যক্ত করলেন। ইতিহাসশাস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেল। ঠিক বিজ্ঞানের পরই এটিকে মূল্যবান মনন-শাস্ত্র বলেই মনে করা হল। ভিকো এই যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। সমাজবিজ্ঞান বিশেষ উন্নতি লাভ করেনি। মন্তেস্কুর 'স্পিরিট অব ল' একটি বিরাট বিফলতা। Enlightenment-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা খুব গভীর ছিল না। 'স্বাধীনতা'কে যদিও জন্মগত অধিকার বলা হত, কিন্তু সাম্যের ওপর জোর দেওয়া হত না। বিভিন্ন প্রকারের সরকার সম্বন্ধে তারা বিশেষ আলোচনা করেননি। এদের অর্থনৈতিক চিন্তাধারাও প্রগতিশীল ছিল না।

স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রই এযুগের বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সের রাজতন্ত্রকে যদিও স্বৈরতন্ত্রের সেরা উদাহরণ বলে মনে করা হত, কিন্তু ফ্রান্সের রাজতন্ত্র পূর্বেকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। স্পেন, ডেনমার্ক বা প্রাশিয়ার রাজাদের মত ক্ষমতা ফ্রান্সের রাজার ছিল না। কিন্তু এরা সকলেই রাশিয়ার জারের চেয়ে কম ক্ষমতাবান

ছিলেন। ইংল্যাণ্ড ও সুইডেনে রাজতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক হতে চলেছিল। এই যুগের শেষদিকে রাজতন্ত্র বেশি করে নৈপুণ্য দেখাতে সুযোগ পায়। কিন্তু বিচার ব্যবস্থায় প্রায় সর্বদেশেই অরাজকতা ছিল। প্রাশিয়া ছাড়া প্রায় সব দেশেই রাজস্ব বিভাগে বিশৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া যায়। একারণে যুদ্ধের পর প্রায় সমস্ত দেশই অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনা হতে মুক্তি পেত না এবং অধিকাংশ দেশেরই বিদেশী সাহায্য প্রয়োজন হত। ফ্রান্সের রাজা ছিলেন সবচেয়ে সম্পত্তিশালী রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু এই শতাব্দীর শেষের দিকে এই ফ্রান্সের রাজাই এমন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন যার ফলে ফ্রান্সের রাজতন্ত্র বিলোপ হল।

বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনী এবং যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতিতে এই যুগের সরকার ও সামাজিক কাঠামোর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। এই যুগে যুদ্ধ যুদ্ধই ছিল, তার সাথে কোন ধর্মীয় বা নৈতিক আদর্শকে যোগ দেওয়া হয়নি, যেমন সপ্তদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে করা হয়েছিল। যে যুদ্ধগুলি এই যুগে সংঘটিত হয়েছিল তার প্রায় অধিকাংশগুলিই সিংহাসনের উত্তরাধিকার সম্পর্কীয়। একারণে অধিকাংশ যুদ্ধগুলির লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট এবং যুদ্ধশেষে রাজ্যাংশ হস্তান্তর প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবে ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুদ্ধগুলিকে কোন ক্রমেই Total war বা সার্বিক যুদ্ধ বলা যায় না। সাধারণ লোক এর দ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হত না এবং যুদ্ধের সাথে তাদের সম্পর্কও সরাসরি থাকত না।

সার্বিক যুদ্ধ-এর প্রতি বিরূপতা এবং রাজবংশের স্বার্থ ভিন্ন যুদ্ধ না করবার ইচ্ছার ফলে ইঙ্গ-ফরাসী ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব-এর পরিসর সীমাবদ্ধ থাকে, সামগ্রিক যুদ্ধ ঘটতে পারেনি। এই দ্বন্দ্ব শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেই তবে এটা প্রথমে প্রচ্ছন্ন ছিল। ইউট্রেক্টের সন্ধির ফলে ইংল্যাণ্ডে-এর বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে লাভ হয় এবং এর পর হতেই ইংল্যাণ্ড নিজের ক্ষমতা বাড়াতে থাকে। তবে এটা মনে করলে ভুল হবে যে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের পরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড প্রধান স্থান অধিকার করে। ফ্রান্সের শক্তিও কম ছিল না। ইউরোপে অষ্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধ বিশেষ জটিল হয়ে পড়ে, কারণ এর সাথে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িয়ে ছিল। এই যুদ্ধ কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারেনি। এই যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে স্বীকৃতি পায়। প্রাশিয়ার পক্ষে কূটনৈতিক তৎপরতা চালান সম্ভব হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় কূটনৈতিক বিপ্লব সম্ভব হয়।

ইউরোপ ১৭৪০
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
বাল্টিক সাগর
ফিনল্যাণ্ড
সেন্টপিটার্স
মস্কো
রাশিয়ার সাম্রাজ্য
ভলগা নদী
আয়ারল্যাণ্ড
লণ্ডন
অস্ট্রিয়ান নেদারল্যাণ্ড
বার্লিন
ওয়ারস
পোল্যাণ্ড
বোহিমিয়া
ভিয়েনা
ভারসাইলস
প্যারিস
ফ্রান্স
সুইজারল্যাণ্ড
অস্ট্রো হাঙ্গেরী
মোলডাভিয়া
ভেনিস
ওয়ালাচিয়া
দানিয়ুব নদী
কৃষ্ণ সাগর
বোসনিয়া
সারভিয়া
বুলগেরিয়া
কনস্টান্টিনোপল
মাদ্রিদ
লিসবন
স্পেন
কর্সিকা
রোম
মেজর্কা
মিনার্কা
সার্দিনিয়া
নেপলস
সিসিলি রাজ্য
তুর্কী সাম্রাজ্য
ভূমধ্য সাগর
আলজিরিয়া
ফেজ
মরক্কো
আলজিরিয়া
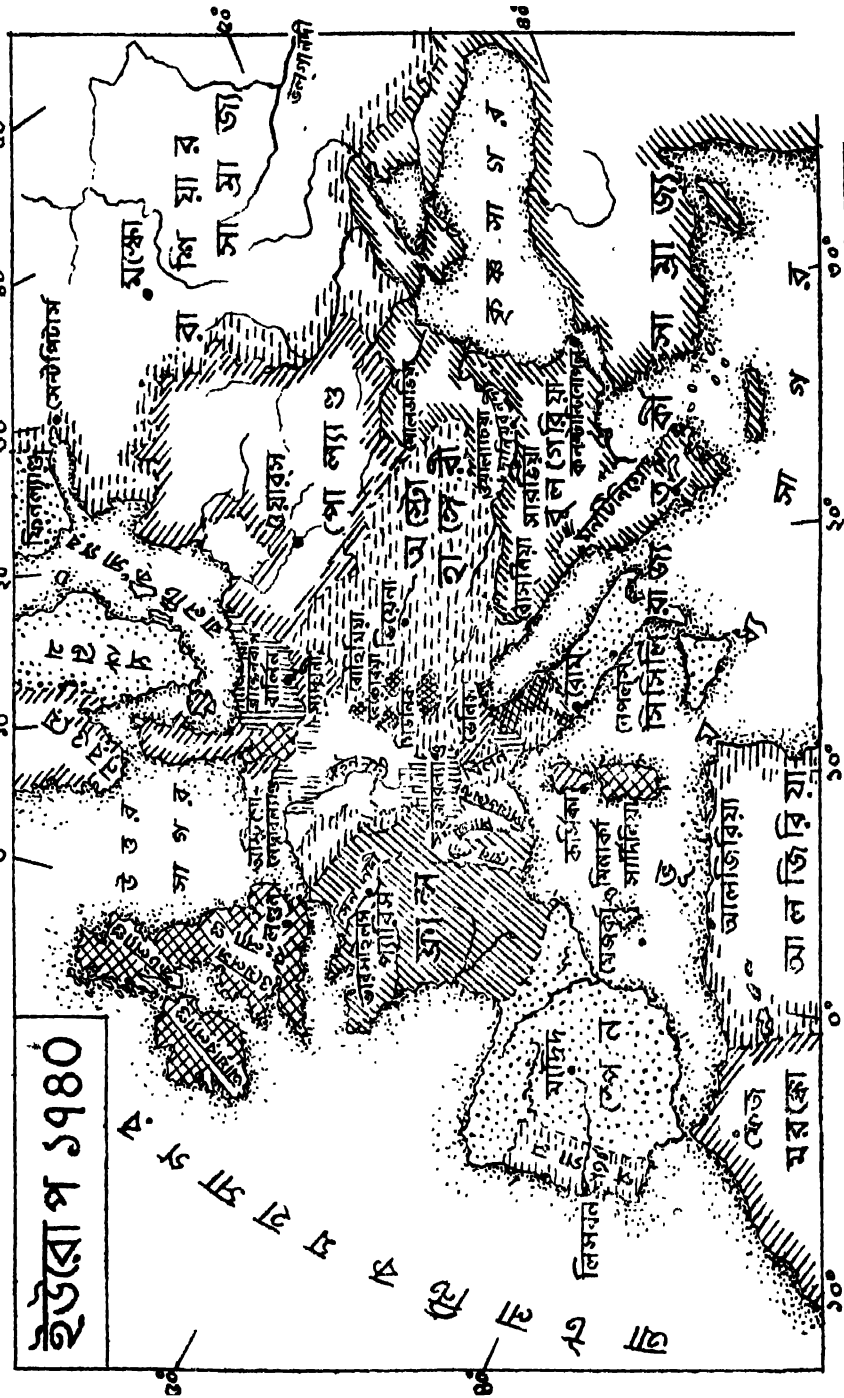
প্রথম অধ্যায়

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ (১৭৪০-৪৮)

1. **What is the importance of the year 1740 in European History.**

Ans.: ইউরোপের ইতিহাসে ১৭৪০ বছরটি নানাদিক হতে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ এই বছরটিতেই ইউরোপের দুটি শক্তিশালী রাজ্যের (জার্মানী ও অস্ট্রিয়া) সিংহাসন খালি হয় এবং যাঁরা সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁরা তাঁদের কার্যাবলীর দ্বারা ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেন। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক (পরে এঁকে 'দি গ্রেট' আখ্যায় ভূষিত করা হয়) সাইলেসিয়া আক্রমণ করে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। ফলে ইউরোপের ইতিহাসে পুনরায় যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হল। ১৭৪০-এর পর হতে ইউরোপের ইতিহাস পুনঃ পুনঃ যুদ্ধের ইতিহাস। এই যুদ্ধ অবশ্য একটানা চলেনি; কিন্তু সংক্ষেপে বলা চলে যে ১৭৪০ হতে ১৮১৫ পর্যন্ত ইউরোপে শান্তির হাওয়া বেশিদিন ধরে বইতে পারেনি। দ্বিতীয়ত এই বছরটিতে অষ্টাদশ শতকের যে সব সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় ছিল সে সব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই সব সমস্যাগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ড বিষয়ক সমস্যা, নিকট প্রাচ্য সমস্যা এবং ইংল্যাণ্ড ও স্পেন এবং ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধীয় সমস্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৃতীয়ত, ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাসেও এই বছরটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জার্মানির পক্ষে এই বছরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাশিয়া যে জার্মানী সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র হতে চলেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল এবং প্রাশিয়াকে কেন্দ্র করে গোটা জার্মানীতে এক নবযুগের সূচনা হল। ফলে জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য কমে আসতে থাকে। প্রাশিয়ার এই উত্থান জার্মানীর অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষমতাশালী হবার আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হল। সংক্ষেপে এই বছরটি প্রাশিয়ার শক্তির দিক হতে বয়ঃসন্ধিকাল ঘোষণা করল। অস্ট্রিয়ার ইতিহাসেও এই বছরটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে মেরিয়া থেরেসা এই বছরেই আরোহণ করেন এবং প্রাশিয়ার সাথে প্রকাশ্য সংঘর্ষ শুরু

১৭৪০ এর তাৎপর্য

বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে

হয়। এই সংঘর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু কালক্রমে অষ্ট্রিয়ার অবস্থা একটু ভালোর দিকে যায়। এই বৎসরটিতে ইংল্যাণ্ড ও স্পেনের মধ্যে বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়ে সংঘর্ষ বিশেষভাবে দেখা যায় এবং অদূর ভবিষ্যতে উপনিবেশ ও বাণিজ্য নিয়ে উভয়ের মধ্যে সংঘাতের ইঙ্গিত দেয়। রাশিয়ার ইতিহাসেও এই বছরটি স্মরণযোগ্য। রাশিয়া ইতিমধ্যেই বল্‌টিক সাগরে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করে মধ্য ইউরোপের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে আগ্রহী হয়। মধ্য ইউরোপে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এই অঞ্চলের অষ্ট্রিয়া প্রমুখ রাষ্ট্রগুলির চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে বলকান অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার সাথে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মত-পার্থক্য ও সংগ্রাম শুরু হয়। আবার এই বছরেই রুশ সম্রাজ্ঞী অ্যানের মৃত্যু হয়। পরিশেষে বলা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুর্বেকার তুলনায় কিরূপ বৃদ্ধি পাবে তা ১৭৪০ অব্দেই কিছুটা জানতে পারা যায়।

2. Describe the causes and results of the war of Austrian Succession. Give a short background of the war of Austrian Succession. Comment on the Treaty of Aix-la-Chapelle. Was it a truce ?

Ans. ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের কর্ণধার ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করলে ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি-বর্গ নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়াসী হয়; এবং অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ফলে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথমে এই যুদ্ধ অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে পরে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি অল্পবিস্তর ভাবে এই যুদ্ধে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে এবং এক ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হয়। এই যুদ্ধ একটি মাত্র কারণে ঘটেনি। বিভিন্ন কারণের সম্মিলিত ফলস্বরূপ এই যুদ্ধ দেখা দেয়।

যুদ্ধের পটভূমি ঃ অষ্ট্রিয়া, মোরাভিয়া ও সাইলেসিয়া সমেত বোহেমিয়া, হাঙ্গেরী, মিলেনীজ ও অস্ট্রীয় নেদারল্যাণ্ড (বেলজিয়াম) নিয়ে গঠিত ছিল হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য অটুট রাখতে হলে হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল একান্তভাবে কাম্য। এতদিন অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় ও ভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে একমাত্র বন্ধন ছিল হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের প্রতি সাধারণ আনুগত্যবোধ। সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের কোন পুত্র সন্তান

ছিল না। সে কারণে তাঁর রাজত্বকালের সবচেয়ে জটিল সমস্যা ছিল—তাঁর মৃত্যুর পরে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে উত্তরাধিকারী স্থির করা। একারণে তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা মেরিয়া থেরেসা যাতে নির্বিবাদে সমগ্র অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হতে পারেন তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি 'প্রাগমেটিক স্যাংশান' নামে এক বিধি প্রণয়ন করে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মতি আদায়ে ব্রতী হন। এর জন্য বহু ক্ষেত্রে নিজের সাম্রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বিভিন্ন রাষ্ট্র তাঁর জীবিতকালে প্রাগমেটিক স্যাংশান মেনে নিলেও তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সমস্যাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ দেখা দিল।

প্রাগমেটিক স্যাংশান কি এবং কেন

ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পর মেরিয়া থেরেসার কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী অষ্ট্রিয়ার সিংহাসন দাবী করে বসেন। এদের মধ্যে প্রধান হলেন বেভেরিয়ার চার্লস। তিনি ষষ্ঠ চার্লসের ভাইঝি মেরিয়া এনেলিয়াকে বিবাহ করেছিলেন এবং এই সম্বন্ধের ওপর ভিত্তি করে তিনি অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে বসবার দাবি জানালেন। অবশ্য স্মরণ করা যেতে পারে যে মেরিয়া এনেলিয়া তাঁর বিবাহের সময় হ্যাপসবার্গ সিংহাসনের ওপর তাঁর দাবি ছেড়ে দেন। স্যাক্সনীর ইলেক্টার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক অগস্টান ও ষষ্ঠ চার্লসের আর এক ভাইঝিকে বিবাহ করেন। ১৭৩৩ খৃঃ অগস্টাস অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে তাঁর দাবি ছেড়ে দেন এই বিনিময়ে যে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনের ওপর তাঁর দাবি ষষ্ঠ চার্লস মেনে নেবেন। কিন্তু ষষ্ঠ চার্লসের মৃতুর সাথে সাথে অগস্টাস তাঁর স্ত্রীর অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের ওপর অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হন এবং অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোহেমিয়া তাঁর পাওয়া উচিত বলে ঘোষণা করেন। স্পেনের রাজা পঞ্চম ফিলিপও চুপ করে থাকলেন না। তিনি ঘোষণা করলেন যেহেতু ষষ্ঠ চার্লসের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু ঘটেছে সে কারণে হ্যাপস্‌বার্গ বংশের অষ্ট্রীয় শাখার আর কেউ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের প্রকৃত দাবিদার নেই, সে কারণে হ্যাপস্‌বার্গ বংশের স্পেনীয় শাখার প্রধান হিসেবে তিনিই অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

মেরিয়া থেরেসার প্রতিদ্বন্দ্বীরা

রাশিয়া, হল্যাণ্ড, গ্রেটবৃটেন, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি প্রাগমেটিক-স্যাংশন গ্রহণ করে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে মেরিয়া থেরেসার দাবি স্বীকার করে। ফ্রান্স ছিল অষ্ট্রিয়ার বহুদিনের শত্রু। একারণে ফ্রান্স প্রথমে প্রাগমেটিক স্যাংশন স্বীকার করেনি। ১৭৩৫ খৃঃ-এ ফ্রান্স মেরিয়া থেরেসার দাবি মেনে নিল। কিন্তু এর আগে ফ্রান্স বেভেরিয়ার ইলেকটারের সাথে একটি চুক্তি করেছিল, যার

দ্বারা ইলেকটারকে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। ১৭৩৮ খৃঃ-এ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ফ্লিউরি 'দাবি' এবং 'আইনগত অধিকার' এ দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে বেভেরিয়ার ইলেকটারের সাথে ফ্রান্সের চুক্তি ও প্রাগমেটিক-স্যাংশন গ্রহণের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। ১৭৪০-এ অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের মৃত্যু হলে বেভেরিয়ার ইলেকটার পূর্বচুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্সের সাহায্য চান। অবশ্য এ সাহায্য তিনি পাবেন কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ফ্লিউরি এই সময় ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করছিলেন। তিনি এই সময় একই সাথে দুটি নীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সময় ফ্রান্সের নীতি ছিল স্পেনের পক্ষ অবলম্বন করে বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। বেভেরিয়ার ইলেকটারকে সাহায্য করলে অষ্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ অনিবার্য বলে তিনি মনে করলেন এবং শুধু অষ্ট্রিয়া নয় বৃটেনের সাথেও ফ্রান্সের যুদ্ধ বেধে উঠবে—সেটি ফ্রান্স চাইছিল না। কিন্তু ঠিক এই সময় ফ্রান্সের রাজনীতিতে ফ্লিউরির প্রভাব কমে যায়। পঞ্চদশ লুই যারা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাইছিল তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ফ্লিউরির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অগ্রসর হল।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থপর নীতি

প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়াম ষষ্ঠ চার্লসের নিকট হতে জুলিগ, রাজ্য ও র‍্যাভেনস্টাইন পাবার প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে ১৭২৬ খৃঃ এ প্রাগম্যাটিক-স্যাংশন স্বীকার করেন। কিন্তু ষষ্ঠ চার্লস এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাশিয়াকে এই রাজ্যগুলি পেতে সাহায্য করেননি যার ফলে প্রাশিয়ার পরবর্তী রাজ ফ্রেডারিক প্রাগম্যাটিক স্যাংশন মানতে রাজি হলেন না এবং হঠাৎ সাইলেসিয়া আক্রমণ করে যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করলেন।

হ্যাপস্‌বার্গ সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও অনৈক্য এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ। ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যু হবার প্রায় সাথে সাথেই যুদ্ধ বেধে ওঠে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যদিও ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্র প্রাগমেটিক-স্যাংশন মেনে নিয়েছিল কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মত দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। ষষ্ঠ চার্লসের উচিত ছিল এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী, সমৃদ্ধ রাজকোষ এবং এক রাষ্ট্রবোধ সৃষ্টি করা। কিন্তু তিনি এ না করে মিত্রতার মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে অযথা সময় ও অর্থব্যয় করেন। মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে যখন বসলেন তখন অষ্ট্রিয়ার অবস্থা খুবই সঙ্গীন এমন কি তাঁর প্রজারাও তাঁকে প্রথমে পছন্দ করল না। মেরিয়া থেরেসা ছিলেন

অষ্ট্রিয়ার দুর্বলতা

অল্পবয়স্কা ও অনভিজ্ঞ। এর ফলে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে ভাগাভাগি করে নেবার জন্য বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিগুলি চেষ্টা করল।

মেরিয়া থেরেসা বৃটেনের রাজা দ্বিতীয় জর্জের সাহায্য পাবেন বলে আশা করেছিলেন। কারণ ইংল্যাণ্ডের রাজা আবার জার্মানীর অন্তর্গত হ্যানোভার রাজ্যের ইলেকটার ছিলেন এবং এদিক হতে প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে তিনি শঙ্কিত ছিলেন। কিন্তু এই সময় ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের প্রাশিয়া বিরোধী মনোভাব বিশেষ ছিল না। বৃটেন চিন্তিত ছিল তার উপনিবেশ নিয়ে এবং ফ্রান্স যাতে স্পেনের পক্ষে যুদ্ধে না নামে তার জন্য প্রচেষ্টা চলল এবং তারা আরও ভাবল যে, এই ফরাসী ভীতি দূর হতে পারে যদি ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারে।

ইংল্যাণ্ডের নীতি

মেরিয়া থেরেসা রাশিয়া ও স্যাক্সনীর সাহায্য পাবেন বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সাহায্য তখন পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী এ্যানের ১৭৪০ খৃঃ-এ মৃত্যু হলে রাশিয়ার সিংহাসনে অনভিজ্ঞ ষষ্ঠ আইভান বসেন। একারণে রাশিয়া নিজের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ফলে রাশিয়ার পক্ষে অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করা যে সম্ভব নয় তা প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক ভাল করেই বুঝতেন। অতএব অষ্ট্রিয়ার দুর্বলতা ও ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ বলে মনে করা যেতে পারে।

রাশিয়ার নীতি

যুদ্ধের জন্য দায়ী কে ঃ যদি কোন একজনকে এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করা যায় তবে তিনি হচ্ছেন প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। কারণ তিনি ছিলেন প্রাশিয়ার সর্বময় কর্তা এবং নীতি নির্ধারক। ইচ্ছা করলে তিনি এই যুদ্ধ বন্ধ রাখতে পারতেন। সাইলেসিয়ার কিছু অংশের ওপর প্রাশিয়ার দুর্বল দাবি ছিল। এই দাবিকে বড় করে দেখিয়ে ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি করবার জন্য চেষ্টা করলেন। সাইলেসিয়া একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশ ছিল এবং এর ওপর প্রাশিয়ার লোভ বহুদিনের। ফ্রেডারিক যুদ্ধের দ্বারাই এই অঞ্চল প্রাশিয়ার অধীনে আনবার জন্য ব্যস্ত হলেন। তবে তিনি ভেবেছিলেন যে, হঠাৎ সাইলেসিয়া আক্রমণ করলে বেশি যুদ্ধ না করেই তিনি এটি পেয়ে যাবেন। একারণে সাইলেসিয়া আক্রমণের অব্যবহিত পরেই ফ্রেডারিক মেরিয়া থেরেসার নিকট এক প্রস্তাব পাঠান। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া পেলে তিনি মেরিয়া থেরেসার অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের দাবি মেনে নেবেন এবং এমন কি তাঁর সাম্রাজ্য যাতে রক্ষা পায় তার

যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে ফেললেন। বৃটেন প্রথমেই দুটি নীতি গ্রহণ করল—(ক) প্রাশিয়ার সাথে অষ্ট্রিয়ার আপস, (খ) সার্ডিনিয়ার সাথে অষ্ট্রিয়ার আপস। এর পর বৃটেন সরাসরিভাবে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করে (১৭৪২)। এর ভেতর অষ্ট্রিয়া ফরাসী বাহিনীকে বোহেমিয়া হতে বিতাড়িত করে এবং বেভেরিয়া অধিকার করে নেয়। অষ্ট্রিয়ার এই জয়ে ফ্রেডারিক ভীত হলেন এবং আশঙ্কা করলেন মেরিয়া থেরেসা হয়ত ক্লিন শ্নেলেনডর্ট (Klein Schnellendort) এর চুক্তি আর মেনে চলবেন না এবং সাইলেসিয়া পুনরধিকার করে নেবেন। এ কারণে তিনি এই চুক্তিটি অগ্রাহ্য করে পুনরায় অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন এবং জাসলাউ (Czaslau) -এর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া বাহিনীকে পরাজিত করলেন। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের কথায় মেরিয়া থেরেসা ফ্রেডারিকের সহিত ব্রেসল্‌-এর (Treaty of Breslau) সন্ধি স্বাক্ষর করলেন। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ফ্রেডারিক গ্লাৎস (Glatz) সহ সাইলেসিয়া পেলেন এবং তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সার্ডিনিয়া রাজ এমানুয়েল মিলানিজ মডেনা পার্মা ও পিয়াসেঞ্জাত পাবার প্রতিশ্রুতিতে অষ্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি করলেন। ব্রেসল্‌ এর সন্ধির সাথে সাথে প্রথম সাইলেসিয়ান যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইংল্যাণ্ডের নীতি

ব্রেসল্‌-এর সন্ধি

যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়: দ্বিতীয় সাইলেসিয়ান যুদ্ধ: প্রাশিয়া যুদ্ধ হতে সরে দাঁড়ালে এবং ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করায় অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। এই যুদ্ধের লক্ষ্যও অনুরূপ হল—ইংল্যাণ্ডের লক্ষ্য হল ইউরোপে ফ্রান্সের আধিপত্য ধ্বংস করা এবং তার উপনিবেশগুলি কেড়ে নেওয়া; অষ্ট্রিয়ার লক্ষ্য হল ফ্রান্সের নিকট হতে তার হৃত রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করা। সংক্ষেপে বলা চলে যে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ এই সময় হতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ও অষ্ট্রিয়া-ফরাসী দ্বন্দ্বে পরিণত হল। অবশ্য প্রাশিয়া পুনরায় এই যুদ্ধে যোগ দিলে এটি অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়া দ্বন্দ্বেও পরিণত হয়। এই তিন দ্বন্দ্বের আশু সমাধান সম্ভব ছিল না বলে এই যুদ্ধ সাময়িক ভাবে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হলেও ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হিসেবে দেখা দেয়।

তিন দ্বন্দ্ব

ইতিমধ্যে অষ্ট্রীয় বাহিনী বোহেমিয়া হতে ফরাসী বাহিনীকে বিতাড়িত করে ব্যাভেরিয়া আক্রমণ করল এবং সহজেই এর রাজধানী মিউনিক দখল করে নিল।

ব্যাভেরিয়ার ইলেকটার যিনি সপ্তম চার্লস হিসেবে পবিত্র রোমক সম্রাট বলে গণ্য হচ্ছিলেন, নিজ দেশ হতে পালিয়ে গেলেন। অষ্ট্রিয়ার সাফল্যে ইংল্যাণ্ড উল্লসিত হয় এবং তার নেতৃত্বে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি রাষ্ট্রজোট স্থাপিত হল। ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড, সার্ডিনিয়া ও স্যাক্সনী এই পাঁচটি রাষ্ট্র ওরমসের চুক্তি (Treaty of Worms) দ্বারা ঘোষণা করল যে তারা এক জোটে ইউরোপে শক্তিসাম্য রক্ষা করবে এবং প্রাগম্যাটিক্ স্যাংশন বলবৎ রাখবে। এই উদ্দেশ্যে যে অর্থব্যয় হবে তা ইংল্যাণ্ড যোগাবে।

ওরমসের সন্ধি ও তার প্রতিক্রিয়া

ফ্রান্স ও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল না। ওরমসের চুক্তির প্রত্যুত্তর হিসেবে স্পেন ও ব্যাভেরিয়াকে নিয়ে সে ফনটেনব্লুর চুক্তি স্বাক্ষর করল। এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স ও স্পেনের সম্বন্ধ আরও নিবিড় হল এবং অনেকের মতে এই চুক্তিটি বুরবোঁ পারিবারিক মৈত্রীরই (Family Compact) এক নতুন সংস্করণ। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ফ্রান্স ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (১৭৪৪ খৃঃ) এবং পূর্বে যদিও ফরাসী সৈন্য অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। সে ব্যাভেরিয়াকে সাহায্য করবার অজুহাত দেখিয়ে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল।

ফ্রেডারিক এই দুবছর নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। কিন্তু ইউরোপে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রজোটের আবির্ভাবে তিনি শঙ্কিত হলেন। তাছাড়া ওরমসের চুক্তিতে ব্রেসলেউ চুক্তির কোন উল্লেখ না থাকায় তিনি স্বভাবতই মনে করলেন যে মেরিয়া থেরেসা সাইলেসিয়া পুনরধিকারের চেষ্টা চালাবেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অষ্ট্রীয় বাহিনীর বিজয়ে তিনি আরও ভীত হলেন। এছাড়া, অষ্ট্রিয়া স্যাক্সনীর সহিত ওয়ারস চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এই চুক্তিটির উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়াকে উভয়ের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া। এই অস্বাভাবিক ও অনিশ্চিত অবস্থা হতে উদ্ধার পাবার জন্য ফ্রেডারিক প্রথমে ব্যাভেরিয়ার ইলেকটার, স্যাক্সবারের রাজা, প্যালাটিনের ইলেকটার ও হেসির শাসকদের নিয়ে একটি আত্মরক্ষা মূলক রাষ্ট্রজোট স্থাপন করলেন। এটির নাম হল Union of Frank fort কিন্তু এতেও ফ্রেডারিক নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি ফ্রান্সের সাথে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন এবং অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করে নেবার জন্য এদের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি হল। এই সব চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ফ্রেডারিক আবার অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন। ফ্রেডারিকের সামরিক শক্তির সামনে অষ্ট্রিয়া দাঁড়াতে পারল না। সাইলেসিয়া পুনরধিকারের

যুদ্ধে প্রাশিয়ার যোগদান

জন্য আবার অষ্ট্রিয়ান সৈন্যবাহিনী হোহেনফ্রিডবার্গের যুদ্ধে ফ্রেডারিকের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। ফ্রেডারিকের এই জয়ে ইংল্যাণ্ড তার নীতি পরিবর্তন করল এবং হ্যানোভার রক্ষা করার জন্য তাঁর সাথে মৈত্রী স্থাপনে আগ্রহী হল। তাছাড়া, ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধাদর্শ ছিল ফ্রান্সকে পরাজিত করা, প্রাশিয়াকে নয়। এ কারণে ১৭৪৫ খৃ:-এর মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ড 'হ্যানোভারের কনভেনশান' স্বাক্ষর করে সাইলেসিয়ার ওপর ফ্রেডারিকের অধিকার স্বীকার করে নিল, প্রতিদানে ফ্রেডারিক সম্রাট পদের জন্য মেরিয়া থেরেসার স্বামী ফ্রান্সিসকে সমর্থন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ইংল্যাণ্ডের সাথে মৈত্রী স্থাপনের ফলে ফ্রেডারিক অধিকতর সাহসী হলেন এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ শুরু করলেন। সুরের (Sohr) যুদ্ধে তিনি অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং এর পরই স্যাক্সনীর রাজধানী অধিকার করে নেন। অগত্যা সাইলেশিয়া পুনরুদ্ধারের চেষ্টা নিষ্ফল ভেবে মেরিয়া থেরেসা ১৭৪৫ খৃ: এর ২৫শে ডিসেম্বর ফ্রেডারিকের সহিত ড্রেসডেনের সন্ধি করলেন। এই সন্ধি দ্বারা দ্বিতীয় সাইলেসিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটল।

ড্রেসডেনের সন্ধি

ড্রেসডেন সন্ধির শর্তাবলী: (ক) সাইলেসিয়া প্রাপ্তির বিনিময়ে ফ্রেডারিক মেরিয়া থেরেসার স্বামী ফ্রান্সিসকে পবিত্র রোমক সম্রাট হিসেবে মেনে নেবেন। (খ) অগস্টাস ফ্রেডারিকের নিকট হতে স্যাক্সনী ফিরে পেলেন। অবশ্য তাঁকে যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ হিসেবে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ফ্রেডারিককে দিতে হল।

ফলাফল: (ক) ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া দখল করলেন সত্য কিন্তু অন্যান্য স্থান তাঁকে ছেড়ে দিতে হল। ড্রেসডেনের সন্ধি প্রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি করল; প্রাশিয়া ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। (খ) অষ্ট্রিয়া সাইলেসিয়া হারাল বটে কিন্তু বোহেমিয়া ফিরে পেল; হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য সাইলেসিয়া বাদে অটুট রইল এবং ইটালীতে অষ্ট্রিয়া তার সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হল। পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাটপদ হ্যাপসবার্গ বংশ পুনরুদ্ধার করল।

ফ্রান্সের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। ফ্রেডারিকের বিশ্বাসঘাতকতা ফ্রান্স ভুলতে পারল না। ব্যাভেরিয়া ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করায়, হ্যানোভার কনভেনসেন গড়ে ওঠায় এবং সম্রাটপদে মেরিয়া থেরেসার স্বামী নির্বাচিত হওয়া ইত্যাদিতে ফ্রান্সের কূটনীতিক চরম পরাজয় বলে মনে করা হল।

ইংল্যাণ্ড হ্যানোভারের নিরাপত্তা রক্ষা করতে সমর্থ হল। ফ্রান্সের মৈত্রীবন্ধন হতে ফ্রেডারিককে সপক্ষে আনবার ফলে ইংল্যাণ্ডের অনেক সুবিধা হল।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ঃ অষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ ১৭৪৮ খৃঃ পর্যন্ত চলেছিল। ড্রেসডেনের সন্ধির পর প্রাশিয়া ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে ইউরোপের এই যুদ্ধ সীমিত হয়ে পড়ে। ইটালী ও পোলাণ্ডে এই যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশ্য ইউরোপের এই যুদ্ধের তরঙ্গ আমেরিকা ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত ছড়ায়। ভারতে ফরাসীদের জয় হয়, আমেরিকায় ইংল্যাণ্ড সাফল্যলাভ করে। ১৭৪৮-এর শুরুতেই বিবদমান রাষ্ট্রগুলি শান্তি স্থাপনে বাধ্য হয়। ফলে ১৭৪৮ এর অক্টোবর মাসে বৃটেন ও হল্যাণ্ডের তৎপরতায় **আয়-লা-স্যাপেলের** সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং স্পেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া জেনোয়া, মোডেনা ও সার্ডিনিয়া কর্তৃক এটি গৃহীত হল।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

সন্ধির শর্তাবলীঃ (ক) প্রাশিয়া গ্রাৎজ সমেত সাইলেসিয়া পেল। (খ) সার্ডিনিয়া পেল স্যাভয়, নীস এবং লম্বার্ডির কিছুটা অংশ। (গ) মডেনার ডিউক তাঁর হারানো রাজ্য ফিরে পেলেন। (ঘ) জেনোয়া আগেকার অবস্থায় ফিরে গেল। (ঙ) মেরিয়া থেরেসার স্বামীকে পবিত্র রোমক সম্রাটরূপে এবং দ্বিতীয় জর্জকে বৃটেনের রাজারূপে ফ্রান্স মেনে নিল। (চ) হল্যাণ্ড ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে সীমান্তে দুর্গ গড়বার অধিকার পেল। ফ্রান্স ডানকার্কের সামরিক ব্যবস্থা ভেঙে দিতে বাধ্য হল; বেলজিয়াম হতে সৈন্য সরিয়ে নিল এবং ষ্টুয়ার্ট বংশধরদের ফ্রান্স হতে তাড়িয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। (ছ) ভারতে মাদ্রাজ ইংরেজরা ফিরে পেল এবং আমেরিকায় লুইসবার্গ ও কেপবৃটন ফ্রান্স ফিরে পেল। (জ) স্পেন ফ্রান্সিসকে সম্রাট হিসেবে মেনে নিল এবং স্পেনীয় আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা অটুট রইল।

সন্ধির সমালোচনাঃ আয়-লা স্যাপেল সন্ধি ইউরোপে স্থিতাবস্থা রক্ষা করল। কার্লাইলের ভাষায়—To Frederick Silesia, as to the rest, wholly as they were". ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া হস্তগত করলেন, যদিও তিনি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেননি। চুক্তিপত্রটিতে বলা হয় যে যতক্ষণ না ফ্রেডারিক এই চুক্তি স্বীকার করেন ততদিন সাইলেসিয়ায় তাঁর আইনগত অধিকার স্বীকৃত হবে না। ফ্রেডারিক কিন্তু চুক্তি পত্রটি মেনে নিলেন না। ফ্রান্স ও বৃটেন উভয়েই অবশ্য এতে প্রাশিয়ার ওপর বিরক্ত হল না, কারণ তারা ভাবল ভবিষ্যতে যুদ্ধ তাদের মধ্যে বাধলে ফ্রেডারিকের সাহায্য একে অন্যের বিরুদ্ধে পেতে পারে। সংক্ষেপে স্বাক্ষরকারী কোন শক্তিই বিশ্বাস করল না যে এই সন্ধিটি ইউরোপের শান্তি বজায় রাখবে।

সন্ধিটির প্রতি অবিশ্বাস

সার্ডিনিয়ার রাজা এমানুয়েল Finale ও Piacenza না পেয়ে অসন্তুষ্ট হলেন। ফ্রান্স ইটালীতে নয়া ব্যবস্থা মেনে নিল বলে স্পেন তার প্রতি রুষ্ট হল। মেরিয়া থেরেসা ইংল্যাণ্ডের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন এই কারণে যে ইংল্যাণ্ডই ব্রেসল চুক্তি ঘটিয়ে প্রাশিয়াকে আস্কারা দিয়েছিল এবং ইংল্যাণ্ডের জিদের ফলে আয়-লা-স্যাপেলের চুক্তিতে অষ্ট্রিয়াকে সাইলেসিয়া ছাড়তে হল। এছাড়া ইটালীতে সার্ডিনিয়ার শক্তি সঞ্চয় এবং পার্মায় স্পেনীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা মেরিয়া থেরেসা খোলামনে স্বীকার করে নিতে পারলেন না।

ফ্রান্স এই চুক্তিতে একেবারেই সন্তুষ্ট হল না। তার কোনরূপ লাভ ত হলই না বরঞ্চ সে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ও অপমানিত হল। অষ্ট্রিয়ার শক্তি ধ্বংস করবার যে পরিকল্পনা সে গ্রহণ করেছিল তা ব্যর্থ হল। ফ্রান্সের বিরাট আর্থিক ক্ষতি হল।

ইংল্যাণ্ডের যেরূপ অর্থক্ষয় ও লোকক্ষয় হল তার তুলনায় লাভ বিশেষ হল না। অবশ্য নৌশক্তিতে সে যে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণিত হল।

আয়-লা-স্যাপেলের সন্ধি সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি এবং তৎকালীন আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির মীমাংসাও এর দ্বারা হয়নি। ফলে এই সন্ধিটিকে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।* অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সাথে জড়িত ছিল ইংল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপনের প্রশ্ন কিন্তু এই সন্ধিতে এ সম্বন্ধে কোন স্থায়ী মীমাংসা হয় নি। এই প্রশ্নের স্থায়ী সমাধানের জন্য পুনরায় আর এক যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। অষ্ট্রিয়া সাইলেসিয়া হারানোর শোক ভুলতে পারল না এবং তার এই হৃত রাজ্যাংশটি পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বদাই চেষ্টিত থাকল; অন্যদিকে প্রাশিয়ার মনেও এই ভয় থেকে যায় যে অষ্ট্রিয়া সুযোগ পেলেই সাইলেসিয়া পুনরধিকার করে নেবে। ফলে আয়-লা-স্যাপেলের সন্ধির পর এই রাজ্যগুলির মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ আরো বৃদ্ধি পেল, একে অন্যকে ঘৃণা করতে লাগল। আবার প্রাশিয়ার এই অভাবনীয় উন্নতিতে ফ্রান্স ঈর্ষান্বিত হল। কেন না, প্রাশিয়ার উন্নতির অর্থ হল ইউরোপে ফ্রান্সের প্রভাব প্রতিপত্তির হ্রাস। প্রাশিয়া অবশ্য ফ্রান্সের এই বৈরী মনোভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিল। অতএব আয়-লা-স্যাপেলের সন্ধি একদিকে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এবং অপর দিকে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত দূরীভূত হল না; বরঞ্চ এই স্বার্থ সংঘাত আরও বেড়ে গেল। ফলে এই চারটি শক্তিই পুনরায় যুদ্ধের জন্য তৎপর হল। দীর্ঘ আট বছর ধরে যুদ্ধ

সন্ধিটির ব্যর্থতা ও তার কারণ

* 'The Peace of Aix-La Chapelle was merely a truce' Hassal.

চলার পরও ইউরোপের মানচিত্রে বিশেষ কিছু পরিবর্তন এই চুক্তি আনতে পারেনি। হ্যাসালের কথায়—'এত রক্তক্ষয় করে, এত অর্থব্যয় করে এত ঘটনার পরে আর কোন যুদ্ধই সংগ্রামী পক্ষদ্বয়কে প্রায় পূর্বাবস্থায় রেখে যায় নি।'*

তবে একথা মনে রাখতে হবে যে আয়-লা স্যাপেলের সন্ধি একেবারে নিরর্থক হয়নি। এই সন্ধি তৎকালীন ইউরোপের রাজনীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে গ্রহণ করেছিল। প্রথমতঃ এই সন্ধিপত্রটি প্রাশিয়াকে একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিল। ইটালীতে সার্ডিনিয়াকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে মনে করা হল। ইউরোপের ইতিহাসে রাশিয়ার গুরুত্ব মেনে নেওয়া হল এবং অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করা হল না।

অষ্ট্রিয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের ফলাফলঃ এই যুদ্ধের ফলাফল কেবলমাত্র রাজ্য হস্তান্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ফল হল অষ্ট্রিয়ার শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভাব। ১৭৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকবে কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছিল, অষ্ট্রিয়া যেন এই সময় ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ১৭৪৮-এ অষ্ট্রিয়া এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকল এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি এটি স্বীকার করে নিল। এই যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা ও নীতিতে পরিবর্তন এল এবং সামরিক শক্তিতে সে বেশ বলীয়ান হল। মেরিয়া থেরেসা নিজেকে মহৎ শাসক হিসেবে প্রমাণ করলেন। এই যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ আরও তীব্র হয়। মেরিয়া থেরেসা সাইলেসিয়া হারানোর শোক ভুলতে পারলেন না, এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হতে থাকলেন। ফ্রেডারিক নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। তিনি অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং প্রাশিয়াকে শক্তিশালী করবার দিকে মন দিলেন।

অষ্ট্রিয়ার দিক হতে

অস্ট্রো প্রাশিয়ান বিরোধ ইটালীতে শান্তি নিয়ে এল। ১৭৪৮ খৃঃ এর পর মেরিয়া থেরেসা বুঝতে পারলেন যে তাঁর প্রাশিয়া বিরোধী নীতি কার্যকরী করতে হলে ইটালীতে বুরবোঁ। হ্যাপসবার্গ বংশদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটাতে হবে। এটা তার পক্ষে সহজেই দূর করা সম্ভব হয়েছিল কেননা ইটালীতে যে সব অঞ্চল

*'Never perhaps did any war after so many great events and so large a loss of blood and treasure, and in replacing the nations engaged in it so nearly in the same situation as they held at first.' —Hassal.

অষ্ট্রিয়ার অধীনে ছিল সেগুলিতে বহিঃশত্রুর আক্রমণের কোন আশঙ্কা ছিল না।

ইটালীতে

ইটালীতে বুরবোঁ রাজারা কলহ চাইছিল না।একারণে ইটালীতে শান্তি বজায় থাকল। সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লসও এটি মেনে নিলেন কারণ তাঁর পক্ষে এককভাবে অষ্ট্রিয়াকে ইটালী হতে তাড়ান সম্ভব ছিল না।

ফ্রান্সের ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল কি হল তা সহজে বোঝা শক্ত। আয়-লা স্যাপেলের সন্ধিতে যা দাঁড়াল তার সাথে ফ্রান্সের ১৭৪১-এর আশা আকাঙ্ক্ষার বেশ পার্থক্য দেখা যায়। অবশ্য ফ্রান্স এই যুদ্ধে কিছু হারালো না। পরোক্ষ ফল

ফ্রান্স

হিসেবে বলা যায় যে ফ্রান্স কোন কোন দিক হতে লাভবান হল—যেমন জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য কিছুটা কমে গেল; এটা তৎকালীন ফরাসীরা তাদের জয় বলে মনে করল। যদিও ফ্রান্স ফ্রান্সিসের পবিত্র রোমক সম্রাট নির্বাচনে বাদ সাধতে পারল না, তবুও এটা ঠিক যে ফ্রান্সিস পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে পারেননি।

হল্যাণ্ডের পক্ষে এই চুক্তিপত্র আশীর্বাদস্বরূপ মনে হয়। তার পক্ষে আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। হল্যাণ্ড এর পর হতে তার বৈদেশিক নীতি ইংল্যাণ্ড কর্তৃক পরিচালিত হতে দিল না; এটা ফ্রান্সের পক্ষে আশাব্যঞ্জক হল। এদিকে অষ্ট্রিয়া ইংল্যাণ্ডের প্রতি রুষ্ট হল। এই বিভেদ তীব্র করবার জন্য ফ্রান্স তৎপর হল। ফ্রান্সের পক্ষে এগুলি শুভ হলেও যুদ্ধ শেষে দেখা গেল

হল্যাণ্ডে ও অন্যান্য দেশে

ফ্রান্সের মিত্র বলে কেউ নেই যার ওপর ভবিষ্যতে সে নির্ভর করতে পারে। এমনকি স্পেনের সাথেও তার সম্পর্কের অবনতি ঘটল। আয়-লা-স্যাপেলে ফ্রান্স স্পেনের জন্য কিছুই করেনি বলে স্পেনবাসী মনে করল। যাই হোক, যুদ্ধশেষে ফ্রান্স অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবেই রয়ে গেল এবং ইংল্যাণ্ড তাকেই প্রধান শত্রু বলে মনে করতে থাকল। যদিও এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সাথে হল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার পূর্ণ সহযোগিতা ছিল না, তবুও ইংল্যাণ্ডের শাসকবর্গ আগেকার শক্তিজোটেই বিশ্বাস অটুট রাখলেন। তাঁরা মেরিয়া থেরেসার প্রাশিয়া বিরোধী নীতির তীব্রতা সম্বন্ধে অজ্ঞ রইলেন এবং তাঁর প্রাশিয়া বিরোধী নীতিও গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। ইংল্যাণ্ড ইউরোপে ফ্রান্সকেই ভয় করত এবং মনে করল যে অষ্ট্রিয়াও আগেকার মত ফরাসী বিরোধী নীতি অনুসরণ করুক। এ ধারণা অবশ্য ভুল প্রমাণিত হল যখন পঞ্চদশ লুই অষ্ট্রিয়া বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করলেন। তবে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বা তার অব্যবহিত পরে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া গেল না যা হতে এটা প্রমাণ

হতে পারে। অতএব এটা বলা ঠিক হবেনা যে কূটনৈতিক বিপ্লব দেখা দিল যেহেতু মেরিয়া থেরেসা এটা চাইলেন।*

More Question with Hints

1, Give a short background of the war of Austrian Succssion. (অষ্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার সমস্যা—প্রাগম্যাটিক-স্যাংশন—সম্ভাব্য দাবিদারগণ—ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মনোভাব ২নং প্রশ্নের দ্বিতীয় হতে সপ্তম অনুচ্ছেদ দেখ।)

2. Describe the war of Austrian Succession up to the treaty of Breslau (1742).

(১৭৪০-এ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অবস্থা—ফ্রেডারিক কর্তৃক সাইলেসিয়া আক্রান্ত—যুদ্ধ শুরু—যুদ্ধের ব্যাপকতা—প্রথম সাইলেসিয়ান যুদ্ধ—মলউইজের যুদ্ধ, ফ্রান্স, ব্যাভারিয়া ও স্যাক্সনীর যুদ্ধে যোগদান—ইংল্যাণ্ডের নিরপেক্ষ নীতি—প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সাথে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি—অষ্ট্রিয়ার পক্ষে ইংল্যাণ্ডের যোগদান—ইংল্যাণ্ডের কূটনীতি ফ্রেডারিকের শান্তি প্রস্তাব—ব্রেসল-এর সন্ধি।

3. Give an account of the European political situation which precipitated the war of Austrian Succession.

Ans. ২নং প্রশ্নের দ্বিতীয় হতে সপ্তম অনুচ্ছেদ দেখ।

4. What were the major issues involved in the war of Austrian Succession and how far they were solved by the war ?

Ans. ২নং প্রশ্নের যুদ্ধের গতি বাদ দিয়ে দেখ।

5. Critically estimate Prussia's part in the war of Austrian Succession. Can you justify the second Silesian war ?

Ans. ২নং প্রশ্নের যুদ্ধের জন্য দায়ী কে, দ্বিতীয় সাইলেসিয়ার যুদ্ধ এবং আয়-লা স্যাপেলের সন্ধির সমালোচনা দেখ।

6. What were this effects of the War of Austrian Succession.

Ans. ২নং প্রশ্নের অষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারী যুদ্ধের ফলাফল দেখ।

---

* 'It did not follow that a diplomatic revolution was bound to occur because Maria Theresa wanted it'. —The New Cambridge Modern History Vol VII

দ্বিতীয় অধ্যায়

কূটনৈতিক বিপ্লব ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

1. What was the Diplomatic Revolution? How far was it effected? How far was it a Revolution? *Or*, Critically analyse the circumstances leading to the Diplomatic Revolution of 1756.

Ans. ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফলে ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরে যে দলবাঁধার রীতি চলে আসছিল তার ব্যতিক্রম ঘটল এবং নতুন করে শক্তিজোটের আবির্ভাব হল। এই নব শক্তিজোট বেশ কিছু বছর ধরে টিকে ছিল। ১৭৫৬ খৃঃ-এ অষ্ট্রিয়া ইংল্যাণ্ডের সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করল এবং ফ্রান্স প্রাশিয়ার মিত্রতা পরিত্যাগ করল। ১৭৪৮ হতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এইভাবে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে নয়া রাজনৈতিক মিত্রতা স্থাপিত হওয়ার ফলে ইউরোপের শক্তিসাম্য যে রূপ পরিগ্রহ করে তাকেই আমরা কূটনৈতিক বিপ্লব বলে থাকি।

কাকে বলা হয়

আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস যখন হতে শুরু হয় ঠিক তখন হতেই ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে স্বার্থ সংঘাত দেখা দেয়। ফ্রাঙ্কো-অষ্ট্রিয়ান দ্বন্দ্ব আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে যেন এক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার বলে মনে করা হত। সুতরাং এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যখন মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হল তখন সেটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বিপ্লব বলা অন্যায় হবে না।

কেন বলা হয়

কূটনৈতিক বিপ্লবের পটভূমি: কূটনৈতিক বিপ্লব হঠাৎ ঘটেনি, ম্যাডাম পম্পাডোরের দেমাকে আঘাত লাগার জন্যও এটি দেখা যায়নি বা কোন ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিও এটি ছিল না। এর ক্ষেত্র তৈরি করতে বহু দিন লেগেছিল, অষ্ট্রিয়া উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় তার বীজ উপ্ত হয় এবং আয় লা স্যাপেলের সন্ধির পর হতে প্রায় আট বছর ধরে এর প্রস্তুতিপর্ব চলে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রস্তুতি পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে ইউরোপের শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।

কূটনৈতিক বিপ্লবের মূলে ছিল প্রধানত তিনটি দ্বন্দ্ব—(১) অষ্ট্রো প্রাশিয়ান দ্বন্দ্ব, ফ্রাঙ্কো প্রাশিয়ান দ্বন্দ্ব, এবং ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব।

অস্ট্রো-প্রাশিয়ান দ্বন্দ্ব : প্রাশিয়ার অকস্মাৎ অভ্যুত্থান জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি কমিয়ে দিল। এতদিন পর্যন্ত জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার রাজবংশ বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে আসছিল। প্রাশিয়ার সাবালকত্ব প্রাপ্তির ফলে জার্মানীতে নেতৃত্বের সমস্যা দেখা দিল। জার্মান রাজ্যগুলি আর অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করতে চাইল না। এর ভেতর প্রাশিয়ার হাতে পরাজয় অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের দুর্বলতা প্রকাশ করল। অস্ট্রিয়া ছিল বহু-জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র। স্বভাবতই প্রাশিয়ার উত্থানে এই বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতি উদ্বুদ্ধ হল, নতুন প্রেরণা পেল এবং তারা জাতীয় রাষ্ট্রের জন্য দাবি জানাল। ফলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। অস্ট্রিয়া এটি কিছুতেই চাইল না। নিজের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্যও তার পক্ষে প্রাশিয়াকে পঙ্গু করে রাখা দরকার হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত সাইলেসিয়া হারানোর শোক মেরিয়া থেরেসা ভুলতে পারলেন না। সাইলেসিয়া পুনরধিকার করার তিনি সংকল্প নিলেন, কারণ অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে অটুট রাখতে হলে এটার আবশ্যকতা অগ্রাহ্য করা যায় না। সাইলেসিয়া হারানোর ফলে মেরিয়া থেরেসা হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়ার ওপর বেশি করে নির্ভর করতে লাগলেন। তিনি আশঙ্কা করলেন যে এই অঞ্চল দুটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এই সুযোগে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাবে। অতএব কেবলমাত্র সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের জন্যই অস্ট্রিয়া প্রাশিয়া-বিরোধী নীতি গ্রহণ করল না, অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে ভবিষ্যৎ ভাঙনের হাত হতে রক্ষা করবার জন্যও এই নীতির দরকার হয়ে পড়ে। এর ফলেই অস্ট্রিয়া তার সুপ্রাচীন বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন আনতে ব্যস্ত হল।

দ্বন্দ্বের কারণ

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান দ্বন্দ্ব : অস্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে ফ্রান্স প্রাশিয়ার মিত্র ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই কিন্তু এই মিত্রতায় ভাঙন দেখা যায়। ফ্রান্স জার্মানীতে প্রাশিয়ার প্রভাবপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাক, এ চাইছিল না এবং প্রাশিয়া যখন অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে এক শক্তিশালী ইউরোপীয় রাষ্ট্রে পরিণত হল তখন ফ্রান্স প্রাশিয়ার এই উত্থানে ভীত হল এবং সে যা আশা করে আসছিল যে অস্ট্রিয়ার বদলে ফ্রান্সই জার্মানীতে প্রভুত্ব স্থাপন করবে তা এর সাথে সাথে ধূলিসাৎ হল। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে প্রাশিয়া জয়লাভ করে এবং লাভবান হয়; কিন্তু ফ্রান্স এই যুদ্ধে কোন কৃতিত্বই দেখাতে পারেনি, বরং ইউরোপীয় রাজনীতিতে তার প্রভাবপ্রতিপত্তি কমে যায়। এ কারণে ফ্রান্স তার

দ্বন্দ্বের কারণ

পররাষ্ট্র নীতিতে এমন পরিবর্তন আনতে চাইল যার ফলে আয়-লা স্যাপলে ঘোষিত তার ভাগ্যের পরিবর্তন আসে।

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব: ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে উপনিবেশ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব বহুদিনের। আয়-লা স্যাপেলের সন্ধিতে এই দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা সম্ভব হয়নি। এমনকি আয়-লা স্যাপেলের সন্ধির পরবর্তী কয়েক বছর যখন ইউরোপে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি বজায় ছিল তখনো আমেরিকা ও ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানিদ্বয় যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ভারতে দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ এই সময় দেখা দেয়। ফ্রান্সকে এই দ্বন্দ্বে পরাজিত করবার জন্য ইংল্যাণ্ড এক নতুন নীতি গ্রহণ করল। সে ফ্রান্সের সামরিক শক্তি যাতে ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করল। বলাই বাহুল্য, ফ্রান্সকে ইউরোপের যুদ্ধে ব্যস্ত রাখতে হলে প্রয়োজন ছিল এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের মিত্রতা। অষ্ট্রিয়ার মত দুর্বল রাষ্ট্রের পক্ষে এটা সম্ভব হবে না বলে ইংল্যাণ্ড মনে করল। সুতরাং নতুন শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রাশিয়ার ওপর ইংল্যাণ্ডের নজর পড়া অস্বাভাবিক ছিল না।

দ্বন্দ্বের কারণ

উপসংহারে বলা যায় যে উপরি-উক্ত তিনটি দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে না; প্রত্যেকটি সমাধানের জন্য অপেক্ষা করছিল এবং এই সমাধান করবার প্রয়াসের ফলেই দেখা দিল কূটনৈতিক বিপ্লব এবং এই ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের ফলেই ইউরোপে আবার যুদ্ধ ঘনিয়ে এল, যে যুদ্ধ সাতবছর ধরে চলেছিল।*

কূটনৈতিক বিপ্লবের প্রস্তুতি: ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের কূটনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে চারটি মৈত্রীবন্ধনে পরিবর্তন দেখা যায়—(ক) অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্বে ভাঙন; (খ) অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে বোঝাপড়া ও মিত্রতা স্থাপন, (গ) ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক শিথিল এবং (ঘ) ইংল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপনে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি। কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ও অস্ট্রো-প্রাশিয়ান দ্বন্দ্ব ঠিকই রয়ে গেল বরঞ্চ আরও তীব্র হল।

অস্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্বে ভাঙন: অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ডের বন্ধুত্ব শিথিল হতে দেখা যায় এবং যুদ্ধ শেষে এটি প্রকট হয়ে ওঠে যার ফলে অষ্ট্রিয়া তার পুরানো মিত্র বৃটেনকে পরিত্যাগ

*"The situation which was to produce the Seven Years' War was composed of Three Rivalries". —*Guedalla*.

করে পুরাতন শত্রু ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল। ইংল্যাণ্ডের সাথে অস্ট্রিয়ার এই সম্পর্কচ্ছেদের কারণ অবশ্য ছিল।

অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে উভয়ের মধ্যে পুরানো মিত্রতা ঠিকভাবে কার্যকরী ছিল না। একে অন্যের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল। তা ছাড়া যুদ্ধশেষে উভয়ে নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হল এবং দেখল অস্ট্রিয়ার যা স্বার্থ বৃটেনের তা নয় এবং বৃটেনের স্বার্থ অস্ট্রিয়ার নিকট অলীক। অস্ট্রিয়া মনে করল যুদ্ধের সময় বৃটেন তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং বৃটেন মনে করল অস্ট্রিয়া বৃটেনের নিকট হতে অযথা অর্থ নিয়ে তা অপব্যয় করেছে। তার ওপর যে দায়িত্ব বৃটেন দিয়েছিল (অর্থের বিনিময়ে) তা সব পালন করেনি। বৃটেন চেয়েছিল অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করুক, কিন্তু অস্ট্রিয়া তা না করে প্রাশিয়াকে ধ্বংস করবার জন্যই ব্যস্ত ছিল। অস্ট্রিয়া অবশ্য অভিযোগ করল যে বৃটেন তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ তাকে দেয়নি। বরঞ্চ প্রাশিয়াকে সাইলেসিয়া দিয়ে দেবার জন্য তার ওপর অহেতুক চাপ দেয়। বৃটেনের শাসকবর্গ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে যুদ্ধ শেষে অস্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষা করা হবে, কিন্তু আয়-লা স্যাপেলের সন্ধিতে সেরূপ কিছুই করা হল না। যুদ্ধ চলার সময়েই ইঙ্গ-অস্ট্রীয়ান মিত্রতায় একটি নতুন বিষয় দেখা দিল যার ফলে এই মিত্রতার পরিবর্তন উভয়ের নিকটই আবশ্যক বলে মনে হল। ইউরোপে প্রাশিয়ার শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুত্থানে জার্মানীতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুটি শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হল—অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয়েই জার্মানীতে প্রাধান্য স্থাপনে তৎপর হল। ফলে বৃটেনের নিকট অস্ট্রিয়ার মূল্য কেবল কমেই গেল না, বৃটেন মনে করল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়াই দাঁড়াবার শক্তি রাখে, অস্ট্রিয়া নয়। একারণে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌রা অস্ট্রিয়ার বদলে প্রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনের কথা বলতে থাকে। ১৭৫০-এর পর ইঙ্গ-অস্ট্রিয়ান সম্পর্ক আরও শিথিল হল। এর অন্যতম কারণ হল দুটি দেশের স্বার্থ একরকম ছিল না। বৃটেন তার উপনিবেশ ও বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ; আর অস্ট্রিয়া মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে নিজের প্রাধান্য রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। নেদারল্যাণ্ড (বেলজিয়াম) রক্ষার জন্য বৃটেন যেমন চিন্তিত ছিল অস্ট্রিয়া তেমন ছিল না। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কৌনিজ বৃটেনকে জানিয়ে দিলেন যে অস্ট্রিয়া বেলজিয়ামকে রক্ষা করবার জন্য বিশেষ কিছু করতে পারবে না। কৌনিজের পত্রের উত্তর বৃটেন না দেওয়ায় অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাথে কি ভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন হতে

অস্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ডের বন্ধুত্বে ফাটল ধরার কারণ

পারে তার জন্ত চেষ্টা করতে থাকল। ফলে ইঙ্গ-অষ্ট্রিয়ান মিত্রতা ভেঙ্গে গেল।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান সম্পর্কে কাটল: অষ্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময়েই ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিক ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে বোহেমিয়া রক্ষা করবার সুবিধা করে দেয়। ১৭৪৪ খৃঃ-এ ফ্রান্স এর প্রতিশোধ নেয়। আলসেস হতে অষ্ট্রিয়াকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে বোহেমিয়া হতে ফ্রেডারিককে বিতাড়িত করবার অষ্ট্রিয়ান পরিকল্পনার সফলতার জন্য ফ্রান্স অনেকাংশে দায়ী ছিল। অতএব এই দুই শক্তির মিতালি যে সম্ভব নয় তা বোঝা গেল। ফ্রান্স চাইত ফ্রেডারিক হ্যানোভার আক্রমণ করুন এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে লড়ুন। কিন্তু ফ্রেডারিক এটি মোটেই চাইতেন না। তিনি মনে করলেন যে দুর্বল ফ্রান্সের সাথে মিত্রতা বজায় রাখার কোন অর্থ হয় না। এ কারণে তিনি নতুন মিত্রের চেষ্টায় থাকলেন। কিন্তু ফ্রান্স তাড়াতাড়ি কিছু করতে রাজী হল না। প্রাশিয়ার সাথে মিত্রতা সে সহজে পরিত্যাগ করল না। এমনকি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সাথে প্রাশিয়া ওয়েস্টমিনস্টারের যে সন্ধিটি স্বাক্ষরিত করে তারও বিশেষ সমালোচনা করেনি, তবে ফ্রেডারিকের আচরণের সমালোচনা না করে থাকতে পারল না। কারণ ফ্রান্সকে না জানিয়ে তার পরম শত্রুর সাথে প্রাশিয়া চুক্তি করায় ফ্রান্সকে অপমান করা হয়েছে বলে মনে করা হল। এই সুযোগে অষ্ট্রিয়া তার প্রাশিয়া-বিরোধী প্রস্তাব ফ্রান্সের নিকট পেশ করল কিন্তু ফ্রান্স সাথে সাথেই এটি গ্রহণ করেনি; ফ্রান্স মধ্য ইউরোপে ভারসাম্য রক্ষা করবার পক্ষপাতী ছিল। প্রাশিয়াকে ধ্বংস করলে এই ভারসাম্য নষ্ট হবে বলে সে মনে করল। কিন্তু ফ্রান্স বেশিদিন অষ্ট্রিয়ার প্রস্তাব গ্রহণ না করে থাকতে পারল না। পঞ্চদশ লুই ও প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিককে তাঁর কার্যাবলীর জন্য শাস্তি দিতে ব্যগ্র হলেন। ফলে প্রাশিয়ার সাথে ফ্রান্সের পুরাতন মিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল।

প্রাশিয়ার সাথে ফ্রান্সের মতবিরোধ

অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন: কুটনৈতিক বিপ্লবের সার্থক রূপায়ণ ঘটল যখন অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের মিত্রতা স্থাপনে সফলতা অর্জন করল। এই মিত্রতা স্থাপন অকস্মাৎ ঘটেনি। ১৭৪৮ হতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত এর জন্য অষ্ট্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করে যেতে হয়েছিল। ফ্রান্স সহজে তার পুরাতন শত্রুকে মিত্রে পরিণত করতে চাইল না। কারণ এই পরিবর্তনের সাথে জড়িয়ে ছিল ফ্রান্সের বহু পুরাতন পররাষ্ট্র নীতি।

মেরিয়া থেরেসার ও কৌনিজের অবদান

অষ্ট্রিয়ার দিক হতে ফ্রান্সের সাথে মিত্রতা স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয় কৌনিজের ১৭৪৮-এ লেখা স্মারকপত্র (Memorandum) দ্বারা। এর ওপর ভিত্তি করেই অষ্ট্রিয়া তার নয়া কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত করে এবং পরিশেষে জয়যুক্ত হয়। এটা অনস্বীকার্য যে কৌনিজের কূটনৈতিক পরামর্শ ও তৎসক্রান্ত কার্যাবলী এই কূটনৈতিক বিপ্লব সংঘটনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তন করা উচিত কিনা এবং কিরূপ হওয়া সঙ্গত সে সম্বন্ধে তাঁর মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ চান। মন্ত্রিসভায় কৌনিজ ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রীরা এরূপ মত ব্যক্ত করলেন—অষ্ট্রিয়ার শত্রু তিনটি—ফ্রান্স, প্রাশিয়া ও তুরস্ক। এদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য অষ্ট্রিয়ার প্রয়োজন হচ্ছে ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, রাশিয়া ও স্যাক্সনীর সাথে মিত্রতা রক্ষা ক'রে চলা। কৌনিজ ছিলেন মন্ত্রীদের মধ্যে বয়োঃকনিষ্ঠ। তিনি তাঁর স্মারকপত্রে উপরি-উক্ত মতের বিরোধিতা করে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল তিনটি। প্রথমত, অষ্ট্রিয়াকে সাইলেসিয়া পুনরধিকার করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য যে যুদ্ধ করতে হবে তাতে ইংল্যাণ্ডের সাথে চলতি মৈত্রী কোন সাহায্য করবে না এবং তৃতীয়ত এই পটভূমিকায় ফ্রান্সের সাথে অষ্ট্রিয়ার মৈত্রীবদ্ধ হওয়া অষ্ট্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য। ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য কৌনিজ যুক্তি দেখান যে, প্রাশিয়ার অভ্যুত্থানের ফলে অষ্ট্রিয়া এক বিরাট বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, তার মর্যাদা নষ্ট হতে চলেছে; এ কারণে অষ্ট্রিয়ার প্রধান শত্রু এখন ফ্রান্স নয়, প্রাশিয়া। প্রাশিয়ার নিকট হতে হারানো সাইলেসিয়া কেড়ে নিতে হবেই। ইংল্যাণ্ড এ বিষয়ে অষ্ট্রিয়াকে কোন সাহায্যই করতে পারবে না, কারণ ইংল্যাণ্ড তার ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। হল্যাণ্ড নিজের সমস্যা নিয়ে বিব্রত; রাশিয়ার জারিনা এলিজাবেথের ওপর বিশ্বাস রাখা কঠিন। অতএব সাইলেসিয়া উদ্ধারের জন্য যখন অষ্ট্রিয়ার পুরাতন মিত্রদের সাহায্য পাওয়া যাবে না তখন ফ্রান্সের সাথে অষ্ট্রিয়ার মৈত্রীস্থাপন একান্ত ভাবে কাম্য। ফ্রান্স কেন অষ্ট্রিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে তার ইঙ্গিতও কৌনিজ তাঁর স্টেট পেপারে দেন। প্রথমত ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং এই যুদ্ধে ফ্রান্সের পক্ষে একজন শক্তিশালী মিত্রের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া উভয়েই ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্র; সুতরাং ধর্মের ভিত্তিতেও এই দুই রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব স্থাপন হতে পারে। তৃতীয়ত সামরিক ক্ষেত্রে প্রাশিয়া ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী; একারণে প্রাশিয়ার শত্রু অষ্ট্রিয়ার সাথে ফ্রান্সের মিতালী হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কৌনিজের স্মারক-পত্রের মূল বক্তব্য

বলা বাহুল্য, মেরিয়া থেরেসা কৌনিজের প্রস্তাবটি সাগ্রহে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অগ্রসর হবার জন্য সর্ববিধ স্বাধীনতা দিলেন। ১৭৫৯-এর শরৎ কালে কৌনিজ প্যারিসে গেলেন যাতে তাঁর পরিকল্পনাটি কার্যকরী হতে পারে। তিনি ফরাসীরাজ ও তাঁর পরামর্শদাতাদের বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে প্রাশিয়ার মত সুবিধাবাদী রাষ্ট্রের সাথে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা ঠিক নয়। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন—ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান মিত্রতাবন্ধনে ভাঙন ধরাতে পারলেন না। তাঁর এই দৌত্যের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছিলেন যে ফ্রান্স যাতে পূর্বেকার মত অষ্ট্রিয়াকে ঘৃণা না করে এটা তিনি ফ্রান্সকে বোঝাতে পেরেছেন।

ফ্রাঙ্কো-অষ্ট্রিয়ান বন্ধুত্ব কিভাবে দেখা দিল

এরপর কৌনিজ তাঁর কূটনৈতিক তৎপরতা সমানে চালিয়ে গেলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃটেনকে জানিয়ে দেন যে অষ্ট্রিয়া নেদারল্যাণ্ডকে (বেলজিয়াম) রক্ষা করবার জন্য কেবলমাত্র ২০০০০ সৈন্য মোতায়েন করতে পারে, অবশ্য বৃটেনকেও একই সংখ্যক সৈন্য পাঠাতে হবে; পরন্তু তাকে রাশিয়ার সাথে এবং প্রাশিয়া ছাড়া অন্যান্য জার্মান রাজ্যগুলির সাথে মিত্রতামূলক চুক্তি করতে হবে এবং ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেটা বৃটেনকে দেখতে হবে। বৃটেন এর উত্তরে কিছু না জানালে কৌনিজ প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাথে অষ্ট্রিয়ার মিতালি কিভাবে সম্ভব তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলেন। এমনকি তিনি পঞ্চদশ লুই-এর জামাতাকে নেদারল্যাণ্ড দিয়ে ইটালীতে তিনি আয়-লা স্যাপেলের সন্ধিতে যে সব স্থান পেয়েছিলেন সেগুলি অষ্ট্রিয়ার অধীনে আনতে চাইলেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ড রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাঁর এই পরিকল্পনা খুব গোপনে ম্যাডাম পম্পাডুরের মারফৎ পঞ্চদশ লুইকে জানান হল। ফ্রান্সের পক্ষে কৌনিজের এই প্রস্তাব গ্রহণ করায় ক্ষতি ত ছিল না, বরঞ্চ লাভ ছিল অনেক। ইতিমধ্যে বার্নিস নামে ম্যাডাম পম্পাডুরের এক প্রীতিভাজন ব্যক্তি অষ্ট্রিয়ায় ফরাসী রাজদূত নিযুক্ত হলেন এবং ধীরে ধীরে অষ্ট্রিয়ার সাথে ফ্রান্সের মিতালি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হল এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভার্সাই চুক্তি সম্পাদিত হল। এই চুক্তি সম্পাদনের কৃতিত্ব অবশ্য পঞ্চদশ লুইয়েরও কম ছিল না। বার্নিস এই নতুন ব্যবস্থা পুরোপুরি সমর্থন করেছেন তাঁর স্মৃতি-আলেখ্যে। তাঁর মতামতই যে তৎকালীন ফরাসী সরকারের মত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফ্রান্স এই চুক্তি করতে আগ্রহী হয়েছিল কেননা ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড ও প্রাশিয়া গোপনে এক পারস্পরিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু পঞ্চদশ লুই সহজে পুরানো ব্যবস্থা ভাঙতে

চাইলেন না। অস্ট্রিয়া বুঝতে পারল যে যতদিন না বৃটেনের সাথে প্রাশিয়ার মিতালি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন ফ্রান্সের সাথে অস্ট্রিয়া মিতালি স্থাপনে বাধা দেবে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হোইটহলে বৃটেনের সাথে প্রাশিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের খবর ফ্রান্সে পৌছালে ফ্রান্স বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং তার সাথে অস্ট্রিয়ার চুক্তি সম্পাদনে যে বাধা ছিল তা দূর হল এবং এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিতে বলা হল যে ইঙ্গ-ফরাসী ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বে অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকবে এবং ফ্রান্স নেদারল্যাণ্ড বা অস্ট্রিয়ার কোন অংশ আক্রমণ করবে না। চুক্তিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে শান্তি অব্যাহত রাখা এবং সমগ্র ইউরোপে শান্তি বজায় রাখা। চুক্তিটিতে আরও বলা হয় যে, ইউরোপের কোন তৃতীয় শক্তি ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে যদি অস্ট্রিয়া বা ফ্রান্সকে আক্রমণ করে তা হলে অন্যটির প্রথমে কাজ হবে আক্রমণকারীকে যুদ্ধের পথ হতে নিবৃত্ত করা, এটি যদি কার্যকরী না হয় তা হলে আক্রান্ত দেশটিকে ১৮ হাজার পদাতিক ও ৬ হাজার অশ্বারোহী দিয়ে সাহায্য করা। অবশ্য এই সাহায্যের বিনিময়ে আক্রান্ত দেশটিকে অর্থ দিতে হবে। এই সন্ধিপত্রটিতে অবশ্য চারটি গোপন শর্ত ছিল। এই শর্তগুলি বিচার করলে দেখা যায় যে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার প্রাশিয়া-বিরোধী নীতি এখনো পুরোপুরি মেনে নেয়নি। কিন্তু অস্ট্রিয়া যা পারল না ফ্রেডারিক তাঁর কার্যাবলী দ্বারা সেটি সম্ভব করলেন। প্রথম ভার্সাই চুক্তি সম্পাদনের সংবাদে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য বিস্মিত হল। হল্যাণ্ড তার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করল। ফলে হল্যাণ্ড ও বৃটেনের মধ্যে যে দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব ছিল তার অবসান ঘটল। ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কে উন্নতি দেখা দিল এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা বোঝাপড়া সম্ভব হল। এবং এটি ঘটল ফ্রেডারিক যখন হঠাৎ স্যাক্সনী আক্রমণ করলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ভার্সাইয়ের দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তি দ্বারা ফ্রান্স অস্ট্রিয়াকে অর্থসাহায্য করবে ঠিক হল এবং তাব পরিবর্তে ফ্রান্স নেদারল্যাণ্ডের অংশ এবং প্রাশিয়ার কিয়দংশ পাবে ঠিক হল।

প্রথম চুক্তি স্বাক্ষর

চুক্তিটির তাৎপর্য

দ্বিতীয় চুক্তি

ইংল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপন: অষ্ট্রিয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের পর প্রাশিয়ার সাথে বৃটেনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যুদ্ধের সময় বৃটেন প্রাশিয়ার মালবাহী জাহজ আটক ও বাজেয়াপ্ত করেছিল। একারণে ফ্রেডারিক বৃটিশ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। ১৭৫০-এ বৃটেন রাশিয়ার সাথে হ্যানোভারকে

রক্ষা করবার জন্য এক চুক্তি করতে চায়। ফ্রেডারিক মনে করলেন যে এ চুক্তি তাঁরই বিরুদ্ধে। এই ছোটখাটো ঘটনাগুলি কিন্তু খুব সহজেই উভয় দেশের জনসাধারণের মন হতে মুছে গেল যখনই তারা তাদের সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত হল। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বৃটেন ডিউক অব ব্রানস্উইকের মারফৎ প্রাশিয়ার সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। বৃটেন প্রথমেই প্রাশিয়ার নিকট হতে প্রতিশ্রুতি চাইল এই বলে যে সে হ্যানোভার আক্রমণ করবে না। এদিকে ফ্রেডারিক ফ্রান্সের সামরিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতা দেখে চিন্তিত হলেন এবং ভবিষ্যতে অষ্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ ঘটলে ফ্রান্স যে তাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারবে না তা মনে করলেন। তাছাড়া ফ্রান্স এই সময় নৌশক্তির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল, ফলে ফ্রেডারিকের ধারণা হল যে ফ্রান্স ইউরোপীয় যুদ্ধ এড়াতে চাইছে। সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পেলেন যে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া একজোটে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এই সময় আবার বৃটেন তার হ্যানোভার রক্ষার জন্য রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তি করে। এই চুক্তি অনুযায়ী ঠিক হয় যে রাশিয়া অর্থের বিনিময়ে হ্যানোভার রক্ষা করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকরী হল না। ইতিমধ্যে ভারতে ও আমেরিকায় উপনিবেশ নিয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। বৃটেন হ্যানোভার রক্ষা করার কথা ভাবতে থাকে এবং রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তি সম্পাদিত করে। এই চুক্তি সম্পাদনের সংবাদ ফ্রেডারিক যথাসময়েই পান। তিনি এই চুক্তিতে প্রাশিয়ার সমূহ বিপদ দেখতে পান এবং মনে করেন যে ফ্রান্সের সাহায্য তাঁকে এ বিপদ হতে রক্ষা করতে পারবে না। এ কারণে জার্মানীতে শান্তি যাতে বজায় থাকে তার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং জার্মানীকে যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ হিসেবে গণ্য করবার জন্য বিভিন্ন ইউরোপীয় রাজ্য সমূহকে অনুরোধ জানালেন। এদিক হতে দেখলে বৃটেন ও প্রাশিয়ার জার্মান নীতি অভিন্ন বলে মনে হবে—জার্মানীতে শান্তি অব্যাহত রাখা। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি নিয়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টে সমালোচনা শুরু হয় এবং এই আলোচনায় বৃটিশ মন্ত্রী চুক্তিটিকে আত্মরক্ষামূলক বলে ঘোষণা করেন। এই আলোচনার বর্ণনা ফ্রেডারিকের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে ইঙ্গ-রুশ চুক্তিটি তখনো আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করা হয়নি। এই সময় বৃটেন ফ্রেডারিকের সাথে একটি চুক্তি করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং চুক্তিটির খসড়া তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই খসড়ার কিছু রদবদল করে বৃটেন ও

মিত্রতা কিভাবে হল

চুক্তি স্বাক্ষর

প্রাশিয়ার মধ্যে ১৭৫৬-এর জানুয়ারীতে হোইটহলে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিটিকে 'কনভেনশন অব ওয়েস্টমিনস্টার' বলা হয়। চুক্তিটিতে বলা হয় যে, বৃটেন ও প্রাশিয়া উভয়েই সমগ্র ইউরোপে শান্তি বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এটিকে ঠিক চুক্তি বলা যায় না, এটি ছিল জার্মানীতে শান্তি রক্ষার জন্য বৃটেন ও প্রাশিয়ার মধ্যে একটি বোঝাপড়া। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসে এর ফলাফল হল সুদূরপ্রসারী। বৃটেন মনে করল যে এই বোঝাপড়ার ফলে প্রাশিয়া ইঙ্গ-অষ্ট্রীয়ান জোটে যোগ দিল। অষ্ট্রিয়াকে এই বলে সে বোঝাল যে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সাথে বৃটেনের বোঝাপড়ার ফলে সর্বাপেক্ষা লাভবান হবে অষ্ট্রিয়া এবং নেদারল্যাণ্ড রক্ষার জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। রাশিয়াকে বৃটেন এই বলে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, যেখানে অর্থের বিনিময়ে বৃটেন রুশ সাহায্য চেয়েছিল তখন রাশিয়ার এ ব্যাপারে কোন স্বাধীন মত থাকা উচিত নয়। বৃটেনের এই যুক্তি অবশ্য কেউ স্বীকার করল না। ফলে কূটনীতি ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন এল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের সাথে অষ্ট্রিয়ার প্রথম ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হল।

চুক্তিটির তাৎপর্য

উপসংহারে বলা যায় যে, ১৭৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় শক্তিগুলি পুরাতন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে নিজেদের মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপন করল। ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়ার সাথে তার দীর্ঘ দিনের মৈত্রী ভেঙে দিল এবং ফ্রান্স আবহমান কাল ধরে যে অষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করে আসছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

কূটনৈতিক বিপ্লবের সমালোচনা: কূটনৈতিক বিপ্লবে সংশ্লিষ্ট চারটি রাষ্ট্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য একে অন্যের সাথে যোগ দিয়েছিল। এর ফলাফল আলোচনার বিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত হতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে অনেকে পশ্চাৎ-দৃষ্টির সুবিধা নিয়ে এটির সমালোচনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক রাষ্ট্রের দিক হতে এটির আলোচনা করা প্রয়োজন।

ফ্রান্সের লাভ-লোকসান: ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার সাথে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হবার ফলে তার লাভ হল, না লোকসান হল, এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ রয়েছে। কেউ বলেন ফ্রান্সের পক্ষে এই চুক্তি অদূরদর্শিতার, বুদ্ধিহীনতার পরিচয়,* আবার কারও মতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য না হলেও অন্ততঃ পক্ষে আত্মরক্ষার জন্য এই চুক্তি স্থাপনের প্রয়োজন ছিল।** এই দুটি মত পরস্পর-বিরোধী হলেও

* 'France committed an act of madness of imbecile treason against herself, the like of which hardly exists in history.' —*Henry Martin*

** 'The Austrian alliance was a condition of safety if not of existence to France.'—*Duc d' Broglie*

প্রত্যেকটির সপক্ষে কিছু যুক্তি রয়েছে। তবে তৎকালীন ফরাসী জনসাধারণ ও সরকার দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করেছিল বলে মনে হয়। এবিষয়ে অষ্ট্রিয়াতে নিযুক্ত ফরাসী রাজদূত বার্নিসের স্মৃতি-আলেখ্যতে এটি বেশ ফুটে উঠেছে। তাঁর মতামতই যে তৎকালীন ফরাসী সরকারের মত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বার্নিসের মতে অষ্ট্রিয়ার সাথে ফ্রান্সের মিত্রতা স্থাপনের হেতু হচ্ছে প্রথমত অষ্ট্রিয়া আর ইউরোপে আধিপত্য স্থাপনে ইচ্ছুক নয় যদিও সে নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। ফ্রান্স যদি অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করে তাহলে ফ্রান্সের পক্ষে সুবিধাই বেশি হবে এবং ফ্রান্স তার শত্রুদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানতে পারবে। দ্বিতীয়ত জার্মানী হতে ফ্রান্সকে আর আক্রমণ করা যাবে না। তৃতীয়ত, অষ্ট্রিয়ার সাথে নতুন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হলে স্পেনে ও ইটালীতে যে বুরবো বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি হবে, চতুর্থত বৃটেন যেহেতু ফ্রান্সের প্রধান শত্রু এবং অষ্ট্রিয়া এতদিন এই শত্রুর মিত্র ছিল, অষ্ট্রিয়াকে বৃটেনের মিত্রতা পাশ হতে বের করে আনতে পেরে ফ্রান্সের পক্ষে লাভই হল। পঞ্চমত, এই চুক্তির ফলে ফ্রেডারিককে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ভালভাবে শাস্তি দেওয়া যাবে এই সন্ধির ফলে। ষষ্ঠত, ইংল্যাণ্ড যখন প্রাশিয়ার সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হল তখন ফ্রান্সের পক্ষে অষ্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সকে জানিয়েছিল যে ফ্রান্স যদি অষ্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি করতে রাজী না থাকে তা হলে অষ্ট্রিয়া ইংল্যাণ্ডের সাথে মিত্রতা আগেকার মত বজায় রাখবে। এক্ষেত্রে ফ্রান্স মনে করল যে সে ইউরোপে একঘরে হয়ে পড়বে এবং এক বিরাট শক্তিজোটের বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করতে হতে পারে। এটা ফ্রান্স কোন ক্রমেই চাইল না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি হঠাৎ করেনি। ১৭৫০-এ অষ্ট্রিয়া এই প্রস্তাব করে কিন্তু এটি কার্যকরী হতে সুদীর্ঘ ৭।৮ বৎসর লেগেছিল, কারণ ফ্রান্স সহজে এই চুক্তি করতে চায়নি। যখন ফ্রেডারিক ইংল্যাণ্ডের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার সাথে মৈত্রী স্থাপনের কথা সত্যসত্যই চিন্তা করল। এ কারণে হেনরি মার্টিন যে ফ্রান্সের পক্ষে এই চুক্তি শিশুসুলভ অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির কাজের সাথে তুলনা করেছেন সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। পরবর্তীকালের ঘটনা তাঁর মতামতকে আচ্ছন্ন করেছিল। তৎকালীন ফরাসী ঐতিহাসিকদের লেখা হতে দেখা যায় যে প্রথম ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় ফ্রান্সের মুষ্টিমেয় রাজনীতিবিদ ছাড়া প্রায় সকলেই এই চুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন যে

ফ্রান্সের দিক হতে

ভালো দিক

এই চুক্তির ফলে ফ্রান্সের বেশ সুবিধা হয়েছে। দুটি বৃহৎ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের মধ্যে এই মিত্রতায় ধর্মগুরু পোপ খুব সন্তুষ্ট হলেন। তবে এই চুক্তিটির খারাপ দিকও ছিল যার ফলে ফ্রান্সের বেশ ক্ষতি হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ফরাসী সরকার এই ক্ষতির দিকটা অগ্রাহ্য করে। অস্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করার ফলে ফ্রান্সকে রাশিয়ার সাথেও মিত্রতা স্থাপন করতে হয়। ফলে প্যোলাণ্ড, তুরস্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রে এতদিন পর্যন্ত ফ্রান্সের যে স্বার্থ ছিল এবং ওই স্বার্থ অনুযায়ী সে তার বৈদেশিক নীতি চালিয়ে আসছিল তা বিসর্জন দিতে হল। এই দুটি রাষ্ট্রের রুশবিরোধী ফরাসী ভক্তদের অবস্থা সঙ্গীন হল এবং ফরাসী রাজদূতরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। ইটালীতেও ফ্রান্সের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হল এবং ইটালীর রাজারা অস্ট্রিয়ার প্রভাবে চলে গেল। তাছাড়া, অস্ট্রিয়াকে মিত্র হিসেবে পেয়ে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক যুদ্ধে কোন লাভ হল না, ববঞ্চ সে নিজেই ইউরোপীয় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল এবং অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রস্তুতে সাহায্য করল। তবে এগুলি অস্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনের প্রত্যক্ষ ফল নয়, এগুলি ঘটেছিল ফরাসী সরকারের দেউলিয়া মনোভাব, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ও সামাজিক দুর্বলতার জন্য।

খারাপ দিক

কূটনৈতিক বিপ্লবের ফলে বৃটেন বেশ লাভবান হল। সে প্রাশিয়ার সাথে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। প্রথমতঃ সামরিক শক্তিসম্পন্ন প্রাশিয়ার মৈত্রী হ্যানোভার রক্ষার পক্ষে যেমন সুবিধা হল তেমনি ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ফ্রান্সকে বিব্রত রাখবার ব্যবস্থা আরও দৃঢ়তর হল। তবে এই নতুন চুক্তির ফলে ইংল্যাণ্ডের সাথে হল্যাণ্ডের পুরনো সম্বন্ধে ছেদ পড়ল।

বৃটেনের দিক হতে

প্রাশিয়াও বৃটেনের ন্যায় কুটনৈতিক বিপ্লবের ফলে লাভবান হয়েছিল। তাকে আর অর্থের জন্য ভাবতে হল না। দুর্বল এবং অনির্ভরযোগ্য ফ্রান্সের বদলে বৃটেনের সহায়তা ও আর্থিক সাহায্য প্রাশিয়ার নিকট আশীর্বাদস্বরূপ হল।

প্রাশিয়া

অস্ট্রিয়া নিজের স্বার্থের খাতিরে এই কূটনৈতিক বিপ্লব আনবার জন্য প্রথম হতে চেষ্টা করে। একারণে অস্ট্রিয়ার দিক হতে ফ্রান্সের সাথে চুক্তি খারাপ ছিল না। অস্ট্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল ফ্রেডারিককে পরাজিত করে সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধার করা। এদিক হতে দেখলে ইংল্যাণ্ড তাকে কোন সাহায্য করত না, কারণ ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ ছিল উপনিবেশ ও

অস্ট্রিয়ার পক্ষে

বাণিজ্য বাড়ানোর দিকে। আবার প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, এবং সুদূরবর্তী ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা নিকটবর্তী ফ্রান্সের সাহায্য তার পক্ষে অধিকতর কাম্য বলে সে মনে করল। সুতরাং ফ্রান্সের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে অষ্ট্রিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়।

Q. 2. What point did Kaunitz play in bringing about the Diplomatic Revolution? Did the said revolution serve Austria's purpose?

Ans. কূটনৈতিক বিপ্লব সংঘটনে অষ্ট্রিয়ার মন্ত্রী কৌনিজের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন কূটনীতিবিদ ইউরোপের ইতিহাসে নাম রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে কৌনিজের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। এই অনন্যসাধারণ কূটনীতিবিদের জন্ম হয় ১৭১১ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা শহরে। বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। ফলে তৎকালীন ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জনে সমর্থ হন। তাঁর এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পরবর্তীকালে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। এরপর তিনি অষ্ট্রিয়া সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে যোগদান করেন এবং রোম, টুরিন ও ব্রাসেল্‌স প্রভৃতি স্থানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত থাকেন। আয়-লা স্যাপেলের শান্তি বৈঠকে তিনি অষ্ট্রিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় তিনি বুঝতে পারেন যে বৃটেন অষ্ট্রিয়াকে সাইলেসিয়া ফেরৎ পাবার জন্য কোন সাহায্যই করবেন না। অন্যদিকে তিনি ফরাসী প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারেন যে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়াকে সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে পারে যদি ফ্রান্স বেলজিয়াম পায়।

কূটনীতিবিদ হিসেবে কৌনিজ

কৌনিজ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। তিনিই ছিলেন এই কাউন্সিলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন করা উচিত কিনা এবং কিরূপ হওয়া সংগত সে সম্বন্ধে কাউন্সিলের সদস্যদের লিখিত মতামত চান। ঠিক সময়মত কৌনিজ তাঁর মতামত একটি স্মারকপত্রে লিপিবদ্ধ করে মেরিয়া থেরেসার নিকট দাখিল করেন। বলা বাহুল্য, তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করলেন সেটাই মেরিয়া থেরেসা গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে আমরা ১নং প্রশ্নে আলোচনা করেছি।

তাঁর অবদান

এরপর কৌনিজ নিজেই ফ্রান্সে যান এবং সেখানে তিন বছর থাকেন। এই

সময় তিনি ফরাসী সরকারকে অষ্ট্রিয়ার সাথে মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপনে রাজী করাতে চেষ্টা করেন। প্রথমে সফলতা অর্জন করেননি সত্য কিন্তু কয়েক বছর পর তিনি জয়যুক্ত হন। ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

কৌনিজ কেবলমাত্র ফ্রান্সের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, রাশিয়াকেও এই দলে যোগদান করাতে সক্ষম হন। ফলে ইংল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোট বেশ শক্তিশালী হল।

কূটনৈতিক বিপ্লব অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের অনুকূল হয়েছিল তা মানতেই হবে এবং এটি সম্ভব হয়েছিল কৌনিজের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার জন্য। সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি যে যুক্তি দেখিয়ে ফ্রাঙ্কো-অষ্ট্রিয়ান মৈত্রী স্থাপনের উল্লেখ করেছিলেন সেগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। নিখুঁত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক, প্রতিভাসম্পন্ন ও উদ্যমশীল মন্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম অষ্ট্রিয়ার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

অস্ট্রিয়া ও কূটনৈতিক বিপ্লব

Q. 3. Do you think that the Seven Years' War is the direct result of the Diplomatic Revolution? If, why? If not, why not?

Ans. কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের একমাত্র কারণ হল কূটনৈতিক বিপ্লব। কারণ এই বিপ্লবই ইউরোপে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। এই মতটি অবশ্য ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেননা এঁরা প্রথম ভার্সাই সন্ধিটিকে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক আক্রমণকারী রাষ্ট্রজোট বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে প্রথম ভার্সাই সন্ধিটি এরূপ ছিল না। এই সন্ধিটি ছিল পুরোপুরিভাবে আত্মরক্ষামূলক। প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স সহজে অষ্ট্রিয়ার সাথে যোগ দেয়নি। প্রথম ভার্সাই সন্ধির পর অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে পূর্বেকার সম্পর্কের কিছুটা পরিবর্তন হল সন্দেহ নেই, কিন্তু পঞ্চদশ লুই ও ম্যাডাম পম্পাডুর মনে করলেন যে এই চুক্তির ফলে ইউরোপে যুদ্ধ করবার আশঙ্কা দূর হল—অষ্ট্রিয়া অবশ্য অন্যরূপ ভেবেছিল। একারণে অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত স্টারেমবার্গ যখন ফ্রান্সকে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবার কথা উত্থাপন করেন তখন ফ্রান্স যুদ্ধ চাইছিল না, কারণ তার স্থিরবিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধে ফ্রান্সের ক্ষতি হবেই। এর ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে গোপনে কূটনৈতিক তৎপরতা চলতে থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে নীতির মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। যেটি সাধারণত মনে করা হয় যে ফ্রেডারিকের স্যাক্সনী আক্রমণের

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ও কূটনৈতিক বিপ্লবের সাথে সরাসরি সম্পর্ক নেই

পূর্বেই ফ্রান্স প্রাশিয়ার ভাগবাটোয়ারায় মত দিয়েছিল সেটির ভিত্তি হল ফ্রান্সে নিযুক্ত অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূতের ভিয়েনায় প্রেরিত রিপোর্ট, যেটির সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ইতিমধ্যে ফ্রেডারিক সৈন্যদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন। ফলে যুদ্ধ ঘনিয়ে এল। ফ্রান্স প্রাশিয়াকে সতর্ক করে দেয়, গ্রেট বৃটেন প্রাশিয়াকে যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে বলে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। নিজের হটকারিতার জন্য ফ্রেডারিক তাঁর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রজোট স্থাপনে সাহায্য করলেন, যেটি সম্ভব হত না, যদি তিনি স্যাক্সনী আক্রমণ না করতেন। সুতরাং আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ কূটনৈতিক বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল নয় এবং এ দুটির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক নেই।

Q. 4. What were the causes of the Seven Years War? What were the war aims of the combating nations engaged in the War? What were the results of the war?

Ans. পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে কূটনৈতিক বিপ্লবই সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের একমাত্র কারণ নয় এবং এই বিপ্লবের মধ্যে যুদ্ধের কারণ সরাসরি ভাবে নিহিত ছিল না। অবশ্য পরোক্ষভাবে কূটনৈতিক বিপ্লব সপ্তবর্ষব্যাপী সংগ্রামকে জোরদার করে। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের আসল কারণ হল অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব এবং প্রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে জার্মানীতে প্রাধান্য নিয়ে দ্বন্দ্ব।

বিস্তৃত আলোচনার জন্য ১নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

তবে এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ করেণ হল ফ্রেডারিকের স্যাক্সনী আক্রমণ। তবে এটাই যুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল না। ফ্রেডারিকের এই আক্রমণ দাহ্য ইউরোপে একটি অগ্নিশলাকার কাজ করল মাত্র। এটি প্রমাণিত হয় যখন আমরা দেখি যে স্যাক্সনী আক্রমণের সাথে সাথেই ইউরোপে ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জলে ও স্থলে যুদ্ধ বেধে উঠল। এটি হত না যদি না ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এই সময় যুদ্ধকেই তারা সমস্যা সমাধানের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করত।

যুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রের লক্ষ্য: অষ্ট্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য ছিল সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধার করা এবং প্রাশিয়ার ক্ষমতা খর্ব করা। রাশিয়ার লক্ষ্য ছিল প্রাশিয়ার পূর্বাঞ্চল দখল করা। সুইডেনের লক্ষ্য ছিল প্রাশিয়ার অন্তর্গত পমারেনিয়া অধিকার করা। ফ্রান্সের লক্ষ্য ছিল রাইন নদীতীরে অবস্থিত ক্লিভস ও অন্যান্য ডাচিগুলি দখলে আনা। ইউরোপীয় যুদ্ধে ফ্রান্স বেশি আশা করেনি। হ্যানোভার সে দখল

করতে চাইল এই হিসেবে যে ইংল্যাণ্ডের সাথে চুক্তি করতে সহজ হবে। বৃটেনের লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সকে ইউরোপীয় যুদ্ধে আবদ্ধ রেখে ঔপনিবেশিক যুদ্ধে জয়লাভ করা।

যুদ্ধের জন্য দায়ী কে ?: সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী কাউকে করা যায় না। তবে ফ্রেডারিক দি গ্রেট এই যুদ্ধের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী ছিলেন। কারণ তিনি কোন কিছু না বলে স্যাক্সনী আক্রমণ করলেন যার ফলে যুদ্ধ বেধে উঠল। তিনি তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রজোট তৈরি করলেন। স্যাক্সনী আক্রমণ করবার পরই দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে এবং রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে)। ফ্রেডারিকের স্যাক্সনী আক্রমণের অন্যতম কারণ হল শত্রুরা প্রাশিয়াকে চারদিক হতে যাতে ঘিরে ফেলতে না পারে—এই ভীতি বা আশঙ্কা প্রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি ও যুদ্ধনীতিকে বহুকাল পর্যন্ত পরিচালিত করে, এমন কি হিটলারও এই ভয়ে ভীত হয়েছিলেন।

যুদ্ধের প্রধান ঘটনা: সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-১৭৬৩) একদিকে অষ্ট্রিয়া রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন ও স্যাক্সনী এবং অপরদিকে প্রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড অংশ গ্রহণ করে। ইউরোপ ছাড়াও এই যুদ্ধ আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্যেও সংঘটিত হয়েছিল।

ইউরোপে: ফ্রেডারিক হঠাৎ আক্রমণ করে স্যাক্সনী জয় করে নিলেন এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার বোহেমিয়া প্রদেশ আক্রমণ করে এর রাজধানী প্রাগ অবরোধ করলেন। কিন্তু তিনি প্রাগ দখল করতে পারলেন না, কোলিন (Kolin)-এর যুদ্ধে তিনি অষ্ট্রিয়ার হাতে পরাজিত হলেন। ইতিমধ্যে রাশিয়া পূর্বদিক হতে প্রাশিয়া আক্রমণ করল এবং সুইডেন পমারেনিয়ায় সৈন্য পাঠাল। এছাড়া এক অষ্ট্রিয়ান বাহিনী বার্লিন পর্যন্ত এগিয়ে এল এবং সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হল; ফ্রান্সও চুপ করে বসে ছিল না। ফরাসী বাহিনী পশ্চিম দিক হতে প্রাশিয়া আক্রমণের জন্য হ্যানোভার আক্রমণ করল। ইংরেজ বাহিনী হ্যাসটেনব্যাকের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্লাস্টার-সেভেনের চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল। এই চুক্তি অনুসারে ইংরেজবাহিনীকে হ্যানোভার ত্যাগ করতে হল। ব্রিমেন ও ভার্দেন ফরাসীদের আওতায় চলে গেল। এই দুটি অঞ্চল ফরাসীদের অধিকারে যাওয়ার ফলে তাদের পক্ষে প্রাশিয়া আক্রমণ সহজ হল। এর পর ফরাসী বাহিনী থুরিঙ্গিয়া নামক স্থানে অষ্ট্রিয়ান বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে প্রাশিয়া আক্রমণ করল। কিন্তু এই দুই বাহিনীর মধ্যে মতানৈক্যের উদ্ভব হওয়ায় এদের দক্ষতা কমে যায়।

ফ্রেডারিক এই বিপদে কিন্তু ধৈর্য হারালেন না। তিনি তাঁর অপূর্ব সমরকুশলতার বলে তাঁর শত্রুদের ওপর আঘাত হানলেন, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর রসবাক্যের (Rosback) যুদ্ধে সম্মিলিত ফ্রাঙ্কো-অষ্ট্রীয়ান বাহিনীকে পরাজিত করলেন। রসব্যাকের যুদ্ধের ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এর ফলে ফরাসী বাহিনী জার্মানী হতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হল এবং জার্মানীতে ফ্রান্সের যেটুকু প্রভাব ও সুনাম ছিল তা মুছে গেল। নেপোলিয়ন বলেছিলেন যে রসব্যাকের পরাজয়ই বুরবোঁ রাজবংশের পতনের অন্যতম কারণ। বস্তুতপক্ষে রসব্যাকের যুদ্ধ জার্মানদের এক জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। রসব্যাক যুদ্ধের ফলাফল ইংল্যাণ্ডকেও প্রভাবিত করে। ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হল এবং বড় পিট শুধু মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন না, তিনি ইংল্যাণ্ডের নীতিও পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি প্রথমেই ক্লাস্টার-সেভেনের চুক্তি বাতিল করে দিলেন এবং ফ্রেডারিককে অকৃপণভাবে আর্থিক সাহায্য দিতে থাকলেন। তাঁর নীতি হল ফ্রান্সকে ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে আবদ্ধ রেখে, ইংল্যাণ্ডের সমগ্র শক্তিকে ঔপনিবেশিক যুদ্ধে নিয়োগ করে, ঔপনিবেশিক সংগ্রামে ফ্রান্সকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা।*

রসব্যাকের যুদ্ধ ও তার তাৎপর্য

রসব্যাক-এর যুদ্ধের একমাস পর ফ্রেডারিক লিউথেন (Leuthen) এর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার এক বিরাট সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে আবার সাইলেসিয়া দখল করলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মোরাভিয়া আক্রমণ করে অলমুজ অবরোধ করেন। কিন্তু সম্ভাব্য রুশ আক্রমণের আশঙ্কায় তিনি এই অবরোধ তুলে নেন এবং সাইলেসিয়ায় সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। এদিকে রুশ সৈন্য পূর্ব প্রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড অধিকার করে উত্তর জার্মানী বিপন্ন করে তুলল। কনিংসবার্গ বিধ্বস্ত হল। ফ্রেডারিক জর্নডরফ-এর যুদ্ধে রুশবাহিনীকে পরাজিত করলেন সত্য কিন্তু এর দুমাস পরেই তিনি হচকার্চেন (Hcohkirchen) নামক স্থানে অষ্ট্রিয়ার হাতে পরাজিত হলেন। ইংল্যাণ্ডের অর্থসাহায্য তাঁকে এই পরাজয়ের হাত হতে উদ্ধার করতে পারল না। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দেও তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। মিনডেনের যুদ্ধে ফরাসী বাহিনীকে পরাজিত করলেও ফ্রেডারিক রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর নিকট কুনারসডরফ্ (Kunersdorf)-এর যুদ্ধে পরাজিত হলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং এমন কি আত্মহত্যা করবার বাসনাও তাঁর জাগে। কিন্তু

অন্যান্য যুদ্ধ

ফ্রেডারিকের পরাজয়

* We shall win Canada on the banks of the Elbe.—*Pitt.*

এই হতাশাভাব শীঘ্রই তিনি কাটিয়ে উঠলেন এবং নিজের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। ইংল্যাণ্ড এই সময় তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং অর্থ-দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ঠিক এই সময় তাঁর প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। ফ্রেডারিকের শত্রুদলের মধ্যে ঐক্যের অভাব বিশেষভাবে দেখা গেল এবং তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু জারিনা এলিজাবেথের মৃত্যু হল। নতুন জার তৃতীয় পিটার ছিলেন একজন ফ্রেডারিক-ভক্ত। তিনি জার্মানী হতে রুশ সৈন্য সরিয়ে নিলেন এবং ফ্রেডারিকের সাথে এক সন্ধি করলেন। সুইডেনও প্রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলল। অতএব চারদিকের অবস্থা ফ্রেডারিকের অনুকূল হয়ে এল। এরপর তিনি পরপর কয়েকটি যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করলেন। ফলে সাইলেসিয়া হতে অস্ট্রিয়ান বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক যুদ্ধে ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের নিকট পরাজিত হল। ফলে রণক্লান্ত ইউরোপ শান্তি চাইল। বহু-প্রত্যাশিত এই শান্তি এল ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে।

বলা বাহুল্য, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্যে সংঘটিত হয়েছিল। আমেরিকায় সর্বত্র ইংল্যাণ্ড ফরাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। ইংরেজ সেনাপতি উল্‌ফ্ ফরাসী উপনিবেশ কানাডার রাজধানী কুইবেক ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে অধিকার করেন। এরপর এক বছরের মধ্যেই সমগ্র কানাডা ইংরেজদের হস্তগত হয়।

বিশ্বের অন্যান্য স্থানে যুদ্ধ

ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে ওঠে। ইংরেজরা ক্লাইভের নেতৃত্বে ফরাসীদের পরাজিত করে। বন্দিবাসের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকুট ফরাসী সেনাপতি লালীকে পরাজিত করেন এবং পণ্ডিচেরী দখল করে নেন।

এই যুদ্ধে যে সব নৌযুদ্ধ হয়েছিল সেগুলিতেও ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করে।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে দুটি চুক্তির ফলে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। **প্যারিসের সন্ধি** ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যাণ্ড ও পর্তুগালের মধ্যে সম্পাদিত হল। আর অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও স্যাক্সনীর মধ্যে সম্পাদিত হল **হিউবার্টস-বার্গের সন্ধি**। রাশিয়া ও সুইডেন পূর্বেই যুদ্ধ হতে সরে দাঁড়িয়েছিল বলে এই দুটি সন্ধির কোনটিতেই অংশীদার হয়নি।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

প্যারিসের সন্ধির শর্তাবলী : প্যারিসের চুক্তির ফলে ইংল্যাণ্ড কানাডা, নোভাস্কশিয়া, কেপ-ব্রিটন, গ্রেনেডা, টোবাগো ও সেণ্ট ভিনসেণ্ট ফ্রান্সের নিকট হতে পেল। ইংল্যাণ্ড পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মার্টিনিক ও সেণ্ট লুসিয়া ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দিল। ফরাসী জেলেরা সেণ্ট লরেন্স ও নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূলে

মাছ ধরতে পারবে বলে ইংল্যাণ্ড সম্মতি দিল। তবে ফ্রান্স সেণ্ট পিয়েরা ও মিকুইলন দ্বীপ দুটিতে কোনোরূপ সামরিক কার্যকলাপ চালাতে পারবে না বলে ঠিক হল।

ভারতে অবস্থিত ফরাসী বাণিজ্যকুঠিগুলি ফ্রান্স ফিরে পেল সত্য কিন্তু সে এখানে কোন দুর্গ তৈরি করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিল। সংক্ষেপে ভারতে ফরাসীদের সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা চিরতরে লোপ পেল।

ইউরোপে ফ্রান্স হ্যানোভার, হেসি, ব্রান্সউইক প্রভৃতি অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে দিল। এ ছাড়া, ইংল্যাণ্ড মাইনরকা ফিরে পেল। ফ্রান্স ডানকার্কের সমস্ত দুর্গ ভেঙে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।

আফ্রিকায় সেনেগাল ইংল্যাণ্ডের অধিকারে রইল এবং গোরী ফ্রান্স ফিরে পেল।

স্পেন: স্পেন নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডে তার মাছের চাষ করার অধিকার ছেড়ে দিল এবং হণ্ডুরাস উপসাগরের নিকটবর্তী বনাঞ্চলে ইংল্যাণ্ডকে কাঠ কাটবার অধিকার দিল। এছাড়া ইংল্যাণ্ড ফ্লোরিডা ফিরে পেল এবং স্পেন ইংল্যাণ্ডের নিকট হতে হাভানা ও ফিলিপাইনস্ এবং ফ্রান্সের নিকট হতে লুসিয়ানা ফিরে পেল। পর্তুগাল হতে স্পেনকে তার সৈন্য সরিয়ে নিতে হল এবং যুদ্ধের সময় পর্তুগালের যে সব অঞ্চল জয় করেছিল সেগুলি পর্তুগালকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল। এই সন্ধিতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স উভয়েই ঘোষণা করল যে তাদের মধ্যে কেউ তাদের ইউরোপীয় বন্ধুদের আর সাহায্য করবে না।

হিউবার্টসবার্গের সন্ধি: এই সন্ধির ফলে প্রাক-যুদ্ধাবস্থা ফিরিয়ে আনা হল। সাইলেসিয়া প্রাশিয়ার অধীনেই রইল, অস্ট্রিয়া এটি ফিরে পাবার জন্য আর চেষ্টা করল না। মেরিয়া থেরেসার পুত্র যোসেফ যাতে পবিত্র রোমক সম্রাট হতে পারেন তার জন্য ফ্রেডারিক চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল: সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ইউরোপের মানচিত্রে বিশেষ পরিবর্তন হল না। কিন্তু বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির শক্তিসামর্থ্য ও ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। ফ্রেডারিকের অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভা প্রাশিয়াকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে বজায় রাখতে

প্রাশিয়ার দিক হতে

পারল। যুদ্ধের প্রথমে অনেকে সন্দেহ করেছিল যে, প্রাশিয়া চারদিক হতে আক্রান্ত হয়ে নিজের স্বাধীনতা রাখতে পারবে না। সাত বছর বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে ফ্রেডারিক প্রমাণ করলেন যে শুধু তিনি প্রাশিয়াকেই শত্রুর হাত হতে রক্ষা করলেন না, ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী

রাষ্ট্র হিসেবে প্রাশিয়ার আবির্ভাব ঘটল। অবশ্য এর জন্য প্রাশিয়াকে মূল্য দিতে হল অনেক। এই যুদ্ধে প্রাশিয়ার জনসংখ্যার প্রত্যেক ৯ জনে ১ জন প্রাণ হারাল, দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়ল, ধনী-নির্ধন সকলেই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হল, কৃষিক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত হল, গ্রাম জনশূন্য এবং শহর গৃহশূন্য হল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিক হতে দেখলে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ প্রাশিয়ার পক্ষে ভাল ফল এনে দেয়নি। প্রাশিয়ার বন্ধু বলে কেউ রইল না। গ্রেট বৃটেনের সাথে সম্বন্ধে ভাঙন ধরল, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও স্যাক্সনী ভেতরে ভেতরে শত্রু হয়ে রইল। সুতরাং একমাত্র রাশিয়ার ওপর প্রাশিয়া নির্ভর করল এবং পোল্যাণ্ডের খণ্ডীকরণে এ দুটি রাষ্ট্র একজোটে কাজ করেছিল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে উত্তর জার্মানীতে প্রাশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার সমপর্যায়ভুক্ত ও সমমর্যাদাসম্পন্ন হল। ফলে ভবিষ্যতে জার্মানীতে দ্বৈত নেতৃত্বের সমস্যা দেখা দেয়।

আপাতদৃষ্টিতে এই যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডই সর্বাপেক্ষা লাভবান হয়। এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকা ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠবার পথ প্রশস্ত হল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছিল তাতে ইংল্যাণ্ড জয়ী হয়ে শ্রেষ্ঠ ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। ইংল্যাণ্ডের বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক প্রতিপত্তিও প্রতিষ্ঠিত হল। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ইংল্যাণ্ড এই যুদ্ধের ফলে খুব লাভবান হল না, যেটা সাধারণতঃ মনে করা হয়। যুদ্ধের সময় যে সব ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল সে জয় করেছিল সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি ফ্রান্সকে ফেরৎ দিতে হল এবং ফ্রান্স এই যুদ্ধের ফলে একেবারে পঙ্গু হল না। ফ্রান্স প্রতিশোধ নেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকল এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চিজোলের নীতিতে এটি পরে প্রকাশ পায়। আমেরিকায় ফরাসী ভীতি দূরীভূত হওয়ার ফলে ইংরেজ উপনিবেশগুলি স্বাধীন হবার জন্য সচেষ্ট হল। তাছাড়া, ইংল্যাণ্ডের স্বার্থপর নীতির ফলে তার বন্ধু বলে কেউ রইল না। ইংল্যাণ্ডের এই অসহায় অবস্থা ফ্রান্স পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাবে। সুতরাং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল বোঝাল যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রভুত্ব নিয়ে বোঝাপড়া এখনো করতে হবে।

ইংল্যাণ্ডের দিক হতে

এই যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হল ফ্রান্স। যুদ্ধে সে তার বহু ঔপনিবেশিক অঞ্চল হারালো তাই নয়—তার নৌশক্তিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এবং রাজকোষ প্রায় শূন্য

হয়ে গেল। ইউরোপীয় যুদ্ধে যদিও ফ্রান্স পুরোপুরিভাবে যোগ দেয়নি তবুও যুদ্ধশেষে তার সম্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট কমে গেল। ফ্রান্স ইউরোপে শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে আর বিবেচিত হল না। যে চুক্তি ইংল্যাণ্ডকে শ্রেষ্ঠ নৌশক্তি ও প্রাশিয়াকে শ্রেষ্ঠ স্থলশক্তি হিসেবে মেনে নিল সে চুক্তি ফ্রান্সের নিকট হৃদয়বিদারক এবং মর্যাদাহানিকর ছাড়া আর কি? এই চুক্তিটি যাতে তাড়াতাড়ি বাতিল করা যায় তার চেষ্টা ফ্রান্স করতে শুরু করল। এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সে স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের ক্ষমতা কমে গেল এবং এর পতনের দিন ঘনিয়ে এল।

ফ্রান্সের দিক হতে

সংক্ষেপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স আর ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা রইল না। এই যুদ্ধের পর ইউরোপের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র যেন পূর্বদিকে সরে গেল। অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া—এই রাষ্ট্রত্রয় ইউরোপের রাজনীতি বা ভাগ্য নির্ধারণ করতে লাগল। ফ্রান্স কেবলমাত্র দ্রষ্টা হয়ে রইল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড ভাগ-বাটোয়ারার এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের খণ্ডীকরণের ন্যায় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিতে ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করতে পারল না।

অস্ট্রিয়া এই যুদ্ধে পরাজিত হলেও তার পরাজয় তেমন শোচনীয় বা অগৌরবের হয়নি। সে যুদ্ধের দ্বারা প্রমাণ করল যে তার শক্তি প্রাশিয়ার তুলনায় একেবারে হীন নয়।*

Q. 5. What was the position of the European Powers immediately after the Seven Years' War?

Ans. সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা: সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা ও শক্তি পর্যালোচনা করলে প্রথমেই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা চোখে পড়ে। তৃতীয় জর্জ ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগলেন। ইংল্যাণ্ড এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় বিস্তৃত সাম্রাজ্য লাভ করে। ব্যবসাক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের সমকক্ষ আর কেউ রইল না।

ইংল্যাণ্ড

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ফ্রান্সের দুর্বলতা আরও প্রকাশ পায়। ফ্রান্স এই সময় পঞ্চদশ লুইয়ের শাসনাধীন ছিল, যিনি কারণে-অকারণে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ফ্রান্সের ধনবল ও জনবল উভয়ই নষ্ট করে-ছিলেন। রাজকার্যে তাঁর নজর ছিল না। ফ্রান্সের ভাগ্য অযোগ্য মন্ত্রীদের দ্বারাই

ফ্রান্স

* 'Austria though exhausted by the war, had proved herself a worthy antagonist of Frederick.'—*Hassal.*

পরিচালিত হতে থাকল। ফলে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রভাব কমে যায়। ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের নিকট ফ্রান্স পরাজিত হয়।

স্পেনে বুঁরবো বংশই শাসন পরিচালনা করছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে স্পেন ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয় এবং তাকে পরাজয় মেনে নিতে হয়। স্পেনের গৌরব-সূর্য বহু আগেই অস্তমিত হয়েছিল। ইউরোপের রাজনীতিতে তার স্থান ছিল না। অবশ্য ইটালীর কিছু অংশ স্পেনের অধীনে ছিল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় চার্লস স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি স্পেনকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং প্রজাদের কল্যাণসাধনে তিনি সদাই চেষ্টিত থাকতেন।

স্পেন

জার্মানী: এই সময় জার্মানী বলে কিছু ছিল না। এ অঞ্চলে তিনশোর বেশী রাজ্য ছিল। প্রতিটি রাজ্য আবার স্বাধীন ছিল। জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্য না থাকায় ইউরোপের অন্যান্য শক্তি এখানে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানীতে এক প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই রাষ্ট্রটির নাম **প্রাশিয়া।** এই প্রাশিয়াই পরবর্তীকালে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য নিয়ে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে গণ্য হয়।

জার্মানী

প্রাশিয়া

অস্ট্রিয়া: সতের শতকে অষ্ট্রিয়া শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ছিল। আঠারো শতকে অষ্ট্রিয়া তার সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করে এবং এক জাতীয় নীতি অনুসরণ করে। সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা ও তাঁর পুত্র সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফ অষ্ট্রিয়াকে অধিকতর সুসংবদ্ধ ও আত্মরক্ষায় সমর্থ করে তোলেন।

রাশিয়া: রাশিয়ার বিখ্যাত জার মহামতি পিটারের প্রচেষ্টায় রাশিয়া একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীরা তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারলেও তাঁরা রাশিয়াকে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। জারিনা এলিজাবেথ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন এবং হঠাৎ তাঁর মৃত্যু না হলে ফ্রেডারিকের পক্ষে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব হত। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে সোফিয়া দ্বিতীয় ক্যাথারিন নাম ধারণ করে রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ প্রমাণ করে দিল যে পূর্ব ইউরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইউরোপ
১৭৬৩
অষ্ট্রিয়ার অধিকার ভুক্ত
১ নেদার ল্যাণ্ডস্
২ মিলান
৩ নেপলস্
স্যাভয় বংশীয়
৪ স্যাভয়
৫ নিস
৬ লম্বার্ডি
ফ্রান্সের অধীন
৭ আলসেস্
প্রাশিয়া
৮ সাইলেসিয়া
ইংল্যাণ্ড
আটলান্টিক মহাসাগর
ফ্রান্স
স্পেন
পর্তুগাল
প্রাশিয়া
পূর্ব প্রাশিয়া
পোল্যাণ্ড
অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারী
তুর্কী সাম্রাজ্য
তুর্কী
কৃষ্ণ সাগর
ভূমধ্য সাগর
সিসিলি
আফ্রিকা
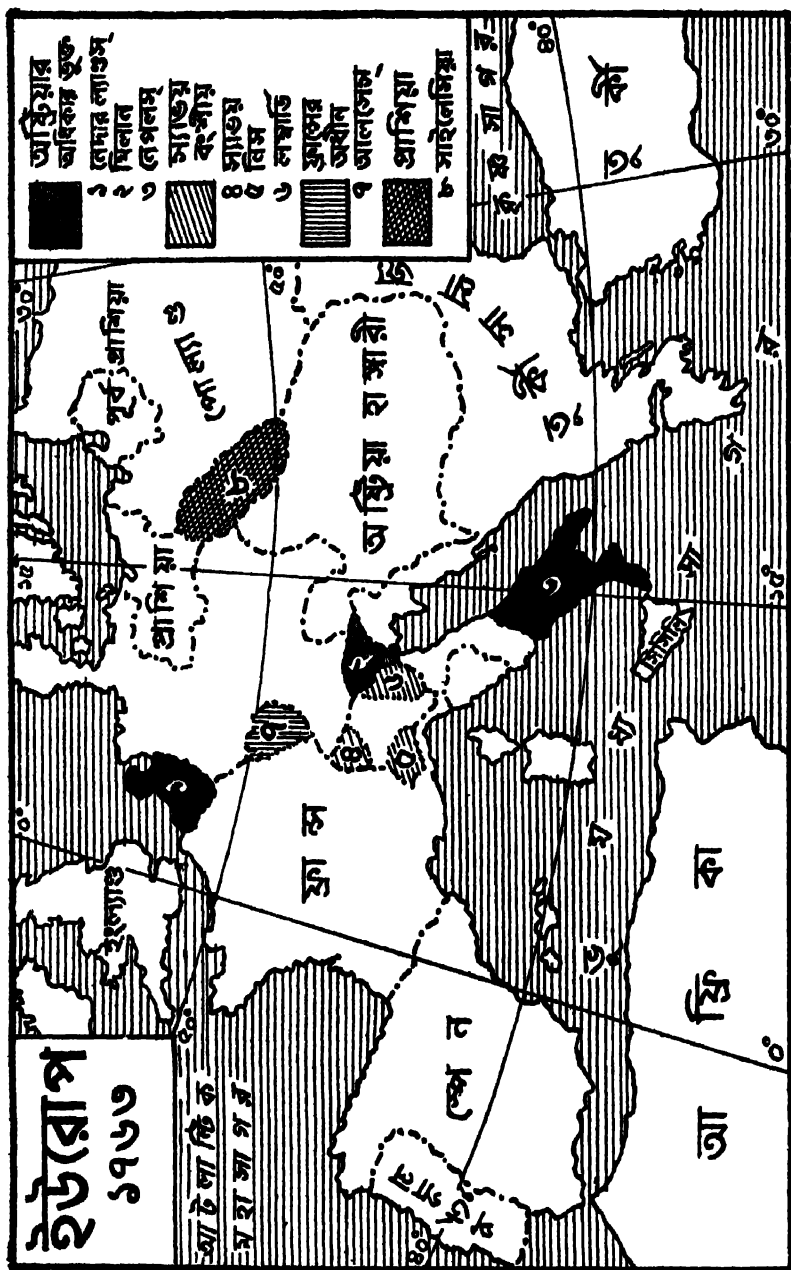
সুইডেন: সতের শতকে সুইডেন বল্টিক উপকূলবর্তী দেশগুলির মধ্যে ক্ষমতায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। আঠারো শতকের প্রথম ভাগেই সুইডেনের পতন শুরু হয়। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর সুইডেন আর প্রথম শ্রেণীর শক্তি রইল না।

সুইডেনের পতন

পোল্যাণ্ড: ষোল এবং সতের শতকে পোল্যাণ্ড ইউরোপে উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল। কিন্তু পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও সংগঠনে নানারূপ দোষত্রুটি থাকায় পোল্যাণ্ড দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া পোল্যাণ্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে এর অবলুপ্তি ঘটায়।

পোল্যাণ্ডের অবলুপ্তি

ইটালী: এই সময় ইটালী বলে একক কোন রাষ্ট্র ছিল না। আধুনিক ইটালীতে কয়েকটি স্বাধীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের অধীনে কয়েকটি পরাধীন রাষ্ট্র ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ: এই অঞ্চলটি তুরস্কের অধীনে ছিল। বলকান রাজ্যগুলি বলতে ইউরোপের যে অঞ্চলটি বুঝায় তার প্রায় সমস্তটিই তুরস্কের অধীনে ছিল। সতের শতকে তুরস্ক-শক্তি নানাকারণে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার পশ্চাদপসরণ আরম্ভ হয়। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া ইউরোপে তুরস্কের প্রধান শত্রুরূপে পরিগণিত হয় এবং এর ফলেই ইউরোপে তথাকথিত 'প্রাচ্য সমস্যা' দেখা দেয়।

More Questions With Hints

Q. 1. 'The situation which produced the Seven Years' War composed of three rivalries.' Explain fully. How far did the Seven Years' War solve those rivalries?

Ans. ১নং প্রশ্নের ৩য় অনুচ্ছেদ হতে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত দেখ এবং তারপর নিম্নলিখিত অংশটুকু যোগ কর:

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ সাধারণতঃ তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছিল—(ক) ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক, বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য নিয়ে দ্বন্দ্ব; (খ) জার্মানীতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং (গ) মধ্য ইউরোপের সামরিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করলে দেখা যায় যে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল তার মীমাংসা হয়ে গেল প্যারিসের সন্ধিতে। ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে পরাজিত করে আমেরিকা ও ভারতে তার সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পথ সুগম করল। ফ্রান্সের পক্ষে এসব অঞ্চলে তাকে বাধা দেওয়া

অসম্ভব হল। ফ্রান্স যদিও ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করবার চেষ্টা চালিয়ে যাবে তবুও বলা যায় যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ফ্রান্স আমেরিকা ও ভারতে সাম্রাজ্য গড়বার স্বপ্ন আর দেখল না। সামুদ্রিক ক্ষেত্রেও ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের ওপর প্রাধান্য স্থাপন করল।

দ্বিতীয় দ্বন্দ্বটি সাময়িকভাবে মীমাংসিত হল। হিউবার্টসবার্গ চুক্তিতে এই দ্বন্দ্বটির সমাধান দেখা যায়। এই চুক্তিটি জার্মানীতে প্রাশিয়াকে অষ্ট্রিয়ার ন্যায় সমমর্যাদা দিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং শেষে অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়। তবুও এটা বলা যায় যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ প্রাশিয়া-অষ্ট্রিয়া দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার পক্ষে রায় দিয়ে এই দ্বন্দ্বের সাময়িক মীমাংসা করল।

মধ্য ইউরোপে সামরিক প্রাধান্যের প্রশ্ন নিয়ে ফ্রান্স-প্রাশিয়া দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা হয়ে গেল। প্রাশিয়া সামরিক ক্ষেত্রে ফ্রান্স অপেক্ষা অধিক গৌরবের অধিকারী হল।

Q. 2. How far is it true to say that the Diplomatic Revolution was the outcome of forces which had been long at work.

Ans. ১ নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

Q. 3. What were the respective interests of the different European powers which caused the Diplomatic Revolution ?

Ans. ১নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদ দেখ।

Q. 4. Was France wise in accepting the friendship of Austria ? How did the other powers stand to gain from the Diplomatic Revolution ?

Ans. ১নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

Q. 5. What were the causes of the Seven Years' War ? How far is it true to say that England emerged in this Seven Years' War everywhere victorious.

Ans. ১নং প্রশ্নের তিনটি দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আলোচনাটি দেখ।

Q, 6. What were the general results of the Seven Years' War ?

Ans. ৪ নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

Q. 7 To what reason would you attribute the defeat of France in the colonial struggle with England?

Ans. সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ বহুবিধ। প্রথমত, ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ইউরোপের অসংখ্য সমস্যার সাথে ফ্রান্সকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ফেলেছিল, বৃটেন সেরূপ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেনি। ইংরেজদের ইউরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তা তাদের ব্যবসাবুদ্ধিকে ছাপিয়ে যায়নি। দ্বিতীয়ত, ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হল নৌশক্তির দিক থেকে ফ্রান্সের দৌর্বল্য। দীর্ঘকাল ধরে ফ্রান্স নৌশক্তির প্রতি অবহেলা করে এসেছিল বলে এই যুদ্ধে তার পরাজয় অনিবার্য ছিল। নৌশক্তির দিক থেকে এবং বাণিজ্য ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলে ইংরেজদের সাফল্য সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। বিদেশে ফরাসী কোম্পানিগুলির বৈশিষ্ট্য ছিল রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষিতা; অন্যদিকে ইংরেজ কোম্পানীগুলি স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম করতে পারত। এবং যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারেও ফরাসীদের ভুলভ্রান্তি হয়েছিল বেশি। ইংল্যাণ্ডের বড় পিটের মত ফ্রান্সে তখন উপযুক্ত নেতার অভাব ছিল। সবশেষে, ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ও অর্থের অভাব ফরাসীদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

Q. 8. 'France played England's game in the War of Austrian Succession and Austria's game in the Seven Years' War.' Discuss.

Ans. আপাতদৃষ্টিতে উপরি-উক্ত বক্তব্যটি অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে বক্তব্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা জানি, অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ সংঘটিত হয় অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে উপনিবেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত সমাধানের অপেক্ষা করছিল। ফ্রান্সের উচিত ছিল এই যুদ্ধে নিজেকে ইউরোপে ব্যস্ত না রেখে ঔপনিবেশিক যুদ্ধে মনোযোগ দেওয়া। কিন্তু অপদার্থ ফরাসী রাজতন্ত্র এটি বুঝতে চাইল না। সে তার ঔপনিবেশিক স্বার্থের পরিবর্তে তার ভ্রান্ত ইউরোপীয় স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হল এবং জার্মানীতে প্রভাব বিস্তার ও অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করে নেবার কল্পনায় মত্ত থাকল। ইংল্যাণ্ড ঠিক এটাই চাইছিল। ইংল্যাণ্ড সবিশেষ চেষ্টা করল যাতে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে, যার ফলে ফ্রান্স যুদ্ধ-শেষে দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়বে এবং ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে নজর দিতে পারবে না। অষ্ট্রিয়া যাতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ভালভাবে লড়তে

পারে তার জন্য ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়াকে শুধু অর্থ-সাহায্যই করল না, অষ্ট্রিয়া যাতে প্রাশিয়া ও সার্ডিনিয়ার সাথে আপস করে তার জন্য সে অষ্ট্রিয়ার ওপর চাপ দেয়। যুদ্ধশেষে দেখা গেল ফ্রান্স কিছুই লাভ করতে পারেনি; বরঞ্চ তার দুর্বলতা ধরা পড়ল। অতএব একথা বললে ভুল হবে না যে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্রান্স ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের সুবিধা করে দিল।

তেমনি সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্স যোগ দিয়ে অষ্ট্রিয়ার সুবিধা করে দেয়। এই যুদ্ধেও ফ্রান্স নিজেকে ইউরোপের রণাঙ্গনে আবদ্ধ রাখে। ফলে তার নিজের ঔপনিবেশিক স্বার্থ বিপন্ন করে। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের কর্তব্য ছিল বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের চরম মীমাংসার জন্য তার সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়োগ করা কিন্তু তা না করে সে প্রধানত সাইলেসিয়া উদ্ধারের জন্য নিজেকে ইউরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত রাখল। এদিক হতে দেখলে ফ্রান্স যেন অষ্ট্রিয়ার হস্তে ক্রীড়নক হয়ে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের জন্য লড়াই করেছিল।

Q. 9. How did Prussia escape from her inevitable danger ?

Ans. সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে প্রাশিয়া চারদিক হতে আক্রান্ত হয়েছিল এবং অনেকে মনে করেছিল প্রাশিয়া একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাছাড়া অষ্ট্রিয়া রাশিয়া ও ফ্রান্সের যুদ্ধাদর্শ ছিল প্রাশিয়াকে ধ্বংস করা। ইউরোপীয় যুদ্ধে প্রাশিয়াকে একক ভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে প্রাশিয়া কিভাবে এই বিপদ কাটিয়ে ওঠে। কারণ যুদ্ধ-শেষে দেখা গেল প্রাশিয়া কেবল নিজের স্বাধীনতাই রক্ষা করেনি, ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। এর পিছনে কয়েকটি কারণ নিশ্চয়ই ছিল। প্রথমত, ফ্রেডারিকের অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভা ও নেতৃত্ব প্রাশিয়াকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচাল। যুদ্ধে পরাজিত হয়েও তিনি ধৈর্য হারাননি। সংক্ষেপে, ফ্রেডারিকের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অসামান্য সমর-নৈপুণ্য প্রাশিয়াকে ধ্বংসের কিনারা হতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হল। দ্বিতীয়তঃ, বড় পিটের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড প্রাশিয়াকে অকৃপণ ভাবে আর্থিক সাহায্য করেছিল। প্রাশিয়ার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। ইংল্যাণ্ডের এই সাহায্য খুবই কার্যকরী হয়েছিল। তাছাড়া, ইংল্যাণ্ড এক সামরিক বাহিনীও প্রেরণ করে। যার ফলে প্রাশিয়ার উপর ফরাসী আক্রমণ খুব জোরদার হতে পারেনি। তৃতীয়ত, রাশিয়ার মতিগতিও প্রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজয়ের হাত হতে রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল। জারিনা এলিজাবেথের ফ্রেডারিকের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। প্রধানতঃ একারণেই তিনি যুদ্ধে নেমেছিলেন ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে জারিনার মৃত্যু হলে তৃতীয় পিটার রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নতুন জার ফ্রেডারিকের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তিনি যুদ্ধ হতে সরে দাঁড়ালেন। ফলে প্রাশিয়া শুধু বৈদেশিক আক্রমণ হতে রক্ষা পেল না, প্রাশিয়া-বিরোধী জোটও ভেঙে গেল। চতুর্থত, প্রাশিয়া আক্রমণের প্রশ্ন নিয়ে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে এবং ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। ফলে প্রাশিয়া নিশ্চিত ধ্বংস হতে রক্ষা পায়। পরিশেষে বলা যায় যে অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সামরিক দুর্বলতা প্রাশিয়াকে বিপদের হাত হতে রক্ষা করেছিল।

10. What major changes in the relationships of European powers took place between the War of Austrian Succession and the Seven Years' War? (

Ans. ১নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞানদীপ্তির যুগ ঃ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার

Q. 1. What is meant by 'The Age of Enlightenment'? Discuss how far Enlightenment influenced the different states of Europe.

Ans. আঠারো শতকের ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে গেলে তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাষ্ট্রাদর্শ ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। ষোল ও সতের শতকের প্রথমভাগে ইউরোপে ধর্ম নিয়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে লড়াই হয়েছিল। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট—এ দুটি ধর্মমতের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়—এই প্রশ্নই ইউরোপীয় চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু সতের শতকের দ্বিতীয়ভাগ হতে ইউরোপের চিন্তাধারা নতুন খাতে বইতে শুরু করে এবং আমরা যাকে যুক্তি বা বিচারের যুগ বলে থাকি সেই নতুন যুগের আবির্ভাব হল। এই নতুন যুগটিকে **জ্ঞানদীপ্তির যুগ** নাম দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দেয়। ইউরোপের

জ্ঞানদীপ্তির যুগ

পুরানো চিন্তাধারার এবং গোঁড়ামির মূল উৎসকেন্দ্র ছিল চার্চ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি চার্চের কার্যকলাপের প্রতি কটাক্ষপাত করেন। এ্যাণ্টনি কলিনস্‌ ত পুরোপুরিভাবে ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের চার্চবিরোধী লেখকদের রচনা ফ্রান্সে আদৃত হয় এবং ফ্রান্সের চিন্তাশীল মনীষীরা চার্চের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। ভল্‌টেয়ার ও এনসাইক্লোপেডিস্টরা প্রথমে এই কাজ শুরু করেন। তাঁদের রচনাবলী চার্চকে বেকায়দায় ফেলে এবং সমগ্র ইউরোপের শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে চার্চ-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। এই মনোভাব হতে সাধারণ বুদ্ধিজীবী হতে রাজা-মহারাজারাও বাদ গেলেন না।

কখন এবং কিভাবে দেখা দিল

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশক চার্চ-বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব বলে ধরা হয়ে থাকে। ডিডেরো, টুসেণ্ট, মণ্টেস্কু, বুফান প্রভৃতি মনীষীরা লেখনীর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক গোড়ামির তীব্র নিন্দা করে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ফ্রেঞ্চ এনসাইক্লোপোডিয়ার প্রথম ভল্যুমটি বের হয়। এতে চার্চ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয়নি, অন্যদিকে চার্চ-বিরোধী চিন্তাধারা সম্বন্ধে বেশ

চার্চ-বিরোধী আন্দোলন

আলোচনা করা হয়। এর পরই হালভেসিয়াস, ডিডেরো, ভলটেয়ার প্রমুখ দার্শনিকরা চার্চবিরোধী রচনায় সাহিত্য জগৎ মুখরিত করলেন। তাঁদের লেখার মধ্যে পুরোহিততন্ত্র এবং জেসুইট-বিরোধী মনোভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। ধর্মের নামে যে অকথ্য অত্যাচার চলে আসছিল তার বিরুদ্ধে এরা প্রতিবাদের ঝড় তোলেন এবং ধর্মসহিষ্ণুতার ওপর জোর দেন। শিক্ষিত জনসাধারণ এঁদের লেখা পড়তে থাকে। ফলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কিছুটা ধর্মবিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। অবশ্য কেবলমাত্র দার্শনিকদের রচনাই এর একমাত্র কারণ নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের রাজারা চার্চের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে রাষ্ট্রের তথা নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল, স্বৈরতন্ত্র শক্তিসঞ্চয় করল এবং রাষ্ট্রিক শাসনব্যবস্থায় কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কার্যকর হল।

এর সীমিত রূপ

তবে এটা ঠিক যে তথাকথিত দর্শন ও দার্শনিকদের মতবাদ ধর্মের স্থান নিতে পারল না। আঠারো শতকের ধর্মবিরোধী বা নাস্তিকধর্মী সাহিত্য প্রচার-সর্বস্ব ছিল। দার্শনিকরা অতীন্দ্রিয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। দেকার্ত দর্শনশাস্ত্রকে অতীন্দ্রিয় জগৎ হতে মাটির পৃথিবীতে নিয়ে এসে বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর দাঁড় করাতে সচেষ্ট হন। স্পিনোজা বাইবেলকেও সমালোচনার উর্ধ্বে রাখেন নি। লক, হিউম, কাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিকরা দর্শনের মধ্যে বস্তুবাদের প্রাধান্য মেনে নেন। এমনকি তাঁরা ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হন। ভল্‌টেয়ার ছিলেন একেবারে বাস্তববাদী। তিনি সমস্ত বিষয়েই কার্যকারণ সম্বন্ধের ওপর জোর দিতেন এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই আসল জ্ঞান বলে মনে করতেন।

যুগটির বৈশিষ্ট্য

জ্ঞান দীপ্তির যুগ কোন কিছুকেই আগে হতে সত্য বলে মানতে রাজী ছিল না, প্রকৃতি বা অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক ঘটনাকেই সত্য ঘটনা বলে মনে করত। Metaphysics-এর চেয়ে এযুগে Physics-এর ওপর জোর দেওয়া হয়, যদিও জ্ঞান-দীপ্তির যুগেই বিজ্ঞানের যুগ শুরু হয়নি, বা এই যুগেই বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ ঘটেনি। তবে এই যুগের কৃতিত্ব হল যে পূর্বেকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির সাথে জনসাধারণের পরিচয় করে দিতে সক্ষম হয়। আইজ্যাক নিউটনের আবিষ্কারের সাথে এই যুগেই জনসাধারণ বিশেষভাবে পরিচিত হয়। থার্মোমিটার, দেওয়াল ঘড়ি প্রভৃতি মার্জিত ও উন্নততর হয়। বিদ্যুৎ-শক্তি সম্পর্কিত গবেষণা চলতে থাকে এবং অল্পদিনের মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের বিরাট উন্নতি ঘটে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

রবার্ট বয়েল হলেন রসায়নবিভার পথপ্রদর্শক। তিনি রসায়নকে কুসংস্কারের নাগপাশ হতে মুক্ত করেন। এই সময় যোসেফ ব্লাক্ কার্বন ডায়োক্সাইড, হেনরী ক্যাভেনডিস হাইড্রোজেন, প্রিস্টলে অক্সিজেন এবং লাভোসিয়ার রসায়নশাস্ত্রের পরিমাণিক বিশ্লেষণ আবিষ্কার করলেন। জেমস হাটন তাঁর ভূতাত্ত্বিক গবেষণা প্রকাশ করে এক আলোড়নের সৃষ্টি করলেন। মাল্‌পিঘি, সিডেনহাম, মরগ্যাগনি, রবার্ট হুক্ ও লিওয়েনহোক-এর গবেষণা দ্বারা শারীরবিভায় এক বিরাট পরিবর্তন এল। উদ্ভিদবিভার উন্নতিসাধন করলেন জন রে ও লিনে। বাফোন প্রাণীবিভায় উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। এই সময় বিভিন্ন দেশে অসংখ্য বিজ্ঞান কেন্দ্রের পত্তন ঘটে। এই সব কেন্দ্র হতে বহু বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্র-পত্রিকা বের হতে থাকে। এছাড়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মানমন্দির নির্মিত হয় এবং যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর প্রভাব

উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিকদের কালজয়ী আবিষ্কারের ফলে মানুষের মন কুসংস্কার-মুক্ত হল এবং তারা বিশ্বাস করতে লাগল যে পৃথিবীতে একটি নিয়মের রাজত্ব রয়েছে। ফলে মানুষের জীবনদর্শনে প্রচলিত বিশ্বাসে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটল। তারা অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির কষ্টিপাথরে সব কিছু যাচাই করতে চাইল। ফলে ধর্মের ক্ষেত্রেও মানুষ প্রজ্ঞাবাদী হয়ে উঠল। ধর্মের ক্ষেত্রে সাধুবাদ (Pietism)-এর উদ্ভব হল এবং ইউরোপে এক নতুন ধর্মচেতনার সৃষ্টি হল। সাধুবাদের প্রচারের ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে সন্দেহবাদ ও নাস্তিকতাবাদ দেখা দিল। প্রজ্ঞাবাদী-সন্দেহবাদীরা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করল। ধর্মকে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করা হল। পরিশেষে প্রাকৃতিক ধর্মমতের সৃষ্টি হল। এর ফলে পাশ্চাত্য জগতে ধর্মীয় সহনশীলতা দেখা দিল।

মানুষ ও তার সমাজকে নতুনভাবে দেখা

জ্ঞানদীপ্তির যুগে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যক্তিমানুষ ও তার সমাজকে বিশ্লেষণ করা। এই যুগ বিশ্বাস করত যে ব্যক্তি বা মানুষ এবং তার সমাজকে জানতে হবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। মণ্টেস্কু তাঁর 'স্পিরিট অব ল' পুস্তকে মানবসমাজে আইনের বিষয় সম্বন্ধে ব্যক্ত করেন। তবে সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীকে প্রস্তুতির যুগ বলা উচিৎ। বার্কলি ও হিউমের অর্থনীতি সম্বন্ধীয় রচনা পরবর্তীকালে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে ফিজিওক্র্যাটদের আবির্ভাব সম্ভব করে, ইতিহাস, দর্শন, মনোবিভা ও অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে এযুগে বিশেষ অগ্রগতি

পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস লেখা শুরু হল। ইতিহাসকে সত্যনিষ্ঠ করার চেষ্টা চলল। বুশো, ভিকো, নিভুর, গিবন ইতিহাস লেখায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এলেন। সমকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান রচনায় বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিল। রাষ্ট্র মানুষই সৃষ্টি করেছে নিজের সুবিধার জন্য। রাষ্ট্র তথা সরকার শাসনের মাধ্যমে ব্যক্তি-মানুষকে শোষণ করবে বলে মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেনি। ভগবান-দত্ত ক্ষমতা বা অধিকার বলে কিছু নেই। জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব সকল রাজার স্বীকার করা উচিত।

অর্থনীতিক্ষেত্রেও এক নতুন মতবাদ দেখা দিল। এই মতবাদের নাম হল লেজা ফেয়ার (Laissez Faire)। এই মতবাদে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদরা প্রচার করলেন

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

যে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকা অমঙ্গলজনক; জনসাধারণ নিজেদের অর্থনৈতিক ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাধ নীতিই একমাত্র আইনানুগ নীতি। বেকারিয়া, কোযেনসে, এড্যাম স্মিথ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই নীতির প্রধান সমর্থক ছিলেন।

ফলাফল : জ্ঞানদীপ্তির যুগ প্রথমত প্রাকৃতিক নিয়মকে উচ্চাসনে বসাল এবং অতীন্দ্রিয়বাদকে অগ্রাহ্য করল। দ্বিতীয়ত, মানুষের বিচারশক্তিকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হল। বিচার এবং যুক্তির বলেই মানুষ সমস্ত রহস্য ও সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে প্রজ্ঞাবাদীরা বিশ্বাস করত। তৃতীয়ত, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস মানুষকে ছোট করে বলে তারা কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর বেশি জোর দেন। সবশেষে তাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে ভগবানদত্ত ক্ষমতার পরিবর্তে সামাজিক স্বার্থের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেন।

জ্ঞানদীপ্তি ইউরোপীয় চিন্তাধারায় যে বিশেষ অগ্রগতি ঘটিয়েছিল সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। কিন্তু এটি কিভাবে ইউরোপের কোন কোন দেশে এবং কতটা অগ্রগতি এনেছিল সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। জ্ঞানদীপ্তির যুগ প্রথমে শুরু হয় ইংল্যাণ্ডে কিন্তু ফ্রান্সেই এটি বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়। ফ্রান্সের শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে এই চিন্তাধারা যেভাবে এবং যতটা সঞ্চারিত হয়েছিল ইউরোপের অন্য কোন দেশে হয়নি। বক্তৃতা, ব্যক্তি-বিশেষের গৃহপরিবেশ, ক্লাব, সাহিত্য একাডেমি, পত্রপত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে নতুন চিন্তাধারা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ক্রমে ফ্রান্স হতে এটি ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞানদীপ্তির যুগ ছিল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদান প্রদানের যুগ এবং ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ছিল তখন

ইউরোপীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান স্বরূপ। ফরাসী ভাষাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একমাত্র ভাষা বলে অনেকে মনে করলেন।

এর ত্রুটি : তবে জ্ঞানদীপ্তির সব কিছুই ভাল ছিল না। এর দ্বারা গোটা ইউরোপ আলোকিত হল না। এটি সর্বজনীনও ছিল না। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনসাধারণ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইটালী এবং স্পেনে জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব সামান্য দেখা যায়। রাশিয়া এবং বল্কান অঞ্চলে এর রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়নি। জ্ঞানদীপ্তি যে সর্বজনীন হতে পারেনি তার অন্যতম কারণ হল সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা। যে সব দেশে মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার অবসান ঘটেছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কিছুটা ক্ষমতা ও স্বাধীনতা ভোগ করছিল, সে সব দেশেই জ্ঞানদীপ্তি দেখা দিল।

Q. 2 What are the characteristics of Enlightened Despotism *Or* what do you mean by Enlightened Despotism ? Illustrate your answer from the history of 18th century Europe.

Ans. আঠারো শতকের জ্ঞানদীপ্তি সমকালীন রাজাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁরাও প্রজ্ঞাবাদকে গ্রহণ করেন এবং এর মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ পেলেন। ব্যক্তি-স্বার্থ বা ধর্মীয় স্বার্থের বদলে তাঁরা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা ভাবলেন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রজ্ঞাবাদ বিশেষ ভাবে দেখা যায়।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে ইউরোপে একটি নতুন রাজনৈতিক ধারণার আবির্ভাব ঘটে। এটিকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার বলে এবং এই যুগে যে সব রাজা রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের জ্ঞানদীপ্ত -স্বৈরাচারী শাসক বলা হয়। পৃথিবীতে যুগে যুগে স্বৈরাচারী শাসকের আবির্ভাব হয়েছে ·কিন্তু তাদের আমরা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক বলি না। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণ ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগে দেখা দেন। সাধারণত ফরাসী বিপ্লবের ২৫ বৎসর পূর্ববর্তী যুগটিকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী যুগ বলা হয় এবং যে সব রাজা এই সময় রাজত্ব করেন তাঁরা প্রায় সকলেই জ্ঞানদীপ্ত ছিলেন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার ও প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচার : জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের সাথে প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারের পার্থক্য রয়েছে। কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের

ইতিহাসে প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসকের বহু উদাহরণ দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের আমরা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক বলে গণ্য করি না। অতএব এই দুই স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছেই। জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে 'প্রজাহিতৈষণা' গুণটি দেখা যায় সত্য, কিন্তু এটিই একমাত্র গুণ ছিল না। এদের মধ্যে এই গুণটি ছাড়াও অন্যান্য গুণ ছিল বলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাসে এরা এক বিশিষ্ট স্থান দখল করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপীয় ভাবমানসে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জ্ঞানদীপ্তির প্লাবন দেখা যায়। এই প্লাবনে স্বৈরতন্ত্রী শাসকরাও অবগাহন করলেন। তাঁরা তাঁদের কার্যাবলীর দ্বারা জ্ঞানদীপ্তির ধারণাগুলিকে বাস্তব রূপায়িত করবার চেষ্টা করেন। পিটার দি গ্রেট রাশিয়ার অগ্রগতির জন্য বহু কিছু করেছিলেন। তাঁর তুলনায় ক্যাথারিন তেমন কিছু করতে পারেননি। কিন্তু পিটার দি গ্রেটকে কেউ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক বলেন না, অন্যদিকে ক্যাথারিনকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এর কারণ ক্যাথারিন এই বিশেষ যুগে রাশিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের বৈশিষ্ট্য: জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা অন্য স্বৈরাচারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়না, যেমন—

(ক) **দর্শনে ও দার্শনিকের প্রতি আগ্রহ:** এই গুণটি এ সময়কার প্রায় সকল স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট নিজেই লেখক ছিলেন এবং সমসাময়িক দার্শনিকদের লেখা পড়তে ভালবাসতেন ও তাঁদের সঙ্গলাভ কামনা করতেন। ফরাসী দার্শনিক ভোলটেয়ারকে তিনি নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এবং বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের মধ্যেও কিছুটা দার্শনিকের ভাব ছিল। ভোলটেয়ারের সাথে তিনি পত্রালাপ করতেন এবং কয়েকজন ফরাসী দার্শনিকদের নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করেন। কয়েকটি পুস্তকও তিনি রচনা করেন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের মধ্যে এই গুণটি সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর চরিত্র আদর্শ ও প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত ছিল।

স্বৈরাচারী শাসকদের দার্শনিকদের প্রতি এই শ্রদ্ধা ভাব প্রমাণ করে যে ইউরোপের সামন্ত যুগ হতে উত্তরণ ঘটেছে। কারণ দার্শনিকরা তাঁদের লেখনী মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তোলেন।

(খ) রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে নতুন ধারণা—এই যুগের শাসকরা যদিও নিজেদের ক্ষমতায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং শাসন-ক্ষমতার ব্যাপারে জনসাধারণের যে কোন স্থান থাকতে পারে তা তাঁরা স্বীকার করেন নি। তবে রাজকর্তব্য সম্বন্ধে তাঁদের এক নতুন ধারণা জন্মায় যেটি অন্য যুগে দেখতে পাওয়া যায় না। জনসাধারণের সেবা করাই রাজার কর্তব্য : এটি তাঁরা মানতেন এবং নিজেদের রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য বলে মনে করতেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে স্বৈরাচাবী শাসকবৃন্দ কেন এই রাজাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। এর উত্তরে বলা যায় যে এটি হঠাৎ আবেগজনিত কোন হৃদয় পরিবর্তনের চিহ্ন নয়। আবেগমুক্ত যুক্তিবাদ যখন প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রথাগুলিকে সমালোচনার প্রধান ক্ষেত্র বলে মনে করল এবং এদিক হতে চার্চকেও রেহাই দিল না, তখন স্বৈরাচারী শাসকরা তাঁদের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখবার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা যুক্তিবাদী দার্শনিকদের সমালোচনার হাত হতে রেহাই পাবার জন্য এই নতুন উপায় নির্ধারণ করলেন—রাষ্ট্রেব প্রধান, ভৃত্য বা অছিদার।

চার্চ বিরোধী নীতি বা ধর্ম সম্বন্ধে উদারতা : এই যুগের শাসকবৃন্দ প্রায় সকলেই চার্চের ক্ষমতা হ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের আধুনিকীকরণের দিকে নজর দেন। তবে তাঁদের এই মনোভাবকে ধর্মবিরোধী না বলে চার্চ বিবোধী বলা যেতে পারে। ইউরোপের ক্যাথলিকধর্মী রাষ্ট্রগুলিতে (অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, স্পেন ইত্যাদি) চার্চের ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। এই ক্ষমতা না কমাতে পাবলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দৃঢতর হচ্ছিল না। একারণেই ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলিব নৃপতিগণ চার্চের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নষ্ট করতে বদ্ধপরিকর হলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ এর জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ফ্রেডারিক দি গ্রেট নিজে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট হয়েও ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি ঘোষণা করেন। অন্যদিকে ভলটেয়াব মত প্রকাশ করলেন যে ফ্রান্সের ক্যাথলিক চার্চ ফরাসী রাষ্ট্রের শত্রুস্বরূপ।

শাসন সংস্কার : এই যুগের প্রত্যেক রাজাই নিজ নিজ রাজ্যে নানা বিষয়ে সংস্কার সাধন করেন। নিজ নিজ দেশের আইন কানুন তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন, আইন বিষয়ক সংস্কার প্রবর্তন করেন, ফৌজদারী আইন সংশোধন করেন এবং জেরেমি বেনথামের উল্লিখিত নীতি অনুসারে তাঁরা রাষ্ট্রিক আইনকানুন লিপিবদ্ধ করেছিলেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাঁরা পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হন এবং ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর জোর দেন। দেশের শাসন সংক্রান্ত বিষয়েও তাঁরা

পরিবর্তন আনেন এবং এ বিষয়ে ভলটেয়ারের রচনার দ্বারা তাঁরা অনুপ্রাণিত হন। নিজ নিজ রাষ্ট্রের সামাজিক বৈষম্যগুলি দূর করবার জন্য তারা তৎপর হন এবং সামন্তদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেন। এই শাসকবৃন্দ কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করতে চাননি। জনসাধারণের ক্ষমতার প্রকৃত মূল্যায়ন তাঁরা করতে অক্ষম ছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন : জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা প্রায় সকলেই নিজ নিজ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের যাতে প্রসার ঘটে তার জন্য চেষ্টা করেন।

বন্দর তৈরি, জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার, খালখনন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁরা দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন। আর এগুলির দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বিশেষ উপকৃত হল।

স্বেচ্ছাচারিতা : এই যুগের শাসকরা সকলেই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউই স্বৈরতন্ত্র ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সে কারণে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা তাঁরা কল্পনাও করেননি। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে রাজকীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের উন্নতি ঘটতে পারে।

বিফলতা : জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্রী শাসকরা তাঁদের প্রজাবর্গের উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের কার্যাবলীর দ্বারা জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হয়নি এবং তাঁদের কার্যাবলীও স্থায়ী হতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বেই এর দ্যুতি কমে যায় এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বৈরতন্ত্রের দুর্বলতা দেখা যায়। ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে কৃতী জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি প্রাশিয়ায় যে সংস্কার প্রবর্তন করেন তা বেশি দিন টেকেনি। নেপোলিয়নের অভিযানকে জার্মান জনসাধারণ মুক্তির অভিযান বলে গণ্য করেছিল ; ফলে তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থা তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙে পড়ে। দ্বিতীয় জোসেফের অবাস্তব ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সংস্কারগুলি তাঁর জীবদ্দশাতেই অকেজো ও ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের বহুগুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সফলতা লাভ করতে পারেননি। এর কারণ প্রজাপুঞ্জ তাঁদের সংস্কারগুলি খোলামনে গ্রহণ করতে পারেনি। এছাড়া শাসকগণ যেরূপ শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন তাঁদের প্রজাপুঞ্জ সেরূপ ছিলেন না।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দ : জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে

সাধারণতঃ আমরা ফ্রেডারিক দি গ্রেট, দ্বিতীয় জোসেফ ও ক্যাথারিন দি গ্রেটকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে থাকি। কিন্তু আসলে এই তিন জনই কেবলমাত্র জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন না, ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের তদানীন্তন শাসকদের অনেকেই এই পর্যায়ে পড়েন। তাঁরা তাঁদের কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁরাও জ্ঞানদীপ্তির আওতার বাইরে নন। সংক্ষেপে বিভিন্ন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের শাসন সম্বন্ধে নিয়ে বলা হল।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট (১৭৪০-১৭৮৬) মহামতি ফ্রেডারিক ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসন লাভ ইউরোপের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। তাঁর মত সুদক্ষ শাসক সেকালে খুব অল্পই ছিল। রাজনৈতিক জ্ঞান ও সামরিক প্রতিভা তাঁর অতুলনীয় ছিল।

বাল্যকাল হতেই তিনি সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তাঁর পিতার কঠোর শাসনের ফলে এ বিষয়ে বেশি দূর এগুতে পারেন নি। অবশ্য তিনি সামরিক ও বেসামরিক শাসন বিষয়ে শিক্ষা ভালভাবেই পেয়েছিলেন। পিতার কঠোর শাসন তাঁর চরিত্রের নম্রভাব নষ্ট করে দেয়। তাঁর হৃদয় ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং মন তিক্ত-সন্দেহে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। তাঁর একমাত্র নীতি ছিল—রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধন করা। প্রাশিয়ার স্বার্থকে তিনি সর্বাগ্রে স্থান দেন। প্রজাসাধারণের মঙ্গলসাধন করাই ফ্রেডারিকের আভ্যন্তরীণ নীতির মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান সেবক বলে মনে করতেন। সমসাময়িক শাসকদের মধ্যে এরূপ কর্তব্যবোধ দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি বেসামরিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই অধিকতর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করেন। যুদ্ধোত্তর যুগে প্রাশিয়ার সমস্যা ছিল পুনর্গঠন এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণের সমস্যা। কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য পুনর্গঠনে তিনি মনোযোগী হন এবং তাঁর চেষ্টায় প্রাশিয়ায় নানারূপ শিল্পের উন্নতি ঘটে, তিনি বহু প্রশস্ত রাজপথ তৈরী এবং খাল খনন করান। যুক্তিবাদী দর্শন তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলে প্রজাসাধারণকে তিনি কয়েকটি মৌলিক অধিকার দেন। মুদ্রানীতি ও আইনকানুনের পরিমার্জন করেন। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি উদার ছিলেন। তিনি নিজে প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী হয়েও নিজের রাষ্ট্রে ক্যাথলিকদের স্বাধীনভাবে বসবাস করতে এবং চার্চ নির্মাণ করতে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেননি। এমনকি তিনি বলেছিলেন যে যদি তুর্কীরা প্রাশিয়ায় বসবাস করতে চায় তা হলে তিনি তাদের মসজিদ নির্মাণে সক্রিয় সাহায্য করবেন।

চরিত্র ও কার্যাবলী

দ্বিতীয় জোসেফ: দ্বিতীয় জোসেফ বহু বছর ধরে অষ্ট্রিয়ার শাসনকার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর তিনি অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হন।

কার্যাবলী: অষ্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন বলে তিনি তাঁর রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করতে চান। একারণে তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। তিনি প্রথমে ধর্মসংস্কারে মনোযোগী হন এবং পোপের আধিপত্য ও গোঁড়া ধর্মের বিরোধিতা করেন।

এর পর তিনি শাসনসংস্কারে মন দেন। সমগ্র রাজ্যটিকে তিনি ১৩টি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেক প্রদেশে দক্ষ ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। সামন্তদের অত্যাচার হতে কৃষকদের রক্ষা করেন। জমির ওপর তিনি কর আরোপ করেন। এবং এই কর হতে কাউকে রেহাই দেওয়া হয় নি। তিনি সমগ্র রাজ্যে একটিমাত্র ভাষা সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করেন। জার্মান ভাষাই সরকারী ভাষা হয়। সামাজিক ব্যাপারে তিনি অনেক সংস্কার-সাধন করেন। দাসত্ব প্রথা তিনি রদ করেন। তিনি সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ করে প্রজাসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সমতা আনতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন।

জোসেফের প্রচেষ্টা অবশ্য নানা কারণে সফল হয়নি তবুও প্রজাহিতৈষণার জন্য তাঁর আন্তরিকতায় কোন সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় ক্যাথারিন: এই যুগের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে নৈতিক আদর্শ বলে কিছু ছিল না। তিনি বিবেক-নীতি শূন্য ছিলেন এবং চতুর বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল। রাশিয়ার শাসকগণের মধ্যে তিনি-ই ছিলেন শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্না। রাশিয়াকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন ও তার উন্নতিতে নিজের উন্নতি বলে মনে করতেন।

চরিত্র ও কার্যাবলী

পিটারের তিনি পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি রাজশক্তি বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা রাশিয়ায় বিস্তার করতে চেষ্টা করেন।

সমগ্র দেশটিকে তিনি ৪৪টি প্রদেশে ভাগ করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশকে আবার কয়েকটি জেলায় ভাগ করেন। এই অঞ্চলগুলিতে যাতে ভালভাবে শাসনকার্য চলে তার জন্য সর্বদাই নজর রাখতেন। দেশের আইনকানুন লিপিবদ্ধ করেন। চার্চের

পৃথক সত্তা রাখলেন না। চার্চকে রাষ্ট্রের অধীনে আনেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপারেও তিনি উৎসাহী ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য চেষ্টা করেন।

তিনি ফরাসী দার্শনিক ভলটেয়ার ও বিশ্বকোষ প্রণেতা ডিডেরো ও অন্যান্য দার্শনিকদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। নিজের স্বৈরাচারী ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে যেমন তিনি মনোযোগী ছিলেন—তেমনি প্রগতির প্রতিও তিনি কম উৎসাহী ছিলেন না।

অন্যান্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক : স্পেনের চতুর্থ ফার্ডিনাণ্ড ও তৃতীয় চার্লস উভয়েই জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। ফার্ডিনাণ্ড চার্চের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করেন এবং এটিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে সমর্থ হন। অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন করেছিলেন। তৃতীয় চার্লস স্পেনের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সংস্কার সাধন করেন। দেশের আইনকানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। জমিদারদের বিচার ক্ষমতা নষ্ট করে রাজকীয় বিচারালয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়।

স্পেনে

পর্তুগালের রাজা প্রথম যোসেফ ও একজন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। তিনি নিজে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রথমেই ধর্মসংস্কারে মনোযোগী হন এবং পোপের আধিপত্য ও গোড়া ধর্মের অত্যাচার বন্ধ করে পরধর্ম সহনশীলতার পরিচয় দেন। দেশে শিক্ষা প্রসারে উৎসাহ দেন এবং শিক্ষকতা ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও সবিশেষ চেষ্টা করেন। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য দান শুরু করেন এবং বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত করেন। শিল্পের সাথে কৃষির উন্নতিরও চেষ্টা চলে। সামাজিক অব্যবস্থা ও কুসংস্কারগুলি দূর করার জন্যও চেষ্টা চালান। পর্তুগাল হতে দাসপ্রথা তুলে দেওয়া হয়।

পর্তুগালে

ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রেও এই যুগে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের দেখা মেলে। পিডমণ্টের চার্লস এমানুয়েল., টাসকানির প্রথম লিওপোল্ড, নেপল্‌সের ডন কার্লোস এবং চতুর্থ ফ্রেডারিক এবং পার্মার ফার্ডিন্যাণ্ড ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাজ্যে নানারূপ সংস্কার কার্যে মনোযোগী ছিলেন এবং দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তাঁরা ব্রতী হন।

ইটালীতে

More Questions with Hints

Q. 1. Give an account of the political, economic and social condition on which Enlightened Despotism thrived in the different countries of Europe.

Ans. মধ্যযুগে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্তপ্রভুদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু রেনেসাঁর পরে, প্রায় দুশো বছর উত্থান-পতনময় পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। ফলে জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রেই রাজতন্ত্র শক্তিশালী হয়। রাষ্ট্র মানুষই সৃষ্টি করেছে নিজের নিজের সুবিধার জন্য—এই ধারণা দানা বাঁধতে থাকে। রাষ্ট্রের কাজ হল মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা এই মত দৃঢ়তর হয়। এর ফলে সামন্ত প্রভুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লুপ্ত হয়। কিন্তু সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা যে সব দেশে রাজার হাতে কেন্দ্রীভূত হল সে সব দেশেই জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার বিশেষভাবে দেখা দিল। আর যে সব দেশে মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণী একক প্রাধান্য অর্জন করল সে সব দেশে এরূপ শাসন দেখা গেল না।

ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক যুগ-সন্ধিক্ষণে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসন দেখা দেয়। মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক অবস্থার যখন সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেনি, অথচ শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটছে এইরূপ অবস্থায় জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসন শুরু হয়। এই শাসন মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে বিশেষ চেষ্টা করেনি আবার দেশের আর্থিক উন্নয়নের দিকেও নজর দেয়। বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের সাথে চুক্তিসম্পাদন করে। শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজকীয় সাহায্য শুরু হয়। সংক্ষেপে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা নিজ নিজ রাজ্যের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের যুগে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই যুগে সমাজে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটলেও এই শ্রেণীর এমন ক্ষমতা ছিল না যার ফলে রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করতে পারে। অন্যদিকে অধিকার ভোগী সামন্ত শ্রেণীর ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়লেও একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি। এর ফলে কোন রাষ্ট্রেই কোন বিশেষ শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারল না। ফলে রাজার ক্ষমতাই বৃদ্ধি পেল।

Q. 2. What is meant by the age of 'Repentant Monarchy'? What were the objectives of the repentant monarchs?

Ans. পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে আঠারো শতকের জ্ঞানদীপ্তি সমকালীন রাজাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বলে এই শাসনকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার শাসন বলা হয়ে থাকে। আবার যেহেতু এই শাসকরা তাঁদের শাসন কার্যের মাধ্যমে প্রজা-হিতৈষণার পরিচয় দেন বলে, কেউ কেউ এই শাসনকে প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসনও বলেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাকটন এই শাসনকে অনুতপ্ত রাজতন্ত্র বলে (Repentant Monarchy) আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে এই সব রাজাদের পূর্বসূরীরা শাসনের মাধ্যমে নিজ নিজ রাজ্যের জনসাধারণকে শোষণ করেছিলেন; অকথ্য অত্যাচার তাঁরা চালিয়েছিলেন। ফলে যে অভিশাপ তাঁরা সঞ্চয় করেছিলেন তার ভার তাঁদের উত্তরসূরীদের ওপর বর্তায়। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত এই অভিশাপ হতে রেহাই পাবার জন্যই তথাকথিত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা প্রচেষ্টা চালান এবং প্রজাহিতৈষণার মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীদের দেয়া সঞ্চিত পাপের বোঝা লাঘব করার চেষ্টা করেন। এ্যাকটনের মতে রাজাদের মধ্যে অনুতপ্তের ভাব বিশেষ ভাবে দেখা দেয় বলেই তাঁরা নানারূপ সংস্কার কার্যে ব্রতী হন। অতএব তাঁর মতে এই রাজতন্ত্রকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরতন্ত্র না বলে অনুতপ্ত রাজতন্ত্র বলাই অধিক সঙ্গত। লর্ড এ্যাকটনের এই অভিমত আমরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ আমরা জানি যে তথাকথিত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা রাজতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য প্রজাহিতৈষণার মুখোস পরেছিলেন। এই যুগের কোন রাজার মধ্যেই পূর্বসূরীদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। সুতরাং অনুতপ্ত রাজতন্ত্র কথাটি সতর্ক ভাবে ব্যবহার করতে হবে।

Q. 3. What were the defects of the Enlightened Despotism?

Ans. অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানদীপ্তি ইউরোপীয় শাসকবৃন্দকে প্রভাবিত করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এরা সকলেই শাসন ব্যাপারে সপ্তদশ শতাব্দীর রাজন্যবর্গের তুলনায় যে অধিকতর উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। তাঁরা প্রজাসাধারণের উন্নতির জন্য বিবিধ সংস্কারের প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার ত্রুটিহীন ছিল না। প্রথমত, এই শাসকরা রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের মতামতের ওপর কোন মূল্যই দিতেন না। জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার আছে বলে মনে করতেন না। সমস্ত সংস্কারমূলক কাজগুলিকে তাঁরা রাজার অনুগ্রহের দান বলে মনে করতেন। ফলে তাঁদের প্রবর্তিত

সংস্কারগুলি জনসাধারণ খোলা মনে গ্রহণ করতে পারে নি। এই সংস্কারগুলির প্রতি তাদের মধ্যে একটা সন্দেহ ও আশঙ্কার ভাব দেখা দেয়। ফলে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণ কোন স্থায়ী সংস্কার সাধন করতে পারেনি।

দ্বিতীয়ত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা:সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আংশিক পরিবর্ত:নের পক্ষপাতী ছিলেন। মধ্যযুগীয় বিধি ব্যবস্থা তারা সমূলে উৎপাটিত করতে চান নি। একটা রফার মনোভাব নিয়ে তাঁরা তাঁদের সংস্কার কার্যে ব্রতী হন। ফলে সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা কিছুটা কমলেও জনসাধারণকে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শোষণ করতে থাকেন। জনসাধারণও অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে আরও বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা নিজেদের বংশগৌরব বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধকে একমাত্র উপায় বলে মনে করতেন। প্রায়শঃই তাঁরা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে তাঁরা একান্ত-ভাবে মনোনিবেশ করতে পারতেন না। পরিশেষে বলা যায় যে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার একান্তভাবে নির্ভর করত শাসকের ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর। কোন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের মৃত্যুর পর এই গুণাবলী তাঁর বংশধরদের মধ্যে বর্তাতে পারেনি। ফলে ইউরোপের রাজনৈতিক জীবনে যে তমসা ছিল তা স্থায়িভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি।

চতুর্থ অধ্যায়

অস্ট্রিয়া (১৭৪০-১৭৯০)

Q. 1. What was the condition of Austria at the time of Maria Theresa's accession.

Ans. সতেরো শতকে অষ্ট্রিয়া ছিল এক শক্তিশালী রাষ্ট্র, এই যুগে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে অষ্ট্রিয়া ছিল শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ মর্যাদার মধ্যে তার দুর্বলতার বীজও উপ্ত ছিল। তিরিশ বছর ব্যাপী ধর্মযুদ্ধে (১৬১৮-১৬৪৮) অষ্ট্রিয়ার যোগদান এবং ক্যাথলিক ধর্মের উগ্র পরিপোষণ তার পক্ষে বুমেরাং স্বরূপ হল। এর পর অবশ্য অষ্ট্রিয়া তার সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করে এবং এক জাতীয় নীতি অনুসরণ করতে থাকে। জার্মানীতে নিজ আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিষ্ফল চেষ্টার পরিবর্তে তুরস্কের বিরুদ্ধে সে অভিযান চালাতে থাকে। এর ফলে জার্মানীতে অষ্ট্রিয়া আর নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারল না। এই সুযোগে প্রাশিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠল। ফ্রান্সের সাথে অষ্ট্রিয়ার বিরোধ ছিল বহুদিনের। এই বিরোধ শুরু হয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগ হতে। মেরিয়া থেরেসার আমলে অবশ্য এবিরোধের সাময়িক বিরতি ঘটে। মেরিয়া থেরেসার পূর্ববর্তী শাসকগণ কিন্তু বংশ গৌরবের স্বপ্ন দেখা হতে নিজেদের রেহাই দেননি। ইউরোপীয় প্রত্যেক যুদ্ধেই তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাঁরা নেদারল্যাণ্ড ও মিলানিজে দূরবর্তী এবং বিচিত্র ভূখণ্ডের অধিকারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এছাড়া সর্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকার ফলে তাঁরা অষ্ট্রিয়ার অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের দিকে একেবারেই নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। ফলে অষ্ট্রিয়া রাজ্যটি সামন্ততান্ত্রিক রাজ্য হিসেবেই টিকে রইল—আমলাতান্ত্রিক রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারল না। তাছাড়া অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতাও বিশেষ ভাবে বর্তমান ছিল। বহু জাতিভিত্তিক এই সাম্রাজ্যে ঐক্য বলে কিছু ছিল না, এবং জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে অষ্ট্রিয়া কোন দিনই গড়ে ওঠেনি। মেরিয়া থেরেসার সময়ে অবশ্য এক বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালান হয়।

অষ্ট্রিয়ার শোচনীয় অবস্থা

Q. 2. Give a brief account of (a) the internal reforms and (b) Foreign policy of Maria Theresa.

Ans. ১৭৪০-এর অক্টোবর মাসে মাত্র ২৩ বছর বয়সে মেরিয়া থেরেসা

অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকবৃন্দ Pragmatic Sanction—এ এই মর্মে সম্মতি দিলেন যে ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যুর পরে মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হবেন, কিন্তু পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হবেন না। একারণে মেরিয়া থেরেসা সম্রাজ্ঞী পদের অধিকারিণী হতে পারলেন না।

চরিত্র

মেরিয়া থেরেসার চরিত্রে নানা সদগুণ ছিল। তাঁর কাজের জন্য একান্তভাবে কি প্রয়োজন তা ঠিক করবার মত বিচার বুদ্ধি তাঁর যথেষ্ট ছিল এবং এর সাথে সত্যকার দেশপ্রেম যুক্ত হয়েছিল। প্রতিভাশালিনী না হলে ও তাঁর সাধারণ বুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান ছিল প্রভূত। তিনি ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন। অদম্য সাহস ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার বলেই তিনি তাঁর প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করেছিলেন। এবং অষ্ট্রিয়াকে চরম বিপদ হতে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিভিন্ন সমস্যা: সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথেই মেরিয়া থেরেসাকে হাজার রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। প্রথমত বৈদেশিক আক্রমণ জনিত সমস্যা এবং দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরীণ সমস্যা। আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সামরিক বিভাগে নানারূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা। সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল এবং তাদের মনোবলও ভেঙে পড়েছিল। রাজকোষ শূন্য অবস্থায় এবং হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহভাব প্রবল হয়ে ওঠে। ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার শত্রুদের উৎসাহ দিল এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বেভেরিয়া, স্তাক্সনি, প্রাশিয়া ও স্পেন মিলিত হয়ে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোট স্থাপনে তৎপর হল। এরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও কিন্তু মেরিয়া থেরেসা বিশেষ বিচলিত হলেন না। তিনি দৃঢ়হস্তে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্ম কৃতসঙ্কল্প হলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের নিকট তাঁকে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের একমাত্র দাবীদার হিসেবে মেনে নেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। ব্যাভেরিয়ার ইলেক্টার তাঁর এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করে নিজেকে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের একমাত্র দাবীদার হিসেবে ঘোষণা করলেন। প্রাশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক মেরিয়া থেরেসার নিকট হতে সাইলেসিয়া দাবী করলেন এবং এ রাজ্যাংশটি যদি তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে তিনি ব্যাভেরিয়ার বিরুদ্ধে মেরিয়া থেরেসাকে সাহায্য করবেন বলে জানালেন। মেরিয়া থেরেসা অবশ্য ফ্রেডারিকের এই দাবী

সরাসরি অগ্রাহ্য করে দেন। স্যাক্সনির ইলেক্টারও মেরিয়া থেরেসার নিকট অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চল চেয়ে বসলেন। স্পেন চাইল হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়া এবং সার্ডিনিয়া চাইল লম্বার্ডি, মেরিয়া থেরেসার ভাগে রইল কেবলমাত্র অস্ট্রিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলি। এর ফলে তার রাজত্বের প্রথমদিকে মনে হয়েছিল যে তিনি তাঁর সাম্রাজ্য অটুট রাখতে পারবেন না। কারণ ব্যাভেরিয়ার দাবীর পিছনে খোদ ভিয়েনাতেই দলের অভাব ছিল না। হাঙ্গেরীও মেরিয়া থেরেসাকে শাসক হিসেবে মানতে চাইছিল না। হাঙ্গেরী সমেত বিভিন্ন প্রদেশগুলি মেরিয়া থেরেসার এই দুর্দিনে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নেবার জন্য তৎপর হল। মেরিয়া থেরেসা তাদের বিভিন্ন দাবী মেনে নেওয়া সত্বেও তারা সম্পূর্ণভাবে তাঁকে সাহায্য করল না। এমনকি তিনি অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে কখনো অভিজাতদের ওপর কর বসানো হবে না বলে ঘোষণা করলেন।

উত্তরাধিকার সমস্যা ও যুদ্ধ

যাই হক ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হল, কিন্তু ইতিমধ্যে ফরাসী ও ব্যাভেরীয় সৈন্য অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে প্রবেশ করল। এদিকে মেরিয়া থেরেসার অধিকাংশ সৈন্যই ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে সাইলেসিয়ায় নিযুক্ত ছিল। একমাত্র ভরসা ছিল হাঙ্গেরী। কিন্তু হাঙ্গেরীর ডায়েট-এ (সভা) নতুন নতুন দাবী পেশ করতে থাকে। অবশেষে মেরিয়া থেরেসা নিজে হাঙ্গেরীয় ডায়েটের এক বৈঠক আহ্বান করলেন এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে মর্যাদাপূর্ণ এক বক্তৃতায় ডায়েটের সদস্যদের জানালেন যে তাঁর এবং তাঁর ছেলেদের এবং রাজবংশের ভাগ্য হাঙ্গেরীর জনসাধারণের রাজানুগত্যের ও শৌর্যের ওপর নির্ভর করছে। হাঙ্গেরীয় সদস্যরা তাঁর বক্তৃতায় বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন হল। অস্ট্রীয় সৈন্যেরা নতুন বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধ করতে থাকল।

তাঁর অপূর্ব নেতৃত্ব

আভ্যন্তরাণ সংস্কার: আয় লা-স্যাপেলের সন্ধি হতে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধশুরু হওয়া পর্যন্ত মেরিয়া থেরেসা অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন। এই কটি বছর তাঁর সংস্কার সাধনের ইতিহাসে প্রাথমিক পর্যায় বলে মনে করা যায়। এই সময়ের ভেতর তিনি অস্ট্রিয়ার রাজতান্ত্রিক কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন আনেন। মেরিয়া থেরেসা পরিপূর্ণভাবে দৈবসত্ব নীতিতে বিশ্বাস করতেন। অবশ্য প্রজাসাধারণের উন্নতির জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অস্ট্রিয়ায় এক কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করেন এবং জমিদারদের

রাজাদর্শ

ক্ষমতা কমিয়ে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটাবার চেষ্টা করেন। তবুও তাঁর সংস্কারগুলি সমগ্র দেশে প্রবর্তিত হয়নি—এক একটি অঞ্চলে হয়েছিল। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকেই তিনি তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, সিংহাসনে তাঁর নিজের স্থায়িত্বের প্রশ্ন উঠেছিল এবং সাইলেসিয়া তিনি হারান এগুলি তিনি ভুলতে পারলেন না এবং একারণেই তিনি শক্তিসঞ্চয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন এবং ফ্রেডারিকের ওপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। একারণে তিনি অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং বুঝতে পারলেন যে অষ্ট্রিয়ার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা। কারণ এটি না হলে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়ে পড়বে। প্রথমেই তিনি রাষ্ট্রীয় সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন সৈন্য বাহিনীর অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য। তাছাড়া সামরিক বাহিনীর প্রত্যেক অংশেই সংস্কার সাধন ও নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করে এটির দক্ষতা বৃদ্ধি করলেন। এর পর তিনি রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি ছিল, সেগুলি যতদূর সম্ভব দূর করবার চেষ্টা করেন এবং এক কেন্দ্রীভূত রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করলেন।

শাসন তান্ত্রিক সংস্কার

কিন্তু অষ্ট্রিয়া ছিল বহু জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র। এখানে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার অসুবিধা ছিল। ইটালী, বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরী প্রভৃতি স্থানে তিনি পুরানো ব্যবস্থা নাকচ করতে পারলেন না। একারণে তাঁর সংস্কারগুলি প্রথমদিকে কেবলমাত্র অষ্ট্রিয়া ও মোরাভিয়ায় প্রযুক্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় প্রথমেই তিনি তাঁর নিজের অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আনলেন এবং এই অঞ্চলের সকল শ্রেণীর সম্পত্তি অধিকারীর ওপর কর বসালেন। আগে শ্রমিক শ্রেণী কর হতে রেহাই পেত। এরপর তিনি শাসন বিভাগের আওতা হতে বিচার বিভাগ পৃথক করলেন। একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হল। আইন কানুন বিধিবদ্ধ করা হল এবং একই রকমের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন বিধি প্রবর্তিত হল। বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থা জারী করে এবং সুন্দর সুন্দর রাজপথ নির্মাণের দ্বারা তিনি জাতীয় ঐক্যের সম্ভাবনা বাড়ালেন।

বৈদেশিক নীতি ঃ অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধে চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও মেরিয়া থেরেসা হতবুদ্ধি হলেন না। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এবং পরিশেষে তিনি আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য বণ্টনের আশঙ্কা হতে নিষ্কৃতি পেয়েছে। অবশ্য সাইলেসিয়া হারাতে হল।

এরপর মেরিয়া থেরেসা সাইলেসিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করলেন এবং অষ্ট্রিয়ার বৈদেশিক নীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এলেন। কৌনিজের সহায়তায় তিনি ইংল্যাণ্ডের সাথে পূর্বসম্বন্ধ পরিত্যাগ করে ফ্রান্সকে মিত্ররূপে গ্রহণ করলেন। এই পররাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন কূটনৈতিক বিপ্লব নামে খ্যাত। এই বিপ্লবের সার্থক রূপায়নে মেরিয়া থেরেসার অবদান সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়।

সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধেও মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার নবলব্ধ শক্তির পরিচয় দিলেন। অবশ্য সাইলেসিয়া তিনি পুনরুদ্ধার করতে পারলেন না।

যখন পোল্যাণ্ডকে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করে নেবার ব্যবস্থা হল তখন মেরিয়া থেরেসা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারলেন না। যদিও তিনি প্রথমে পোল্যাণ্ড ভাগের বিরোধী ছিলেন, শেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে অষ্ট্রিয়া যদি এতে যোগ না দেয় তা হলে অষ্ট্রিয়ারই ক্ষতি হবে এবং তার শত্রুদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে তিনি অষ্ট্রিয়ার সংলগ্ন পোল্যাণ্ডের সর্বোৎকৃষ্ট অংশটুকু লাভ করলেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসার যখন মৃত্যু হল তখন দেখা গেল যে আধুনিক রাষ্ট্রের মর্যাদায় অষ্ট্রিয়া অনেকটা উন্নত হয়েছে। এবং এর জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মেরিয়া থেরেসার। তাঁর শাসন স্বৈরাচারী ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু তাঁর শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল প্রজাদের কল্যাণ সাধন করা। তাঁর প্রগতি মূলক সংস্কার ও বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র-নীতির ফলেই অষ্ট্রিয়া সম্ভাব্য বণ্টন হতে পরিত্রাণ পায়। আঠারো শতকের ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে মেরিয়া থেরেসা অন্যতম ছিলেন।

Q 3. Give an account of the home and foreign policy of Joseph II. How far was he successful? *Or*, Give an account of the reforms of Joseph II. Why did he fail? Give a critical account of the foreign policy of Joseph.

Ans. দ্বিতীয় জোসেফ পনের বছর ধরে তাঁর মায়ের সাথে সহ-শাসক ছিলেন এবং মাতার মৃত্যুর পর (১৭৮০) দশ বছর তিনি একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন।

চরিত্র: জোসেফের চরিত্র আদর্শ ও প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। তাঁর ন্যায় রুচিস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরপতি সমসাময়িক যুগে আর দেখা যায় না। তৎকালীন প্রচলিত সর্বোত্তম শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর মধ্যে এক

প্রগতিশীল মনোভাব গড়ে ওঠে। তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই দেশ ভ্রমণ তাঁর মানসিক প্রসারতায় সাহায্য করেছিল। বহু সমস্যা জর্জরিত অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি অব্যাহত রাখবার জন্ত তিনি প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য ও মনোভাব নিয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন।

জ্ঞানদীপ্ত শাসক

আভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল—(ক) শান্তি শৃঙ্খলা এবং দক্ষতার একান্ত পরিপোষকরূপে সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং অসংঘবদ্ধ অঞ্চলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। (খ) আইনের ক্ষেত্রে সকল প্রজাকে সমান মর্যাদা দেওয়া এবং অভিজাতদের বিশেষ সুবিধাগুলি বিলুপ্ত করা, (গ) বিভিন্ন প্রদেশগুলির উগ্র প্রাদেশিকতা দূর করে সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি শাসন বিভাগে বিভক্ত করা এবং জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগানো। তিনি যে আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণ করেছিলেন তা হতে বোঝা যায় যে তিনি ইউরোপীয় জটিলতম রাজনৈতিক সংস্থাকে তৎকালীন সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ভাবধারা অনুযায়ী পুনর্গঠিত করতে চেষ্টা করেন। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার অধীনে গণতান্ত্রিক সমদর্শিতা স্থাপন করতে চান।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে শাসন সংস্কার যে একান্ত ভাবে প্রয়োজন তা জোসেফ প্রথম হতেই জানতেন এবং এই শাসন সংস্কার প্রবর্তন করাকে তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করলেন। নিজে দয়ালু ছিলেন বলে তাঁর ধারণা হল যে ব্যাপক সংস্কারের মধ্য দিয়ে দয়া এবং করুণাকে পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত করতে হবে। ফলে সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি আভ্যন্তরীণ সংস্কারকার্যে ব্রতী হলেন। তাঁর সংস্কারগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি—**ধর্মনৈতিক সংস্কার ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার।**

ধর্মনৈতিক সংস্কার: ধর্ম কখনো রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করবে না বলে জোসেফ মনে করতেন এবং রাষ্ট্রনীতি ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ফলে তিনি এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি পোপের শাসনমুক্ত এক জাতীয় চার্চ গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। এই অভিপ্রায়ে ১৭৮১, ১৭৮৪ ও ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরপর তিনটি অনুশাসন জারি করেন। এগুলির দ্বারা তিনি ঘোষণা করলেন যে তাঁর অনুমতি ছাড়া ধর্মব্যাপারে পোপের কোন নির্দেশ অষ্ট্রিয়াতে কার্যকরী হবে না। এ ছাড়া তিনি চার্চের উচ্চ

ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ

পদগুলিতে পুরোহিত নিয়োগের ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং পুরোহিতদের সুষ্ঠুভাবে শিক্ষিত করে তোলবার জন্ত উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি সহনশীলতার নির্দেশ (Edict of toleration) জারি করে ধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর প্রজাকে অবাধে নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী ধর্মাচরণের অধিকার দিলেন। এই আইনের ফলে অষ্ট্রিয়ার প্রটেষ্টাণ্টরাও চার্চ ও বিদ্যালয় স্থাপন করবার অধিকার পেল। অবশ্য গোঁড়া ক্যাথালিকরা এ আইনের বিরোধিতা করল এবং বেলজিয়ামের অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। জোসেফ কিন্তু তাঁর ধর্মনীতির পরিবর্তন করলেন না। বরঞ্চ তিনি জেসুইট সংঘের ক্ষমতা খর্ব করলেন।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার: এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে জোসেফ তাঁর সমগ্র রাজ্যটিকে ১৩টি অঞ্চলে বিভক্ত করলেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলের শাসনভার একজন সামরিক কর্মচারীর ওপর দিলেন। প্রদেশপাল বা গভর্ণরের কাজ ছিল তাঁর এলাকার মধ্যে আইন কার্যকরী করা এবং কৃষককুলকে জমিদারদের অত্যাচার হতে রক্ষা করা। অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সহরগুলির যে স্বায়ত্ত শাসনমূলক বিশেষ অধিকার ছিল তা কেড়ে নেওয়া হল এবং 'বেলিফ' নামক রাজকর্মচারীর উপর শাসনভার দেওয়া হল। জোসেফ প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি সার্কেলে এবং প্রত্যেকটি সার্কেলকে কয়েকটি টাউনশিপে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক অঞ্চলেই উপযুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করে একই প্রকারের শাসন ব্যবস্থা চালু করলেন। জোসেফ আশা করেছিলেন যে একই রকম শাসন ব্যবস্থা চালু থাকলে জনসাধারণের মধ্যে সংকীর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য বোধ জাগতে পারবে না।

আইন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার: সাম্রাজ্যের প্রজারা যাতে ন্যায় বিচার পেতে পারে তার জন্ত তিনি প্রচলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধির সংস্কার করেন এবং ব্যয়বহুল বিচার ব্যবস্থার বহু ক্ষেত্রে ব্যয় সঙ্কোচসাধন করেন। অপরাধীকে নির্যাতন করা বন্ধ করে দেন এবং মৃত্যুদণ্ড কেবলমাত্র রাজদ্রোহীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে বলে ঘোষণা করেন। যাদু এবং নাস্তিকতা অপরাধ বলে আর গণ্য হবে না বলে ঘোষণা করেন। ভিয়েনা নগরীতে সর্বোচ্চ বিচারের অধিকার সম্পন্ন একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা করেন। এই সুপ্রীম কোর্টের অধীনে ছয়টি প্রাদেশিক আপিল আদালতও স্থাপিত হল। অভিযুক্ত ব্যক্তি এখন হতে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল আদালতে এবং আপিল-আদালত হতে সুপ্রীম কোর্টে চূড়ান্ত আপিল করবার সুযোগ পেল।

সামরিক বিভাগে সংস্কার: মেরিয়া থেরেসার আমলেই এদিকে নজর

দেওয়া হয়েছিল। জোসেফ অষ্ট্রিয়াকে সামরিক দিক হতে শক্তিশালী করবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি অষ্ট্রিয়াতে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করলেন যাতে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী জাতীয় বাহিনীতে পরিণত হতে পারে। এছাড়া সৈন্যবাহিনীর ওপর তিনি নিজের ক্ষমতা বজায় রাখলেন।

দেশের অর্থনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সংস্কার: দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য জোসেফ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি প্রচলিত কর ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনলেন। ফলে অভিজাত শ্রেণী ও পুরোহিতগণ কর দিতে বাধ্য হলেন। সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি ভূমিকর প্রবর্তন করলেন। তিনি বিভিন্ন সামগ্রী আমদানির ওপরে খুব উচ্চহারে শুল্ক বসালেন। স্বভাবতই এটি করা হয়েছিল মারকেনটাইলপন্থীদের মতবাদ অনুযায়ী। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য, মরক্কো, তুরস্ক, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত করলেন। লেভান্ত ও আড্রিয়াটিক অঞ্চলে বাণিজ্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন এবং ভারত ও চীনে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করা হয়। দেশের অসংখ্য রাস্তাঘাটের সংস্কার করে এবং নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করে তিনি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পথ সুগম করেন।

সামাজিক সংস্কার: সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে জোসেফের অবদান সর্বাধিক। তিনি ভূমিদাস প্রথা উঠিয়ে দেন। কৃষকদের স্বাধীনতা দেন এবং কর্ভি (corvee) বা বেগার প্রথার জুলুম বন্ধ করেন। চাষীরা যাতে জমির মালিক হতে পারে তার আইনগত ব্যবস্থা তিনি করেন। তিনি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐক্য আনবার জন্য তিনি জার্মান ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করলেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ বিবাহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থাকে আইনগত স্বীকৃতি দিলেন।

আভ্যন্তরীণ সংস্কার নীতির সমালোচনা: জোসেফের আভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলির অধিকাংশই যে আধুনিক কালের মাপকাঠিতে প্রগতিমূলক ও জনকল্যাণমূলক ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এই সব সংস্কার সাধনের পেছনে জোসেফের আন্তরিকতা, দেশপ্রেম ও সুবিচারের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে জোসেফ প্রবর্তিত সংস্কারগুলির অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছিল। কেবলমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি যে সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন সেগুলি স্থায়ী হয়েছিল। অন্যান্য সংস্কারগুলি প্রত্যাহার করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। এর পিছনে অবশ্য

কারণও ছিল। প্রথমত তিনি সংস্কার সাধনের জন্য অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ শুরু করেন—মানবপ্রকৃতির সীমাবদ্ধতা ও মানবসমাজের রক্ষণশীলতার কথা তাঁর স্মরণে ছিল না। দ্বিতীয়ত তিনি সংস্কার প্রবর্তনের আগে প্রজাপুঞ্জের মানসিক প্রাক্-প্রস্তুতির জন্য চেষ্টা করেন নি। ফলে জনসাধারণ তাঁর সংস্কারের মূল্য বুঝতে পারল না এবং তারা বিদ্রোহ করল। তৃতীয়ত বহুভাষাভাষী অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে জার্মান ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে তিনি অন্যান্য ভাষাভাষী জনসাধারণের ভাবগ্রন্থিতে (sentiment) আঘাত করেন। চতুর্থত, ক্যাথলিক ধর্মের উপর আঘাত করে তিনি ধর্মভীরু প্রজাদের বিরাজভাজন হন। এর ফলে বেলজিয়ামে বিদ্রোহ হয়। তাছাড়া, অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রের শক্তি অনেকটা নির্ভর করত চার্চের সহযোগিতার ওপর। তিনি চার্চের ক্ষমতা কমিয়ে রাজতন্ত্রের বিপদ ডেকে আনলেন। পরিশেষে বলা যায় যে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করায় অভিজাত শ্রেণী তাঁকে হস্তক্ষেপকারী স্বেচ্ছাচারী রাজারূপে গণ্য করলেন। অভিজাতদের মধ্যে সেই কারণে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। জোসেফ প্রবর্তিত সমস্ত সংস্কার অস্ট্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য ছিল, কিন্তু জোসেফের ধৈর্য ও বাস্তবানুগ অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে এবং তাঁর প্রজাদের রক্ষণশীল মনোভাবের ফলে সেগুলি ব্যর্থ হল।

পররাষ্ট্র নীতি: পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণেও দ্বিতীয় জোসেফ অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, (ক) অস্ট্রিয়ার বিক্ষিপ্ত অঞ্চলগুলির একত্রীকরণ, (খ) প্রাশিয়াকে দমন করে জার্মানীতে অস্ট্রিয়ার প্রভাব পুনঃস্থাপন, (গ) অ্যাড্রিয়াটিক সাগরতীরে অবস্থিত অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন এবং দানুয়ুব ও কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার বাণিজ্যিক স্বার্থ-সংরক্ষণ।

লক্ষ্য

এই উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য জোসেফ তৎপর হলেন। প্রথমে তিনি অস্ট্রিয়ার সন্নিকটে অবস্থিত রাজ্যগুলি গ্রাস করবার চেষ্টা করেন। ভেনিস, ইস্ট্রিয়া, ডালমেসিয়া ও ওয়ালেসিয়া, বেলগ্রেড, বসনিয়া, হার্জিগভনিয়া, মন্টিনেগ্রো এবং সার্বিয়ার একাংশ জয় করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। তা ছাড়া অস্ট্রিয়ার বিক্ষিপ্ত অঞ্চলগুলির একত্রীকরণের জন্য তিনি বেলজিয়াম ছেড়ে দিয়ে বাভেরিয়া পাবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। প্রাশিয়া ও ফ্রান্স তাঁর কার্যের বিরোধিতা করতে পারে বলে তিনি রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। আভ্যন্তরীণ সংস্কার ক্ষেত্রে তিনি যেমন ব্যর্থ হয়েছিলেন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্যলাভ করতে পারেননি।

পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি দখল করার ইচ্ছা

জোসেফের জার্মান নীতি: অষ্ট্রিয়াকে শক্তিশালী করবার জন্য জোসেফ প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেটের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার চেষ্টা করেন। জার্মানীতে অষ্ট্রিয়া যাতে তার আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করলেন। বাভেরীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ, হল্যাণ্ডকে ভীতি প্রদর্শন ও বেলজিয়াম বিনিময় প্রস্তাব—এই তিনটি বিষয় হল জোসেফের জার্মান নীতির স্তম্ভ স্বরূপ। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ার সিংহাসন খালি হয়ে পড়ে। পুরানো রাজবংশের কোন দাবীদার না থাকায় প্যালাটিনের ইলেক্টর বাভেরিয়ার সিংহাসন পান। তিনি অর্থের বিনিময়ে জোসেফকে বাভেরিয়া দিয়ে দিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট এর বিরোধিতা করলেন। তিনি মনে করলেন যে অষ্ট্রিয়া বাভেরিয়ায় হস্তক্ষেপ করলে জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে। ফ্রান্সও এবিষয়ে অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করল না। ক্যাথারিন দি গ্রেট অবশ্য সাময়িক ভাবে এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তেসচেন-এর সন্ধি অনুসারে জোসেফ বাভেরিয়ার কেবলমাত্র ইন (Inn) নামক ক্ষুদ্র স্থানটি পেলেন। এর পরিবর্তে তাঁকে প্যালাটিনের ইলেক্টারের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল তা নাকচ করে দিতে হল।

বাভেরিয়া দখল করার ইচ্ছা

হল্যাণ্ড-এর প্রতি ভীতি প্রদর্শন: ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে জোসেফ দৃঢ়ভাবে জানালেন যে সীমান্তবর্তী দুর্গগুলি হতে ডাচ সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। এই সময় হল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফলে জোসেফের এই হুমকিতে সে ভয় পেল এবং যথাসময়ে সৈন্য সরিয়ে নিল। এতে উৎসাহিত হয়ে জোসেফ হঠাৎ কয়েকটি ডাচ দুর্গ দখল করে নিলেন এবং সেলড্‌ট নদীতে অষ্ট্রিয়ার বাণিজ্য জাহাজের অবাধ গমনাগমনের অধিকার ডাচদের নিকট দাবি করলেন। অন্য কোন রাষ্ট্র যাতে এই নদীর ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে তার জন্য ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকত। প্রাশিয়া ও ফ্রান্স তাদের সাথে যোগ দিল। কিন্তু এতেও জোসেফ তাঁর কাজ হতে বিরত হলেন না। কিন্তু তাঁর একমাত্র মিত্র রাশিয়া যখন তাঁকে হল্যাণ্ডের সাথে সন্ধি করবার জন্য পরামর্শ দিল তখন জোসেফ বাধ্য হয়ে তাঁর আক্রমণাত্মক নীতি পরিবর্তন করলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ফন্টেইনব্লো (Fontainbleau) নামক সন্ধিতে জোসেফ মেষ্ট্রিক্ট-এর ওপর তাঁর দাবি ত্যাগ করলেন। কিন্তু হল্যাণ্ডের সীমান্ত দুর্গের কয়েকটি তাঁর অধিকারে এল এবং সেলড্‌ট নদীর নির্দিষ্ট এলাকায় অষ্ট্রিয়ার বাণিজ্যিক অধিকার মেনে নেওয়া হল।

হল্যাণ্ড নীতি

বেলজিয়াম নীতি : জোসেফ বেলজিয়ামকে বিনিময় করে বাভেরিয়া পাবার চেষ্টা করলেন। এই চেষ্টার মধ্যে তাঁর কূট কৌশলজ্ঞানের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এটি সফল হলে জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার প্রতিপত্তি বেশ বৃদ্ধি পেত। তাছাড়া, সুদূরে অবস্থিত বেলজিয়ামের পরিবর্তে অষ্ট্রিয়ার নিকটবর্তী বাভেরিয়া অধিকার করতে পারলে অষ্ট্রিয়ার শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মনে করলেন। কিন্তু প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট তাঁর এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জার্মান রাজাদের এক রাষ্ট্রজোট (Furstenbund) গঠন করে এমন আপত্তি তুললেন যে জোসেফ বাভেরিয়া অধিকারের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করলেন।

রুশ নীতি : রাশিয়ার সাথে অষ্ট্রিয়ার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধিতে অষ্ট্রিয়া শঙ্কিত হল। অষ্ট্রিয়ার পূর্ব-সীমান্তে রাশিয়ার এই অগ্রগতি জোসেফ ভাল চোখে দেখলেন না। এই কারণে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পোল্যাণ্ড বিভাগে অষ্ট্রিয়া যোগ দেয় এবং পোল্যাণ্ডের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী অঞ্চল গ্যালেসিয়া হস্তগত করেন। সাইলেসিয়া হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে অষ্ট্রিয়ার যে ক্ষতি হয়েছিল এর দ্বারা তা কিছুটা পূরণ হল।

তুরস্ক নীতি : বাভেরিয়া অধিকার করতে না পেরে জোসেফ অষ্ট্রিয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত তুর্কী সাম্রাজ্যের ওপর নজর দিলেন এবং মলডেভিয়া, ওয়ালেকিয়া, সার্বিয়া প্রভৃতি অঞ্চল যাতে হস্তগত করতে পারেন তার জন্য তৎপর হলেন। এ বিষয়ে রাশিয়ার সাহায্য পেলে তার সুবিধা হবে মনে করে তিনি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইউক্রেনে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। এই বৈঠক শেষে অষ্ট্রিয়ার সাথে রাশিয়ার একটি মিত্রতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করে নেবার কথা চুক্তিটিতে বলা হয়। তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাথে চুক্তি করা জোসেফের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তিনি বুঝতে পারেননি যে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের জন্যই তাঁর রুশ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল, তুরস্ক-বিরোধী নীতি নয়।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সাথে তুরস্কের পুনরায় যুদ্ধ বেধে ওঠে। অষ্ট্রিয়া এই যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। রুশ বাহিনী যুদ্ধে জয়ী হলেও অষ্ট্রীয় বাহিনী তুরস্কের বিরুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাতে পারল না। এই সময় আবার বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফ্রেডারিক দি গ্রেটও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে নানারূপ মতলব করতে থাকেন। এই যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই জোসেফের মৃত্যু হল (১৭৯০)। তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় নীতিও ব্যর্থ হল।

পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা : জোসেফ তাঁর আভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলির দ্বারা অষ্ট্রিয়ার যে উন্নতিসাধন করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে গেল তাঁর ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতির ফলে। এইখানেই তাঁর রাজত্বের ব্যর্থতা দেখা যায়। তিনি যদি তাঁর সুষ্ঠু আভ্যন্তরীণ নীতির মত কার্যকরী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে পারতেন তাহলে তাঁর রাজত্বকাল অষ্ট্রিয়ার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের অবতারণা করত। কিন্তু তা হল না, কারণ তিনি যে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করলেন তা অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ-বিরোধী ছিল। রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করে তিনি খুবই ভুল করেছিলেন। তুরস্কের ওপর চাপ দিয়ে তিনি ক্যাথারিনকে লাভবান করালেন, নিজে অবশ্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের কোন অংশই গ্রহণ করলেন না। তবে আশা করলেন যে ক্যাথারিন তাঁর জার্মান নীতি সমর্থন করবেন এবং বাভেরিয়া হস্তগত করায় সাহায্য পাবেন। কিন্তু সেরূপ সাহায্য পেলেন না, ফলে ফ্রেডারিক আরও উৎসাহিত হয়ে যোসেফের বাভেরিয়া নীতির বিরোধিতা করলেন। জোসেফ জার্মানীতে হাপ্‌সবার্গ রাজবংশের প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে দেখলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিক রাজারা প্রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করছে। এটা তাঁর নিকট একটা বিরাট বেদনাদায়ক ব্যর্থতা। এর পর তিনি রাশিয়ার সাথে মিত্রতার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান কিন্তু কৌনিজের পরামর্শে তা করতে পারলেন না। পরন্তু রুশ-তুর্কী যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া অনর্থক যোগ দিয়ে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ-বিরোধী কার্য করলেন তিনি যখন বলকান অঞ্চলে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন ঠিক সেই সময় বেলজিয়াম বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং হাঙ্গেরির জমিদাররা হারানো ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হয়। ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায় এবং নতুন যুদ্ধ কর জনসাধারণের অসন্তোষ বাড়িয়ে দেয় এবং এই অসন্তোষ সুবিধাবাদীরা কাজে লাগায়। এদিকে রুশ-তুর্কী যুদ্ধে যোগ দিয়ে অষ্ট্রিয়ার সমূহ আর্থিক ক্ষতি হল, লাভ কিছুই হল না। যুদ্ধ পরিচালনার আনুষঙ্গিক যোগানের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল, ১৭৮৮-এর সামাজিক অভিযান ব্যর্থ হল এবং জোসেফের পূর্বেকার সামরিক খ্যাতি নষ্ট হয়ে গেল। সুবিধা বুঝে প্রাশিয়া স্যাক্সনী অষ্ট্রিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করল। জোসেফকে দুটি রণাঙ্গণে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হল। বাধ্য হয়ে তিনি সম্ভাব্য প্রাশিয়ার আক্রমণে সর্বৈব সাহায্য পাবেন কিনা তা ক্যাথারিনের নিকট জানতে চাইলেন নচেৎ অষ্ট্রিয়া তুরস্কের সাথে পৃথক ভাবে সন্ধি করবে বলে উল্লেখ করলেন। ঠিক এই বিপদসংকুল অবস্থায় জোসেফ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

জোসেফের কৃতিত্ব : বিদ্যা, বুদ্ধি, ঔদার্য ও প্রজাহিতৈষণার দিক হতে দেখলে জোসেফ ছিলেন আঠারো শতকের রাজন্যবর্গের মধ্যে অনন্য। স্বৈরতন্ত্রী

শাসক হয়েও তিনি গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অষ্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন বলেই তিনি তাঁর রাজ্যকে অধিকতর সুসংবদ্ধ এবং আত্মরক্ষায় সমর্থ করে তুলতে চেয়েছিলেন।

জনসাধারণ শাসক

তিনি যে অভ্যন্তরীণ নীতি চালু করেছিলেন তাতে দেখা যায় যে তিনি ইউরোপের জটিলতম রাজনৈতিক সংস্থাকে তখনকার দিনের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ভাবধারা অনুযায়ী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তিনি ভূমিদাস প্রথা তুলে দেন এবং চাষীও যাতে জমির মালিক হতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে অষ্ট্রিয়াতে সামন্ত-তান্ত্রিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ ঘটল এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে কিছুটা সাম্য সাধনে সফলতা অর্জন করল। সার্ফ প্রথার বিলুপ্তি যে জোসেফের অক্ষয় কীর্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যের সর্বত্র পক্ষপাতশূন্য বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি আইনের চোখে সকল প্রজাকে সমান মর্যাদা প্রদান করেন। আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তিনি অষ্ট্রিয়ার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। ধর্ম ব্যাপারেও তিনি উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন।

ব্যর্থতা: জোসেফের চরিত্রে দোষগুণের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ইউরোপের আঠারো শতকের রাজাদের মধ্যে পাণ্ডিত্যে তিনি ছিলেন সকলের সেরা। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন। তাঁর আদর্শ, চিন্তাধারা এবং প্রগতিশীল মন যুগের তুলনায় এত বেশি অগ্রসর ছিল যে তা বুঝবার ক্ষমতা তাঁর প্রজাবর্গের ছিল না। আধুনিক রাষ্ট্র তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলির মূল্য বুঝেছে। এদিক দিয়ে দেখলে জোসেফকে Statesman par excellence বলা হয়। অথচ ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে তিনি তাঁর শুভ প্রচেষ্টার বিনিময়ে পেলেন রাজ্যময় অশান্তি ও প্রজাদের নিকট হতে অকৃতজ্ঞতা।

জনসাধারণ তাঁর অভিনব নীতিগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারল না। ফলে জোসেফের মধ্যে সংস্কারের যে সৎসাহস ছিল তার প্রয়োগের দ্বারাই তিনি তাঁর অধিকাংশ সংস্কার কার্যগুলিকে বাতিল করে দেন।

ব্যর্থতার কারণ: সহজেই বোঝা যায় যে জোসেফ সংস্কারের দ্বারা একদিকে শ্রেণীস্বার্থ এবং অন্যদিকে জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রথা ও ঐতিহ্যের ওপর বলিষ্ঠ আঘাত করেন, এর জন্যই বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ ঘটে। হয়ত একটু ধীরগামী হলে অনেকগুলি সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি সফলতা অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন খুবই দ্রুতগতিতে—প্রথম পদক্ষেপ করবার পূর্বেই তিনি দ্বিতীয় পদক্ষেপ করে ফেলতেন। ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা, যে

কৃষককুলের জন্য তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছা ছিল তাঁরাও তাঁকে বুঝতে পারেনি, তাঁকে প্রশংসা করেনি। তাঁর মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থাতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর সমাধির ওপর কি চৈত্যলিপি থাকবে তাও তিনি ঠিক করে দেন—'এই স্থানে এরূপ ব্যক্তি শায়িত রয়েছেন যিনি যা কিছু করেছেন তাতেই ব্যর্থ হয়েছেন।' জোসেফের কার্যক্রমের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শুধু ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদটিই টিকে থাকল।

জোসেফ যতটা রাষ্ট্রবিদ্ ছিলেন ততটা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। মানুষের ক্ষমতা সীমিত, তা তিনি বুঝতে চাইতেন না। অনেক বিষয়েই তিনি আঠারো শতকের মানুষের বদলে উনিশ শতকের মানুষরূপে প্রতিভাত হতেন। কিন্তু তাঁর মত এত দ্রুতগতিতে ইতিহাস এগিয়ে যায় না। তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা বাস্তবধর্মী না হয়ে দার্শনিক মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্যই তিনি ব্যর্থকাম হয়েছিলেন। জনসাধারণের সমর্থন ভিন্ন কেবলমাত্র রাজশক্তির সাহায্যে কোন সংস্কার কার্যকরী হতে পারে না জোসেফ তা বুঝতে পারেননি।

দ্বিতীয় জোসেফ যদিও সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেননি। তাঁর আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি এবং কুটিল ষড়যন্ত্র তাঁর সংস্কার কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

অষ্ট্রিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা তাঁর উদারনৈতিক সংস্কারগুলির পরিপন্থী ছিল। অষ্ট্রিয়ার সামাজিক অবস্থা ছিল মধ্যযুগীয়, অর্থনৈতিক অবস্থা অনড়, পুঁজিবাদের তখনো বিকাশ ঘটেনি। এরূপ অবস্থায় জোসেফ যখন প্রগতিমূলক সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করলেন তখন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

জোসেফের কতকগুলি সংস্কার ঠিক প্রগতিমূলক ছিল না। সমগ্র অষ্ট্রিয়ায় জার্মানভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা তাঁর পক্ষে ঠিক হয়নি।

More Questions

1. 'Joseph II's history is · ···only the long and sorrowful story of a prince animated by the best intentions who failed in much that he attempted'. Explain.

Ans. ৩নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

2. 'Joseph II was the statesman par excellence of the age of reason'. Explain fully. Account for his failure to arrest the

decline of the Hapsburg monarchy. How far is it true to say that the policy of the Emperor Joseph II was radical? Do you agree with the view that he was the statesman par excellence of the age of reason?

Ans. ৩নং...প্রশ্ন দেখ।

3. Was Joseph the best Enlightened Despot of the 18th century? How far was his reforms successful?

Ans. ৩নং...প্রশ্নের উত্তর দেখ।

4. How far was the foreign policy of Joseph II basically related to his project of internal reforms? What were the causes of Joseph's failure?

Ans. বৈদেশিক নীতি অনুসন্ধানের সময় দ্বিতীয় জোসেফ তাঁর আভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলির কথা ভোলেন নি। বরঞ্চ তাঁর বৈদেশিক নীতি ও আভ্যন্তরীণ নীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। বৈদেশিক নীতিতে তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল হ্যাপসবার্গ বংশের রাজ্যগুলিকে অধিকতর সুবিধাজনকভাবে সুসংবদ্ধ করে অষ্ট্রিয়ার শক্তি সংগঠন করা। (এরপর ৩নং প্রশ্নের উত্তর দেখ)

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাশিয়া (Prussia 1740-1790)

পূর্বকথা : আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে প্রাশিয়ার অভ্যুদয় এক বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনা। উত্তর জার্মানীর অবস্থিত ক্ষুদ্র 'মার্ক' ব্রাণ্ডেন বার্গকে কেন্দ্র করে প্রাশিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে। ১৬৪০ হতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পর পর চার জন রাজার নেতৃত্বাধীনে প্রাশিয়া ইউরোপে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। গ্রেট ইলেক্টর (১৬৪০-১৬৮৮), প্রথম ফ্রেডারিক (১৬৮৮-১৭১৩), প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ম (১৭১৩-১৭৪০) এবং ফ্রেডারিক দি গ্রেট (১৭৪০-১৭৮৬)—সকলেই মনে করতেন যে রাজতন্ত্রই প্রাশিয়ার একমাত্র উন্নতিসাধন করতে পারে, স্বৈরতন্ত্রই একমাত্র সরকার এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই হল রাজতন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য। অবশ্য জনসাধারণের উন্নতির জন্য রাজারা চেষ্টা করে যাবেন।

Q. 1. Frederick William was the real founder of the modern Prussian state, which under Frederick the Great was to wrest the hegemony of Germany from Austria'. Discuss. *Or* Critically discuss the internal reforms of Frederick the Great. How far is it true to say that his achievements in the external field were more stable than those in the internal field ?

Ans. ফ্রেডারিক দি গ্রেট রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিশেষ সংস্কার সাধন করেননি। তাঁর পিতা ফ্রেডারিক উইলিয়ম দেশের শাসন ব্যবস্থার যে পরিবর্তন আনেন তা প্রায় দুশো বছর চালু ছিল। ফ্রেডারিক দি গ্রেট সেই শাসন কাঠামোকে আরও শক্তিশালী, রীতিবদ্ধ, সমুন্নত ও স্বৈরতন্ত্রের দিকে নিয়ে যান।

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের পিতা প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়ম যুদ্ধ পছন্দ করতেন না

প্রথম ফ্রেডারিকের আভ্যন্তরীণ সংস্কার

এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। অবশ্য এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তিনি গড়ে তোলেন। তাঁর পুত্র সিংহাসনে বসেই এই সৈন্যবাহিনী কাজে লাগান।

এক বিরাট সৈন্য বাহিনীর ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি দেশের আর্থিক সম্পদ ও রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭১৩) তখন মাত্র দুটি ক্ষেত্র হতে রাজস্ব সংগ্রহ করা হত—রাজার খাস জমি হতে এবং গ্রামাঞ্চলে কন্ট্রিবুসেন নামক কর এবং শহরাঞ্চলে একসাইজ নামক কর হতে।

এগুলি হতে যাতে ঠিকভাবে কর আদায় হতে পারে তার ব্যবস্থা তিনি করেন। ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে রাজস্ব আদায় দ্বিগুণ হল। রাজার খাস জমির পরিমাণ খুব বেশি ছিল বলে তিনি জোতদারদের মধ্যে কোন কোন জমি বাৎসরিক করের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিলি করবার ব্যবস্থা করলেন। এই জোতদাররা ইচ্ছে করলে আবার জমি বিলি করতে পারবে বলা হল। প্রথমে দু'বছরের জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হল। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ফ্রেডারিক উইলিয়ম সমগ্র দেশটিকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে ভাগ করেন। এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলে একজন করে বেলিফ (Bailiff) নিযুক্ত করেন। বেলিফের প্রধান কাজ ছিল নিজ নিজ অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বিচার ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে সেদিকে নজর রাখা। এসবের জন্য যা খরচ হত সেটা দেওয়া হত আদায়ীকৃত আঞ্চলিক কর হতে। এই ব্যবস্থার ফলে সরকারের পক্ষে বাৎসরিক বাজেট তৈরি করা সুবিধা হল এবং গ্রামাঞ্চলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। ফ্রেডারিক উইলিয়মের রাজত্বের শেষাশেষি রাজার খাস জমি হতে প্রাপ্ত রাজস্ব অন্যান্য কর হতে প্রাপ্ত রাজস্বের প্রায় সমান দাঁড়ায়। Contribution করটি ছিল অনেকটা আধুনিক কালের সম্পত্তি কর ও আয় করের মত, এটি ঠিক ভূমিকর ছিল না। এই কর আদায় করবার ভার দেওয়া হয় War Commissariat-এর ওপর। একসাইজ কর শহরাঞ্চলের জনসাধারণের ওপর বসান হয়েছিল। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য-এর আওতায় ছিল। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের আমলে এই করগুলি হতে প্রচুর রাজস্ব আদায় হয়। তাঁর পিতার জমান প্রচুর অর্থ তিনি পান। একারণে তাঁর পক্ষে সিংহাসনে আরোহণ করেই অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছিল।

ফ্রেডারিক উইলিয়মের শাসনকালে প্রায় প্রত্যেক শহরে সরকারী কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপন করা হয়। এই পরিষদের সদস্যরা আজীবন সদস্য থাকতেন এবং রাজকোষ হতে নিয়মিত বেতন পেতেন।

প্রত্যেক কাউন্সিলে ৩জন বারগোমাস্টার, ছয় বা ততোধিক কাউন্সিলার থাকত। এছাড়া কাউন্সিলের একজন ক্লার্ক, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং একজন সচিব থাকত। এই আঞ্চলিক কাউন্সিলগুলি কেবলমাত্র সরকারের স্বার্থের দিকে নজর রাখত না, নিজ নিজ অঞ্চলের শহরগুলির উন্নতির জন্য পরিকল্পনা ইত্যাদি গ্রহণ করত। কেন্দ্রীয় সরকারের excise করটি যাতে ঠিকভাবে আদায় হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখত। ১৭২৩ খৃ-এ জেনারেল ডাইরেক্টারী নামে একটি কেন্দ্রীয় কার্যদপ্তর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রাজস্ব ব্যাপারে এটি ছিল সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের

রাজস্ব ও শাসন ব্যাপারে দায়ী ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প সম্বন্ধেও এটির দায়িত্ব ছিল। রাজ্যের মন্ত্রী ও পরামর্শদাতারা এর সভ্য ছিল। এক এক জন মন্ত্রী দেশের একটি একটি অঞ্চলের জন্য দায়ী থাকত। তাছাড়া ডাক অধিকর্তা ও টাকশালের অধিকর্তাও এর সদস্য ছিল। রাজা এর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি নতুন নীতির প্রবর্তন করতেন এবং কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সময় ভোট গ্রহণ করা হত। ফ্রেডারিক দি গ্রেট-এর সময় অবশ্য এই ভোট নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তিনি কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে জেনারেল ডাইরেক্টারীর সদস্যদের কেবলমাত্র জানাতেন।

ফ্রেডারিক উইলিয়ম প্রাশিয়ার শাসন সমস্যা এরূপ সুষ্ঠুভাবে সমাধান করেন যে ফ্রেডারিক দি গ্রেট-এর সময় প্রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তিনি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করতে হয়নি।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডারিক উইলিয়মের মৃত্যু হয় এবং তাঁর প্রথম পুত্র ফ্রেডারিক সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৃত্যুর পুর্বেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ঠিক হাতেই তিনি দিয়ে যেতে পেরেছেন। আভ্যন্তরীণ শাসন ও সংস্কার ব্যাপারে ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি, করবার কিছু ছিলও না, কারণ তাঁর পিতা এবিষয়ে কিছু বাকী রেখে যাননি। ফ্রেডারিক দি গ্রেট অবশ্য প্রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থাকে আরও সুসংবদ্ধ করেন এবং স্বৈরতন্ত্রকে আরও জোরদার করেন। ফ্রেডারিক দি গ্রেট পিতার ন্যায় সংগঠক ছিলেন না তিনি ছিলেন উদ্যমী উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ। নিজের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস তাঁর ছিল এবং জীবনে ঝুঁকি নিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও লক্ষ্য তাঁর পিতার ঠিক বিপরীত ছিল। ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও ছিল অনুরূপ। তিনি পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য মানতেন না। ১৭৪০-এ অষ্ট্রিয়ার সিংহাসন খালি হলে তিনি আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করলেন এবং প্রাশিয়ার পরিধি বাড়াবার জন্য সাইলেসিয়া আক্রমণ করলেন। এই আক্রমণের পুর্বে তিনি অষ্ট্রিয়াকে কোনরূপ সতর্ক করে দেননি। আবার নিজের সুবিধা মত তিনি অষ্ট্রিয়ার সাথে চুক্তিও করেন। রাজনীতিতে সাধুতা ও নৈতিকতার কোন স্থান নেই বলে তিনি মনে করতেন। অবশ্য এবিষয়ে তিনিই কেবল দোষী ছিলেন না, পুর্বে ও পরে অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও অন্যান্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের শাসকগণও সমভাবে দোষী ছিলেন।

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের চরিত্র

আভ্যন্তরীণ সংস্কারনীতি: শান্তির সময় ফ্রেডারিক-এর শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানতে হলে ১৭৪৬ হতে ১৭৫৬ পর্যন্ত প্রাশিয়ার ইতিহাস জানতে হবে। দুটি যুদ্ধের এই মধ্যবর্তী দশ বছরেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টার পরিকল্পনা নেন। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর তাঁর কাজ হল দেশকে দুরবস্থা হতে উদ্ধার করা, যুদ্ধের পূর্বে যে জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সেগুলি বাস্তবে পরিণত করা। তবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রাশিয়ার রাজাকে সর্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্রস্তুতির দিকেই তাঁর নীতি পরিচালিত হয়েছিল। কারণ সিংহাসনে বসেই তিনি যে যুদ্ধ শুরু করেন পরবর্তীকালে যুদ্ধই তাঁর নীতি পরিচালিত করে; কারণ তিনি তাঁর নীতি দ্বারা বেশ কিছু শত্রু সৃষ্টি করেন—অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্র প্রাশিয়া.. প্রতি বিরূপ হয়ে রইল।

আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্কই অনুসরণ করেন এবং আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন করেন নি। রাজার ক্যাবিনেট টিকে থাকে। কিন্তু তিনি কারও ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না এবং কাউকে বিশ্বাসও করতেন না। মন্ত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতেন। তাঁর নিজের কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা ছিল অসীম, যন্ত্রের ন্যায় একটানা কাজ করতে পারতেন। সকাল ৫টা হতে তাঁর দৈনন্দিন কাজ শুরু হত এবং এটা চলত গভীর রাত্রি পর্যন্ত। রাষ্ট্রের প্রতিটি নীতি তিনিই নির্ধারণ করতেন, রিপোর্ট পড়তেন, সেই সবের জবাব দিতেন এবং নির্দিষ্ট মাসে রাজ্যের নানাস্থান সচক্ষে পরিদর্শন করতেন, কোথায়ও অব্যবস্থা থাকলে সত্বর দূর করতেন।

রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা একজনের ওপর পড়ায় ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি। কারণ ফ্রেডারিকের ন্যায় কর্মবীর প্রাশিয়ায় আর জন্মগ্রহণ করেন নি। তাছাড়া তাঁর সময়েই এই শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছিল না, নানা দোষত্রুটি থেকে যায়। কেন্দ্রীয় শাসন সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগের সংযোগ এবং আদান প্রদানের অভাব ছিল। কারণ ফ্রেডারিক বেশি করে লিখিত বিবরণের ওপর নির্ভর করতেন, আর এই লিখিত বিবরণ তাঁর দেখার জন্য যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করা হত। তাঁর উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের সাথে কোন ব্যক্তিগত সংযোগ ছিল না, সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা খাটাবার সুযোগ পেত না, সে কারণে স্বাধীনভাবে কাজ করবার মত ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে পরবর্তীকালে প্রাশিয়ার খুবই দুঃসময় উপস্থিত হয়।

খারাপ দিক

ফ্রেডারিকের শাসনকালে জেনারেল ডাইরেকটরী তার অনেক ক্ষমতা হারাতে বাধ্য হয়। ফ্রেডারিক এটিকে ভাল নজরে দেখতেন না কারণ এর কাজকর্ম মন্থর গতিতে চলত বলে। তা ছাড়া ফ্রেডারিক জমিদারদের সাথে কোনরূপ মতানৈক্য উপস্থিত হলে অফিসারদেরই দোষী করতেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের সময় কৃষকদের অসুবিধায় ফেলতে নিষেধ করতেন, কারণ তাঁর সামরিক বাহিনীতে কৃষক শ্রেণীই বেশি করে যোগ দিত। তাই বলে তিনি কৃষক শ্রেণীকে করভার হতে রেহাই দিতে পারেননি, কারণ তিনি জমিদার শ্রেণীকেও চটাতে চাইতেন না এবং একারণে তিনি জমিদারী প্রথার ও উচ্ছেদ চাইতেন না।

আভ্যন্তরীণ সংস্কার

অর্থনীতির দিক হতে দেখলে তিনি মারকেনটাইল নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এবিষয়ে অবশ্য তিনি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বিশেষ পছন্দ করতেন না। তাঁর অফিসারদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বিদেশ হতে দেশে সম্পদ আনবার দায়িত্ব হল ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায়ের, আর দেশ হতে সম্পদ বাইরে যাবার পথ রুদ্ধ করবার দায়িত্ব হল দেশীয় শিল্পের।

১৭৪২ খৃঃ-এ ফ্রেডারিক মনে করলেন যে দেশের শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির জন্য জেনারেল ডাইরেকটরী বিশেষ কাজ করেছে না বা করবার সামর্থ্য নেই, এদিকটা দেখার জন্য তিনি একজন মন্ত্রীর অধীনে একটি নতুন কার্যকরী বিভাগ খোলেন। এরপর আরও দুটি নতুন বিভাগ খোলা হয়—সাইলেসিয়ার জন্য এবং সামরিক শাসনের জন্য। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ফ্রেডারিক পুনরায় শাসনব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আনেন। জেনারেল ডাইরেকটরীর ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে ১৭৬৬ খৃঃ-এ Regie নামে এক নতুন বিভাগ স্থাপন করেন এবং এই বিভাগ পরিচালনার জন্য বিদেশীদের নিযুক্ত করেন। এতে তাঁর অফিসারগণ স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হন। এছাড়া তিনি ১৭৬৮ খৃঃ-এ বিজ্ঞান এবং বন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। পররাষ্ট্র ও বিচার বিভাগও জেনারেল ডাইরেকটরীর হাত হতে পৃথক করেন। ফলে এই বিভাগগুলি দ্রুত কাজ করতে সক্ষম হয়।

অর্থনৈতিক

প্রাদেশিক চেম্বারগুলি টিকে থাকে এবং রাজার সাথে তাদের সম্পর্ক নিকটতর হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন। ১৭৪৭ খৃঃ হতেই তিনি অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শুল্ক নির্ধারণের জন্য ব্যবসা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ব্যবহার করতে শুরু করেন। আভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রাচীর তুলে দেন এবং বেশ সুদীর্ঘ খাল খনন করেন ফলে জলপথে আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে আমদানীর ওপর যথেষ্ট বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। প্রাশিয়ার শিশু শিল্পগুলিকে

বাঁচাবার জন্য এটা প্রয়োজন হয়েছিল। স্বল্পবিত্ত প্রজাদের শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি সরকারী ঋণদানের বন্দোবস্ত করেন।

বিচারব্যবস্থায় তিনি আমূল পরিবর্তন করেন এবং এদিকে তিনি পিতার নিকট হতে কোন সাহায্য পাননি। দেশের অর্থ নৈতিক ও সামরিক চাহিদাই তাঁকে এই সংস্কার প্রবর্তন করতে বাধ্য করে। বিচারব্যবস্থায় তিনি জাতীয়করণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং দেশে একটি সুসংবদ্ধ কেন্দ্রীভূত বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। গোটা রাজ্যে একই প্রকার বিচার-ব্যবস্থা যাতে চালু হয় তার ব্যবস্থা তিনি করেন এবং অযোগ্য লোকদের সরিয়ে দিয়ে দক্ষ বিচারক নিযুক্ত করেন। দেশের আইন কানুন বিধিবদ্ধ করবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। ফলে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে কেন্দ্রীয় বিচারালয় স্থাপিত হয় এবং বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতিগণ ভাল বেতন পেতে থাকলেন এবং তাঁদের পক্ষে জরিমানার অর্থ নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সৎ ব্যক্তি যাতে উকিল হয় সেদিকেও তিনি নজর দেন। বিচারব্যবস্থার সংস্কারের ফলে সাধারণ লোকের ব্যক্তিস্বাধীনতা কিছুটা বৃদ্ধি পেল, তাদের নাগরিক অধিকারগুলি এবং বিশেষভাবে সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার ভাল ভাবে রক্ষা করা হল।

বিচারব্যবস্থা

যুক্তিবাদী দর্শনে প্রগাঢ় আস্থা ছিল বলে ফ্রেডারিক তাঁর প্রজাবর্গকে ধর্মোপাসনার স্বাধীনতা দান করেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও মেনে নেন। শিক্ষার প্রসারের তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন এবং সরকারী উদ্যোগে প্রাশিয়ায় অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বার্লিনের Academy of Sciences-কে পুনর্গঠন করেন। মুদ্রার ক্ষেত্রেও তিনি সংস্কারসাধন করেন। তিনি আভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপনের নীতি বজায় রেখেছিলেন। তাঁর রাজ্যের মধ্যে বসতি স্থাপনের জন্য জার্মানীর বিভিন্ন অংশের লোকদের উৎসাহিত এবং আকর্ষণ করবার ব্যবস্থা করেন। পশ্চিম প্রাশিয়াকে উন্নত করবার জন্য জার্মানদের সেখানে বসবাস করতে উৎসাহ দেন।

অন্যান্য সংস্কার

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের পর ফ্রেডারিকের সমস্যা ছিল প্রাশিয়ার পুনর্গঠন এবং ক্ষয়ক্ষতি পূরণের সমস্যা। প্রাশিয়ার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক যুদ্ধে ধ্বংস হয়, কৃষি. শিল্প বিধ্বস্ত হয়েছিল। এ কারণে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য পুনর্গঠনে তিনি ব্রতী হলেন। কৃষকদের ঋণ-দান এবং চাষবাসের জন্য অশ্ব দানের ব্যবস্থা করলেন। গ্রামে গ্রামে ঋণ সমিতি গড়ে ওঠে। সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় দশ সহস্র নতুন খামার তৈরি হল। প্রাশিয়ার বিবিধ শিক্ষা সরকারী

কৃষিক্ষেত্রে

আনুকূল্য লাভ করল। ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য প্রশস্ত রাজপথ ও খাল খনন করা হল। ভিশ্চুলা ও এলব নদী দুটির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি করা হল। দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে সার ও বীজ বণ্টনের বন্দোবস্ত করা হল। বহু জলাভূমির জলনিকাশেরও ব্যবস্থা হল। ফ্রেডারিকের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতার ফলে পুনরায় দেশের শ্রীসম্পদ ফিরে এল।

Q. 2. Discuss the foreign policy of Frederick the great.

Ans. বৈদেশিক নীতিতে ফ্রেডারিক মূলতঃ দুটি নীতি মেনে চলতেন—জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্থাপন করে অষ্ট্রিয়ার সাথে ক্ষমতার মোকাবিলা করা এবং প্রাশিয়ার সীমানা বৃদ্ধি করে ইউরোপের তৎকালীন সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এই নীতি দুটির সার্থক রূপায়ণে তিনি প্রথম হতেই সচেষ্ট হন এবং এর জন্য তিনি সততা, বাক্যনিষ্ঠা বা আন্তরিকতার কোন মর্যাদা আছে বলে মনে করতেন না। নিজের এবং তাঁর রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যা দরকার বলে মনে করতেন তার জন্য ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিতে ইতস্ততঃ করতেন না। এদিক হতে দেখলে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি নেন তাকে সংক্ষেপে সুবিধাবাদ বলা যেতে পারে। "যদি ন্যায় নীতি গ্রহণের ফলে কিছু লাভের সম্ভাবনা থাকে তাহলে সৎ হতে আমার আপত্তি নেই যদি প্রবঞ্চনার প্রয়োজন হয় তা হলে আমাকে প্রবঞ্চক হতে হবে,—যদি ফিরিয়ে দিতে না হয়, তা হলে অপরের যা কিছু নিতে পারো নিয়ে নাও—তাতে কোন অন্যায় হয় না", এই কথাগুলির মধ্যে তাঁর বৈদেশিক নীতির মর্মকথা নিহিত রয়েছে।

বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি

পিতার সুগঠিত সৈন্যবাহিনী ও পরিপূর্ণ রাজকোষ ফ্রেডারিকের বৈদেশিক নীতিতে বিস্ময়কর সাফল্য নিয়ে আসে।

সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরেই ফ্রেডারিকের বৈদেশিক নীতির সাফল্যের সুযোগ এল। ১৭৪০-এ অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস দেহত্যাগ করলে তাঁর কন্যা মেরিয়া থেরেসা অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এই সিংহাসনে অন্যান্য দাবীদার থাকায় ফ্রেডারিকের পক্ষে এক মহা সুযোগ উপস্থিত হল। তিনি অষ্ট্রিয়ার সমৃদ্ধশালী প্রদেশ সাইলেসিয়া দখল করবার জন্য তৎপর হলেন। এটি গ্রাস করতে পারলে একদিকে যেমন প্রাশিয়ার সীমানা বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে তার ইউরোপীয় রাজনীতিতে সম্মানজনক স্থান হবে। এই যুদ্ধ ৮বৎসর ধরে চলেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী

সাইলেসিয়া দখল ও যুদ্ধ

বহু কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হল। যুদ্ধের ফলে ফ্রেডারিক সাইলেসিয়া লাভ করলেন। প্রাশিয়ার সীমানা বৃদ্ধি পেল; বৃহৎ শক্তি হিসেবে প্রাশিয়ার অভ্যুত্থান ঘটল।

সাইলেসিয়া হারানোর শোক মেরিয়া থেরেসা ভুলতে পারলেন না। এটি পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি তৎপর হলেন এবং অষ্ট্রিয়ার চিরাচরিত বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন করতে চাইলেন। অষ্ট্রিয়া তার পুরানো বন্ধুরাষ্ট্র ইংল্যাণ্ডের পরিবর্তে ফ্রান্সের সাথে মিত্রতাস্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করল। ফ্রেডারিক দূরদর্শী ছিলেন। তিনি ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে প্রাশিয়ার সমূহ বিপদ হতে পারে বলে মনে করলেন এবং যুদ্ধকালে ইউরোপে প্রাশিয়া যাতে নির্বান্ধব অবস্থায় না পড়ে তার জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডের সাথে 'ওয়েস্টমিনস্টারের কনভেনশন' নামে এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এই চুক্তি স্বাক্ষর হবার পর ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার সাথে প্রথম ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করল। সুতরাং এদিক হতে দেখলে কূটনীতিক বিপ্লবের জন্য ফ্রেডারিকের অবদান কম নয়।

কূটনৈতিক বিপ্লব

কূটনীতিক বিপ্লবের অবধারিত ফল হিসেবে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ দেখা দেয়নি, এই যুদ্ধের জন্য বেশি করে দায়ী হলেন ফ্রেডারিক। তিনি আশঙ্কা করলেন যে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া একজোটে প্রাশিয়া আক্রমণ করে ধ্বংস করবে। শত্রু দ্বারা প্রাশিয়া পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে এই আশংকা করে ফ্রেডারিক :এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসলেন—স্যাক্সনী আক্রমণ করলেন। ফলে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হল। এ যুদ্ধের জন্যও ফ্রেডারিক বিশেষ ভাবে দায়ী ছিলেন।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ও ফ্রেডারিকের দায়িত্ব

হিউবার্টসবার্গ ও প্যারির চুক্তি দ্বারা সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়ার মর্যাদা সম্মানজনক ভাবেই বজায় থাকল। অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও রাশিয়া একজোটে প্রাশিয়াকে দাবাবার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে তারা প্রাশিয়াকে হারাতে পারল না, এটাই প্রাশিয়া তথা ফ্রেডারিকের চরম জয়। মেরিয়া থেরেসা প্রাশিয়ার ধ্বংস কল্পনা করছিলেন, তিনিই আবার হিউবার্টসবার্গের সন্ধি দ্বারা প্রাশিয়ার সাইলেসিয়া অধিকার চিরদিনের জন্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন। ফলে প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার সমকক্ষ রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হল। অদূরভবিষ্যতে জার্মানীতে অনিবার্যরূপে প্রাশিয়ার নেতৃত্বলাভের সম্ভাবনা দেখা দিল।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধই ফ্রেডারিকের জীবনে শেষ যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এরপর তিনি যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয় নীতি ত্যাগ করে কূটনীতি-দ্বারা প্রাশিয়ার পরিধি বৃদ্ধি ও মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পোল্যাণ্ড বিভাগে তিনি

বিশেষ ভাবে যোগ দেন এবং প্রাশিয়াকে সংহত করার জন্ম পোল্যাণ্ডের নিকট হতে পশ্চিমপ্রাশিয়া নিজের রাজ্যভুক্ত করেন। এর ফলে পূর্ব-প্রাশিয়ার সাথে ব্রাণ্ডেনবার্গের সংযোগ সাধিত হল এবং পূর্বে তাঁর রাজ্যের যে ভৌগোলিক ঐক্য ছিল না এর দ্বারা সে ঐক্য লাভ সম্ভব হল।

পোল্যাণ্ড বিভাগ

অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফ যখন ব্যাভেরিয়া কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করেন তখন ফ্রেডারিক সর্বশক্তি দিয়ে অষ্ট্রিয়ার এই প্রচেষ্টায় বাধা দিতে সংকল্প করলেন। কারণ তিনি মনে করলেন যে ব্যাভেরিয়া অষ্ট্রিয়ার আওতায় চলে গেলে জার্মানীতে পুনরায় অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, আর এরই বিরুদ্ধে তিনি জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে আসছিলেন। অবশ্য ফ্রেডারিকের এই বাধাদানের ফলে অষ্ট্রিয়া ব্যাভেরিয়া অধিকারের সংকল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল। ফ্রেডারিক এখানেই ক্ষান্ত হলেন না। ভবিষ্যতে যাতে অষ্ট্রিয়া পুনরায় ব্যাভেরিয়ার ওপর প্রাধান্য স্থাপন না করতে পারে তারজন্য ফ্রেডারিক হ্যানোভার, স্যাক্সনি, মেইনজ প্রভৃতি কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্রের সহযোগিতায় অষ্ট্রিয়া বিরোধী এক রাষ্ট্রজোট (Furstenbund) গঠন (১৭৮৫) করেন। এটাই হল ফ্রেডারিকের সর্বশেষ কূটনীতিক সাফল্যজনক কাজ। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ৪৬ বৎসর রাজত্বের পর পরিণত বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অষ্ট্রিয়া বিরোধী নীতি

পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা: প্রাশিয়ার অগ্রগতিতে ফ্রেডারিকের যে অবদান তার অধিকাংশই প্রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতির সাথে জড়িত। তাঁর একনিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতির ফলেই ইউরোপে প্রাশিয়ার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইউরোপের এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে তার অভ্যুদয় ঘটে। কূটনীতি ও সামরিক শক্তির সম্পর্ক যে খুব নিবিড় তা তিনি ভালভাবেই জানতেন এবং এ দুটির প্রয়োগের দ্বারা তিনি একদিকে যেমন প্রাশিয়ার নিরাপত্তার বিধান করেন অন্যদিকে তেমনি তার সীমাও সম্প্রসারিত হয়। ফলে অষ্ট্রিয়ার সাথে সমানভাবেই প্রাশিয়া এখন বৃহৎ শক্তিরূপে পরিচালিত হতে থাকল এবং ইউরোপের রাজনীতিতে তাঁর মতামত বিশেষ মূল্য পেল।

কিন্তু ফ্রেডারিকের পরারাষ্ট্রনীতি ত্রুটিশূন্য ছিল না। প্রথমতঃ সাইলেসিয়া ও স্যাক্সনি আক্রমণ সমর্থন করা যায় না। এদুটিতে তাঁর আগ্রাসী মনোভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি সাইলেসিয়া দখল করেন তাতে অন্যান্য দেশে প্রাশিয়ার প্রতি যথেষ্ট ঘৃণার উদ্রেক হয়। আবার সাইলেসিয়া দখলে রাখার জন্ম প্রাশিয়ার জনসাধারণকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করতে হয়।

তৃতীয়তঃ পোল্যাণ্ড বিভাগে যোগ দিয়ে তিনি নীচ, স্বার্থপর ও নীতিজ্ঞানহীন কার্যের যে উদাহরণ রেখে গেলেন তা কোনক্রমেই গৌরবজনক নয়।

Q. 3. Describe Frederick the Great as a diplomat.

Ans. সমরনায়ক হিসেবে ফ্রেডারিক যেমন অনন্য ছিলেন সেরূপ কূটনীতিবিদ্ হিসেবে তিনি অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রাশিয়ার কিসে সুবিধা হবে—এই স্থির লক্ষ্য নিয়ে তিনি তাঁর কূটনীতি প্রয়োগ করেছিলেন। সুবিধাবাদ, দক্ষতা ও অসততা ছিল তাঁর কূটনীতির বুনিয়াদ। তৎকালীন ইউরোপীয জটিল রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। প্রথমে অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের পারস্পরিক মনোমালিন্যের সুযোগ তিনি পুর্ণভাবে গ্রহণ করেন। প্রাশিয়ার সুবিধাজনক অবস্থার এবং অষ্ট্রিয়ার অসুবিধাজনক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি সাইলেসিয়া দখল করে নেন। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় তিনি নিজের স্বার্থের কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করেন।

কূটনীতিজ্ঞ হিসেবে ফ্রেডারিক পরিচয়

অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে

প্রাশিয়ার সুবিধার জন্য তিনি ফ্রান্সের সহিত এক সন্ধি করেন (১৭৪১); আবার সেই বৎসর অষ্ট্রিয়ার সহিত ক্লিন-স্লেলেনডরফ এর চুক্তি স্বাক্ষর করেন। আবার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি এই চুক্তি নাকচ করে আবার ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। আবার ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের পক্ষ পরিত্যাগ করে অষ্ট্রিয়ার সাথে সন্ধি স্বাক্ষর করেন। সংক্ষেপে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে তিনি অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের পারস্পরিক বিরোধের সুযোগ নেন।

আবার অষ্ট্রিয়ার সাথে ফ্রান্সের যখন বন্ধুত্ব স্থাপনের কথাবার্তা চলতে লাগল, তখন কূটনীতিবিদ্ ফ্রেডারিক এই বন্ধুত্ব যে প্রাশিয়ার পক্ষে বিপদস্বরূপ হবে তা সহজেই বুঝতে পারলেন। এই সমূহ বিপদ হতে রক্ষা পাবার জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডের সাথে মৈত্রী চুক্তি করলেন ফলে কূটনৈতিক বিপ্লব ত্বরান্বিত হল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধও তিনিই শুরু করেন প্রাশিয়াকে সম্ভাব্য বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য। এই যুদ্ধে তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব দেখান।

কূটনৈতিক বিপ্লবে

এরপর অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার পারস্পরিক মনোমালিন্সের সুযোগে তিনি একজনের পক্ষ অবলম্বন করে অপরের নিকট হতে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেন। যখন রাশিয়া সমগ্র পোল্যাণ্ড গ্রাস করতে উদ্যত হল তখন তিনি বাধা দিলেন এবং পোল্যাণ্ড হতে প্রাশিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না।

পোল্যাণ্ড বিভাগে তিনি অষ্ট্রিয়ার সাথে এক তালে চলেছিলেন। আবার যখন অষ্ট্রিয়া জার্মানীর ব্যাভেরিয়া নামক রাজ্যটি গ্রাস করতে চেষ্টা করল তখন তিনি একদিকে যেমন সামরিক শক্তির সাহায্য নিলেন, অন্যদিকে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ কামনা করলেন। ফলে অষ্ট্রিয়া ব্যাভেরিয়া গ্রাস করতে পারল না। পুনরায় ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন অষ্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফ রাশিয়ার সহায়তায় ব্যাভেরিয়া কুক্ষিগত করতে চাইলেন তখন ফ্রেডারিক জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের একত্রিত করে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রজোট গড়ে তুললেন ফলে অষ্ট্রিয়া ব্যাভেরিয়া দখল করতে পারল না।

রুশ ও অস্ট্রিয়ার বিরোধী নীতি

আবার ক্যাথরিনের নেতৃত্বে রাশিয়া যখন ক্ষয়িষ্ণু তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল গ্রাস করতে উদ্যোগী হল ফ্রেডারিক নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। তিনি এ বিষয়ে অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সাথে হাত মিলিয়ে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিরোধ করলেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, একদিকে সামরিক শক্তি এবং অপর দিকে ফ্রেডারিকের সুদক্ষ কূটনীতি প্রাশিয়াকে বহু বিপদ হতে রক্ষা করে প্রাশিয়ার অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছিল।

Q. 4 Review the character and achievements of Frederick the Great. Do you think that this statesmanship was free from criticism. *Or* Account for the greatness of Frederick the Great. Discuss the importance of the Frederick's reign in the history of Germany and Europe. *Or*, Did Frederick the Great succeed in making Prussia of decisive weight in European politics and effecting a blend of absolutism and enlightenment ?

Ans. প্রথম ফ্রেডারিক উইলিয়মের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক—যিনি ইতিহাসে ফ্রেডারিক দি গ্রেট নামে প্রসিদ্ধ—প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর ৪৬ বৎসরব্যাপী রাজত্বকাল প্রাশিয়া তথা ইউরোপের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় অধ্যায়। আঠারো শতকে ইউরোপের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে সমস্ত শাসক আবির্ভূত হয়েছেন ফ্রেডারিক দি গ্রেট তাঁদের মধ্য অম্লান ও অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন।

ভূমিকা

ফ্রেডারিকের পিতার একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্র তাঁর মত সামরিক ও বেসামরিক

প্রশাসন ক্ষেত্রে আগ্রহান্বিত হয়। কিন্তু বাল্যকাল হতেই ফ্রেডারিক সাহিত্য, কলা সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এগুলি তাঁর পিতার নিকট ঘৃণ্য বিষয় ছিল। তিনি পুত্রের এই মনোবৃত্তিতে খুবই রুষ্ট হন। এবং অবাধ্য পুত্রকে শায়েস্তা করবার জন্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি ফ্রেডারিককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। শেষপর্যন্ত ফ্রেডারিক অবশ্য পিতার আদেশ শিরোধার্য করে শাসন ও সামরিক শাসনকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষানবিশী করে বিভিন্ন ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পরবর্তী কালে এগুলি তাঁর পক্ষে খুবই মঙ্গলদায়ক হয়েছিল। ১৭৩৩-এর পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধে যোগদান করে তিনি যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ১৭৩৪-৪০ এই ছ'বছর ফ্রেডারিক দর্শন ও সাহিত্যাদি পাঠে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। নাট্য, কলা ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সর্বজনবিদিত ছিল। তিনি জার্মান সাহিত্যের চেয়ে ফরাসী সাহিত্যের প্রতি বেশি অনুরাগী ছিলেন। সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তাধারার সাথে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। তৎকালীন জ্ঞানদীপ্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল।

সম্রাট হবার পূর্বেকার ইতিহাস

১৭৪০-১ ফ্রেডারিক যখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন তখন তার মধ্যে পরস্পর বিরোধী গুণাগুণের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। তাঁর চরিত্রে একদিকে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে, ধৈর্য ও সংযমের সমাবেশ হয়েছিল, অন্তদিকে তেমনি কূটনীতি ও রণচাতুর্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। এর ফলে তিনি হলেন তৎকালীন ইউরোপের সুদক্ষতম রাজা। তিনি সম্পূর্ণরূপেই সকল নম্রভাব বিসর্জন দিতে সক্ষম হন। তাঁর হৃদয় হয়ে উঠেছিল যেন ইস্পাতে গড়া এবং মন তিক্তসন্দেহে আচ্ছন্ন। তিনি কোন সম্মানমূলক নীতির ধার ধারতেন না—একটিমাত্র যা ছিল তা হল, প্রাশিয়ার মঙ্গল। তাঁর প্রজাদের কিন্তু আনুগত্য এবং শ্রদ্ধার দ্বারা পূরণ ও উদ্বুদ্ধ করবার অপূর্ব ক্ষমতা তাঁর ছিল।

চারিত্রিক গুণাবলী

শাসনকার্যের প্রতিটি বিষয়েই তিনি অবহিত থাকতেন। প্রাশিয়ায় বা অন্ত কোন দেশে 'কর্তব্যকে' এভাবে সিংহাসনে রূপ পরিগ্রহ হতে দেখা যায়নি। প্রাশিয়ার স্বার্থকে তিনি সবার উর্ধ্বে স্থান দেন। রাজকীয় পদকে তিনি গৌরব, শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হিসেবে না ভেবে একে দায়িত্বের উৎস হিসেবেই ভাবতেন। একারণে তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য রূপে পরিচয় দিতেন।

ফ্রেডারিকের সমস্যা: সিংহাসনে আরোহণ কালে ফ্রেডারিক পিতার নিকট

হতে পরিপূর্ণ কোষাগার এবং সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী যেমন পেলেন তেমনি নানা সমস্যারও সম্মুখীন হলেন। প্রথমতঃ, প্রাশিয়া তখনো এক সুসংহত রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। তার ভৌগোলিক ঐক্য বলে কিছু ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীতে হ্যানোভার ও অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্ররূপে বর্তমান ছিল। এই সমস্যাগুলির আশু সমাধানের জন্য তিনি যুদ্ধকেই প্রকৃত উপায় হিসেবে গ্রহণ করলেন। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের ফলে একদিকে প্রাশিয়া যেমন সাইলেসিয়া লাভ করল, অন্যদিকে এই যুদ্ধ প্রাশিয়াকে মধ্য ইউরোপে আধিপত্যের স্থান প্রদান করল। এই যুদ্ধের পর প্রায় আট বৎসর তিনি প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সংস্কারে ব্রতী থাকেন এবং দেশের নানাক্ষেত্রে প্রগতিমূলক সংস্কার প্রবর্তন করেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ওয়েস্টমিনিস্টারের চুক্তিদ্বারা ইংল্যাণ্ডের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন এবং এই বছরেই স্যাক্সনী আক্রমণ করে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবতারণা করলেন। এই যুদ্ধ ইউরোপীয় সমস্যা (মধ্য-ইউরোপের শক্তিরূপে প্রাশিয়া টিকে থাকবে কিনা) প্রাশিয়ার অনুকূলেই মীমাংসা করল। ফ্রেডারিকের অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভা প্রাশিয়াকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করল। এরপর ফ্রেডারিক আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী প্রজাহিতৈষণার পন্থা অনুসরণ করলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কর্মনৈপুণ্যের ফলে প্রাশিয়া এক সম্পদশালী প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হল। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য ১নং প্রশ্ন দেখ)

বিভিন্ন সমস্যা

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্যলাভ করেন। এক জোরদার পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে তিনি প্রাশিয়ার রাজ্যসীমা ও মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করলেন। প্রাশিয়ার স্বার্থ অনুযায়ী তিনি তাঁর পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেন। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য ২নং প্রশ্ন দেখ)

কৃতিত্ব : প্রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ক্ষেত্রে ফ্রেডারিকের বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন প্রাশিয়ার ভৌগোলিক ঐক্য বলে কিছু ছিল না। রাজ্য হিসেবেও এটি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। অনুর্বর জমি, অরক্ষিত ও অচিন্তিত সীমান্ত প্রাশিয়ার চিরন্তন সমস্যা ছিল। এ দুটি সমস্যা উপেক্ষা করে তিনি দুটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে যোগদান করেন এবং পরিশেষে প্রাশিয়ার আয়তন, সম্পদ, শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন। প্রাশিয়ার সীমান্তও অধিকতর শক্তিশালী করে তোলেন। প্রথম পোল্যাণ্ড বিভাগে যোগ দিয়ে তিনি পশ্চিম প্রাশিয়া হস্তগত করেন। এর ফলে পূর্ব প্রাশিয়ার সাথে ব্রাণ্ডেনবার্গের সংযোগ সাধিত হল এবং পূর্বে তাঁর রাজ্যের যে ভৌগেলিক ঐক্য ছিল না, তদ্দারা

সেই ঐক্য লাভ সম্ভব হল। সংক্ষেপে ফ্রেডারিক প্রাশিয়ার যে পরিমাণ আয়তন, সম্পদ এবং শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন তা অনন্যসাধারণ "২৩০০ বর্গমাইল বিশিষ্ট এবং মাত্র কুড়িলক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত প্রাশিয়াকে তিনি ৩৬০০ বর্গমাইল ও ষাট লক্ষ অধিবাসী পূর্ণ রাষ্ট্রে এবং সেনাবাহিনীকে সত্তর হাজার হতে দু'লক্ষে পরিণত করেন। বার্ষিক আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণও দ্বিগুণ করেন। সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক কৃতিত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিকর্মের উন্নতি, জনসাধারণের কর্মপ্রেরণা এবং শাসন পদ্ধতির শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা সমস্ত ব্যাপারেই অগ্রগতির চিহ্ন দেখা যায়" আর এসব উন্নতির জন্য দায়ী ছিলেন ফ্রেডারিক দি গ্রেট।

আভ্যন্তরীণ উন্নয়নেও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি যে সব সংস্কার প্রবর্তন করেন তার ফলে প্রাশিয়ার জাতীয় সম্পদ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রজাসাধারণের জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ভাব দেখা দেয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রাশিয়ার অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপে আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যের দ্বারা তিনি অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন।

জার্মানীতে তিনি অষ্ট্রিয়ার একক প্রাধান্য নষ্ট করতে সক্ষম হন। তাঁর প্রচেষ্টায় জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে প্রাশিয়ার আবির্ভাব ঘটল এবং জার্মানীতে রাজনৈতিক আধিপত্যের ক্ষেত্রে দ্বৈত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকল। এ ছাড়া, মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামরিক খ্যাতির দিক দিয়ে প্রাশিয়া ফ্রান্সকে ছাড়িয়ে গেল। এ সবের মূলেও যে ফ্রেডারিকের কৃতিত্ব রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

সমালোচনা: প্রাশিয়ার উন্নতির মূলে ছিল ফ্রেডারিকের দূরদর্শিতা, প্রগাঢ় রাজনৈতিক জ্ঞান এবং বিস্ময়কর কর্মক্ষমতা। তবে এটা ঠিক যে প্রাশিয়ার এই অগ্রগতির জন্য তিনিই একমাত্র দায়ী ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরীদের অবদান নগণ্য নয়। তাছাড়া প্রাশিয়ার উদ্যমী জনসাধারণেরও অবদান ছিল। ইউরোপের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ ও তাঁর অনুকূলে ছিল। ইউরোপের ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, স্পেন প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি এই সময় শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল বলে ফ্রেডারিকের পক্ষে জোরদার পররাষ্ট্রনীতি কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছিল। ফ্রেডারিকের রাষ্ট্রনীতিও সমালোচনার হাত হতে রেহাই পেতে পারে না। প্রথমতঃ যে পরিস্থিতির মধ্যে সাইলেসিয়া দখল করা হয়েছিল তা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। এরপর অন্যান্য দেশে প্রাশিয়ার প্রতি যথেষ্ট ঘৃণার ভাব দেখা দেয়। আবার সাইলেসিয়াকে দখলে রাখবার জন্য প্রাশিয়ার জনসাধারণকে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি সৈন্যবাহিনীর ওপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। দেশের জনসমষ্টি

বা আর্থিক অবস্থার তুলনায় সৈন্যবাহিনীর আয়তন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ছিল খুবই বেশি। মিরাবো ঠিকই বলেছিলেন, প্রাশিয়া বলতে সৈন্যবাহিনী বিশিষ্ট জনসমষ্টি বোঝায় না, জনসমষ্টি বিশিষ্ট সৈন্যবাহিনী বোঝায়।* এছাড়া সৈন্য বাহিনীতে তিনি জাতীয়করণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না বলে পরবর্তীকালে প্রাশিয়ার সর্বনাশ ঘটে। তাঁর সৈন্যবাহিনীর এক তৃতীয়াংশ ছিল বিদেশীদের দ্বারা গঠিত। ফলে তাদের মধ্যে যেমন দেশপ্রেম বলে কিছু ছিল না, তেমনি এই সৈন্য-বাহিনী জনসাধারণের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা অর্জন করতে পারেনি। নেপোলিয়ানের হাতে এই সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ, ফ্রেডারিকের দক্ষতাই তাঁর দেশের পক্ষে শেষকালে ক্ষতিকারক হয়েছিল। তিনি স্বহস্তে সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত করে ছিলেন বলে সরকারী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ বা কর্মপ্রচেষ্টার কোন সুযোগ ছিল না। এমনকি, তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীকেও রাজকার্যের উপযুক্ত করে শিক্ষা দেননি। তাঁর মৃত্যুর পর এর কুফল দেখা গেল—রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যাপারে দায়িত্বশীল লোকের চরম অভাব ঘটল। নেপোলিয়ানের হাতে প্রাশিয়ার নিদারুণ পরাজয়ের জন্য ফ্রেডারিকের ব্যক্তিনিষ্ট শাসন কিছুটা দায়ী। চতুর্থতঃ, তিনি দেশের সামাজিক বৈষম্য দূর করার কোন চেষ্টাই করেননি। পূর্বের ন্যায় অভিজাত সম্প্রদায়ই দেশের শাসন ও অন্যান্য কাজে কর্তৃত্ব ভোগ করতে থাকল। সাধারণ লোকের শাসন ব্যাপারে কোন অধিকার আছে বলে তিনি মনে করতেন না। কৃষকসম্প্রদায়ের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেননি; বরং তাদের কষ্টের বোঝা বাধ্যতামূলক সৈন্যবৃত্তির (conscription) নিয়মের দ্বারা আরও ভারী হল। পঞ্চমতঃ জড়বাদে প্রাশিয়াবাসীদের বিশ্বাসী করবার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। এর ফলে তাদের চিন্তাধারা ও মানসিক প্রতিভার স্ফুরণে বাধা ঘটে।

উপরিউক্ত ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও একথা বলা অন্যায় হবে না যে ফ্রেডারিক দি গ্রেট সমকালীন ইউরোপীয় শাসকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃতী ও গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার দরুন প্রাশিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

More Questions with Hints

1. Give an account of the career of Frederick the Great.

Ans. ৪নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

*"Prussia is not a people that has an army, but an army that has a people".

2. Account for the greatness of Frederick the Great.

Ans. (তাঁর আভ্যন্তরীণ সংস্কার—পররাষ্ট্রনীতি—ব্যক্তিগত চরিত্র উল্লেখ কর)।

3. 'Frederick's statesmanship is not wholly free from criticism'. Discuss.

Ans. ৪নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

4. 'In the age of enlightened despotism the most enlightened despot was Frederick II'

Ans. ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে অহেতুক গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে এরূপ বলার সঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায়না। বরঞ্চ তাঁকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রূপটি যা দেখে থাকি তাতে স্বৈরাচারী শাসকের রূপই ফুটে ওঠে, জ্ঞানদীপ্তের লক্ষণ দেখা যায়না। জোসেফের মত ফ্রেডারিকও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন, নিজ দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন এবং পতিত জমি উদ্ধারের জন্যও উৎসাহ দেন। কিন্তু তিনি প্রাশিয়ার অভিজাতদের কায়েমী স্বার্থে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হননি বা চাননি! জমির উপর কর বৃদ্ধি করা হল না (জমিদারদের সুবিধার জন্য) অন্যদিকে অপ্রত্যক্ষ কর বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হল। (জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি বৃদ্ধি পেল) এবং রাজস্ব সংগ্রহে কুখ্যাত ঠিকাদারী প্রথার প্রবর্তন করা হল। ফ্রেডারিক কৃষকদের নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য কিছুই করলেন না এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা জিইয়ে রাখলেন। বিচার বিভাগের তিনি কিছু সংস্কার সাধন করলেও তাঁর অযথা হস্তক্ষেপের ফলে সুবিচার হতে পারত না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাশিয়া (Russia 1740—1796)

Q. 1. Give a short history of Russia from 1740 to 1762.

Ans. আধুনিক রাশিয়ার স্রষ্টা হলেন পিটার দি গ্রেট। তাঁর মূল নীতি ছিল রাশিয়াকে ইউরোপীয় শক্তিতে পরিণত করা। তিনি দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন এবং এক নৌবাহিনী গঠন করেন। শাসন ব্যবস্থার দক্ষতাও তিনি কিছুটা বাড়ান। রাশিয়ার জন্য সমুদ্রোপকূল তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতিকে একটি সুস্পষ্ট রূপ দেন। তাঁর প্রচেষ্টায় রাশিয়া একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে পিটারের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর যথাক্রমে প্রথম ক্যাথারিন, দ্বিতীয় পিটার ও এ্যান রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন। এরা শাসক হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

পিটার দি গ্রেটের অবদান

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে পিটার দি গ্রেটের কন্যা এলিজাবেথ সামরিক বাহিনীর সাহায্যে রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৭৬২ খৃঃ পর্যন্ত রাশিয়া শাসন করে যান। তিনি আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে কিছুটা পারদর্শিতা দেখান। অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। গ্রেট বৃটেনের সাথে ও রাশিয়ার বন্ধুত্ব বজায় থাকে। এই যুদ্ধের ফলে মধ্য ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটল।

পরবর্তী শাসকবৃন্দ

এরপর কূটনৈতিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়া অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের দলে যোগ দেয় এবং প্রাশিয়াকে ধ্বংস করবার জন্য সচেষ্ট হয়।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদান ইউরোপের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। এই যুদ্ধে রুশ বাহিনী জার্মানীতে প্রবেশ করে এবং প্রাশিয়ার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এর ফলে ফ্রেডারিকের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথের মৃত্যু হওয়ায় রাশিয়া সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হতে সরে দাঁড়ায়।

এলিজাবেথের মৃত্যুর পর রাশিয়ার সিংহাসনে তৃতীয় পিটার আরোহণ করেন। তিনি নিতান্তই অকর্মণ্য ছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হল। তাঁর পত্নী সোফিয়াই এই ষড়যন্ত্রের নায়িকা ছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তৃতীয় পিটারকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর পত্নী সোফিয়া দ্বিতীয় ক্যাথারিন নাম নিয়ে রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

Q. 2. Briefly describe the home and foreign policy of Catherine the Great of Russia.

Ans. আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আদর্শ ও লক্ষ্য পিটার দি গ্রেটের অবলম্বিত আদর্শ ও নীতি হতে অভিন্ন ছিল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে একদিকে তিনি কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন অপর দিকে প্রজাবর্গের মধ্যে পশ্চিমী ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটিয়ে রাশিয়াকে সুসভ্য করে তুলতে চান। পররাষ্ট্র নীতিতে পিটারের ন্যায় তিনিও রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। সমুদ্রে যাবার পথ পাবার জন্য, কৃষ্ণসাগরের কূলে স্থান সংগ্রহের জন্য এবং ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্যিক পথ লাভের জন্য তিনি চেষ্টিতা ছিলেন। সুতরাং তাঁর পররাষ্ট্র নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার সম্প্রসারণ ঘটান। এই উদ্দেশ্যে তিনি পোল্যাণ্ড ও তুরস্কের বিরুদ্ধে জোরদার পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করেন।

দুটি নীতির মূল ভিত্তি

আভ্যন্তরীণ সংস্কার: পিটার দি গ্রেট যে শাসনযন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন ক্যাথারিন সেটিকে অধিকতর কার্যপ্রদরূপে গড়ে তোলেন। দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করার জন্য তিনি সমগ্র দেশটিকে ৪৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসনভার দেন নিজের মনোনীত কর্মচারীর ওপর। প্রদেশগুলিকে আবার কয়েকটি জেলায় ভাগ করেন এবং জেলার শাসনভার দেওয়া হল তাঁর আজ্ঞাবহ কর্মচারীর ওপর। এছাড়া, মন্ত্রী, চ্যান্সেলার ও রাজকীয় পরিষদের সদস্যদের তিনিই মনোনীত করবেন বলে ঠিক করেন। অভিজাত শ্রেণীকেই তিনি রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে উপযুক্ত বলে মনে করতেন। তবে এই শ্রেণী হতে যাদের রাজ-কর্মচারী রূপে নেওয়া হত তাদের ওপর তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর নির্দেশ ছাড়া তারা কোন কাজ করতে পারত না। এই শাসন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ন' হলেও এটি খুব সক্রিয় ও কর্মকুশল ছিল। এমন কি একথাও বলা চলে যে পিটার যতটা সুশৃঙ্খল রাজ্যে রাজত্ব করেছিলেন, তার চেয়ে বেশি সুশৃঙ্খল রাজ্যে ক্যাথারিনের শাসন কর্তৃত্ব প্রযুক্ত হয়েছিল।

কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন

ক্যাথারিন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর মধ্যে ধর্মের গোড়ামি ছিল না। আবার স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন বলে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অপ্রতিহত ক্ষমতাও পছন্দ করতেন না। একারণে তিনি রাশিয়ায় চার্চের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

চার্চ বিরোধী নীতি

প্রথমে তিনি চার্চের অধিকৃত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করলেন এবং পরে এটিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। চার্চকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্যাথারিন পরোক্ষভাবে জনসাধারণের উপকার করেন। কারণ চার্চের অধীনে ভূমিদাসের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। চার্চের ক্ষমতা ধ্বংস করে দেবার ফলে এই সব ভূমিদাসের অবস্থা কিছুটা ভাল হল।

ক্যাথারিন অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করবার চেষ্টা করেন। অভিজাতরাই উচ্চ পদস্থ কর্মচারী হবার উপযুক্ত বলে তিনি ঘোষণা করেন। এছাড়া যে সব অভিজাত তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তাঁর নির্দেশ মত কর্তব্য পালন করত তাদের তিনি বিনা খাজনায় ভূ-সম্পত্তি ভোগ করবার অধিকার দেন। ক্যাথারিন অভিজাতদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নষ্ট করতে চেয়েছিলেন এবং এর প্রতিদানস্বরূপ তাদের একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত করেন। এটি তিনি করতে বাধ্য হয়েছিলেন এই কারণে যে রাশিয়ায় কোন শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। একারণে অভিজাতদের তিনি কিছুটা তোষণ করেছিলেন।

অভিজাত তোষণ নীতি

ক্যাথারিন কেন্দ্রীভূত স্বৈরতন্ত্রে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন বলে আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংস্থা বা পরিষদগুলি তিনি ভেঙে দেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ক্যাথারিনের পূর্বে রাশিয়ায় সুস্পষ্ট আইন কানুন বলে কিছু ছিল না। এর ফলে বিচারের নামে অহরহ প্রহসন চলত। বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর করবার জন্য এবং দেশের প্রচলিত আইন বিধি সংকলন এবং নতুন আইন প্রণয়নের জন্য ক্যাথারিন একটি আইন বিভাগীয় তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করেন। কিন্তু বৈদেশিক যুদ্ধের জন্য এই কমিশনের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করা হয়নি।

বিচার বিভাগে সংস্কার

অন্যান্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের ন্যায় ক্যাথারিন শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকারী হাসপাতাল ও অধিক সংখ্যায় চিকিৎসক নিযুক্ত করলেন। জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি রাজকীয় কমিশনও নিযুক্ত করেন। তৎকালীন ভেষজ বিজ্ঞানে যে যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি দেখা দিয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা দূর করারও তিনি চেষ্টা করেন।

ক্যাথারিন নিজেই একজন সুলেখিকা ছিলেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাশিয়া যাতে পিছনে না পড়ে তারজন্য তিনি চেষ্টিতা ছিলেন। তাঁর রাজসভা ইউরোপের অন্যতম

সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। প্রখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিকদের তিনি রাশিয়ায় নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁদের সাথে পত্রালাপ করে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। তাঁর আনুকূল্যে রুশ সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। কাব্য, গদ্যসাহিত্য, ব্যঙ্গ সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখতে পাওয়া যায়।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

ক্যাথারিন সামাজিক ক্ষেত্রেও সংস্কার সাধন করতে চেষ্টা করেন কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেননি। তিনি ভূমিদাস প্রথা তুলে দেবার কথা ভাবেন কিন্তু তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি এরূপ ছিল যে তাঁর পক্ষে এটি বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। রাশিয়া হতে দাসত্ব প্রথাও তিনি তুলে দিতে পারেননি। অবশ্য রাজকীয় খাস জমির ভূমিদাসের অবস্থার কিছুটা উন্নতি তিনি করতে সক্ষম হন। তৎকালীন ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে তিনি রাশিয়ায় শিল্পোদ্যম ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। দেশের মুদ্রা সংস্কার ব্যাপারেও তিনি আগ্রহ দেখান।

সামাজিক সংস্কার

সমালোচনা: আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কার কার্যে ক্যাথারিন যথেষ্ট আগ্রহ দেখান এবং রাশিয়ার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে চেষ্টা করেন। ভালভাবে কাজ করতে পারে এরূপ এক আমলাতন্ত্রের তিনি সৃষ্টি করতে চান এবং সমগ্র রাজ্যের মধ্যে রাজক্ষমতাকে তিনি সর্বোচ্চ শক্তিতে পরিণত করেন। রাশিয়াকে তিনি একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করবার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। কিন্তু তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারেনি। এর একাধিক কারণ অবশ্য ছিল—প্রথমতঃ তিনি একই সাথে অসংখ্য বিষয়ে সংস্কার করবার চেষ্টা করেন কিন্তু সবগুলি ক্ষেত্রেই সমান মনোযোগ দিতে পারেননি। ফলে অধিকাংশ সংস্কার কার্যগুলি কাগজে কলমে থেকে যায়, বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁকে একমাত্র অভিজাত শ্রেণীর ওপর নির্ভর করতে হয়—এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। রাজক্ষমতা ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এই আঁতাত কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। তৃতীয়তঃ রাশিয়ায় উদ্যমী মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকায় প্রজাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের অভাব ঘটে এবং তাঁর আধুনিক সংস্কার কার্য ব্যর্থ হয়। চতুর্থতঃ তাঁর উদ্যমের অধিকাংশই পররাষ্ট্র বিষয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। ফলে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি সমাধান করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেননি। পঞ্চমতঃ, তাঁর স্বৈরাচারী মনোভাব প্রগতিমূলক

সংস্কারের পরিপন্থী ছিল। তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে কোনরূপ সংস্কার আনতে চাননি ফলে রাশিয়ার মৌলিক সমস্যাগুলি ঠিকই রয়ে গেল।

পররাষ্ট্র নীতি ঃ পররাষ্ট্র নীতিতে ক্যাথারিন সর্বাধিক কুশলতার পরিচয় দেন। রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থিতির বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তার পররাষ্ট্রনীতির গোড়াপত্তন। রাশিয়া বিরাট দেশ হলেও তার কোন ভাল বন্দর ছিল না। তার পক্ষে সমুদ্রে যাবার একটি মাত্র পথ ছিল উত্তর সাগরে আর্কেঞ্জেলে বন্দর; কিন্তু বছরে ন' মাস কাল এটি বরফে জমে বন্ধ হয়ে থাকত। রাশিয়া বল্টিক সাগরে যাবার পথ সুইডেন রুদ্ধ করে রেখেছিল। কৃষ্ণসাগর হয়ে ভূমধ্যসাগরে যাবার পথ রুদ্ধ করেছিল তুরস্ক। এ সব কারণে রাশিয়ার সাথে পশ্চিম ইউরোপের জলপথে কোন সম্পর্ক ছিল না, আর স্থলপথেও সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি; কারণ পোল্যাণ্ড রাশিয়ার ইউক্রেণ ও লিটল রাশিয়া নামক স্থান দখল করেছিল। এই সব কারণে পশ্চিম ইউরোপ হতে রাশিয়া ছিল বিচ্ছিন্ন। মহামতি পিটার রাশিয়াকে ইউরোপীয় শক্তিতে পরিণত করতে সচেষ্ট হন। তিনি চেয়েছিলেন রাশিয়ার সাথে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় হোক। এবং এটা সম্ভব হবে যদি রাশিয়া বল্টিক ও কৃষ্ণ সাগরের সমুদ্র উপকূল লাভ করতে পারে। পিটার রাশিয়ার জন্য বল্টিক সাগরের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতিকে একটি সুস্পষ্ট রূপ দেন। বল্টিক সাগরে যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত হবার ফলে রাশিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্র পরিবারের মধ্যে অন্যতম রূপে গণ্য হবার যোগ্য হয়ে উঠল।

রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থিতি

পিটারের যথার্থ উত্তরাধিকারিণী রূপে রাশিয়াকে তিনি পশ্চিম ইউরোপের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একান্তভাবে আগ্রহী হলেন; সমুদ্রে যাবার পথ পাবার জন্য, কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার ঘাঁটি স্থাপনের জন্য স্থান সংগ্রহ, ভূমধ্য-সাগরের বাণিজ্যিক পথ লাভের জন্য এবং বলকান অঞ্চলে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের জন্য ক্যাথারিন—সবিশেষ চেষ্টা করেন।

পররাষ্ট্র-নীতির মূল ভিত্তি

ক্যাথারিনের বিশ্বাস ছিল যে পশ্চিমের দিকে রাশিয়ার সম্প্রসারণ ঘটাতে পারলে ইউরোপীয় রাজনীতিতে তাঁর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। তিনি নিজে ছিলেন জার্মান। রাশিয়াকে যথার্থ ভালবাসলেও পশ্চিম ইউরোপের প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল।

তিনি এটিও মনে করতেন যে মধ্যযুগের বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের প্রকৃত

উত্তরাধিকারী হচ্ছে রাশিয়া। অতএব তুরস্কের হাত হতে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপোল সমেত অন্যান্য রাজ্যাংশ রাশিয়ার দিক হতে দখল করে নেওয়ার দিকে যুক্তি রয়েছে। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির এই উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক ছিল একাধিক। পশ্চিমমুখী সম্প্রসারণে বাধা ছিল পোল্যাণ্ড এবং দক্ষিণে ছিল তুরস্ক। কিন্তু এ দুটি রাষ্ট্রই ছিল খুবই দুর্বল। ফলে ক্যাথারিন তাঁর জোরদার পররাষ্ট্রনীতির ফলে রাশিয়ার সীমানা যেমন বাড়ালেন অন্যদিকে ইউরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার মর্যাদাও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তবে এর জন্য ক্যাথারিনকে খুব সুচতুর কূটনীতির সাহায্য নিতে হয়েছিল। প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি তাঁর পররাষ্ট্র নীতির সার্থক রূপায়নে বাধা স্বরূপ ছিল। একারণে তিনি এই চতুঃরাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থবিরোধের সুযোগ নিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করেছিলেন। কূটনীতিতে ক্যাথারিন বিশেষ পারদর্শিণী ছিলেন। কখনো তিনি প্রাশিয়ার সাথে মিতালি করে অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরোধিতা করেন, কখনো অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করে প্রাশিয়ার বিরোধিতা করেন, কখনো ইংল্যাণ্ডের নীতির বিরোধিতা করে ফ্রান্সের সন্তোষ বিধানে চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক

বল্টিক সাগরে ও তুরস্ক সাম্রাজ্যে রাশিয়ার সম্প্রসারণ প্রাশিয়া ভাল চোখে দেখল না। ফ্রেডারিক দি গ্রেটের প্রতি ক্যাথারিন ব্যক্তিগত কারণে রুষ্টা ছিলেন। এ কারণে সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরই তিনি প্রাশিয়ার সাথে অমিত্রমূলক নীতি গ্রহণ করেন। অবশ্য ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পোল্যাণ্ড বিভাগের সময় তিনি প্রাশিয়ার সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি নাকচ করে দেন যখন প্রাশিয়া তাঁর তুরস্ক নীতি সমর্থন করল না। এক্ষেত্রে ক্যাথারিন অষ্ট্রিয়ার সাথে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া একজোটে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে অবশ্য অষ্ট্রিয়ার কোন লাভ হয়নি।

প্রাশিয়ার সাথে

অষ্ট্রিয়ার সাথে

ইংল্যাণ্ডের সাথে রাশিয়ার কোন স্বার্থ সংঘাত ছিল না। ফলে এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বভাব বজায় রাখতে ক্যাথারিনের অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এইযুদ্ধে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির প্রতি ইংল্যাণ্ডের স্বেচ্ছাচার নীতির বিরুদ্ধে তিনি কেবল প্রতিবাদই করেন নি ১৭৮০-এ সশস্ত্র নিরপেক্ষ চুক্তি স্থাপনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ক্যাথারিনের তুরস্ক বিরোধী নীতির বিরোধিতা করে।

ইংল্যাণ্ডের সাথে

ফরাসী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্‌রা ক্যাথারিনের দরবারে প্রভাব বিস্তার করলেও ক্যাথারিনের সাথে ফরাসী রাষ্ট্রের কখনো সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল তুরস্ক সাম্রাজ্যকে অটুট রাখা। ফরাসী বিপ্লব যখন শুরু হল তখন ক্যাথারিন একে ধ্বংস করবার জন্য অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সাথে যোগ দেননি। বরঞ্চ অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া যখন বিপ্লবী ফ্রান্সকে নিয়ে ব্যস্ত তখন তিনি পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার করবার জন্য চেষ্টিতা ছিলেন।

ফ্রান্সের সাথে

ক্যাথারিন ও পোল্যাণ্ড: রাশিয়ার সাথে পশ্চিম ইউরোপের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের প্রধান বাধা ছিল পোল্যাণ্ড; ক্যাথারিন প্রথম হতে পোল্যাণ্ড গ্রাস করতে উৎসুক হন। তিনি পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বিবাদ বিসংবাদের পূর্ণ সুযোগ নিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে ক্যাথারিন তাঁর সমাদরকারীদের অন্যতম স্তানিসলাস্ পণিয়াতুস্কিকে নিজের প্রভাব খাটিয়ে পোল্যাণ্ডের রাজা করলেন। অবশ্য এবিষয়ে তিনি প্রাশিয়ার সাহায্য পেলেন। পনিয়াতুস্কিকে হাতে রেখে ক্যাথারিন সমগ্র পোল্যাণ্ড দখল করতে ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া এর বিরোধিতা করতে থাকায় ক্যাথারিন বাধ্য হয়ে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সহযোগে পোল্যাণ্ডের প্রথম বাঁটোয়ারা সম্পন্ন করলেন। এর দ্বারা ক্যাথারিন হোয়াইট রাশিয়া তাঁর নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে তিনি প্রাশিয়ার সহযোগিতায় পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বিভাগ সম্পন্ন করেন। এর ফলে রাশিয়া পূর্ব পোল্যাণ্ড, লিটল রাশিয়া এবং পোডালিয়ার অবশিষ্ট অংশ পেল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের তৃতীয় ও শেষ বিভাগের দ্বারা ডুইনা ও গ্যালেসিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল লাভ করল। ইউরোপের মানচিত্র হতে পোল্যাণ্ড মুছে গেল। পোল্যাণ্ড বিভাগের ফলে পশ্চিম ইউরোপের দিকে রাশিয়ার সম্প্রসারণ ঘটল। রাশিয়ার সীমানা বিশেষভাবে বিস্তৃত হল, এই সীমানা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের সীমান্ত অপেক্ষা ৩৫০ মাইল অধিক হল।

পোল্যাণ্ড বিভাগ

তুরস্ক নীতি: ক্যাথারিন পিটারের নীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিনিময়ে কৃষ্ণ সাগরীয় অঞ্চলে রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপনে অগ্রণী হলেন। তাঁর এই নীতি যাতে সফলতা লাভ করে তার জন্য তিনি অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী হন। প্রধানত তিনটি কারণে ক্যাথারিন তুরস্কের ক্ষমতা নষ্ট করে তুরস্কের অধিকৃত দক্ষিণাঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব

তুরস্কের সাথে যুদ্ধ

প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন—(ক) কৃষ্ণসাগর রাশিয়ার অধীনে না এলে রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের উন্নতি সম্ভব নয়; (খ) এতদিন পোল্যাণ্ড ছিল সম্ভাব্য তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্বইউরোপের প্রহরীস্বরূপ। পোল্যাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সে গুরু দায়িত্ব রাশিয়ার ওপর বর্তেছে বলে তিনি মনে করলেন, (গ) তুরস্কের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল জয় করে তুরস্কের নির্যাতিত খৃষ্টান প্রজাদের বাঁচানোকে ক্যাথারিন ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করলেন।

পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে তুরস্ক স্বভাবতই শঙ্কাবোধ করল কারণ পোল্যাণ্ড ও তুরস্কের সীমানা ঠিক চিহ্নিত ছিল না। আবার ফ্রান্সও পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার এই প্রভাব বিস্তার পছন্দ করল না। ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে দাঁড় করাল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শুরু হল। এই যুদ্ধ কিন্তু অচিরেই আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করল। রুশ সৈন্য দানিয়ুব নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মালডাভিয়া ও ওয়ালেসিয়া দখল করার ফলে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া শঙ্কিত হল। অষ্ট্রিয়া তুরস্কের সাথে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করল। ক্যাথারিন যখন দেখলেন যে তুরস্ককে গ্রাস করা সহজ হবে না, তখন তিনি তুরস্কের সাথে চুক্তি করতে সম্মত হলেন। ১৭৭৪-এ কুসুক-কাইনারজির (Kutchuk-Kainardje) সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

এই চুক্তির দ্বারা রাশিয়া কৃষ্ণসাগরে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেল। আজফ কার্চ ও উপকূলবর্তী কয়েকটি অঞ্চল তার হস্তগত হল। প্রণালীদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য জাহাজ পাঠাবার অধিকার সে পেল। ক্রিমিয়া এতদিন তুরস্কের অধীনে ছিল; এখন তাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হল সত্য, কিন্তু এর ফলে রাশিয়া এটিকে গ্রাস করবার সুযোগ পেল।

রাশিয়ার লাভ

চুক্তিদ্বারা ঠিক হল যে তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে রাশিয়ার বাণিজ্যদূত থাকবে; তুরস্ক সুলতানের খৃষ্টান প্রজারা ধর্মব্যাপারে স্বাধীনতা পেল এবং প্যালেস্টাইনের পবিত্র স্থানগুলিতে যাবার অধিকার দেওয়া হল। এর দ্বারা রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের গোঁড়া খৃষ্টানদের আনুগত্য লাভ করল। তাঁরা রাশিয়াকেই তাঁদের রক্ষক বলে মনে করতে থাকল। এর ফলে রাশিয়ার দিক হতে তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার বহু সুযোগ দেখা দিল।

নিকট-প্রাচ্য সমস্যার উদ্ভব

কুসুক-কাইনারজির সন্ধি ক্যাথারিনের পররাষ্ট্র নীতির অসামান্য সাফল্যের

পরিচায়ক। এই সন্ধি নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সূত্রপাত করল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার মূলকথা ছিল পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার সম্প্রসারণ। সেই সম্প্রসারণের ফলে তুর্কীশক্তি পিছিয়ে যেতে থাকল।

বাস্তবক্ষেত্রে এই চুক্তি ছিল রাশিয়ার জয়যাত্রার প্রথম সোপান স্বরূপ। ক্রিমিয়াকে দখল করে নেওয়া ছিল এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ক্যাথারিনের ইচ্ছা ছিল পোল্যাণ্ডের মত তুরস্ককেও গ্রাস করা। রাশিয়ার পক্ষে এটি সম্ভব ছিল না বলে তিনি দ্বিতীয় জোসেফের সাথে এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সম্বন্ধে তিনি এক পরিকল্পনা তৈরি করেন। প্রথমতঃ তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এক গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপিত হবে এবং ক্যাথারিনের এক পৌত্র এই সাম্রাজ্যের সম্রাট হবেন। অষ্ট্রিয়া তাঁর এই পরিকল্পনা মেনে নেবার পুরস্কার স্বরূপ আড্রিয়াতিক সাগরতীরে অবস্থিত তুরস্কের কয়েকটি প্রদেশ পাবে। রাশিয়ার সম্মতি পাবার পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাথারিন ক্রিমিয়া দখল করে নিলেন। সেবাস্তপোলে নৌঘাটি স্থাপন করেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আবার রুশ-তুর্কী সংঘর্ষ দেখা দিল। অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার সাথে তুরস্কের বিরুদ্ধে যোগ দিল। কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত ওচাকফ রুশ সৈন্য আক্রমণ করে দখল করে নিল ; অষ্ট্রিয়া বেলগ্রেড আক্রমণ করল। এদিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার আগ্রাসী নীতিতে ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া ও হল্যাণ্ড শঙ্কিত হল। তারা একজোটে ঘোষণা করল যে এই যুদ্ধ যদি চলতে থাকে তা হলে তারা তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করবে। অষ্ট্রিয়ার নতুন সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ড এতে ভীত হয়ে যুদ্ধ হতে সরে দাঁড়ালেন (১৭৯০)। ক্যাথারিন কিন্তু ভীত হলেন না। আরও দু'বছর তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জ্যাসির সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। তুরস্ক রাশিয়া কর্তৃক ক্রিমিয়া এবং ওচাকফদখল মেনে নিল। ফলে নীস্টার নদীর উত্তর অবধি কৃষ্ণসাগরের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুরস্ক হারাল।

সমালোচনা : ক্যাথারিনের পররাষ্ট্রনীতি ত্রুটিহীন ছিল না। তাঁর তুর্কীনীতি ইউরোপের ইতিহাসে নিকট-প্রাচ্য সমস্যাকে জটিল করল। ভবিষ্যতে এই সমস্যা সমাধানের জন্য অসংখ্য যুদ্ধ দেখা দেবে। তাঁর পোল্যাণ্ড-নীতিও সমালোচনার যোগ্য। পোল্যাণ্ডকে ধ্বংস করে তিনি রাশিয়ার ভবিষ্যৎ ক্ষতির পথ করে রাখলেন। প্যোল্যাণ্ড বিভাগের ফলে রাশিয়ার সীমানা অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার নিকটবর্তী হবার ফলে এই রাষ্ট্রদ্বয়ের সাথে ভবিষ্যতে সীমান্ত-বিরোধ দেখা দেবে। তাছাড়া পোল্যাণ্ডের অধিবাসীরা রাশিয়াকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকল।

Q. 3. Review the character and achievements of Catherine II. *Or*, Give an estimate of Catherine II of Russia.

Ans. ক্যাথারিন জন্মগত ভাবে ছিলেন জার্মান এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক হতে ফরাসী। কিন্তু রাশিয়ার সিংহাসনে বসার পর হতেই তিনি রাশিয়ার স্বার্থ ও রুশ জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জড়িয়ে ফেলেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, কাব্য এবং প্রগতিমূলক ভাবধারা অনুশীলনে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি যে একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন তা তাঁর লেখা পত্রাবলী, জীবন-স্মৃতি, নাটক প্রভৃতি হতে জানা যায়।

চারিত্রিক গুণাবলী

রাশিয়ার শাসকবৃন্দের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম শিক্ষাপ্রাপ্তরূপে ধরা যায়। "যেখানে পিটার শুধু কাজ করতেন, পড়তেন না কিছুই এবং কখনই চিন্তা করতেন না, ক্যাথারিন এই তিনটিই করতেন।" নারী হয়েও তাঁর মধ্যে নারীসুলভ দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল না। তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ। খামখেয়ালী ভাবও তাঁর ছিল এবং স্বভাবতই তিনি ছিলেন দুঃসাহসী। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কাজে নামতেন তা হতে সহজে বিচ্যুত হতেন না। তৎকালীন রাজন্যবর্গের মতই তিনি নীতিজ্ঞান শূন্য ছিলেন এবং অনেকের অপেক্ষা তিনি চতুর ছিলেন বেশি। কূটনীতিতে তিনি ছিলেন পারঙ্গমা। তৎকালীন জটিল আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও

কৃতিত্ব

তিনি বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে যে ভাবে তিনি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগিয়েছিলেন তা হতে তাঁর কূটনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া পোল্যাণ্ড বিভাগে তাঁর ধৈর্য ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই।

রাশিয়ার ইতিহাসে ক্যাথারিনের অবদান চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে। পিটার দি গ্রেটকে আধুনিক রাশিয়ার স্রষ্টা বলা হয়। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ক্যাথারিনের কার্যাবলী পিটারের কার্যাবলীকেও ম্লান করে দিয়েছে। পিটার যতটা সুশৃঙ্খল রাজ্যে রাজত্ব করেছিলেন, তার চেয়ে অধিকতর সুশৃঙ্খল রাজ্যে ক্যাথারিন তাঁর শাসন চালিয়ে যান।

ক্যাথারিন ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে নামকরা একজন। প্রজাহিতৈষণা তাঁর শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করে তাকে সর্বপ্রকারে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে তিনি চেয়েছিলেন।

এর জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। নানারূপ সংস্কার প্রবর্তন করে তিনি প্রজাহিতৈষণার পরাকাষ্ঠা দেখান। তাঁর আভ্যন্তরীণ শাসনসংস্কারমূলক কার্যাবলীর ফলে রাশিয়ায় শৃঙ্খলা ও সংহতি স্থাপিত হয়।

পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তাঁর চেষ্টার ফলে রাশিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পোল্যাণ্ড বিভাগ ও তুরস্কের সাথে যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার রাজ্যসীমা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার জন্য কৃষ্ণসাগরের দ্বার উন্মুক্ত করবার ফলে তার একটি চিরন্তন সমস্যার সমাধান হয়। সংক্ষেপে, তাঁর পররাষ্ট্র নীতির ফলে ইউরোপের ইতিহাসে রাশিয়ার মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেল। পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি কিরূপ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তা তাঁর উক্তি হতেই বোঝা যায়; 'আমি দরিদ্র বালিকা হিসেবে রাশিয়ায় এসেছিলাম এবং রাশিয়া আমাকে প্রচুর উপঢৌকনে ভূষিত করছে। কিন্তু আমি ওটির বিনিময়ে রাশিয়াকে আজফ. ক্রিমিয়া ও ইউক্রেন অঞ্চল উপহার দিয়েছি।'

ত্রুটি : (অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা দেখ।)

উপসংহারের বলা যায় যে পিটারের অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করবার প্রচেষ্টার জন্য ইতিহাসে ক্যাথারিন প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। সৃজনধর্মী প্রতিভা তাঁর ছিল না। পিটার যেমন রাশিয়ায় এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন, ক্যাথারিন ওরকম কিছু করতে পারেননি। তিনি তাঁর যুগের আদর্শে প্রভাবিত হয়েই সংস্কারগুলি প্রবর্তন করেছিলেন। "পিটার তাঁর যুগ সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর যুগই ক্যাথারিনকে সৃষ্টি করেছিল।" তবুও একথা অনস্বীকার্য যে ক্যাথারিনের কীর্তি বিশেষভাবে স্মরণ যোগ্য।

More Questions with Hints

1. Make an estimate of Catherine II as an enlightened despot.

Ans. 3 নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

2. Explain the foreign policy of Catherine II. How far was she successful in satisfying the traditional aims of Russian foreign policy.

Ans. 2 নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

3. Catherine was an apt pupil of Peter the Great. Discuss.

Ans. (পিটারের অসমাপ্ত কার্য সম্পন্ন করবার উদ্যোগী রূপে ক্যাথারিনকে দেখা হয়ে থাকে—পিটারের বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেন—পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা রাশিয়ায় আনবার চেষ্টা করেন—পিটারের ন্যায় বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন—পিটারের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে পিটারের চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেন। (তৎসহ ৪নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।)

সপ্তম অধ্যায়

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

Q. 1. What were the causes and effects of the War of American Independence?

Ans. ইংরেজরা আমেরিকায় বসবাস করতে যায়। কেউ কেউ নির্বিবাদে ধর্ম আচরণ করবার জন্যও যায়। তাদের মধ্যে পিউরিটানগণ অন্যতম। তা ছাড়া, রোমান ক্যাথলিক ও অন্যান্য খ্রীষ্টানগণের দ্বারাও কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতলান্তিকের তীরে তেরটি বিভিন্ন ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে উঠে। এই উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের শাসনাধীনে থাকলেও উপনিবেশের প্রতিনিধিদের হাতেই শাসনভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাপারে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ছিল না।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে—যেমন 'আব্রাহামের মালভূমিতে উলফের বিজয়লাভের সাথে সাথেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস শুরু হয়।' সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের নিকট নানা দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা সেনাদল গঠন ও যৌথ স্বার্থের খাতিরে রসদ প্রভৃতি সংগ্রহ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন উপনিবেশের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে অনেক শিখতে পেরেছিল। তাছাড়া, এই যুদ্ধের ফলে কলোনীগুলি তাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত হল এবং ন্যায্য অধিকারের দাবীতে ইংল্যাণ্ডের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে ভয় পেল না। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে বলা হয় যে :

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন কারণ

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রভাব

রাজা তৃতীয় জর্জ এবং পার্লামেন্ট উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করেছিল, সরকারে প্রতিনিধিত্ব না দিয়ে কর ধার্য করেছিল, তাদের বাড়িতে সৈন্য রাখতে বাধ্য করেছিল। একারণগুলি কিন্তু বাহ্য, এগুলির পিছনে ছিল কয়েকটি মূল বিষয়; এগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ মুখ্য

প্রধান কারণ

হল বৃটিশ সাম্রাজ্যের রূপ এবং তার সাথে কলোনীগুলির সম্পর্ক প্রসঙ্গে পরস্পর-বিরোধী মতবাদ।

আমেরিকানরা ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল

আমেরিকানদের মতে তেরটি উপনিবেশ হল বৃটিশ অধীনস্থ তেরটি স্বায়ত্ত-শাসনশীল অঞ্চল। এই সমস্ত উপনিবেশের অধিবাসীরা জাতিতে ছিল ইংরেজ। তাঁদের ধমনীতে যেমন ইংরেজ রক্ত প্রবাহিত ছিল ঠিক তেমনি তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারাও ছিল সতের শতকে ইংরেজ চিন্তাধারা ও আদর্শের অনুরূপ। এ কারণে ম্যাগনা-কার্টার সময় থেকে ইংরেজরা যেসব সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে, উপনিবেশকারীও সে সব সমানাধিকার পাবার অধিকারী বলে নিজেদের মনে করত। ইংল্যাণ্ডের রাজার প্রেরিত গভর্নর তাদের আইন-সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন। এতে আমেরিকানদের তেমন আপত্তি ছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই গভর্নর আইন সভাকে লঙ্ঘন করতেন না।

উপনিবেশগুলি সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের মত ও নীতি

বৃটিশ সরকার কিন্তু উপনিবেশগুলির অধিকার প্রসঙ্গে ভিন্নতর মত পোষণ করত। তাদের মতে কলোনীগুলির পুর্ণ স্বায়ত্তশাসনলাভের অধিকার নেই এবং সেখানকার অধিবাসীরা ইংরেজদের সমান নয়। উপনিবেশে বসবাসকারীদের কর্তব্য হল বৃটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বাজার সৃষ্টি করা এবং বৃটেনে কাঁচা মাল প্রেরণ করে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ রক্ষা করা। প্রথমদিকে ইংল্যাণ্ড নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল বলে কলোনী-গুলিকে ভাল করে শোষণ করতে পারেনি। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও স্পেন আমেরিকা হতে হটে যাবার পর, তাদের মনে হল যে এইবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। সময় হয়েছে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের যুপকাষ্ঠে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থকে বলি দেবার। সময় হয়েছে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের দরুন যে অর্থব্যয় হয়েছিল, আমেরিকানদের নিকট হতে তার কিছুটা আদায় করবার।

বিভিন্ন কর স্থাপন

এইজন্য ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী গ্রেনভিল পার্লামেণ্টে **স্ট্যাম্প অ্যাক্ট** নামক আইন পাস করলেন। এতে স্থির হয় যে, এরপর আমেরিকায় দলিলদস্তাবেজের জন্য সরকারী স্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ ব্যবহার করতে হবে। ঔপনিবেশিকগণ এর প্রতিবাদ করল। তাদের বক্তব্য ছিল ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে যখন তাদের কোন প্রতিনিধি নেই তখন তাদের ওপর কর বসাবার অধিকারও পার্লামেণ্টের নেই। এইরূপে ইংল্যাণ্ডের শাসন-নীতির একটি মূল সূত্র তারা তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োগ করল—**প্রজাদের**

প্রতিনিধিদের সম্মতি ভিন্ন প্রজাদের উপর কর বসানো অবৈধ। উপনিবেশগুলিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হল। গ্রেনভিল পদত্যাগ করলেন।

লর্ড রকিংহাম এরপর প্রধানমন্ত্রী হলেন। স্ট্যাম্প অ্যাক্ট প্রত্যাহার করে তিনি পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন যে উপনিবেশগুলিতে কর ধার্য করবার অধিকার ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের আছে। সুতরাং ঔপনিবেশিকদের অসন্তোষ দূর হল না।

এর ফল স্বরূপ মন্ত্রী টাউনসেণ্ড কাচ, সীসা এবং চায়ের ওপর শুল্ক ধার্য করলেন। **ইংল্যাণ্ডের এই কর ধার্য ব্যাপারে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য যতটা না ছিল ততটা ছিল শুধু ইংল্যাণ্ড যে তার উপনিবেশের ওপর কর ধার্য করতেপারে সেটাই প্রতিপন্ন করা।** কিন্তু এটি উপনিবেশগুলির অসন্তোষ প্রজ্বলিত করল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে **লর্ড নর্থ** প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি অন্যান্য জিনিসের ওপর আমদানী শুল্ক উঠিয়ে দিলেন, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সম্মানহানির ভয়ে **'চা'-এর উপর কর রহিত করলেন না।** ঔপনিবেশিকগণ যুদ্ধ সংকেতের দ্বারা এর উত্তর দিল। এই সময় বোস্টন বন্দরে চা-বোঝাই ইংরেজ জাহাজ পৌছলে কয়েকজন সশস্ত্র লোক রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে জাহাজে ওঠে। তারা চায়ের বাক্স সমুদ্রে ফেলে দিল। ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দিলেন এবং আমেরিকায় সৈন্য প্রেরণ করলেন। এর ফলে ইংল্যাণ্ডের সাথে ঔপনিবেশিকদের যুদ্ধ আরম্ভ হল।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কারণ হচ্ছে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। দুটি কারণে এটি দেখা দেয়—আমেরিকার ভৌগোলিক অবস্থিতি এবং মানসিক চেতনা। উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ড হতে বহু দূরে ছিল। এতে তাদের মধ্যে পৃথক সত্তার ভাব দেখা দেয়। তা ছাড়া, তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার এবং মানসিক চিন্তাধারা স্বাধীনতার প্রেরণা দেয়।

জাতীয়তাবাদ

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার এই সংগ্রামে কোন্ পক্ষ ন্যায় বা কোন্ পক্ষ অন্যায় করেছিল সে প্রশ্নের ঠিক জবাব দেওয়া কষ্টসাধ্য। উভয় পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করেছিল এবং পরিণামে উভয়ের মধ্যেই গভীর অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল। শেষে মাথাগরম লোকেরাই যুদ্ধ ত্বরান্বিত করে।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়া শহরে ঔপনিবেশিকদের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার দাবি করলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ একত্র হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। স্বাধীনতার ঘোষণায় দৃঢ় এবং পরিষ্কারভাবে

জানিয়ে দেওয়া হল যে উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। এছাড়া এই ঘোষণায় বলা হল :

"আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি—যে সকল মানুষ জন্মসূত্রে সমান, সৃষ্টিকর্তা তাদের কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য অধিকারে ভূষিত করেছেন ; এই সবের মধ্যে আছে জীবনধারণ, স্বাধীনতা এবং সুখানুসরণের অধিকার।" ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ থেকে যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার সৃষ্টি হচ্ছিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে তা রূপ পেল। ঘোষণাপত্রে স্বেচ্ছাচারের ওপর চরম আঘাত হেনে বলা হল যে সরকার হল জনসাধারণের সেবক, প্রভু নয়।

স্বাধীনতার ঘোষণা

সাত বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। প্রথমে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে জয়লাভ করে কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হতে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় শুরু হয়। এই সময়ে ফ্রান্স ও স্পেনআমেরিকানদের পক্ষে যোগ দেয়। এছাড়া রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক, প্রাশিয়া, পর্তুগাল এবং অষ্ট্রিয়া—উত্তরের 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতা' নামে একটি সংঘ গড়ে তোলে। ফলে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি শত্রুভাবাপন্ন একতাবদ্ধ ইউরোপের সৃষ্টি হল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সেনাপতি কর্ণওয়ালিশ জর্জ ওয়াশিংটনের নিকট ইয়র্ক টাউনে আত্মসমর্পণ করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড প্যারিসের সন্ধির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ সমাপ্ত করল। এই সন্ধি দ্বারা তেরটি উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হল।

যুদ্ধ

ফলাফল : আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ আমেরিকার বিপ্লবকে জয়ী করল, পরোক্ষভাবে দৈবস্বত্ব রাজতন্ত্রের ওপর আঘাত হানল। জনগণের অধিকার সার্বভৌম বলে স্বীকৃত হল এবং সমগ্র বিশ্বে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করল।

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ডে চরমপন্থীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারল এবং প্রগতিবাদীরা জয়যুক্ত হল। ইংল্যাণ্ড পুরানো ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন করল।

ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধ বিপর্যয় আনল। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ফ্রান্সের রাজকোষ নিঃশেষিত হল। ফরাসী দেশে পৃথিবীবিখ্যাত বিপ্লব দেখা দিল। ফরাসী বিপ্লবীগণ আমেরিকানদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। মানবমুক্তির ইতিহাসে তা এক সুদিনের সূচনা করে। জগতের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও আশাহত মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দেয় "যখন কোন রাষ্ট্র

অত্যাচারী হয়ে ওঠে তখন তাকে পরিবর্তিত করে বা তাকে ভেঙে নতুন সমাজ গঠন করবার অধিকার জনসাধারণের আছে।"

Q. 2. Discuss fully the causes of the American Revolution. What led to its Success ?

Ans. ১নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ, তারপর নিম্নলিখিত অংশটুকু যোগ দাও।

ঔপনিবেশিকদের জয়লাভের কারণ : নানা কারণে ঔপনিবেশিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করে। প্রথমত ইংরেজ সরকার কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ চালাতে পারেনি। এতে আমেরিকানদের সুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত ইংল্যাণ্ডের শত্রুরা ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ঔপনিবেশিকদের দিকে যোগ দেয় এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের সাহায্য ছাড়া ঔপনিবেশিকদের যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হত। তৃতীয়ত, জর্জ ওয়াংশিংটনের প্রতিভা ও সংগঠন শক্তি জয়লাভের অন্যতম কারণ। ঔপনিবেশিকদের অদম্য সাহস, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও দুর্নিবার স্বাধীনতা লিপ্সা তাদের বিজয়ী করেছিল। মহাসমুদ্রের ব্যবধান এবং ইংল্যাণ্ড হতে আমেরিকার দূরত্ব ঔপনিবেশিকদের সাহায্য করেছিল। ঔপনিবেশিকরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য যুদ্ধ করেছিল। ইংরেজ সরকারের কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না।

Q. 3. 'The fundamental cause of American Revolution was the rise of nationality'. Explain.

Ans. ঐতিহাসিক রাইকারের মতে মার্কিন বিপ্লবের প্রধানতম কারণ হল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। এটি দেখা দেয় দুটি কারণে—ভৌগোলিক ও মানসিক। ভৌগোলিক দিক হতে মার্কিন উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ড হতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল এবং তাদের ভূ-সীমানাও ছিল বিস্তীর্ণ। এর ফলে তাদের মধ্যে একদিকে স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতা দেখা দিল, অপরদিকে স্বাধীনতার প্রেরণাও জেগে উঠল। আবার তাঁদের ধমনীতে ইংরেজ রক্ত বইছিল বলে তারা বাইরের শাসন দ্বারা শাসিত হইতে চাইল না তারা যেরূপ স্বায়ত্তশাসন পেয়েছিল তার ফলেও তাদের মনোভাব কঠোর হয়ে ওঠে। একারণে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরই তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দাবী করল।

অষ্টম অধ্যায়

আঠারো শতকে ইংরেজ-ফরাসী সম্পর্ক : নিকট-প্রাচ্য সমস্যা

Q. 1. Describe the course of Anglo-French relations in the fifty years after 1740.

Ans. ১৭৪০ হতে ১৭৯০ পর্যন্ত ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই সম্পর্ক কখনই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। এই অর্ধ শতাব্দী ধরে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে উপনিবেশ নিয়ে দ্বন্দ্ব সমানে চলে এবং এই দ্বন্দ্ব ইউরোপের রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। সংক্ষেপে এই অর্ধশতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে যেমন প্রধান শত্রু বলে মনে করত, ফ্রান্সও তেমনি ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করে।

ভূমিকা

এই অর্ধ শতাব্দীতে ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্ক মৈত্রীমূলক হতে পারেনি ; তার পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল। তবে প্রধান কারণ হল ঔপনিবেশিক প্রাধান্য নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় কারণ হল বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও জার্মানীতে ফ্রান্সের প্রভাব যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা। ইংল্যাণ্ড একদিকে যেমন হ্যানোভার রক্ষার কথা চিন্তা করছিল, অন্যদিকে ইউরোপে তার ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে রক্ষা পায় তার জন্য বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডকে ফরাসী প্রভাব-মুক্ত রাখতে চাইছিল। তাছাড়া ফ্রান্স যাতে ভূমধ্যসাগরে প্রাধান্য স্থাপন করতে না পারে তার জন্যও ইংল্যাণ্ড বিশেষ চেষ্টা চালায়। সবশেষে ইউরোপে ফ্রান্স যাতে বেশি শক্তিশালী না হতে পারে, ইউরোপে শক্তিসাম্য যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য ইংল্যাণ্ড বিশেষ চেষ্টা করে।

দ্বন্দ্বের কারণ

ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব : ফ্রান্স উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। সতের শতকের প্রথমদিকে এসব উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কানাডা, নোভাস্কেটিয়া প্রভৃতি নতুন নতুন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব অঞ্চল প্রথম হতেই ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ফরাসীরা কেবলমাত্র উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেই ক্ষান্ত হল না। আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে তারা বাণিজ্য-কুঠি

অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় আমেরিকায় ইঙ্গ ফরাসী উপনিবেশ

স্থাপন করে এবং এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এটি বাস্তবে পরিণত হয়নি। ইংরেজরা বাধা দেয়। ফলে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত চলেছিল।

ইংরেজ উপনিবেশ : রানী এলিজাবেথের আমলে ইংরেজরা সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারে ও উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রসর হয়। হকিন্স, ড্রেক, ক্যাভেণ্ডিস, র‍্যালে, ফ্রবিশার প্রভৃতি দুঃসাহসী নাবিকরা সমুদ্রপথে ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্য স্থাপনে সহায়তা করে। রাশিয়া, এশিয়া মাইনর ও পারস্য দেশে ব্যবসা করবার জন্য বিভিন্ন কোম্পানী গড়ে ওঠে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য দেশের অন্যান্য জায়গায় বাণিজ্য করবার অধিকার পায়। এবং কালক্রমে ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব স্থাপিত হয়। ১৬০৭-এ ভার্জিনিয়ায় কিছু সংখ্যক ইংরেজ বসতি স্থাপন করে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে একদল গোঁড়া প্রোটেস্টাণ্ট বা পিউরিটান স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণের আকাঙ্ক্ষায় 'মেফ্লাওয়ার' নামক জাহাজে আটলাণ্টিক সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকায় চলে যায়। তারা প্লীমাউথ নাম দিয়ে একটি উপনিবেশ স্থাপন করে। কালক্রমে আমেরিকার পূর্ব-উপকূলে ইংরেজদের তেরটি উপনিবেশ গড়ে ওঠে। আমেরিকা ও ভারতবর্ষ ছাড়াও ইংল্যাণ্ড অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সম্পর্ক স্থাপন করে। চীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়, আফ্রিকা দেশগুলির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রথমে স্থাপিত হয়। পরে ওই সব দেশে ইংরেজ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশটিও সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের অধিকারে আসে। তাছাড়া, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের নিকট হতে ইংরেজেরা বহু অংশ কেড়ে নিতে চায়। ফলে সতের শতকের শেষ ভাগ হতে উপনিবেশ নিয়ে ইংরেজদের সাথে অন্যান্য দেশের যুদ্ধ বাধে।

ইংল্যাণ্ডের প্রচেষ্টা

ইংরেজ ও ফরাসীদের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য নিয়ে দ্বন্দ্ব : আঠার শতকে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য নিয়ে ইংরেজ ফরাসী দ্বন্দ্ব বিশেষ দেখা যায়। ফরাসী ও ইংরেজরা উভয়েই আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ায় বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রবল চেষ্টা করে। এসব অঞ্চলে ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশগুলি খুবই কাছাকাছি ছিল। ভারতবর্ষে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর যে রাজনৈতিক সংহতির অভাব দেখা দেয় তার ফলে ফরাসী ও ইংরেজ শক্তিদ্বয় ক্ষমতা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। সতের শতকের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন অংশে ইংরেজ ও ফরাসীরা অনেকগুলি কুঠি

দ্বন্দ্বের কারণ ও অঞ্চল সমূহ

স্থাপন করে ও দেশের রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে রাজনীতির পাশা খেলায় মেতে ওঠে। শেষপর্যন্ত ভারতে ফরাসী প্রতিযোগিতার অবসান হয় এবং ইংরেজ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ইংরেজদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এরজন্য তাদের দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। প্রধানতঃ তিনটি যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে পৃথিবী ব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। স্পেনীয় উত্তরাধিকারীর যুদ্ধ (১৭০১-১১), অষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৭৪০-১৭৪৮) এবং **সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ** (১৭৫৬-১৭৬৩)। বলাই বাহুল্য, ইংল্যাণ্ড এই তিনটি যুদ্ধের ফলে সর্বাপেক্ষা লাভবান হল। এই যুদ্ধ তিনটি স্থির করে দিল যে জলপথে এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে ফ্রান্সকে পিছনে রেখে ইংল্যাণ্ড এগিয়ে চলতে থাকবে।

ইংল্যাণ্ডের জয়

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর : ফ্রান্স সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। কিন্তু চয়সিউল ও ভার্গেনিজের নেতৃত্বে ফ্রান্স আবার জোরদার পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে এবং ইউরোপে তার হারানো প্রাধান্য পুনরুদ্ধারে চেষ্টিত হয়। চয়সিউল ও ভার্গেনিজের পররাষ্ট্রনীতির সবল বিষয় ছিল ইংরেজ বিদ্বেষ এবং ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করা। ইংল্যাণ্ডের সাথে পুনরায় লড়বার জন্য চয়সিউল ফ্রান্সের ক্ষমতা পুনর্গঠিত করেন। ফ্রান্সের নৌবাহিনীও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ইংলণ্ডকে জব্দ করবার জন্য আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেল। ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধে যোগদানের একমাত্র কারণ ছিল ইংরেজের প্রতি ঐকান্তিক ঈর্ষা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের একটা অদম্য উৎসাহ। যদিও ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধ বিপর্যয় এনে ছিল।

ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করবার জন্য ফ্রান্স ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের সাথে একটি বাণিজ্যিক ও সামরিক সাহায্য দান চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এই চুক্তির ফলে হল্যাণ্ডে ফরাসী প্রভাব বিশেষ ভাবে দেখা যায় এবং ইংল্যাণ্ডের প্রভাব কমে যায়।

এই অর্ধশতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ডও ফ্রান্সকে তার প্রধান শত্রু মনে করেছিল এবং সুযোগ-সুবিধা পেলেই ফ্রান্সকে অসুবিধায় ফেলতে চেষ্টা করেছিল। এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক এতই বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল যে ফরাসী বিপ্লব যখন শুরু হল (১৭৮৯) ইংল্যাণ্ড তখন এটিকে আহ্বান জানায় এই বলে যে ফ্রান্স আর তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে না। ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কে তিক্ততার ভাব ১৭৯০ খৃষ্টাব্দেই দূর হল না। বরঞ্চ বিপ্লবী ফ্রান্সের সাথে ইংল্যাণ্ডের

উপসংহার

প্রকাণ্ড যুদ্ধ বাধল এবং বিপ্লবী ফ্রান্সকে ধ্বংস করবার জন্য ইংল্যাণ্ডই বিশেষভাবে সচেষ্ট হল। নেপোলিয়নের সময়ে এই সম্পর্ক আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করবার জন্য বহু চেষ্টা করেন কিন্তু পরিশেষে ব্যর্থ হন।

Q. 2. What is meant by the Eastern question in European history? What factors were responsible for this question? Or, Give a short history of the Easten Question in the second half of the 18th century.

Ans. সূচনা: সতের হতে বিশ শতকের দু দশক পর্যন্ত তিনশো বছরের কিছু বেশি ধরে ইউরোপের নিকট-প্রাচ্য সমস্যা বারবার দেখা দিয়েছিল। নিকট-প্রাচ্য বলতে ইউরোপীয়রা প্রধানতঃ কৃষ্ণসাগর-বল্‌কান-আদ্রিয়াটিক ও পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলটিকে বুঝাতো। নিকট-প্রাচ্য সমস্যা একান্তভাবে ইউরোপের সমস্যা। আমাদের নিকট এটি নিকট-প্রাচ্য সমস্যা নয়; কারণ যে অঞ্চলগুলি নিকট-প্রাচ্যের আওতায় ছিল সেগুলি আমাদের পূর্ব দিকে অবস্থিত নয়, পশ্চিমেই অবস্থিত।

নিকট-প্রাচ্য কাকে বলে

নিকট-প্রাচ্য-সমস্যার উৎপত্তি: মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত তুর্কীরা এককালে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। এটিকে অটোম্যান সাম্রাজ্য বলা হত। আফ্রিকার উত্তর উপকুলে মিশর, ট্রিপলি প্রভৃতি অঞ্চল, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বিস্তীর্ণ আরব ভূভাগ এবং টিউনিস, আল-জেরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ বারবার 'ধর্মযুদ্ধ' করেও ব্যর্থ হয়।

ক্ষয়িষ্ণু অটোমান সাম্রাজ্য ও তার বিভিন্ন সমস্যা

বিরাট অটোমান সাম্রাজ্যে ঐক্য বলে কিছু ছিল না। বহু-জাতিভিত্তিক এই সাম্রাজ্যের পরতে পরতে যখন ঘুঁন ধরল তখনই ইউরোপের 'নিকট-প্রাচ্য সমস্যা' দেখা দিল। এই সমস্যাটিকে অল্প কথায় বলা যায় 'তুরস্কের ভাগ্যে কি ঘটবে?'

সতের শতক হতেই তুরস্কের ক্ষমতা কমতে শুরু করে, কারণ তুরস্কের শক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল মিথ্যা ভিত্তির ওপর। জাতি-ধর্ম ও ভাষার দিক হতে তুর্কীদের সাথে ইউরোপীয়দের কোন মিলই ছিল না। এ কারণে ইউরোপীয় প্রজাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল খুবই তিক্ত। তুর্কীদের শাসন পরিচালনায় কোন দক্ষতা ছিল না। তাদের নির্ভর করতে হত খ্রীষ্টান প্রজাদের ওপরই। আর শাসন-পরিচালনা ছিল যেন একটা এলোমেলো ব্যবস্থা—রাজ প্রাসাদের পোষ্যরাই এটা

চালাত। 'পাশা' নামে অভিহিত প্রাদেশিক শাসন কর্তারা কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার ফলে প্রায় স্বাধীন শাসক হয়ে উঠত।

তুর্কী সুলতানের ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি ছিল তাঁদের নিজস্ব 'জেনিসারী' বাহিনী। খৃষ্টান প্রজাদের শিশুকালে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে এই বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। কালক্রমে এই জেনিসারী বাহিনী সাম্রাজ্যের হর্তাকর্তা হয়ে ওঠে। এমন কি সুলতানদের সিংহাসনে বসান ও সরান এই বাহিনীর ওপর নির্ভর করত।

তুর্কী সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন অধিকার ছিল না, তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কঠোর হস্তে দমন করা হত।

এই সাম্রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল মধ্য-যুগীয়। ইউরোপের নবজাগৃতির ফলে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায় তার সাথে তুর্কী সাম্রাজ্য তাল রাখতে পারল না। ব্যবসা-বাণিজ্যে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র হতে তুর্কীরা হটে গেল। তুর্কী সাম্রাজ্যে কৃষকদের অবস্থা বড়ই সঙ্গীন ছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তুর্কী সাম্রাজ্য দেউলিয়া হল। রক্ষণশীলতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে কোন পরিবর্তনই তারা পছন্দ করল না।

তুর্কী সাম্রাজ্যের যখন এরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময়ই তুর্কী সাম্রাজ্যের চারদিকে কয়েকটি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রের আবিভাব ঘটে। এই রাষ্ট্রগুলি সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করে এবং দুর্বল তুর্কী সাম্রাজ্যকেই তাদের সম্প্রসারণ নীতির প্রধান স্থল বলে গণ্য করে; অতএব এর ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ দেখা দিল এবং নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সৃষ্টি হল।

আঠারো শতকে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা: আঠারো শতকের নিকট-প্রাচ্য সমস্যা বিশেষ জটিল ছিল না। এই শতকের নিকট-প্রাচ্য সমস্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতি রাশিয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাব। স্বাভাবিক ভাবেই তুরস্ক ছিল রাশিয়ার শত্রু। কারণ রাশিয়া কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চাইল। ফলে তুরস্কের সাথে তার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। রাশিয়া এই অঞ্চল হতে তুর্কী শক্তিকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হল। তাছাড়া রাশিয়া গ্রীক চার্চের রক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনে করল। ফলে তুর্কী সাম্রাজ্যের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ অনেকটা ধর্মযুদ্ধের রঙ নেয়।

রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি

রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেট যখন দক্ষিণ-পুর্ব ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করে রাশিয়ার অধিকার বিস্তার নীতি গ্রহণ করলেন তখন ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শুরু হল। আভ্যন্তরীণ সংকটে জর্জরিত ফ্রান্স কিন্তু তুরস্ককে বিশেষ সাহায্য করতে পারল না। যুদ্ধ হওয়ার এক বছরের মধ্যেই রাশিয়া মোলডাভিয়া, ওয়ালাসিয়া, আজভ প্রভৃতি অঞ্চল হতে তুর্কীদের বিতাড়িত করল। প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া এতে ভীত হ'ল এবং রাশিয়াকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। অবশেষে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে **কুস্থক কৈনার্জীর** (Kutchuk Kainardji) সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া কৃষ্ণসাগরে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেল। ক্রিমিয়া অঞ্চল রাশিয়ার ভবিষ্যৎ গ্রাসের জন্য তৈরী করা হল। প্রণালীগুলির মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে জাহাজ পাঠাবার অধিকার রাশিয়া পেল। তাছাড়া রাশিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের গ্রীকচার্চ অনুগামীদের অভিভাবকত্ব লাভ করল।

বিভিন্ন সময়ে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ

কুস্থক-কৈনার্জীর সন্ধি (১৭৭৪)

এই চুক্তি তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জয়যাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য পথচিহ্ন। এরপর ক্যাথারিন অষ্ট্রিয়া সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ইউরোপীয় তুর্কী সাম্রাজ্য ভাগাভাগির পরিকল্পনা করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিন ক্রিমিয়া দখল করে নেন। দুর্বল তুরস্ক এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না। ক্রিমিয়ার অন্তর্গত সেবাস্তোপোলে রাশিয়া এক শক্তিশালী নৌঘাটি স্থাপন করল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অষ্ট্রিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষ নিল। রাশিয়া ওচাকফ আক্রমণ করে দখল করে নিল। যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়া অবশ্য বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। এমন কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইংল্যাণ্ডের এই মনোভাব পরবর্তীকালে নিকট-প্রাচ্য সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। এই সমস্যা যে বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গুরুতর বিবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, সেটা এই যুদ্ধে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল এবং এই সমস্যা নিয়ে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার দীর্ঘকালীন সংঘর্ষ শুরু হল। এখন হতে ইংল্যাণ্ড নিজেকে তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ড সত্তার প্রধান রক্ষক হিসেবে মনে করল।

দ্বিতীয় রুশ-তুর্কী যুদ্ধ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে **জ্যাসির** সন্ধি দ্বারা থামল এবং এই সন্ধিতে তুরস্ক ক্রিমিয়া ও ওচাকফের ওপর রাশিয়ার অধিকার মেনে নিল। এবং এর সাথে সাথে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার একটি পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

জ্যাসির সন্ধি (১৭৯২)

More Questions with Hints

1. Make an estimate of the respective strength and weakness when England and France embarked upon their long colonial wars.

Ans. ফ্রান্সের চেয়ে ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশের সংখ্যা বেশি ছিল। ইংরেজের অধীনে যে সব উপনিবেশ ছিল সেগুলি অধিকাংশই ছিল সমৃদ্ধশালী ও সুশাসিত, অন্যদিকে ফরাসী উপনিবেশগুলি কোনদিক দিয়েই লাভজনক ছিল না। ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলি স্থাপিত হয়েছিল সরকারী আনুকূল্যে নয়, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। একারণে ইংরেজ উপনিবেশগুলি নানা বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করত যা ফরাসী উপনিবেশগুলি পারত না। (1নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক পরিচ্ছেদগুলি যোগ দাও।)

2. Give a short history of the Eastern Question in the second half of the 18th century.

Ans. ২নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

3. Account for the decline of the Ottoman Empire which led to the Eastern Question.

Ans. ২নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

4. Give an account of the Austro-Russian relation on the Eastern Question.

Ans. ২নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদ দেখ।

নবম অধ্যায়

পোল্যাণ্ড বিভাগ

Q. 1. Narrate briefly the story of the first partition of Poland. What was the consequences of the partition? Review the circumstances that led to the first partition of Poland. Did Russia make a blunder in agreeing to the partition?

Ans. ষোল ও সতের শতাব্দীতে পোল্যাণ্ড ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। সতের শতকে পশ্চিম ইউরোপকে তুরস্কের আগ্রাসী নীতি হতে রক্ষা করবার কৃতিত্ব পোল্যাণ্ডের প্রাপ্য। কিন্তু আঠারো শতকের প্রথম হতেই পোল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে এক গোলযোগ দেখা দিল। পোল্যাণ্ডের রাজপদ ছিল নির্বাচন সাপেক্ষ। পোল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় অগস্টাস-এর মৃত্যু হলে বৈদেশিক শক্তিগুলি পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে তাদের নিজ নিজ প্রার্থীকে বসাবার জন্য চেষ্টা শুরু করল, ফলে পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে দুর্নীতির বিষ ঢুকল।

ভূমিকা

পোল্যাণ্ডের দুর্বলতা: পোল্যাণ্ডের রাজার কোন ক্ষমতা ছিল না। দেশের শাসন-ক্ষমতা অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি সভা ডায়েটের হাতেই চলে যায়। অভিজাতদের অধিকাংশই আবার বৈদেশিক শক্তিগুলির নিকট হতে অর্থ নিত। তাছাড়া, এই ডায়েটই রাজা নির্বাচন করত এবং ডায়েটের প্রত্যেক সদস্যের হাতে 'লবেরাম ভিটো' ক্ষমতা ছিল। এই ক্ষমতার সাহায্যে যে কোন সদস্য রাজা নির্বাচন বাতিল করে দিতে পারত। শুধু নৃপতি নির্বাচন নয়, ডায়েটের যে কোন ব্যবস্থাও বাতিল করে দিতে পারত। ফলে পোল্যাণ্ডে সার্বভৌমত্বের আধার রাজা ছিলেন না, কোন শ্রেণীও ছিল না, ছিল ডায়েটের প্রত্যেক সদস্য।

পোল্যাণ্ডে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে নি। ফলে অভিজাতদের ক্ষমতা হ্রাসের কোন চেষ্টা হয়নি আর মধ্যবত্তি শ্রেণী না থাকায় অভিজাত শ্রেণী এবং নির্যাতিত কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-সংঘাতের তীব্রতা কমানো যায়নি।

পোল্যাণ্ডের জাতীয় ধর্ম ছিল রোমান ক্যাথলিক মতবাদ। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। এরা রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল না সত্য কিন্তু

সুযোগ পেলে এরা বৈদেশিক শক্তিকে পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ ও সাহায্য করত।

পোল্যাণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও তার দুর্বলতার অন্যতম কারণ, কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারাও এটি সুরক্ষিত ছিল না। রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মত দুটি সম্প্রসারণকামী রাষ্ট্রের মাঝখানে এটি অবস্থিত ছিল। তাছাড়া, পোল্যাণ্ডের কোন স্থায়ী সৈন্যদল ছিল না এবং তার অর্থনীতিও মধ্যযুগীয় ছিল। অভিজাত শ্রেণীরা কোনরূপ কর দিত না। কৃষকদের অবস্থা ছিল শোচনীয়।

পোল্যাণ্ডের রাজা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা: আঠারো শতকের শুরুতেই পোল্যাণ্ডের নৃপতি নির্বাচন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। পোল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় অগাস্টাসের মৃত্যু এই সমস্যাকে আরও জটিল করে। তিনি কেবল পোল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন না, স্যাক্সনিরও শাসক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসবার জন্য দ্বিতীয় অগাস্টাসের পুত্র তৃতীয় অগাস্টাস এবং পোল্যাণ্ডের অভিজাতদের নেতা স্টানিশ্লাউস লেক্‌জিনস্কির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। অগাস্টাসের দাবি সমর্থন করল অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়া, আর লেক্‌জিনস্কির দাবি সমর্থন করল ফ্রান্স ও স্পেন। এটা স্মরণ রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি বিদেশী রাষ্ট্রের এই সমর্থন-এর পিছনে স্বার্থপরতা বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। ইতিমধ্যে

বিভিন্ন রাষ্ট্রের আগ্রহ

ফরাসী অর্থের জোরে লেকজিনস্কি পোল্যাণ্ডের রাজা নির্বাচিত হলেন। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া এই নির্বাচন মেনে নিল না। তারা সামরিক শক্তির সাহায্যে তাদের মনোনীত প্রার্থী তৃতীয় অগাস্টাসকে প্রকৃত পোলাণ্ডের রাজা বলে ঘোষণা করল এবং অষ্ট্রিয়া ও রাশিযার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে অগাস্টাস যুদ্ধে লেকজিনস্কিকে পরাজিত করে নিজেকে পোল্যাণ্ডের ন্যায়সম্মত রাজা বলে ঘোষণা করলেন। ফ্রান্স ও স্পেন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল না। তারা ইটালী ও রাইন অঞ্চলে অষ্ট্রিযার প্রাধান্য নষ্ট করবার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাল। এই সৈন্য-বাহিনীর হাতে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদল পরাজিত হল। কয়েক বছর যুদ্ধ চলার পর ভিয়েনার তৃতীয় সন্ধি দ্বারা পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। তৃতীয় অগাস্টাসই পোল্যাণ্ডের ন্যায়সঙ্গত নরপতি বলে স্বীকৃত হলেন। এই যুদ্ধ পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ করল এবং পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে দুটি পরস্পর-বিরোধী দলের সৃষ্টি হল। একটি দল হল ফ্রান্সপন্থী আর অন্যটি হল রুশপন্থী। এই যুদ্ধের পরে প্রায় বিশ বছর ধরে ফ্রান্সপন্থী দলের মাধ্যমে ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে রুশ হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে আসে। এই বিরোধিতায়

পোল্যাণ্ড
(ব্যবচ্ছেদের পূর্বে)
রুশিয়া
পোল্যাণ্ড
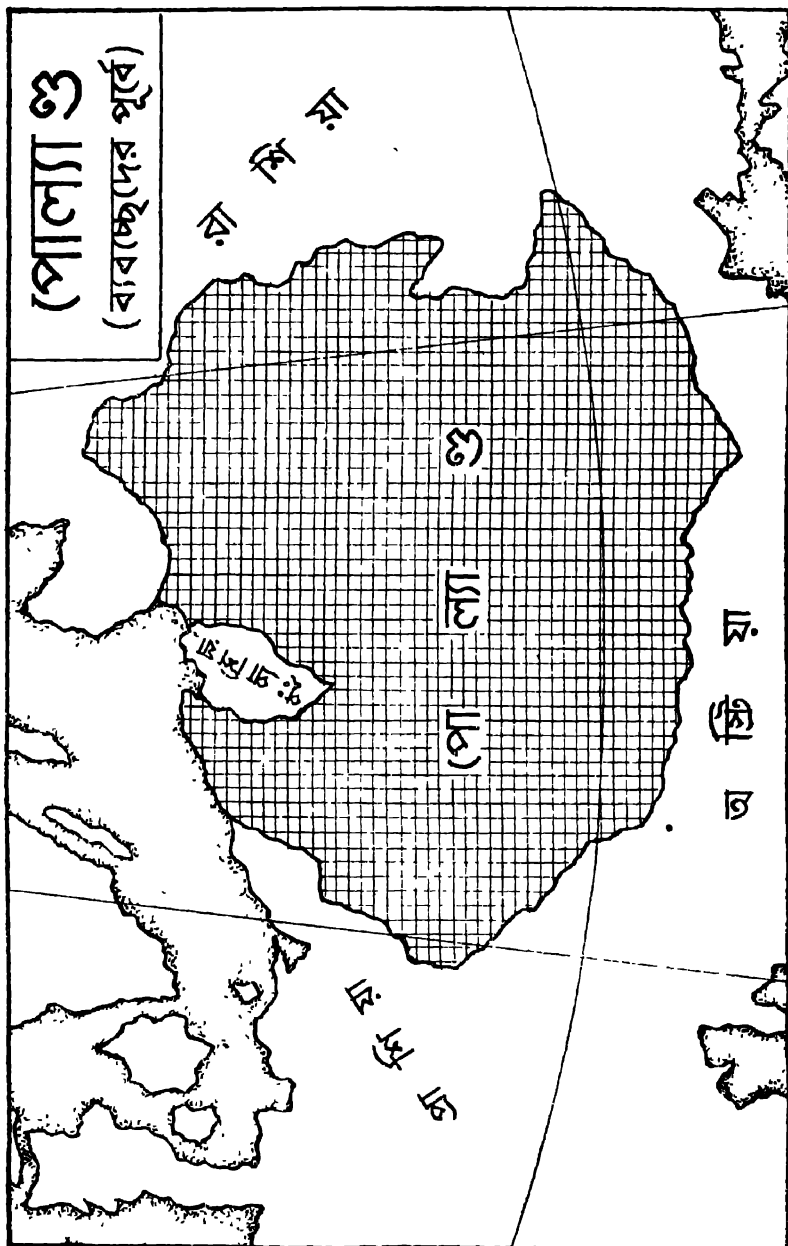
অকস্মাৎ বিরতি আনা হল কুটনৈতিক বিপ্লবের দ্বারা (১৭৫৬)। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফলে পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

পোল্যাণ্ড হতে ফ্রান্স হাত গুটিয়ে নিল বটে কিন্তু তার জায়গা দখল করল প্রাশিয়া। পোল্যাণ্ডের মধ্যে প্রাশিয়ার স্বার্থ জড়িত ছিল। ভৌগোলিক ঐক্য বিধানের জন্য প্রাশিয়ার নিকট পশ্চিম প্রাশিয়া ছিল একান্ত কাম্য।

রাশিয়া নিজেকে ইউরোপীয়·শক্তিরূপে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপন্ন করবার জন্য পোল্যাণ্ডকে গ্রাস করতে চাইল।

অষ্ট্রিয়া নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে মনে করল যদি স্যাক্সনির ইলেক্টররাই বংশপরম্পরায় পোল্যাণ্ডের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। সংক্ষেপে পোল্যাণ্ড রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার স্বার্থভূমি হয়ে দাঁড়াল। পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে রাশিয়া কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করতে চায়নি। কারণ বল্‌কান অঞ্চলে এ দুটি রাষ্ট্রের স্বার্থসংঘাত ছিল। রাশিয়া পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রাশিয়ার সাথে মিতালি করে। ইংল্যাণ্ড পোল্যাণ্ড ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকল। ফ্রান্সের পোল্যাণ্ড ব্যাপারে আগ্রহ থাকলেও সাধ্য ছিল না। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের ইউবোপীয় রাজনীতিতে প্রভাব একেবারে কমে যায়, তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা জটিল হয়। একারণে পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের সময় ফ্রান্স শক্তিহীন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভূমিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

পোল্যাণ্ড বিভাগ কিভাবে ঘটল: ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় অগাস্টাসের মৃত্যু হয়। বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্র এই সুযোগে নিজের নিজের প্রার্থীকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্থাপন করবার চেষ্টা শুরু করল। রাশিয়া ও প্রাশিয়া এ ব্যাপারে উদ্যোগী হল বেশি। তারা এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হল এবং প্রাশিয়া রাশিয়ার মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন করতে রাজী হল। দ্বিতীয় ক্যাথারিন প্রোটেস্টাণ্ট ও গ্রীক ধর্মাবলম্বীদের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এই অজুহাতে পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করলেন। রুশ-বাহিনী পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করল। স্তানিসলাস পনিয়াতুস্কি নামে এক পোলিশ অভিজাতকে ক্যাথারিন ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উভয়েই পোল্যাণ্ডের রাজারূপে মনোনয়ন করে দিলেন এবং পোল্যাণ্ডের ডায়েট চাপে পড়ে তাঁকেই রাজা নিবাচিত করতে বাধ্য হল। পনিয়াতুস্কি ক্যাথারিনের সমাদরকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি লিবেরাম ভিটো বজায়

প্রথম পোল্যাণ্ড বিভাগ

রাখবেন এবং অন্যান্য ধর্মবলম্বীরা রোমান ক্যাথলিকদের মতই পোল্যাণ্ডে সমান অধিকার ভোগ করতে থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দেবার পর তবে তাঁকে ক্যাথারিন ও ফ্রেডারিক রাজপদে মনোনয়ন দেন। পোল্যাণ্ডের অভিজাতদের ডায়েট এর বিরোধিতা করলেও শেষে রুশ সৈন্যের অবস্থিতির জন্য তা মেনে নিতে বাধ্য হল।

দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল

ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডের অভিজাতদের মধ্যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল দেখা দিল। নব-নির্বাচিত রাজার দলে যে সব অভিজাত ছিল তাদের জারটোরিসকি বলা হত। আর যাঁরা এই দলের বিরোধী ছিলেন তাঁদের 'পোটকি' (Potoki) বলা হত। প্রথম দল পোল্যাণ্ডে রুশ-প্রাধান্য ও রোমান ক্যাথলিকদের সহিত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সমান অধিকার দাবি করত। শেষোক্ত দলটি রোমান ক্যাথলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার এবং দেশকে বিদেশী প্রভাব হতে মুক্ত করবার পক্ষপাতী ছিল।

পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাশিয়ার সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং ডায়েটের শক্তিহীনতার ফলে পোল্যাণ্ডের অভিজাত শ্রেণী ক্ষুব্ধ হল। তারা বিনা প্রতিবাদে এই অবস্থা স্বীকার করল না। তারা Confederation of Bar নামে একটি সংঘ স্থাপন করে বৈদেশিক আক্রমণকারী ও দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। ঠিক এই সময় ফ্রেডারিক দি গ্রেট ক্যাথারিনের নিকট পোল্যাণ্ড বিভাগের প্রস্তাব দিলেন। ক্যাথারিন সমগ্র পোল্যাণ্ড কুক্ষিগত করার চেষ্টায় ছিলেন বলে প্রথমে ফ্রেডারিকের এই প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না। অবশ্য কয় বৎসর পরই অবস্থার চাপে পড়ে তাঁকে ফ্রেডারিকের প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়।

দেশপ্রেমিকদের যুদ্ধ

পোল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিকগণ রুশ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু তারা পরাজিত হয় এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। রুশসৈন্য তাদের ধরবার জন্য তুরস্কের সার্বভৌম ক্ষুণ্ণ করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৭৬৮)। এই যুদ্ধ অচিরেই আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি করল। রুশ সৈন্য দানিয়ুব অঞ্চলে কয়েকটি তুর্কী প্রদেশ জয় করলে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া শংকিত হল এবং রাশিয়াকে সন্দেহের চোখে দেখল। এদিকে ফ্রান্স আগে হতেই রাশিয়ার বিরোধিতা করে আসছিল। তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই তৎপরতায় অষ্ট্রিয়া এতদূর বিচলিত হল যে সে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত জিপস (Zips) অঞ্চল দখল করে নিল এবং ফ্রেডারিক ও দ্বিতীয় জোসেফ এক বৈঠকে মিলিত হলেন। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মতিগতি দেখে ক্যাথারিন পোল্যাণ্ড বিভাগে রাজী হতে বাধ্য হলেন এবং ১৭৭২

পোল্যাণ্ডের
প্রথম ব্যবচ্ছেদ
১৭৭২
রাশিয়া
প্রাশিয়া
পঃ প্রাশিয়া
পোল্যাণ্ড
গ্যালিসিয়া
অস্ট্রিয়া
প্রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত
অস্ট্রিয়া কর্তৃক অধিকৃত
রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত
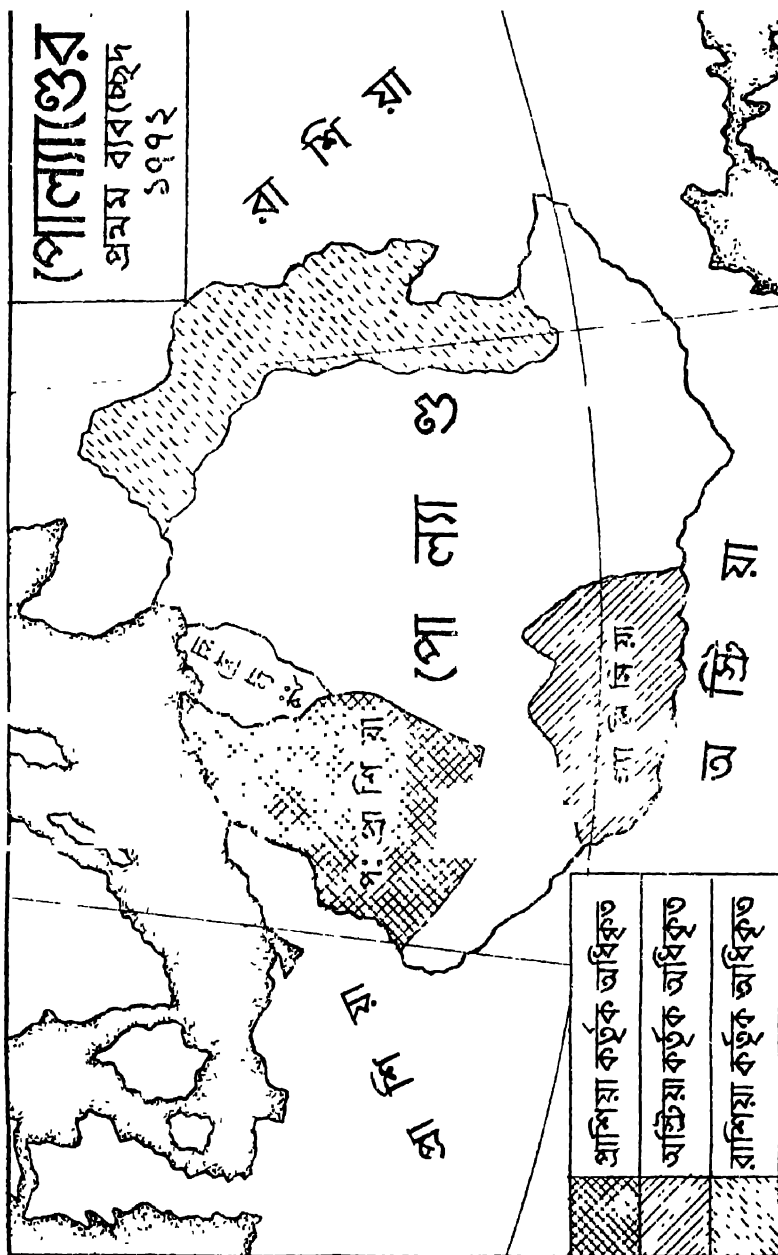
খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগেই রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদের চুক্তি স্থির হল এবং কয়েকমাস পরে সেণ্ট পিটার্সবার্গের সন্ধি দ্বারা এই চুক্তির শর্তগুলি বলবৎ হল।

প্রথম বিভাগের ফলাফল: (ক) পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদের ফলে প্রাশিয়া লাভ করল ড্যানজিগ ও থর্ন বাদে পশ্চিম প্রাশিয়া এবং গ্রেট পোল্যাণ্ড। (খ) রাশিয়া পেল হোয়াইট রাশিয়া এবং ডুইনা ও নীপার নদীর মধ্যবর্তী সব স্থানগুলি। এখানকার অধিবাসীরা অবশ্য প্রায় সকলেই লিথুয়ানিয়ান এবং শ্বেত রাশিয়ান ছিল।

প্রাশিয়ার ও রাশিয়ার লাভ

(গ) অষ্ট্রিয়া পেল পোডোলিয়া, স্যাণ্ডোমির ও ক্র্যাকাওর অঞ্চলবিশেষ সহ প্রায় সমগ্র রেড রাশিয়া এবং গ্যালেসিয়া।

অস্ট্রিয়া

প্রথম ব্যবচ্ছেদের ফলে পোল্যাণ্ড তার এক তৃতীয়াংশ ভূমি এবং অধিবাসীর অর্ধাংশ হারাল। পোল্যাণ্ডের ক্লীব ডায়েট এই জাতীয় সর্বনাশকে মেনে নিল।

পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদ রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া—এই তিন রাষ্ট্রের স্বার্থ-সংঘাতরূপ ক্ষতে সাময়িক প্রলেপ দিল। এর ফলে রাশিয়া দানিয়ুব অঞ্চল হতে সাময়িকভাবে হাত গুটিয়ে নিল। এতে অষ্ট্রিয়ার রুশভীতি কিছুটা কমলো। প্রাশিয়া পশ্চিম প্রাশিয়া পেয়ে খুব খুসী হল। এদিক হতে দেখলে এই ব্যবচ্ছেদের ফলে প্রাশিয়াই বেশি লাভবান হল। কারণ, পশ্চিম প্রাশিয়া কুক্ষিগত করার ফলে প্রাশিয়ার চির-আকাঙ্ক্ষিত ভৌগোলিক ঐক্য সম্পূর্ণ হল এবং সে শক্তি সঞ্চয়ের পথে এগিয়ে যেতে থাকল। পোল্যাণ্ডের প্রতি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ক্লীব নীতির সমর্থন করা যায় না। একটা স্বাধীন রাষ্ট্রকে এভাবে ভাগাভাগি করে নেবার বিরুদ্ধে এ দুটি রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। ফলে ভবিষ্যতে তারা আরও সাহসী হবে তা বোঝা গেল।

এটা অস্বীকার করা যায় না যে পোল্যাণ্ডের এই জাতীয় সর্বনাশের মূলে ছিল পোল্যাণ্ডের নিজস্ব দোষত্রুটি। আভ্যন্তরীণ কলহ, স্বার্থপরতা, মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থা দেশে এরূপ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে কৃষক সম্প্রদায় বিদেশী শাসনের ভয়াবহতা বুঝতে পারল না। ব্যবচ্ছেদের ফলে পোল্যাণ্ড আরও দুর্বল হল। পশ্চিম প্রাশিয়া হারিয়ে তার বাল্টিক যাবার পথ বন্ধ হল এবং যে গ্যালেসিয়া ছিল তার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী প্রদেশ তাও সে হারাল।

পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদ সমর্থনযোগ্য কিনা: ঐতিহাসিক হ্যাসল (Hassal)-এর মতে প্রথম ব্যবচ্ছেদ একটি মারাত্মক জাতীয় অপরাধ, আঠারো শতকের রাজনৈতিক প্রবণতার দৃষ্টান্ত, জাতীয়তাবাদকে চরম অবহেলা

করে পররাজ্য গ্রাসের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। ঐতিহাসিক হ্যাসলের অভিমত পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। স্থিরভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে প্রত্যেক যুগেই পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদের ন্যায় ঘটনা ঘটে এসেছে। অন্য রাজ্য কুক্ষিগত করা, বাজেয়াপ্ত করা এবং সংযুক্ত করার অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। আধুনিক যে সব রাষ্ট্র রয়েছে সেগুলির পূর্ব-ইতিহাস দেখলে এ সব দৃষ্টান্তের উদাহরণ মেলে। অতএব পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদ নতুন কিছু নয়।

পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদ পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়েছিল সন্দেহ নেই। এটা স্মরণ রাখতে হবে যে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসা প্রাশিয়া ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।

প্রথম ব্যবচ্ছেদের ফলে যে সব অঞ্চল পোল্যাণ্ডের নিকট হতে কেড়ে নেওয়া হল সেগুলি আসলে পোলিশ জনসাধারণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল না এবং পোলিশ ভাষাভাষী অঞ্চলও ছিল না। বিশেষ করে রাশিয়া যে অঞ্চল পায় তা কোনক্রমেই পোল্যাণ্ডের অঙ্গ বলে ধরা যেতে পারে না। অবশ্য পশ্চিম প্রাশিয়া সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা অনুচিত নয়।

উপসংহারে বলা যায় যে এ সত্ত্বেও পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বিশেষ করে রাশিয়া ও প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডে আভ্যন্তরীণ বিভেদ এবং স্বার্থান্ধতা ও মধ্যযুগীয় সামন্ত-দ্বন্দ্ব জিয়িয়ে রাখতে চাইল। তাদের এই ঘৃণ্যনীতি সর্বকালের নিন্দার যোগ্য।

ব্যবচ্ছেদে ক্যাথারিনের স্বীকৃতির যৌক্তিকতা: হ্যাসলের মতে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর প্রকারান্তরে পোল্যাণ্ড রাশিয়ার আওতায় চলে যায়; পনিয়াতুস্কিকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসিয়ে ক্যাথারিন অনায়াসে সমগ্র পোল্যাণ্ড তাঁর মাধ্যমে শাসন করতে পারতেন এবং ক্রমে ক্রমে গোটা দেশটাকে রাশিয়ার কুক্ষিগত করে নিতে সক্ষম হতেন। অন্যদিকে ব্যবচ্ছেদের ফলে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ক্ষমতা একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেল, অন্যদিকে পোলিশ জনসাধারণের মধ্যে রুশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হল এবং দানিয়ুব অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে বাধা পড়ল। অতএব প্রথম ব্যবচ্ছেদে মত দিয়ে ক্যাথারিন রাশিয়ার স্বার্থের হানি করেন। তাঁর মন্ত্রী প্যানিন এ বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে রাশিয়ার স্বার্থ সবচেয়ে রক্ষা হবে যদি পোল্যাণ্ডকে রাশিয়ার প্রভাবাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখা যায়। ক্যাথারিন মন্ত্রী প্যানিনের পরামর্শ উপেক্ষা করে প্রথম ব্যবচ্ছেদে মত দেন। অতএব আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে ক্যাথারিন ব্যবচ্ছেদে মত দিয়ে ভাল করেন নি। কিন্তু একটু

ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে অগ্রপশ্চাৎ ভেবেই ক্যাথারিন ব্যবচ্ছেদ মেনে নিলেন। কারণ অষ্ট্রিয়া দানিয়ুব অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তারে শঙ্কিত হয় এবং ক্যাথারিন যখন তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন অষ্ট্রিয়া পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত জিপস্ নামক অঞ্চলটি দখল করে নেন। এদিকে প্রাশিয়াও রুশ-বিরোধী হয়ে ওঠে। সে পশ্চিম প্রাশিয়ায় সৈন্য পাঠায়। ফ্রেডারিক-জোসেফ সাক্ষাৎকার রাশিয়ার পক্ষে অশুভসূচক বলে মনে হয়। ফ্রান্সও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ছিল। এমত অবস্থায় ক্যাথারিন যদি সমগ্র পোল্যাণ্ড এককভাবে গ্রাস করতে চাইতেন তা হলে তাঁকে এক বিরাট রাষ্ট্র-জোটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হত। অতএব মিলেমিশে পোল্যাণ্ড ভাগ করে নেওয়াই ক্যাথারিন সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলে মনে করলেন। এবং ঐরূপ পরিস্থিতিতে এছাড়া গত্যন্তরও ছিল না।

Q. 2. Tell the story of the second and the third Partitions of Poland. What were their results ?

Ans. **দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ** (১৭৯৩): প্রথম ব্যবচ্ছেদ পোলবাসীরা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয়নি। এই ব্যবচ্ছেদের পর পোল্যাণ্ডে সংস্কার আন্দোলন জোরদার হয় এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ঠিক এই সময় কয়েকটি আন্তর্জাতিক ঘটনা পোল্যাণ্ডের সংস্কার আন্দোলনকে সাহায্য করে—(ক) রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে পূর্বেকার মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন, (খ) ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের রুশ-তুর্কী যুদ্ধ, (গ) প্রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে রুশ-বিরোধী চুক্তি।

দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদ কিভাবে দেখা দিল

উপরিউক্ত ঘটনাগুলি পোলবাসীদের নিকট খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তারা রাশিয়ার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করতে উদ্যত হল। পোল্যাণ্ড প্রাশিয়ার সাথে সন্ধি স্থাপন করল এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করার ব্যাপারে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ডের সাহায্য পাবে বলে আশ্বস্ত হল। পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার প্রভাব নষ্ট করে এক শক্তিশালী পোল্যাণ্ড রাষ্ট্র যদি গড়ে ওঠে তাহলে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয়েই লাভবান হবে বলে তারা মনে করল। কারণ শক্তিশালী পোল্যাণ্ড রুশ-আক্রমণের প্রথম বলি হবে। এই সব ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে জাতীয় জীবন পুনরুদ্ধারের জন্য পোলবাসীরা প্রস্তুত হল। ১৭৮৮-তে সংস্কারপন্থী ডায়েট সর্বপ্রথম ওয়ারশতে মিলিত হল। ১৭৯১-তে কার্যকরী করা সম্ভব এরূপ একটি শাসনতন্ত্রের খসরা তৈরি করা হল। এই শাসনতন্ত্রের দ্বারা লিবেরাম ভিটো তুলে দেওয়া হল এবং যথার্থ ও সুদক্ষ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হল।
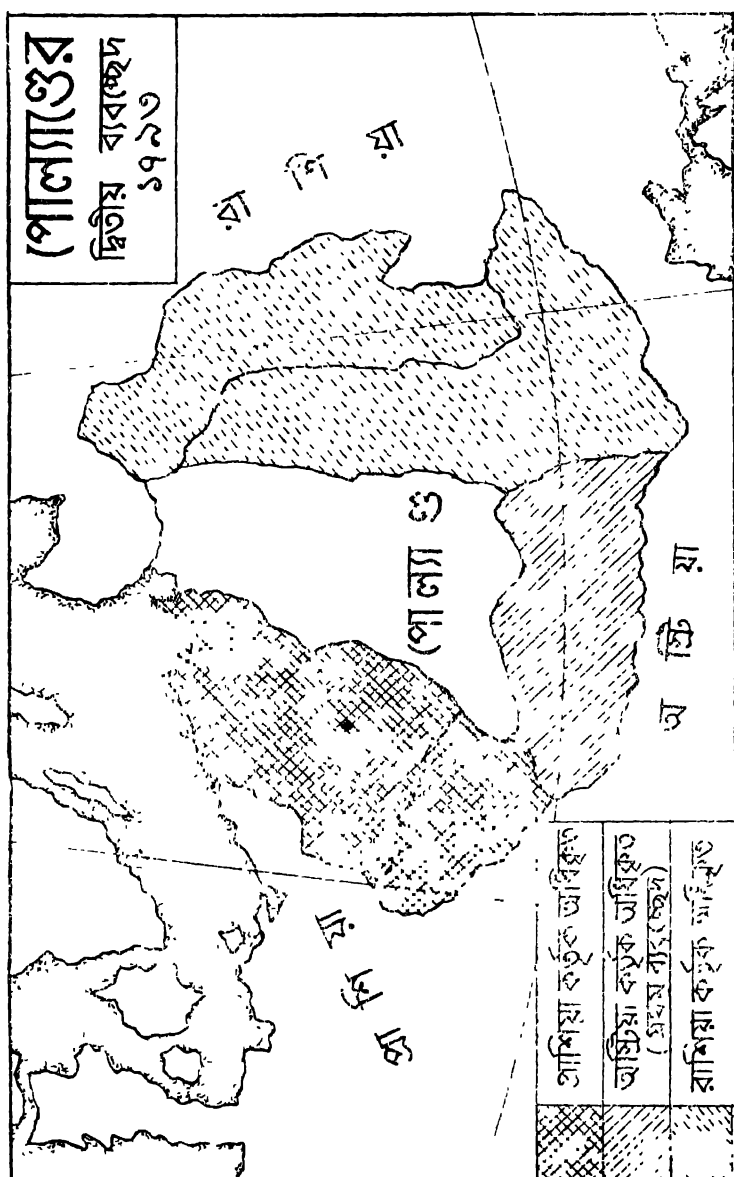
জাতীয়তাবাদী পোলবাসীদের এই আন্দোলন রাশিয়া কিন্তু বিদ্রোহরূপেই দেখল। এখন ক্যাথারিনের নীতি হল অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে ফরাসী বিপ্লবে ব্যস্ত রেখে পোলবাসীদের এই আন্দোলন সমূলে দমন করে বাদবাকী পোল্যাণ্ড গ্রাস করা। তাঁর

এই নীতি অনেকটা কার্যকরী হল। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া ফরাসী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং প্রাশিয়াও যোগ দেয়। এর ফলে পোলবাসীরা অষ্ট্রিয়ার প্রতিশ্রুত সাহায্য পেল না। সুযোগ বুঝে ক্যাথারিন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। এই আক্রমণের সময় পোল্যাণ্ডের আপামর জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না। একটি শক্তিশালী দল রাশিয়াকে সাহায্য করল। ক্যাথারিনের সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে আন্দোলনকারীরা পরাজিত হল এবং বাধ্য হয়ে ডায়েট শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন-গুলি বাতিল করে দিল। প্রাশিয়া পোলবাসীদের প্রতিশ্রুত সাহায্য ত করলই না, বরঞ্চ দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদে অংশীদার হল।

ফলাফল: পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদের ফলে প্রাশিয়া পেল ড্যানজিগ, থর্ন, পোজেন, জেরোসেন ও কালিস্কি।

রাশিয়া পেল পূর্ব পোল্যাণ্ড, লিটল রাশিয়া এবং পোডোলিতুস্কির অবশিষ্ট অংশ। এছাড়া, পোল্যাণ্ডের হতভাগ্য রাজা পনিয়াস্তোকি ক্যাথারিনের সঙ্গে এক অসম্মানজনক চুক্তি করতে বাধ্য হলেন। এই চুক্তিতে পোল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা বা রাশিয়ার অনুমতি ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিস্বাক্ষর করা নিষিদ্ধ বলে ঠিক হল।

দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদে রাশিয়া সর্বাপেক্ষা লাভবান হল। আর পোল্যাণ্ডের যেটুকু বাকী রইল তাও প্রকারান্তরে রাশিয়ার তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হল।

তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ (১৭৯৫): পোল্যাণ্ডের জাতীয়তাবাদীরা এই অপমান নীরবে সহ্য করল না। তারা 'কসিউস্কো' নামে জনৈক নেতার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাতে থাকল। তারা ওয়ারশতে ১৭৯১-এর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এক লোকায়ত সরকার স্থাপন করল। এমত অবস্থায় রাশিয়া পুনরায় সৈন্য পাঠাল। প্রাশিয়া সুযোগ বুঝে ফ্রান্সের ব্যাপার হতে সরে এল পোল্যাণ্ডে কিছু সুবিধা হতে পারে বলে। এদিকে পোলদের জাতীয় প্রতিরোধ প্রচেষ্টা বিধ্বস্ত হল। কসিউস্কো রাশিয়ার হাতে পরাজিত ও বন্দী হলেন। ওয়ারশ দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার পর আত্মসমর্পণ করল। জাতীয়তাবাদীদের এই পরাজয়ে পোল্যাণ্ডের চূড়ান্ত পরাজয় হল। এখন যে ব্যবচ্ছেদ হল তার ফলে ইউরোপের মানচিত্র হতে পোল্যাণ্ডের অস্তিত্বও নিশ্চিহ্ন হল।

কারণ ও ফলাফল

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পোল্যাণ্ডের তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ চূড়ান্তভাবে স্থির হল। এর ফলে—(ক) রাশিয়া ডুইনা নদী ও গ্যালেসিয়ার অন্তবর্তী অঞ্চল লাভ করল, (খ) অষ্ট্রিয়া পেল ক্রাকাউ ও গ্যালেসিয়ার যে সব অঞ্চল প্রথম ব্যবচ্ছেদে
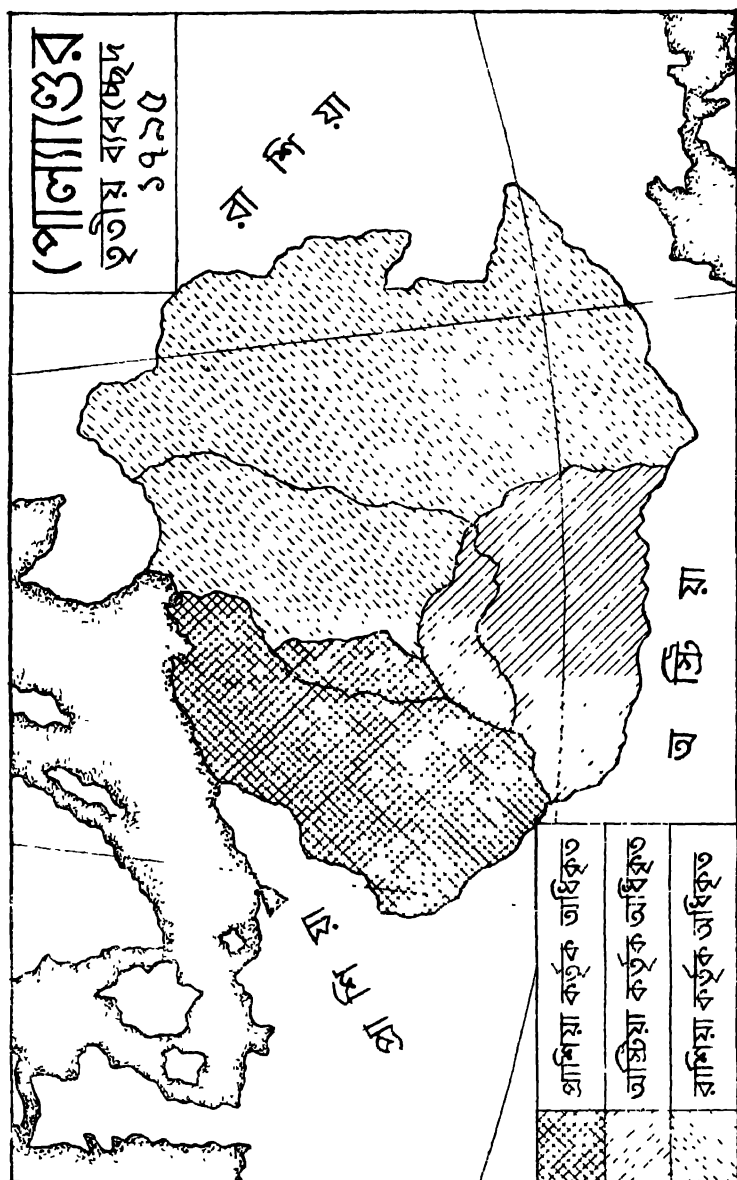
পায়নি সে সব অঞ্চল', (গ) প্রাশিয়া ওয়ারশ সমেত বাগ ও নী'মেন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল পেল।

তৃতীয় ব্যবচ্ছেদে সর্বাপেক্ষা লাভবান হল রাশিয়া। ১৭৯৩-এর সীমান্ত অপেক্ষা রুশ সীমান্ত এখন পশ্চিম দিকে ১০০ মাইল এগিয়ে এল।

Q. 3. What were the results of the Partitions of Poland ?

Ans. পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের ফলাফল আলোচনা করলে প্রথমেই পোল্যাণ্ডের কথা মনে আসে। তিনটি ব্যবচ্ছেদের ফলে পোল্যাণ্ড নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটির অবলুপ্তি ঘটল। পোলবাসীদের জীবনে চির অন্ধকার নেমে এল, স্বাধীনতার আস্বাদন হতে তারা বঞ্চিত হল। তবে কৃষকদেব অবস্থাব বিশেষ পরিবর্তন হল না। তারা আগেও যেমন দুর্বিষহ জীবন যাপন করে আসছিল বিদেশী প্রভুদের অধীনে তাদের অবস্থা সেইরূপই রইল। বরঞ্চ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের অধীনে থেকে তাদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হল। পোল অভিজাতশ্রেণীব অবস্থা সঙ্গীন হল। পূর্বেকার মত কৃষককূলকে শোষণ করতে তারা আর পারল না।

পোল্যাণ্ডেব দিক হতে

প্রাশিয়া পোলাণ্ডের যে অংশ পেল তার দ্বারা ব্রাডেনবার্গ ও পূর্ব-প্রাশিয়া সংযুক্ত হয়ে একটানা অঞ্চলে পরিণত হল।

রাশিয়ার পশ্চিম ইউরোপে প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ হল। রাশিয়ার সীমানা বাগ ও নী'মেন রেখা অবধি বিস্তৃত হল। এই সীমানা ১৭৬৩-এর সীমানা হতে ৩৫০ মাইল অধিক।

অন্যান্য রাষ্ট্রেব দিক হতে

অষ্ট্রিয়াও পূর্ব সীমান্তে শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হল এবং সাইলেসিয়া হারানোর শোক কিছুটা ভুলতে পারল। অবশ্য পূর্বাঞ্চলে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার স্বার্থসংঘাত বিশেষভাবে দেখা দিল। আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রত্রয় যতটা লাভবান হয়েছিল বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তারা ততটা লাভবান হয়নি। কারণ তাদের এই কার্য ঘৃণ্য বলে সকলে মনে করল। গিডেলা এই ব্যবচ্ছেদকে ইউরোপীয় কূটনীতির সর্বাপেক্ষা নির্লজ্জ এবং নিষ্ফল কায বলে অভিহিত করেছেন।

পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদে প্রাশিয়া, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া বিশেষ লাভবান হল না। প্রাশিয়াব অধিকারে পোল্যাণ্ডের যে অংশ এল তার ফলে তার ওপর অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে দুটি দীর্ঘ সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায় এবং দুটি সীমান্তে যুদ্ধ করবার চিরন্তন বিপদ দেখা দেয়। রাশিয়ার দিক দেখলে তার পক্ষেও এক বিরাট সীমান্ত রক্ষা করা দুঃসাধ্য হল, কারণ এই সীমান্ত ছিল সামরিক দিক হতে প্রতিকূল ও অকার্যকরী। পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ অষ্ট্রিয়ার পক্ষেও লাভজনক হয়নি। রাশিয়া ও

প্রাশিয়ার সম্প্রসারণের ফলে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বিপদ দেখা দিল। অষ্ট্রিয়ার সাথে প্রাশিয়ার মতবিরোধ দেখা দিল। পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ জোর যার মুল্লুক তার নীতির জন্ম স্থাপিত করল।

সতেরো শতকে বহু ঘোষিত আঞ্চলিক সার্বভৌম নীতিকে এর দ্বারা নস্যাৎ করা হল এবং ব্যাপকভাবে পররাজ্য গ্রাস নীতির ইন্ধন যোগাল। পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ প্রমাণ করল যে কোন রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ধারণে জনসাধারণের কোন হাত নেই; স্বেচ্ছাচারী শাসকগণই সর্বেসর্বা, তাদের কার্যাবলীই ইতিহাসকে তখন মুখর করে রেখেছে। উপসংহারে বলা যায় যে, পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের ফলে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার প্রত্যেকেই তাদের সীমানা বাড়াল সত্য, কিন্তু এর জন্য তাদের মূল্যও দিতে হল প্রচুর। বিশ্বাসঘাতকতার অসহ্য দুঃস্বপ্নের মধ্যে তারা দিন কাটাতে থাকল। পোলজাতি কোনদিন বিদেশীর আনুগত্য স্বীকার করেনি। তাদের এই আনুগত্যহীনতা পরিণামে রাষ্ট্রত্রয়ের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধার কারণ হয়েছিল।

More Questions with Hints

1. Examine the reasons for the partitions of Poland and estimate their importance in European history.

Ans. 1 ও 2 নম্বর প্রশ্নের আনুসাঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

2 Give an account of Poland's weakness which facilitated foreign aggression and the partitions of Poland.

Ans. 1 নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

3. Review the circumstances that led to the first partition of Poland. Can you justify it? Did Russia make a blunder in agreeing to the partition?

Ans. 1 নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

4. 'The destruction of Poland was the most shameless and barren act of European diplomacy.'—Discuss.

Ans. **নির্লজ্জ কেন**—পদানত পোল্যাণ্ডকে রাশিয়ার ব্যবচ্ছেদ করা কোন ক্রমেই উচিৎ হয়নি। এটি নির্লজ্জতার উদাহরণ। দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদের পূর্বে প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য দেবে বলেছিল কিন্তু তা না দিয়ে দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদে সে যোগ দেয় এবং পোল্যাণ্ডের অংশ-বিশেষ কুক্ষিগত করে। রাজ্য হারানোর শোক যে কি অষ্ট্রিয়া তা জানত। কিন্তু সেই অষ্ট্রিয়াই পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদে যোগ দিল।

নিষ্ফল কেন: রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া প্রকৃতপক্ষে লাভবান হল না। তারা পোল্যাণ্ডের অংশ-বিশেষ নিজ নিজ রাষ্ট্রভুক্ত করলেও পোলজাতি কোন দিন

বিদেশীর আনুগত্য স্বীকার করে নি। পোলদের জাতীয়তাবাদ পরিণামে এ রাষ্ট্র-গুলির পক্ষে অমঙ্গলজনক হয়।

5. How can you apportion the responsibility for the partitions of Poland ?

Ans. একটিমাত্র রাষ্ট্রকে পোলাণ্ড ব্যবচ্ছেদের জন্য দায়ী করা যায় না। তবে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে কে বেশি দায়ী ছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। আমরা জানি যে ক্যাথারিন প্রথমে পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন। তিনি সমগ্র পোল্যাণ্ড-রাশিয়ার অধীনে আনিতে চেয়েছিলেন। পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা প্রথম পেশ করেন ফ্রেডারিক দি গ্রেট। অবস্থার চাপে পড়ে ক্যাথারিন এ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। অবশ্য প্রথমে তিনি ফ্রেডারিকের ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা ব্যবচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন : 'লোকে আমাকে দুর্বল মনে করুক কিন্তু নীচ বলে যেন মনে না করে।' অতএব প্রথম ব্যবচ্ছেদের জন্য বেশি দায়ী ছিল প্রাশিয়া।

দ্বিতীয় ব্যবচ্ছেদের সময়েও প্রাশিয়া উদ্যোগী হয়। অবশ্য প্রাশিয়া যদি উদ্যোগী না হত তা হলে রাশিয়াই সমগ্র পোল্যাণ্ড গ্রাস করত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ তখনই সম্ভব হল যখন রুশ সৈন্য পোল্যাণ্ড প্রবেশ করে পোল জাতীয়তাবাদীদের প্রতিরোধ ধ্বংস করেছিল। অতএব দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবচ্ছেদের জন্য রাশিয়াই বেশী দায়ী এবং এই ব্যবচ্ছেদের ফলে সে বেশি লাভবান হয়।

ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ থেকে ব্যবচ্ছেদকে ত্বরান্বিত করেছিল।

অবশেষে পোলবাসীরাও এই ব্যবচ্ছেদের জন্য কম দায়ী ছিল না। তারা নিজের দেশে এরূপ অবস্থায় সৃষ্টি করেছিল যার ফলে বিদেশীরা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়।

Q. 6. Examine the reasons for the partitions of Poland and estimate their importance in European History.

Ans. **কারণ :** শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থা—বিদেশী রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সুযোগ—আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা—ডায়েটের সদস্যদের ক্ষমতা—ক্লীব রাজতন্ত্র—দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাব—কৃষকদের দুরবস্থা—সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখার অভাব—ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিরোধ—শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির লোভ ও স্বার্থ—ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে নিষ্ক্রিয় নীতি—প্রথম ব্যবচ্ছেদ—দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ।

ইউরোপের ইতিহাসে তাৎপর্য : পোল্যাণ্ডের অবলুপ্তি ইউরোপের ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ ঘটনা। দুর্বল পোল্যাণ্ডকে বিভক্ত করে রাশিয়া, প্রাশিয়া

ও অষ্ট্রিয়া প্রমুখ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক অপরাধই শুধু করল না, এক জঘন্য উদাহরণ স্থাপন করল, উনিশ এবং বিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে যেটি বারবার লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের যে সব রাষ্ট্র আগ্রাসী নীতির পক্ষপাতী ছিল তারা পোল্যাণ্ডের ব্যবচ্ছেদ হতে উৎসাহ লাভ করল এবং অন্য রাষ্ট্রের রাজ্যখণ্ড গ্রাস করবার জন্য তৎপর হল। উনিশ শতকের নিকট-প্রাচ্য সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিলেই এটি দেখা যায়। দুর্বল তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ গ্রাস করবার জন্য শক্তিশালী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বিশেষভাবে চেষ্টা করল, যার ফলে এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যবচ্ছেদ ফরাসী বিপ্লবীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদে ব্যস্ত থাকায় বিপ্লবীদের পক্ষে আত্মসংগঠনে সুবিধা হয়।

তৃতীয়তঃ, পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদকারী রাষ্ট্রত্রয়ের পক্ষে পোল্যাণ্ডের বিভক্তিকরণ শুভ ফলদায়ক হয়নি। রুশ-জার্মান সীমান্ত পাশাপাশি হওয়ার ফলে অদূর-ভবিষ্যতে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। অষ্ট্রিয়া নিজ রাজ্যে বহু জাতির সমস্যা নিয়ে আগে হতেই বিব্রত ছিল। বিপ্লবী পোল জাতির ওপর আধিপত্য স্থাপন করে নিজ সমস্যাকে সে আরও বাড়াল। সুতরাং কি প্রাশিয়া, কি রাশিয়া, কি অষ্ট্রিয়া—প্রত্যেকের পক্ষেই পোল্যাণ্ড-ব্যবচ্ছেদ অবিবেচনার কাজ হয়েছিল।

চতুর্থতঃ, পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের ফলে ইউরোপের মানচিত্র হতে পোল্যাণ্ডের নাম মুছে গেলেও পোলবাসীদের স্বাধীনতা-স্পৃহা নষ্ট হল না, বরঞ্চ আরও জোরদার হল। বিপ্লবী পোলবাসীরা মুছে-যাওয়া পোল্যাণ্ডেই স্বাধীনতা আন্দোলন জিয়িয়ে রাখল না, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করল। উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে পোলিশ জাতীয়তাবাদ এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। অষ্ট্রিয়া, রাশিযা, বল্‌কান অঞ্চল, ইটালি, জার্মানি প্রভৃতি দেশে যে সব প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা যায় সেগুলিতে বিতাড়িত পোল নেতাদের অবদান অল্প ছিল না।

বিশ শতকের ইউরোপের মানচিত্রে পোল্যাণ্ডের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এখন পোল্যাণ্ড একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এতে হতে বোঝা যায় রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ নীতি কত ভ্রান্ত ছিল। ইতিহাস পোল্যাণ্ডের অবলুপ্তি মেনে নেয়নি, কারণ জাতীয়তাবাদী পোলরা তাদের স্বাধীনতার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তাদের এই সংগ্রাম ইউরোপের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

দশম অধ্যায়

বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের ইতিহাস (১৭৪০-১৭৮৯)

ফরাসী বিপ্লব

1. Review the foreign policy of France from 1763 to 1789.

Ans. সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ-শেষে ফ্রান্সের সম্মান ও প্রতিপত্তি কমে গেল। ফ্রান্স ইউরোপে শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে আর বিবেচিত হল না। প্যারিসের চুক্তিটি ফ্রান্সের নিকট হৃদয়বিদারক এবং অসম্মানজনক বলে মনে হল। অতএব এই চুক্তিটি যাতে শীঘ্র বাতিল হয়ে যায় তার জন্য সে চেষ্টা করল। এই চেষ্টা পররাষ্ট্রনীতিতেই বিশেষ ভাবে ফুটে ওঠে। অষ্ট্রিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ফ্রান্স যে ভুল করেছিল তা সে বুঝতে পারল। তবে অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতামূলক সম্পর্ক সে তাড়াতাড়ি ছিন্ন করতে পারল না। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স পুনরায়-অষ্ট্রিয়া বিরোধী নীতি গ্রহণ করে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

ভূমিকা

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের পর ফরাসী কূটনীতি পুনরায় তৎপর হল। ইউরোপীয় রাজনীতিতে তার হারানো স্থান পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চললো। এই প্রচেষ্টার পিছনে ছিল চয়সিউল (choiseul) ও ভার্গেনিসের (Vergennes) অক্লান্ত কর্মোদ্যগ। প্রকারান্তরে ১৭৬৩ হতে ১৭৮৭ পর্যন্ত এই দুজন কূটনীতিজ্ঞ ফরাসী পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেন। চয়সিউল ১৭৬৩ হতে ১৭৭০ পর্যন্ত পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান ছিলেন। তাঁর পতনের পর ভার্গেনিস পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্ণধার হন।

চয়সিউলের নীতি

ক্ষয়িষ্ণু ফরাসী রাজতন্ত্রকে তাঁরা জোরদার পররাষ্ট্র নীতির দ্বারা কিছুদিন টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে চয়সিউল পররাষ্ট্র দপ্তরের কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সে সময় ফ্রান্সের অবস্থা খুবই শোচনীয়। সপ্তবর্ষ যুদ্ধের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সে পরাজয় বরণ করেছে। তবুও চয়সিউল চেষ্টা করলেন এই যুদ্ধে ফ্রান্সের ভাগ্য ফেরাতে। তাঁর চেষ্টাতেই স্পেন ফ্রান্সের হয়ে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে যোগ দিল। তাঁর চেষ্টায় অষ্ট্রিয়া তার নীতি পরিবর্তন করলো যাতে ফ্রান্সের কিছুটা লাভ হল।

কুটনীতিক বিপ্লবের পর পোলাণ্ডের অভিজাত শ্রেণীদের মধ্যে ফরাসী প্রভাব

লোপ পায়। চয়সিউল পোল্যাণ্ডের বিষয়ে যে নীতি গ্রহণ করলেন, তার ফলে ফরাসী কূটনীতি পুনরায় সক্রিয় হল। তিনি রুশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য করতে মনস্থ করলেন এবং কনফেডারেসি অব বার (Confederacy of Bar) কে অর্থ ও লোকবল দিয়ে সাহায্য করেন। ফলে ফরাসী দেশপ্রেমিকরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সাহসী হন। কিন্তু ঠিক এই সময়ে (১৭৭০) অপদার্থ পঞ্চদশ লুই তাঁর চাটুকারদের কথা শুনে চয়সিউলকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। তাঁর অপসারণের ফলে পোল্যাণ্ডের প্রথম ব্যবচ্ছেদ ত্বরান্বিত হল।

চয়সিউল অস্ট্রিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পছন্দ করতেন না। এর বদলে তিনি বুরবোঁ রাজাদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। জেসুইটসদের ক্ষমতা চূর্ণ করতে তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন এবং পরিশেষে তিনি সফলতাও লাভ করেন। এ বিষয়ে অন্যান্য বুরবোঁ রাজারাও তাঁর নীতি অনুসরণ করেন এবং এই শক্তিশালী ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের দলটিকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

ফ্রান্সকে নৌবলে শক্তিশালী করবার জন্য চয়সিউল চেষ্টা করেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে ইংল্যাণ্ডই ফ্রান্সের প্রধান শত্রু। ফ্রান্সের অধীনে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তিনি ভালভাবে সুরক্ষিত করবার চেষ্টা করেন। চয়সিউলের নিরলস কর্ম প্রচেষ্টার ফলে ফরাসী নৌবাহিনী আবার শক্তিশালী হয়ে উঠল।

হল্যাণ্ডের প্রতি চয়সিউল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং ইংল্যাণ্ডের আওতা হতে হল্যাণ্ডকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। হল্যাণ্ডের ক্ষমতাশালী বার্গার পার্টি ফ্রান্সের সাথে হল্যাণ্ডের মৈত্রীমূলক চুক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করলে এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হয়।

চয়সিউল ফ্রান্সের রাজ্য বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে লরেন নামক স্থানটি ফ্রান্সের অধীনে আসে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে চয়সিউল জেনোয়ার নিকট হতে কর্সিকা দ্বীপটি কিনে নেন। এখানেই নেপোলিয়ান ফরাসী নাগরিক হিসেবে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের রুশ-তুর্কী যুদ্ধেও চয়সিউল সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির পৃষ্টপোষকতা করবার যে নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন তার ফলেই তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে দাঁড় করাতে চাইলেন। এর পিছনে অবশ্য তাঁর অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ভেবেছিলেন ইউ-রোপের পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ বাধাতে পারলে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া ব্যস্ত থাকবে, তখন

ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের সাথে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। অবশ্য চয়সিউলের তুরস্ক-নীতি বিশেষ কার্যকরী হয়নি।

ক্ষমতা হতে চয়সিউলের হঠাৎ অপসারণের ফলে ফরাসী পররাষ্ট্র নীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা বোঝা যায় ইংল্যাণ্ড ও স্পেনের মধ্যে কয়েকটি দ্বীপের মালিকানা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। স্পেন ফ্রান্সের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে আসছিল কিন্তু চয়সিউল ক্ষমতায় না থাকায় সে সাহায্য স্পেন পেল না। স্পেনকে ফ্রান্স সাহায্য দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পঞ্চদশ লুই সে প্রতিশ্রুতি রাখলেন না।

ভার্গেনিসের নীতি: ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতির পরিচালক হলেন ভার্গেনিস। তিনি তের বছর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর আগে তিনি তুরস্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশে ফরাসী রাজদূত ছিলেন। তিনি পররাষ্ট্র নীতিতে চয়সিউলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া এই ছিল তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ভার্গেনিসের চেষ্টায় ফ্রান্স যোগদান করে। এই যুদ্ধে যোগদানের একমাত্র কারণ ছিল ইংরেজদের প্রতি ঐকান্তিক ঈর্ষা এবং প্রতি-শোধ গ্রহণের অদম্য উৎসাহ। ফ্রান্স হতে অজস্র স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে পাঠানো হল। এই সাহায্য পেয়ে ঔপনিবেশিকরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভালভাবে যুদ্ধ করতে পারল। এছাড়া ফ্রান্সের নৌবহর বৃটিশ ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করল। এমনকি ফরাসী নৌসেনাপতি সাঁফ্রে মহীশূরের হায়দর আলিকে সাহায্যের জন্য মনস্থ করলেন। ফলে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা সাময়িকভাবে সঙ্গীন হল। ইংল্যাণ্ড বাধ্য হয়ে ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা মেনে নিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিস চুক্তির দ্বারা ফ্রান্স সেণ্টলুসিয়া, সেণ্ট পিয়েরে, টোবাগো, সেনিগাল এবং গোরী পেল। ডানকার্কে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়বার হারানো অধিকার ফিরে পেল।

ভার্গেনিসের আমলে ফ্রান্সের সাথে অষ্ট্রিয়ার মৈত্রীমূলক সম্পর্ক বজায় থাকলেও এই সম্পর্ক শিথিল হতে থাকে। ব্যাভেরিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করল না। ফ্রান্সের বক্তব্য হল অষ্ট্রিয়ার সাথে ১৭৫৬-৫৭তে যে চুক্তি ফ্রান্স করেছিল তা হল আত্মরক্ষামূলক, আক্রমণাত্মক নয়। আবার ১৭৮৪তে দ্বিতীয় জোসেফ যখন শেলড নদীর ওপর অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হন এবং মেনস্ট্রিচ হল্যাণ্ডের নিকট হতে কেড়ে নিতে চাইলেন তখন ভার্গেনিস প্রকাশ্যে অষ্ট্রিয়ার এই আগ্রাসী নীতির সমালোচনা করেন। ফ্রান্সের এই মনোভাবের জন্য

জোসেফ মেনসৃষ্টিচের ওপর তাঁর দাবী ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভার্গেনিস হল্যাণ্ডের সাথে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ফলে হল্যাণ্ডে ফ্রান্সের প্রভাব বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে হল্যাণ্ড ফ্রান্সের চিরশত্রু ছিল সেই হল্যাণ্ডকে মিত্রতে পরিণত করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। আর এর সবটুকুই ভার্গেনিসের প্রাপ্য। তাঁর এই নীতি ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে বিশেষ আঘাত হানল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ভার্গেনিস দেহত্যাগ করেন এবং ফ্রান্স তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এমন জড়িয়ে পড়ে যে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সে বিশেষ নজর দিতে পারল না।

Q. 2. Make a critical assessment of the reign of Louis XV of France.

Ans. দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্দশ লুই পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যু ইউরোপ তথা ফ্রান্সের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর শাসনকালে রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ফ্রান্স ইউরোপের রাজনীতিতে সাময়িকভাবে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। তাঁর আগ্রাসী নীতির ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে যায় এবং বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তার সামরিক খ্যাতি ম্লান হয়ে আসে। ফ্রান্সের এই চরম দুর্দিনে তাঁর মৃত্যু ঘটল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পাঁচ বছরের পৌত্র লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি পঞ্চদশ লুই নামে পরিচিত। তিনিও দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন এবং তাঁর কুশাসনের ফলে ফ্রান্স বিপ্লবের পথে অনেকটা এগিয়ে গেল।

ভূমিকা

পঞ্চদশ লুই-এর নাবালক অবস্থায় তাঁর খুল্লতাত পুত্র ডিউক অব অর্লিয়েন্স রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ লুই স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন।

চরিত্র : পঞ্চদশ লুই উচ্ছৃঙ্খল এবং বিলাসপ্রিয় নরপতি ছিলেন। রাজকার্যে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। ভার্সাই প্রাসাদে আমোদপ্রমোদ-এ দিন কাটাতে ভালবাসতেন; চাটুকারদের কুপরামর্শ অনুযায়ী মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করতেন এবং তাদের হাতে শাসনকার্য ছেড়ে দিয়ে বিলাসব্যসনে কালাতিপাত করতেন। তাঁর অমিতব্যয়িতা ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে দিল। ফ্রান্স দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হল।

পররাষ্ট্র নীতি : তাঁর রাজত্বকালের প্রথমদিকে কার্ডিন্যাল ফ্লিউরি নামে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি দেশের আর্থিক সমস্যার সমাধান সাময়িকভাবে করতে সক্ষম হন। পররাষ্ট্র নীতিতে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল শান্তি রক্ষা করা, যুদ্ধে জড়িয়ে না পরা। অবশ্য তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার যুদ্ধে এবং পরে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে যোগ দেয়। ফ্রান্স অবশ্য এর আগে মেরিয়া থেরেসার পিতা ষষ্ঠ চার্লসকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা মেরিয়া থেরেসাকে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে প্রকৃত দাবিদার বলে ফ্রান্স মেনে নেবে। ফ্লিউরি এই প্রতিশ্রুতি রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন কারণ তিনি যুদ্ধ চাই ছিলেন না। কিন্তু তাঁর প্রভাব ইতিমধ্যে কমে এসেছে বেলেসলি তখন রাজপ্রাসাদের শক্তিশালী চক্রের পরম বিশ্বাসী নেতা। তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাইলেন এবং ফ্লিউরিকে তা গ্রহণ করতে হল। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ফ্লিউরির মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে ফ্রান্স হতে রাজনৈতিক বিজ্ঞতাও যেন বিদায় নিল। ফ্লিউরির মৃত্যুর পর মারকুইস এ্যারগনসন পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধান হলেন। তিনি অবাস্তববাদী ছিলেন। তাছাড়া পঞ্চদশ লুই পররাষ্ট্র ব্যাপারে তাঁর কথাই শুনতেন না, বিভিন্ন দল, উপ-দলের পরস্পরবিরোধী নীতিও গ্রহণ করতেন। ফলে এ্যারগনসনের পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারেনি। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। ১৭৪৮-এ এয়লা শ্যাপেলের সন্ধির ফলে ইউরোপে শান্তি ফিরে আসে। ১৭৪৮ হতে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতি কার দ্বার পরিচালিত হতে থাকে তা বলা শক্ত। এবিষয়ে রাজার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন ব্রগলি ও কন্টি। ম্যাডাম পম্পাডুরও এই সময় হতে তাঁর বিশেষ প্রীতিভাজন হন। যদিও তাঁর পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল না। তবে কে কে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করবে তা তিনি ঠিক করতেন। তাঁর কথা মতই পঞ্চদশ লুই মন্ত্রী ও রাজকর্মচারী নিযুক্ত বা পদচ্যুত করতে লাগলেন। প্রথমে বার্নিস ও পরে চয়সিউলকে পররাষ্ট্র ব্যাপারে ম্যাডাম পম্পাডুর পছন্দ করেন। বার্নিসের আমলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল অষ্ট্রিয়ার সাথে মৈত্রীমূলক চুক্তি। এর ফলে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত হল এবং অষ্ট্রিয়ার স্বার্থে ইউরোপের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে চয়সিউল ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হন এবং ফ্লিউরির পর তিনিই দৃঢহস্তে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করবার সুযোগ পান। চয়সিউল দৃঢচেতা ও বহুগুণান্বিত পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ফরাসী সরকার সবদিক হতে এরূপ দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল যে

দুর্বল নীতি

চয়সিউলের মত পররাষ্ট্র মন্ত্রীও ফ্রান্সকে পরাজয়ের হাত হতে রক্ষা করতে পারল না।

আভ্যন্তরীণ নীতি : আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার ফলে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অবশ্য রাজপ্রাসাদের রাজনীতি বিশেষ দায়ী ছিল না। ধর্মীয় ব্যবস্থা ও অর্থ নৈতিক অবস্থা আভ্যন্তরীণ নীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

পঞ্চদশ লুই স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে সমাজে চার্চের ক্ষমতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম স্তম্ভ ছিল চার্চ। কিন্তু পঞ্চদশ লুই-এর আমলে ফরাসী সমাজে চার্চের পূর্বের ন্যায় ক্ষমতা ছিল না। ধর্মযাজকদের মধ্যেও

চার্চ সম্বন্ধীয়

বিভেদ দেখা দেয়। ফলে দার্শনিক ও অন্যান্যদের সমালোচনার বিরুদ্ধে যাজক সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়াতে পারল না। এই সময় জেসুইটদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হল। পঞ্চদশ লুই বাধ্য হয়ে জেসুইটদের ফ্রান্স হতে বিতাড়িত করলেন এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল।

ধর্মীয় ক্ষেত্রের ন্যায় আর্থিক ক্ষেত্রেও পঞ্চদশ লুই দুর্বলতার পরিচয় দেন। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পার্লামেণ্ট অব প্যারিস ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করে।

আর্থিক ক্ষেত্রে

১৭৪০ হতে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই প্রচেষ্টা বেশ জোরদার হয়। এই সময় ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে এবং আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়। অর্থমন্ত্রী কয়েকটি ব্যাপক সংস্কারের দ্বারা এই অবস্থার উন্নতি করবার চেষ্টা করেন এবং একটি নতুন কর (ভিংটেমি) প্রবর্তন করতে প্রয়াসী হন। এই করটি সর্বশ্রেণীর ওপর বসান হবে বলে ঘোষণা করা হয়। অভিজাত ও যাজক শ্রেণী এর বিরোধিতা করেন কারণ তারা কোনরূপ কর দিত না। ফলে দুর্বলচিত্ত পঞ্চদশ লুই এই কর হতে তাদের রেহাই দিলেন। ফলে ফ্রান্স বিপ্লবের পথে কিছুটা এগিয়ে গেল।

পঞ্চদশ লুই-এর সময় ফ্রান্সের সমাজব্যবস্থা আরও ক্রটিপূর্ণ হয় এবং শ্রেণী সংঘাতও বাড়তে থাকে। পঞ্চদশ লুই এই ক্রটিগুলি দূর করবার কোন চেষ্টাই করেননি।

পঞ্চদশ লুই আর্থিক দুর্গতি হতে বাঁচবার জন্য জাতীয় ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি করতে থাকলেন। ঋণকেই তিনি আয়ের পথ মনে করলেন। এই ব্যবস্থা আপাত সুবিধাজনক মনে হলেও পরিণাম যে শংকাজনক তা তিনি বুঝেছিলেন। 'আমার মৃত্যু পর্যন্ত

সব টিকে থাকবে' এর সাথে সুর মিলিয়ে ম্যাডাম পম্পাডুর বলতেন—'আমাদের পর মহাপ্লাবন দেখা দেবে'। আর সত্য সত্যই তাঁদের মৃত্যুর পর বিপ্লবরূপী মহাপ্লাবন দেখা দিল।

Q. 3. Give an account of the various reforms attempted in France by Louis XVI. Why did these attempts fail ?

Ans. পঞ্চদশ লুই-এর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র ষোড়শ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি জনসাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং

চারিত্রিক দুর্বলতা

ফ্রান্সের দুরবস্থা দূর করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কিন্তু ফ্রান্সের তৎকালীন জটিল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য যে প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার প্রয়োজন ছিল তা তাঁর মধ্যে ছিল না। মানসিক জড়তাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। যুক্তিসম্মত সুনির্দিষ্ট কোন নীতি তিনি উদ্ভাবন করতে পারতেন না। উপরন্তু শাসনব্যাপারে তিনি তাঁর স্ত্রী মেরী এন্টয়নেটের দ্বারা পরিচালিত হতেন। ফ্রান্সের তখন প্রয়োজন ছিল অভিজাতদের বিশেষ সুবিধাবলী নষ্ট করা, অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য রদ করা, সামাজিক বৈষম্য দূর করা, কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করা এবং

বিভিন্ন সমস্যা

রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় বের করা। এগুলি বাস্তবে পরিণত করতে গেলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হত অভিজাত শ্রেণী। এ কারণে তারা লুই-এর সংস্কার ও সদিচ্ছার বিরুদ্ধে স্বভাবতই প্রবল বাধা দিতে ইচ্ছুক হল। আর তাদের দলে ছিলেন স্বয়ং মেরী এন্টয়নেট। একারণে লুই-এর নিকট মূল সংস্কার সাধন অসম্ভব বলে মনে হল।

ষোড়শ লুই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেন। ফ্রান্সের আর্থিক-সংকট

ষোড়শ লুই-এর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করবার প্রচেষ্টা

তখন চরমে উঠেছে। জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল। ষোড়শ লুই-এর সংস্কারক বা জাতির ত্রাতা হবার মত যোগ্যতা ছিল না। তবুও তিনি ফ্রান্সকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা করবার জন্য তুর্গো (Turgot)-কে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করলেন। তুর্গো অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা

তুর্গো

করেন। তিনি শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাপারে অবাধ নীতি গ্রহণ করেন। তিনি গিল্ড উঠিয়ে দিলেন এবং কৃষকদের ওপর বিশেষ করও তুলে দিলেন। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের ওপর কর বসাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তুর্গোর বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদীরা আন্দোলন শুরু করে। এবং মেরী এন্টয়নেটের মধ্য দিয়ে রাজার ওপর প্রভাব বিস্তার করল। ফলে দুর্বলচিত্ত ষোড়শ লুই

তুর্গোকে পদচ্যুত করেন। তুর্গো এই সময় রাজাকে বলেছিলেন। 'মনে রাখবেন স্যার ইংল্যাণ্ডের প্রথম্ চার্লসের দুর্বলতাই তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল।' তুর্গোর পদচ্যুতির সংবাদ পেয়ে ভলটেয়ার অভিমত প্রকাশ করেন 'এখন তুর্গো চলে যাবার পর আমার সামনে কেবল মৃত্যুই দেখছি'। তুর্গোকে পদচ্যুত করে ষোড়শ লুই নেকারকে অর্থসচিব নিযুক্ত করেন। নেকার তুর্গোর মত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী না হলেও তিনি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের দ্বারা ফ্রান্সকে আপাততঃ দুর্ভাগ্যের হাত হতে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। তিনি তুর্গোর পথ অনুসরণ করে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে এগুতে থাকেন এবং অনাবশ্যক ব্যয় বন্ধ করে রাজকোষের অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য কার্যকরী করার আগেই আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ইংরেজদের প্রতি ঐকান্তিক ঈর্ষা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের একটা অদম্য উৎসাহের জন্য ঔপনিবেশিকদের অর্থ ও জনবল দিয়ে সাহায্য করল। ফ্রান্সের পক্ষে কিন্তু এই যুদ্ধে যোগদানের নীতি ফ্রান্সের নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হল। তার আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হল। ফ্রান্সের আর্থিক কাঠামোতে বহু আগে হতেই ঘুণ ধরেছিল, এখন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার ফলে এই ভঙ্গুর কাঠামোর ওপর শেষ আঘাত হানল। অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করবার জন্য নেকার বিত্তশালী নাগরিকদের ওপর কর বসাতে চাইলেন এবং রাজসভার ব্যয়সংকোচের প্রস্তাব দিলেন। ফলে অভিজাত শ্রেণী ও রাণী এণ্টয়নেট তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। অবশেষে ষোড়শ লুই নেকারক পদচ্যুত করতে বাধ্য হন।

নেকার

নেকারের পদচ্যুতির পর রাজস্ববিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ক্যালোনি। তিনি সর্বনাশা সুদের হারে ঋণ নিয়েও আয়ব্যয়ের সমতাসাধন করতে পারলেন না। ১৭৮৬ তে তিনি দেখলেন যে জাতীয় ঋণের সুদ দেওয়ার মত অর্থ ও রাজকোষে নেই। কোন উপায় না দেখে তিনি অভিজাত শ্রেণীর ওপর কর বসাবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে রাজাকে জানালেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ষোড়শ লুই ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল অব নোটেবলস্ এর অধিবেশন ডাকলেন। এই সভার অধিবেশনে ক্যালোনি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করবার জন্য কয়েকটি আশু ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেন, যেমন, রাজসভার ব্যয়সংকোচ, অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর ওপর কর স্থাপন, বেগার খাটানো বন্ধ করা, আভ্যন্তরীন শুল্ক প্রাচীর তুলে দেওয়া ইত্যাদি। এই সভার বৈঠকে কিছুই হল না। অভিজাতশ্রেণী নিজেদের সুবিধাগুলি ছাড়তে রাজী

ক্যালোনি

হল না, বরঞ্চ ক্যালোনির পদত্যাগ তারা দাবি করল। অবশ্য এই সভা কর স্থাপনের প্রশ্নটি স্টেটস্ জেনারেলের নিকট প্রেরণ করবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিল।

ব্রিয়ান

ক্যালোনির পর ব্রিয়ান নতুন অর্থমন্ত্রী হলেন। তিনি জনসাধারণকে মিষ্টি কথা ও ভূয়া আশ্বাস দিলেন। কিন্তু জনমত আর এতে ভুলল না। পার্লামেণ্ট অব্ প্যারিস্ নামক যে বিচার সভা ফ্রান্সে ছিল সেটি কর আদায়ের জন্য নতুন রাজকীয় আদেশ অনুমোদন করতে অস্বীকার করল। এবং ঘোষণা করল যে স্টেটস জেনারেল ছাডা আইন অনুযায়ী কর স্থাপনের অধিকার কারও নেই। এর ফলে রাজা পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন। কিন্তু জনসাধারণ প্রতিবাদ জানাল এবং স্টেটস্ জেনারেল দাবি করল। ষোড়শ লুই বাধ্য হয়ে এই দাবি মেনে নিলেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় নেকারকে অর্থমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করলেন এবং স্টেটস্ জেনারেল মহাসভা গঠনের জন্য নির্বাচনের আদেশ দিলেন। ১৭৫ বছর পরে নতুন করে স্টেটস্ জেনারেল ডাকা হল।

স্টেটস্ জেনারেল আহ্বান, ১৭৮৮

...এর স্বরূপ

স্টেটস্ জেনারেল সভা বরাবর যাজক, অভিজাত ও জনসাধারণ—এই তিন শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হত। প্রত্যেক স্টেটের একটি করে ভোট ছিল। এবং প্রত্যেক স্টেট পৃথক ভাবে বসত। আগেকার দিনে রাজাকে পরামর্শ দেওয়া এই সভার প্রধান কাজ ছিল।

Q. 4. Was Louis wise in summoning the States General ?

স্টেটস জেনারেল সভা ডাকার যৌক্তিকতা

Ans. ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ষোড়শ লুই যখন পনের বছর চেষ্টা করেও দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে পারলেন না তখন বাধ্য হয়ে তিনি ফরাসী জাতির নিকট আবেদন জানালেন এবং স্টেটস জেনারেল নামক মহাসভা আহ্বান করলেন। ফলে রাজা অজ্ঞাতসারে দৈবস্বত্ব শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করলেন।

একারণে কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক স্টেটস জেনারেলর আহ্বানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ফ্রান্সের ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে স্টেটস জেনারেলের আহ্বানই ফরাসী বিপ্লবের সূচনা করে। এদিক হতে দেখলে মনে হবে যে স্টেটস জেনারেল আহ্বান করে লুই খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি। ঐতিহাসিকদের এই অভিমত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা মেনে নিলে ফরাসী বিপ্লব যে সব কারণে

ঘটেছিল সেগুলির কোন মূল্য থাকে না এবং সহজভাবেই তাহলে মেনে নিতে হয় যে স্টেটস জেনারেল না ডাকলে ফ্রান্সে বিপ্লব হত না। আমরা জানি বিপ্লব তখনই দেখা দেয় যখন সমাজে অসামঞ্জস্য প্রকট হয়। ফরাসী সমাজে এটি পরিপূর্ণভাবে দেখা দিয়েছিল এবং স্টেটস জেনারেল আহ্বান না করলেও ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দিত।

দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থার কথা মনে করলে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে লুই স্টেটস জেনারেল আহ্বান করেছিলেন শেষ অবলম্বন হিসেবে।

তৃতীয়তঃ, লুই যদি স্টেটস জেনারেল না ডাকতেন তাহলে তাঁকে অন্য কোন বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করতে হত। যেমন জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণজনক বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করতে হত। কিন্তু তাঁর মত দুর্বল চরিত্রের লোকের পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব ছিল। এ কারণেই তিনি স্টেটস জেনারেল আহ্বান করলেন।

চতুর্থতঃ, স্টেটস জেনারেল আহ্বান করার ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র-বিরোধী প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয়—এটাও সত্য নয়। স্টেটস জেনারেলের অধিকাংশ সদস্যই রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁরা যে সংবিধান রচনা করেন তাতে রাজতন্ত্রকে সম্মানের আসন দেওয়া হয়। লুই যদি স্টেটস জেনারেলের সদস্য-দের সাথে সহযোগিতা করে দেশ হতে অসাম্য ও পুঞ্জীভূত অনাচার দূর করতে সচেষ্ট হতেন তাহলে ফ্রান্সে বিপ্লব রক্তাক্ত বিপ্লবে পরিণত হত না। লুই-এর নির্বুদ্ধিতার জন্যই ফরাসী বিপ্লব বাঁকা পথ অনুসরণ করে।

উপসংহারে বলা যায় যে লুই স্টেটস জেনারেল আহ্বান করে রাজতন্ত্রকে রক্ষা করার সুযোগ পান, কিন্তু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি করতে পারলেন না।

Q. 5. Why did the Revolution break out in France and not in any other country in Europe ?

Ans. যে সব উপাদান বিপ্লব সংঘটিত হবার জন্য প্রয়োজন সেগুলি ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রেই কম বেশী বর্তমান ছিল ; সে ক্ষেত্রে বিপ্লব শুধু ফ্রান্সেই দেখা দিল কেন ?

বিভিন্ন কারণ

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমতঃ, ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীরূপে জনগণের যে অংশ ছিল তাকে আধুনিক সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলা হয়। এদের হাতে অর্থ ছিল এবং এরাই সরকারের করের বোঝা বইত এবং সরকার এদের নিকট হতেই ঋণ পেতেন। অভিজাত শ্রেণী নানা সুবিধা ভোগ করত অথচ দায়িত্ব পালন করত না। দেশের উঁচু সরকারী পদগুলি তারাই গুণ না থাকা সত্বেও অধিকার করে ছিল। দেশের কুশাসনের ফল প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করত বুর্জোয়া শ্রেণী এবং

শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী

এরা যখন একদিকে করদাতা ও ঋণদাতা ছিল, তখন সরকার দেউলিয়া হলে এদের আর্থিক বিপর্যয় ঘটবার সম্ভাবনা ছিল অধিক। তাছাড়া, এই বুর্জোয়া শ্রেণী শিক্ষা দীক্ষায় বিশেষভাবে প্রগতিশীল হবার দরুণ মৌলিক পরিবর্তনের বিপ্লবাত্মক ভাবধারা তারা সহজেই নিতে পেরেছিল। সেকারণে যুক্তিবাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা এদের সংবেদনশীল মনকে সহজে আচ্ছন্ন করতে পেরেছিল। ইংল্যাণ্ড ভিন্ন ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই শ্রেণীর শিক্ষিত প্রগতিশীল এবং সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকায় লাঞ্ছিত ও শোষিত জনগণ নেতৃত্ব লাভের সুযোগ পায়নি এবং সুসংগঠিত হতে পারেনি। ফ্রান্সের নিষ্পেষিত জনগণ সহজেই এই নেতৃত্ব এবং সংগঠন লাভ করতে পেরেছিল।

ফ্রান্সের ন্যায় ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু ওই সব দেশে জমিদারগণ যেমন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাভোগ করত তেমনি তাদের দায়িত্বও ছিল প্রচুর। একারণে ওই সব রাষ্ট্রে অভিজাতদের সামাজিক ও

দায়িত্বহীন অভিজাত শ্রেণী

অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ সুবিধা ভোগ দৃষ্টিকটু ছিল না। কিন্তু ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। সুতরাং ফ্রান্সের গণজীবনে সামন্তশ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছিল। মধ্যবিত্তশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী এটিকে খুবই অন্যায় ও গর্হিত বলে মনে করত, এবং এ দূর করবার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন হল।

ফ্রান্সের কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা তদানীন্তন ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষকদের

উন্নত কৃষক সম্প্রদায়

চেয়ে ভাল ছিল। তারা নিজেদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সম্বন্ধে অধিক সচেতন ছিল এবং অন্যান্য দেশের কৃষকদের চেয়ে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করবার সাহস ও ইচ্ছা তাদের অনেক বেশি ছিল। ইউরোপে অন্যান্য দেশের কৃষকরা যখন ভূমিদাসের জীবনযাপন করছিল, তখন ফরাসী কৃষকদের অবস্থা ছিল সচ্ছল এবং তারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনও ছিল।

ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দেবার অন্যতম কারণ হল ফরাসী দার্শনিকদের চিন্তাধারা। তাঁরা তাঁদের লেখনী মাধ্যমে ফরাসী সরকার ও সমাজজীবনের অসাম্য, অনাচার ও

দার্শনিকগণ

দুর্নীতির প্রতি ফরাসীজনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হলেন না, কিভাবে এগুলি দূর করা যায় এবং কি পথ অনুসরণ করলে সুস্থ ও সাবলীল সমাজ জীবন গড়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধেও তাঁরা জনসাধারণের সামনে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তববাদী কর্মপন্থা তুলে ধরলেন।

ফরাসী দেশে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই স্বৈরতন্ত্র ঘুনেধরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। প্রাশিয়া বা রাশিয়ার মত ফরাসী দেশের স্বৈরতন্ত্র কর্মনিপুণ ও সার্বিক ছিল না। দুর্বল স্বৈরতন্ত্র কেবল স্বৈরতন্ত্রের অযোগ্যতাই প্রকাশ করল না, এর প্রজাহিতৈষণার দিকও অস্ফুট রয়ে গেল।

দুর্বল শাসন

আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদানকারী ফরাসীরা উপনিবেশবাসীর হয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সুতরাং এই যুদ্ধ একদিকে স্বাধীনতার প্রেরণা ও অপরদিকে রাজতন্ত্রের বিরোধিতা, এই উভয় দৃষ্টান্তের সাথে প্রত্যক্ষভাবে কিছু সংখ্যক ফরাসী এবং পরোক্ষভাবে আপামর জনসাধারণ পরিচিত হয়।

ফ্রান্স অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেমন কঠিন অবস্থায় পড়েছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশকে এরূপ অবস্থায় পড়তে হয়নি।

উপসংহারে বলা যায় যে বাস্তব পরিবেশ ও আদর্শের মিল ফ্রান্সেই সার্থকভাবে ঘটেছিল বলে এখানেই বিপ্লব প্রথমে দেখা দেয়।

Q. 6. Analyse the causes of the French Revolution.

Ans. ফরাসী বিপ্লবের বহুবিধ কারণ ছিল—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স এমন একটি অবস্থায় পৌঁছেছিল যখন তার ঘুনে ধরা প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলি তাকে ধরে রাখতে পারল না। এই বিপ্লব অবশ্য হঠাৎ ঘটেনি। এর পিছনে ছিল বহু ঘটনা সংস্থান এবং এগুলির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলে ফরাসী বিপ্লব দেখা দিল। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল :

ভূমিকা

রাজনৈতিক কারণ: ফ্রান্সের কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র চতুর্দশ লুই-এর আমলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজতন্ত্রের ক্ষমতা ছিল অসীম। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে কিছু ছিল না। এমন কি ষ্টেটস জেনারেল নামক মহাসভার অধিবেশন ১৭৬ বৎসরকাল ডাকা হয়নি। এর ফল কিন্তু ভাল হয়নি। রাজার হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে সে ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করবার জন্য প্রয়োজন হয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাশালী নরপতির। চতুর্দশ লুই-এর মৃত্যুর পর ফ্রান্সের সিংহাসনে যাঁরা আরোহণ করলেন তাঁরা সকলেই দুর্বলচিত্তের ছিলেন; ফ্রান্স শাসন করবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা দুই-ই তাঁদের ছিল না। আন্তর্জাতিক যুদ্ধে পরপর কয়েকবার পরাজিত হয়ে এবং উপনিবেশ হারিয়ে রাজতন্ত্র প্রজাদের নিকট হাস্যাস্পদ হয়, তাদের শ্রদ্ধা হতে বঞ্চিত হয়। পঞ্চদশ লুই ফরাসী রাজতন্ত্রের সর্বনাশ সাধন করেন।

তিনি রাজকার্য দেখতেন না, বিলাসব্যসনে দিন কাটাতে ভালবাসতেন। ষোড়শ লুই ভাল মানুষ ছিলেন ; সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষপাতীও ছিলেন, কিন্তু দৃঢ় চরিত্রের না হওয়ার ফলে তিনি বিপ্লব ডেকে আনলেন। স্বার্থান্বেষী অভিজাত শ্রেণীর কুচক্র তিনি ভেঙে দিতে পারলেন না। এর ওপর দেশের দুরবস্থা বাড়তে থাকে এবং এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তিনি শত চেষ্টা করেও এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারলেন না।

শাসন বিভাগের অনাচার ও ব্যাপক দুর্নীতির সাথে অত্যাচার-অবিচারের শেষ ছিল না। ব্যক্তি মানুষের সম্পত্তি ও জীবনের কোন মূল্য ছিল না। যথেচ্ছভাবে সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তার করা হত এবং শাস্তি দেওয়া হত। রাজার বা তাঁর প্রিয় পাত্রদের বিরাগভাজন হলেই যে কোন ব্যক্তিকে কোন কারণ না দেখিয়ে লেত্রি ডি কেশে (Letter de cachet) নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দ্বারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে বন্দি করে রাখা হত। অনেক সময় অভিজাতরা তাদের ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করবার জন্য রাজার এই ক্ষমতাকে কাজে লাগাত। দেশে ন্যায়বিচার পাওয়া ছিল অত্যন্ত দুরূহ। বিচারকরা তাঁদের পদ পৈত্রিক সম্পত্তি হিসেবে পেতেন বা কিনে নিতেন। সুতরাং 'ফি' নিয়ে তাঁরা নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। সুতরাং আইনের চোখে সকলে সমান ছিল না। তাছাড়া, দেশে বিচার-ব্যবস্থার কোন সমতা ছিল না। দেশের এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের আইনবিধি প্রচলিত ছিল। এর ফলে ফ্রান্স হয়ে উঠেছিল আইনজীবীদের স্বর্গরাজ্য। শাসন বিভাগে অব্যবস্থা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। ফ্রান্সে শাসন ক্ষেত্রে সমতা ছিল না এবং এর শাসন কাঠামো ছিল দাবার ছকের ন্যায় বহু-বিভক্ত। কর্তৃত্ব ছিল রাজকীয় পরিষদে, ক্ষমতা ছিল তিরিশজন প্রাদেশিক পরিদর্শকের হাতে, বিচারকার্য সম্পন্ন হত তেরটি পার্লামেন্টের এবং অসংখ্য সামন্ততান্ত্রিক আদালতের দ্বারা। চতুর্দশ লুইয়ের আমলে প্রাদেশিক পরিদর্শকরা জনসাধারণের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ন থাকে তার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখত এবং জমিদারদের ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে এরাই কায়েমী স্বার্থবাদী এবং জনসাধারণের শোষক হয়ে দাঁড়াল। দেশে অবিচার ও নির্যাতনের কোনরূপ প্রতিকার ফ্রান্সে অদ্ভুত ছিল না। একে স্বৈরতন্ত্র না বলে অত্যাচারতন্ত্র বললেই ভাল হয়। বিপ্লবের ঠিক আগে রাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। রাজশক্তি যদি পঙ্গু না হয়ে পড়ত তাহলে অত শীঘ্র বিপ্লব ঘটত কিনা সন্দেহ।

সামাজিক কারণ : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রচুর গলদ ছিল। চতুর্দশ লুই ও তাঁর মন্ত্রীরা ফ্রান্সে এক অনড় সমাজ ও রাজনৈতিক প্রথা গড়ে তোলেন, যখন ইংল্যাণ্ডের মানবসমাজের ভালভাবে অগ্রগতি ঘটছিল। চতুর্দশ লুই-এর আমলে ফরাসী সমাজের রূপ অনেকটা পিরামিডের ন্যায় ছিল—সর্বনিম্নে কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবীরা। তাদের দেয় ট্যাক্সেই সরকারের আর্থিক সঙ্গতি নির্ভর করত এবং তারাই সমাজের আর্থিক বুনিয়াদ গঠনের দায়িত্ব নিয়েছিল। এর বদলে তারা রাজার নিকট হতে আশা করতো যে তাদের প্রাচীন অধিকার সমূহ রক্ষা করা হবে। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে অনেকেই ভূমির মালিক হতে পেরেছিল। শহরে শহরে বহু গিল্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালক্রমে বুর্জোয়া শ্রেণীও ফ্রান্সে সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হয়। কারণ রাজা ব্যবসায়ীদের অভিজাত শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে রক্ষা করতেন। অভিজাত শ্রেণীর কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত না, কেউ করলে তাকে শ্রেণীচ্যুত করা হত এবং সে আর অভিজাত বলে গণ্য হত না।

দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল রাজার সৃষ্ট Noblesse de robe-এর হাতে। আর যারা অভিজাত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের শাসনকার্যে কোন ক্ষমতা না থাকলেও তারা কয়েকটি সুবিধা ভোগ করত—কর দিতে হত না। সৈন্যবাহিনীতে অফিসার তাদের মধ্য হতেই নিযুক্ত হত এবং বিচারালয়ের বিচারক তাঁদের মধ্যে থেকেই নেওয়া হত। এর ওপর ভিত্তি করেই প্রাচীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তৎকালীন ফ্রান্সের সামাজিক ব্যবস্থা একটু পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে যে বাস্তব অবস্থা হতে এটা কত দূরে ছিল। প্রথমত, ফরাসী সমাজ পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল যথা—অভিজাত শ্রেণী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, যাজকবৃন্দ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং কৃষক সম্প্রদায়। প্রকৃতপক্ষে ফরাসী সমাজ কিন্তু এত সহজ ও সরল ছিল না। বিশেষ জটিল আকার ধারণ করেছিল। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই শ্রেণী-সংঘাত দেখা দেয়। ফলে প্রত্যেক শ্রেণী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে কোন শ্রেণীর মধ্যেই ঐক্য ছিল না এবং একজোটে শ্রেণী স্বার্থ নিয়ে তারা আন্দোলনও করতে পারত না। এক অভিজাত শ্রেণীই সুনির্দিষ্ট প্রধান নয়টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া রাজপ্রাসাদে বসবাসকারী অভিজাতদের সাথে প্রদেশে বসবাসকারী অভিজাতদের অহিনকুল সম্বন্ধ ছিল। আবার বৃটন প্রদেশের অভিজাতদের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে তাদের মধ্যে অনেকেই শহরের মুখ দেখেনি। অভিজাতরা কেবল দুটি ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে পারত—কর হতে

রেহাই এবং কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর নিকট হতে সামন্ত শুল্ক আদায়। ধর্মযাজকদের মধ্যে দুটি শ্রেণী বিশেষভাবে দেখা দেয়—উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ যাজকবৃন্দ। Noblesse de robeকে একটি ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী মনে করলে ভুল হবে। এদের মধ্যেও দুটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণী দেখা যায়। পার্লামেন্ট সমূহের সদস্যবৃন্দ একটি শ্রেণী এবং মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ অন্যটি। প্রথম শ্রেণীটি স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীটি পক্ষে ছিল।

সুবিধাহীন শ্রেণীগুলির মধ্যেও নানারূপ জটিলতা দেখা দেয় 'সুবিধাহীন' কথাটিই অর্থহীন। একজন বিত্তবান ব্যবসায়ী কম সুবিধাভোগী ছিল না, রাজস্ব আদায়কারী, ব্যাঙ্কব্যবসায়ী এবং কুসিদজীবীদের সাথে ব্যবসায়ী ও কারখানার মালিকদের কোন মিল ছিল না। সমাজের আর্থিক সঙ্গতি এই শ্রেণীর হস্তগত ছিল। চতুর্দশ লুইয়ের যুদ্ধগুলির সুযোগ গ্রহণ করে ফ্রান্সের কয়েকটি ধনী ব্যবসায়ী আরও ধনী হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে তারা ফ্রান্সের ধনকুবের হয়ে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে যে কেউ অর্থ দিয়ে সরকারী পদ কিনে Noblesse de robe হতে পারত। উপসংহারে বলা যায় যে, ফরাসী সমাজে অষ্টাদশ শতাব্দীর কাঠামো তথাকথিত তিন ভাগে ভাগ ছিল না—বেশ জটিল ছিল। এক একটি শ্রেণীর মধ্যেই বেশ কয়েকটি উপশ্রেণী গড়ে উঠেছিল এবং শ্রেণী-ভিত্তিক ফরাসী সমাজে সামাজিক বিভেদই প্রকট হয়ে ওঠে, সামাজিক ঐক্য বলে কিছু থাকল না, এবং তাদের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত প্রবল হয়ে উঠল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তারা বেশি ব্যস্ত ছিল তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য, তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ তৎপর ছিল না। বিপ্লবের ফলে সুবিধাভোগীদের সুবিধাগুলি নষ্ট হয়ে যাবার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাষ্ট্রে বিশেষ শক্তিশালী শ্রেণী বলে পরিগণিত হয়। রাজতন্ত্র যদি সুবিধাভোগী শ্রেণীগুলির হাত হতে নিজেকে স্বাধীন করে নিতে পারত তাহলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র সামাজিক বিকাশে সহায়তা করত, রাজনৈতিক বিপ্লবকে আহ্বান জানাত না। কিন্তু রাজতন্ত্রের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না, কারণ এটা করতে হলে রাজতন্ত্রের স্বরূপ বদলাতে হত।

সুতরাং ফরাসী সমাজে অসাম্যের অন্ত ছিল না। যাজক শ্রেণীর মধ্যে উচ্চতর সম্প্রদায় বহু সুবিধা ভোগ করত কিন্তু ধর্মপ্রচার বা জনসাধারণের নৈতিক উন্নতির জন্য কিছুই করত না বরঞ্চ ধর্মীয় কাজের পরিবর্তে তারা আমোদপ্রমোদে দিন কাটাত। নিজেদের অসদাচরণ ও অধার্মিক জীবনযাপনের ফলে তারা জনসাধারণের

শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারাল। এই উচ্চতর যাজক সম্প্রদায় ফরাসী বিপ্লবের জন্য কিছুটা দায়ী ছিল। অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীর যাজকদের অবস্থা ভাল ছিল না। তাদের কোন বিশেষ সুযোগসুবিধা ছিল না। ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত কর্তব্য তারাই সম্পন্ন করত। একারণে কৃষককূলের ওপর তাদের বেশ প্রভাব ছিল। উচ্চতর যাজকদের নিকট হতে কোন সুবিধা আদায় করা যাবে না বলে নিম্নস্তরের যাজকরা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর সাথে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলল।

অনুরূপভাবে নিম্নস্তরের অভিজাতরাও তৃতীয় শ্রেণীর সমগোত্রীয় ছিল বলে তাদের মধ্যে অনেকে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে। সাধারণ লোকদের নিয়ে গঠিত ছিল তৃতীয় শ্রেণী। এই শ্রেণীতে মধ্যবিত্ত, কৃষক, মজুর সকলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরাক্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যথেষ্ট অর্থসম্পদ ও শিক্ষা-সংস্কৃতি থাকলেও তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কিছুই ছিল না। রাজ্যের উচ্চপদ ও প্রতিপত্তি হতে তারা বঞ্চিত ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বিক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব পরিচালিত করে। এ কারণে কেউ কেউ বলে থাকেন যে ফরাসী বিপ্লব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক ক্ষমতালাভের আন্দোলনের ফলেই দেখা দেয়। এই অভিমত আংশিক সত্য হলেও সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ ফরাসী বিপ্লব কৃষক, মজুর প্রভৃতি সর্বহারাদের সমবেত চেষ্টায় সংগঠিত হয়েছিল, কেবলমাত্র মধ্যবিত্তদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা লাভের স্পৃহায় নয়।

অর্থনৈতিক কারণ: ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুরবস্থা বিপ্লব আনতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। ফ্রান্সে সকল সুখ-সুবিধা ধনী অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় ভোগ করত। তাঁদের কোনরকম কর দিতে হত না। সামন্ততন্ত্রের নীতি অনুসারে কৃষকরা বেগার খেটে মরত আর ধনাঢ্য অভিজাতেরা নিশ্চিন্ত বিলাসে কালাতিপাত করত। দেশের ভাল ভাল জমি তাদের দখলে ছিল। রাষ্ট্রের ভাল ভাল চাকরি তারাই পেত। রাষ্ট্রের সমগ্র আয়ের প্রায় সমস্তটাই সাধারণ প্রজাদের নিকট হতে নেওয়া হত।

অর্থনৈতিক

করধার্য সম্পর্কে কোন ন্যায়সঙ্গত নীতি ছিল না। ফ্রান্সে প্রধানতঃ তিনটি প্রত্যক্ষ কর জনসাধারণের ওপর ধার্য করা হত যথা, টেইলি, ক্যাপিটেশন এবং ভিংটিয়েমে। এই করগুলি কখন কিসের ওপর ধার্য হবে তা করদাতারা জানতেন না। তাছাড়া পরোক্ষ করের সংখ্যা ছিল অগণ্য। ফ্রান্সের এক এক অঞ্চলে লবণের জন্য এক এক রকম দাম আদায় করা হত। টেইলি নামক কর কখনো জমির ওপর ধার্য হত কখনো আয়ের বিভিন্ন উৎসের ওপর ধার্য হত। এরূপ ব্যবস্থায়

কোন ন্যায় বিচার ছিল না। রাজসভার অমিতব্যয়িতার ফলে জনগণের ওপর বেশি পরিমাণে কর ধার্য করা হতে থাকে। কৃষকদের সর্বাপেক্ষা বেশি কর দিতে হত। তাদের আয়ের শতকরা ৫৩ ভাগ দিতে হত সরকারকে ভূমিকর বা টেইলি হিসেবে, শতকরা ২৮ ভাগ দিতে হত গীর্জা কর (Tithe) এবং জমিদারদের সামন্ত প্রথা অনুযায়ী কর। এছাড়া পরোক্ষ কর দিতে হত। উৎপাদন শুল্ক ও লবণ শুল্কের মাধ্যমে সরকার এটি আদায় করত।

ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গীও সঙ্কীর্ণ ছিল। গিল্ড দেশের শিল্প নিয়ন্ত্রণ করত এবং বিভিন্ন গিল্ডগুলি ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। শিক্ষানবীশ কর্মীদের স্বাধীন কারিগর হবার কোন সুযোগ ছিল না। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও অল্প মজুরী তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করেছিল। কারিগরদের অবস্থাও ভাল ছিল না। কিন্তু শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ করভার, প্রাদেশিক শুল্ক, রাজপথ, নদীপথ, নগর শুল্ক প্রভৃতি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে বাধার সৃষ্টি করছিল। একারণে ব্যবসায়ীরা সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়।

রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়ের সমতা ছিল না। বাজেট ছিল না। করধার্য সম্পর্কে কোন নীতি ছিল না, অথচ বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল। এবং অর্থ সংগ্রহের নানারূপ চেষ্টা করা হত। কর সংগ্রহের পদ্ধতির দ্বারা জনসাধারণের ওপর আর্থিক বোঝা আরও ভারী হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল কর সংগ্রাহকরা, সশস্ত্র আক্রমণকারীদের অপেক্ষাও তারা বেশি সর্বনাশ সাধন করত। একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য—সাধারণতঃ ছয় বছর কর সংগ্রাহকের সাথে সরকারের চুক্তি হত। এই চুক্তির দ্বারা কর সংগ্রাহকরা সরকারকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকত—কর সংগ্রহ করবার পর সরকারকে দেয় অর্থের ওপর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত তা সংগ্রাহকদের প্রাপ্যরূপে থেকে যেত। রাষ্ট্রের যখন অর্থের একান্ত প্রয়োজন তখনই জনসাধারণের নিকট হতে আদায়ীকৃত অর্থের একটা মোটা অংশ একটি বিশেষ শ্রেণী পকেটস্থ করত। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রের ব্যয়নির্বাহ করবার জন্য রাজাকে অর্থ সংগ্রহের জন্য বহু রকমের হাস্যকর ও অযৌক্তিক উপায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করে বিক্রি করা হতে থাকল। আবার কর অব্যাহতি বিভিন্ন অঞ্চলকে বিক্রী করা হল। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন হিসেব না রেখেই অর্থ আদায়ের বিশেষ ক্ষমতা রাজার ছিল। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষতি এবং ঘাটতি বেড়েই চলল।

ক্রমাগত ঘাটতি রাজস্ব সত্ত্বেও ফ্রান্স যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়। ফলে ফ্রান্সের

আর্থিক তহবিল আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদেশে ফ্রান্সের আর্থিক মর্যাদা বলে কিছু ছিল না, রাজকোষ শূন্য, জাতীয় ঋণের তহবিল দিনের পর দিন স্ফীত হল। এমন কি জাতীয় ঋণের সুদ প্রদানেরও ক্ষমতা রইল না। এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থা হতে রক্ষা পাবার জন্য ষোড়শ লুই ১৭৬ বৎসর ধরে উপেক্ষিত স্টেটস্ জেনারেল মহাসভা আহ্বান করলেন। সুতরাং ফ্রান্সের আর্থিক দুর্গতি বিপ্লবের অন্যতম কারণ বলা যায়।

বৌদ্ধিক ঃ ফ্রান্সে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটবার বহু পূর্বেই ভাব-জগতে বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। আঠারো শতকের ফরাসী দর্শন ও সাহিত্যের মধ্যে একটা স্বাধীন অনুসন্ধিৎসু ও বিপ্লবী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রান্সে এ যেন পঞ্চদশ শতাব্দীর নব জাগৃতি ফিরে এল। তবে এই জাগৃতির মূল কথা ছিল যুক্তিবাদ। এর অর্থ হল যে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান-গুলি যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে এবং এর ফলে যেগুলি অযৌক্তিক বলে মনে হবে সেগুলিকে টিকে থাকতে দেওয়া হবে না। সুতরাং ফরাসী দার্শনিক ও লেখকদের রচনার মূল বিষয় ছিল তৎকালীন ফরাসী সমাজের নানাবিধ বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের উদ্‌ঘাটন। মণ্টেস্কু, ভলটেয়ার, রুশো, ডিডেরো, ডি এলেমবার্ট প্রভৃতি মনীষীরা তাঁদের লেখনী মাধ্যমে জনসাধারণের বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তুললেন।

দার্শনিকরা

মণ্টেস্কু : মণ্টেস্কুকে যুক্তিবাদের প্রথম ব্যাখ্যাতা হিসেবে ধরা হয়। প্রথমে তিনি ব্যঙ্গ লেখক ছিলেন। তাঁর রচিত পারস্য চিঠিতে তিনি দুর্নীতি অসহনশীলতা ও বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগের তীব্র ব্যঙ্গ করেন।

মণ্টেস্কু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার অনুরাগী ছিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে 'স্পিরিট অব লজ' নামে তাঁর যে পুস্তক বের হয় তাতে তিনি রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিভাজনের নীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। তাঁর মত হল শাসন, আইন এবং বিচার বিভাগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে। তাঁর এই পুস্তক পরবর্তী কালে বিপ্লবী শাসনতন্ত্র রচনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বিশ্বকোষ রচয়িতা (encyclopaedists) রূপে পরিচিত একদল লেখকের মধ্যে দিয়েও এই যুক্তিবাদ এবং তা হতে উদ্ভূত প্রগতিশীল মতবাদের প্রসার ঘটে। ডিডেরো-এর সম্পাদনায় বিশ্বকোষ নামে বৃহৎ গ্রন্থকে প্রগতিশীল এবং প্রচলিত প্রথা প্রতিষ্ঠান গুলির ধ্বংসাত্মক জ্ঞানের ভাণ্ডার বললে ভুল হবে না।

ফিজিওক্র্যাটস (Physiocrats) নামে পরিচিত এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদরা নতুন ভাবধারা আনতে সাহায্য করলেন। অর্থনীতিক্ষেত্রে তাঁরা যুক্তিবাদ প্রয়োগ করেন এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের সকল নিয়মকানুন তাঁরা তুলে দেবার পক্ষে কথা বলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হতে সরকারের হাত গুটিয়ে নেওয়া উচিত বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। তাঁদের এই মতবাদকে লেজে ফেয়ার (Laissez Faire) মতবাদ বলা হয়। ফিজিওক্রাটসরা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের এডাম স্মিথ হলেন এই মতবাদের পুরোধা। ফ্রান্সে কুয়েস্‌নে (Quesney) ছিলেন ফিজিওক্র্যাটসদের মধ্যে অগ্রণী ও প্রভাবশালী। ফ্রান্সের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ফিজিওক্র্যাটস মতবাদের বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়ে।

ভল্টেয়ার—বিপ্লবী সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভল্‌টেয়ারের প্রতিভা অনন্যসাধারণ ছিল। সমাজ ধর্ম ও অন্যান্য অন্যায় অবিচারের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন।

ভলটেয়ার তীব্র কশাঘাত করলেন স্বৈরাচারের অন্যতম স্তম্ভ চার্চ-কে। তাঁর বিদ্রূপে ও শ্লেষে শিক্ষিত লোকদের মানসিক প্রসারতা ঘটল। 'ঐ জঘন্য জিনিসকে ধ্বংস করে দাও' এটাই তিনি সোচ্চারে ঘোষণা করেন। তিনি প্রজ্ঞাশক্তির ওপর সব চেয়ে গুরুত্ব দিতেন। অবশ্য তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না, প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারে বিশ্বাসী ছিলেন। ভলটেয়ার প্রচলিত প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ফরাসীদের অভ্যস্ত করান।

রুশো—ভলটেয়ারের পর রুশো সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন। তাঁর রাজনৈতিক মত ছিল যে, রাজা ঈশ্বর-দত্ত অধিকারের বলে রাজ্য শাসনের অধিকারী নন, প্রজারাই রাজাকে রাজ্য-শাসনের অধিকার দিয়েছে, এবং যে রাজা প্রজাদের প্রতি কর্তব্য পালন করেন না তাঁকে প্রজারা বিতাড়িত করতে পারে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'কনট্রাক্ট সোস্যিয়াল' নামক গ্রন্থে তিনি এই মত ব্যক্ত করেন। বিপ্লবী ফ্রান্সে এই পুস্তকটিই চরমপন্থী বিপ্লবীদের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়। রুশোর জ্বালাময়ী লেখা ফরাসীদের মনে উন্মাদনা এনেছিল। সেজন্য রুশোকে বলা হয় ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু।

দার্শনিকদের অবদান

ফরাসী বিপ্লব আনয়নে দার্শনিকদের অবদান সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন তোলা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক Holland Rose মনে করেন যে দার্শনিক ও সাহিত্যিকরাই ফরাসী জনসাধারণকে প্রাচীন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সক্ষম করে, তাদের চেতনাকে বিপ্লবমুখী করে। অন্যদিকে মুনিয়ার ও মোর্সষ্টিফেনসের মতে বিপ্লবের পিছনে দার্শনিকদের অবদান বিশেষ ছিল

না। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে দার্শনিকরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে ফ্রান্সের তৎকালীন ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমতকে সক্রিয় করে তুলেছিলেন। উৎ-পীড়িত জনসাধারণ এসব রচনার মধ্যে নিজেদের দুঃখ-দারিদ্র্যের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হল এবং এর জন্য তারা রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দায়ী বলে মনে করে এগুলির পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হল। দার্শনিকদের রচনা হয়ত বিপ্লব আনয়নে সরাসরি সাহায্য করেনি কিন্তু দার্শনিকরা যে জনমতের সৃষ্টি করলেন সেটি সমস্ত কিছু যাচাই করতে চাইল এবং আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য উৎসুক হল। (৭নং প্রশ্নের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখ।)

অন্যান্য কারণ—আমেরিকার স্বাধীনতা সমরও ফরাসী বিপ্লবের সহায়ক হয়েছিল। যে সকল ফরাসী যুবক আমেরিকার পক্ষে স্বাধীনতা সমরে যোগ দেয় তারা আমেরিকা হতে এই শিক্ষালাভ করে যে প্রজাদের কল্যাণের জন্য প্রজারাই দেশ শাসন করবার মালিক এবং প্রয়োজন হলে বিপ্লব ন্যায্য। ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করে তারা স্বাধীনতার বাণী প্রচার করল। ফরাসী বিপ্লবের পিছনে ইংল্যাণ্ডের ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবেরও অবদান ছিল। ইংল্যাণ্ডে এই বিপ্লব ঘটবার ফলে প্রমাণিত হল যে জনগণের ইচ্ছার দ্বারা রাজতন্ত্র সীমিত হতে পারে। শাসিতের নিকট শাসকের দায়িত্ব রয়েছে এবং সে দায়িত্ব শাসক কখনই অবহেলা করতে পারে না এবং অবহেলা করলে রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়—এই বিপ্লবের দৃষ্টান্ত ফ্রান্সে খুব সহজেই পৌঁছায়। মণ্টেস্কু, ভলটেয়ার প্রভৃতি ফরাসী লেখকদের রচনায় এই আদর্শ বিশেষ ভাবে স্থান পেল। ফ্রান্সে স্বৈরতন্ত্রী শাসনের অবসান ঘটিয়ে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণী তৎপর হল। সুতরাং এটা সহজেই বলা যায় যে "The flow of ideas which directed France towards Revolution was composed of two streams."

উপরিউক্ত কারণ-সমূহের মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটেছে। কারও মতে অর্থ নৈতিক কারণই বিপ্লবের জন্য মুখ্যত: দায়ী। কারও মতে রাজতন্ত্রের দুর্বলতাই বিপ্লবের মৌলিক কারণ। আবার কেউ মনে করেন দার্শনিকরাই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেন। ঐতিহাসিক ফিশার ফরাসী বিপ্লবের জন্য মুখ্যত দায়ী করেন ফ্রান্সের সমাজ-ব্যবস্থাকে। সমাজে অভিজাত শ্রেণী যেরূপ সুযোগসুবিধা ভোগ করত সেগুলি দূর করবার জন্যে বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লব ঘটাতে বাধ্য হল। মর্স-ষ্টিফেন্স-এর মতে বিপ্লবের প্রধান কারণ হল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—বৌদ্ধিক

বিভিন্ন মত

বা সামাজিক কারণগুলি গৌণ।* হল্যাণ্ড রোজ মনে করেন যে ফরাসী দার্শনিকদের রচনাগুলি পাঠ করে শিক্ষিত ফরাসী জনসাধারণের মনে যে আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার হয় তার ফলেই বিপ্লব দেখা দেয়।** রাইকার বিপ্লবের জন্য ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে দায়ী করেন না। আবার মণ্টেগু মনে করেন যে কৃষকশ্রেণীর দুরবস্থাই ফরাসী বিপ্লবের জন্য মুখ্যত দায়ী। ঐতিহাসিকদের পরস্পরবিরোধী উক্তিগুলির কারণ হল তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ফরাসী বিপ্লবের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যার ফলে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কারও মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

উনিশ শতকের ঐতিহাসিকদের নিকট ফরাসী বিপ্লবের কারণ হল মানসিক। দার্শনিকদের অবদান ও রাজনৈতিক প্রাক-বিপ্লব যুগে ফরাসী জনসাধারণের গণ-মানসে যে পরিবর্তন আসে এবং ষোড়শ লুই এর শাসনকালে ক্রমিক রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয়ের ফলে বিপ্লব দেখা দেয়। অবশ্য কৃষককুল এবং দুঃস্থ শহরবাসী পুরাতন দুর্নীতিপূর্ণ শাসনব্যবস্থার এবং অভাব অভিযোগের অবসান ঘটাবার জন্য তৎপর হয় এবং তাদের এই প্রচেষ্টা বিপ্লবের পটভূমিকা তৈরি করে। বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকরা অবশ্য উপরিউক্ত মত গ্রহণ করতে রাজি নন। ঐতিহাসিক ম্যাথিয়েজ (১) লাফেব্রা (Lefebre) ও লাব্রু-র ফরাসী বিপ্লবের ওপর গবেষণার ফলে উপরিউক্ত মত আর গ্রহণযোগ্য নয়। লাফেব্রা প্রমুখ ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের মার্কসীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত বলে তাঁরা ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলির ওপরই জোর দিয়েছেন। তাছাড়া বিপ্লবের পূর্বেকার ২৫ বছরের ইতিহাসের ওপরও তাঁরা জোর দিয়েছেন। এই কয় বছরের সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া ও বিপ্লব ঘটাবার সহায়ক হয়েছিল—১৭৮৭-৮৮র অভিজাতদের অভ্যুত্থান বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় শুরু করে। অবশ্য এই মতটি অভিনব নয়—রোবসপিয়র ও চাটুব্রিয়াঁ এই মতই পোষণ করতেন। আধুনিক গবেষণার ফলে ঐতিহাসিকগণ বিপ্লবের জন্য এখন আর মাত্র ভার্সাই ও প্যারিসের ঘটনাবলীর ওপর বিশেষ জোর না দিয়ে প্রদেশগুলির ঘটনাবলীর ওপর জোর দিয়ে থাকেন এবং শ্রেণী সংঘাতই ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কারণ বলে মনে করেন। এবং এই শ্রেণী সংঘাত চরম আকার ধারণ করে অর্থনৈতিক অবস্থা, কায়েমী স্বার্থবাদীদের

---

*'The causes......were chiefly economical and political, not philosophical or social'—Morse Stephens.

**'It was hope which made the Revolution'. –*H. Rose.*

জনসাধারণকে শোষণ করবার প্রচেষ্টা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং শোষিত জনসাধারণের শোষণ হতে মুক্তি পাবার বলিষ্ঠ ইচ্ছা হতে।* আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন একটিমাত্র কারণে বিপ্লব সংঘটিত হয় না বহু কারণের সমন্বয়েই বিপ্লব দেখা দিয়েছিল।

Q. 7. 'Only the king in 18th century France could have created the Revolution.'—*David Thomson* Discuss.

Ans. ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বিপ্লব চায়নি। জনসাধারণ যেমন না চাইলেও কখনো কখনো যুদ্ধ যেমন বেধে ওঠে, তেমনি বিপ্লব ও দেখা দিতে পারে।

জনসাধারণ হয়ত সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করতে চায় কিন্তু এই সংগ্রামই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়। যেমন হয়েছিল. ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে। আঠারো শতকের শেষার্ধে ইউরোপের গণমানসে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। এটিকে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বলা যেতে পারে। এই চিন্তাধারা যুক্তিবাদী ছিল এবং এটি প্রতিষ্ঠিত প্রথাগুলিকে (Institution) তীব্রভাবে সমালোচনা করল। ক্যাথলিক চার্চ, স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র, সুবিধাভোগী অভিজাততন্ত্র কেউই যুক্তিবাদী সমালোচনার হাত হতে রেহাই পেল না। ফ্রান্সের যুক্তিবাদী দার্শনিকরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে জনসাধারণের পুরাতন আমলের প্রতি শ্রদ্ধা বিনষ্ট করে দিলেন। নিপীড়িত ও বিক্ষুব্ধ ফরাসীবাসীদের মনে এই ধারণা জন্মাতে সাহায্য করলেন যে, রাজা ঈশ্বরদত্ত অধিকারের বলে রাজ্য শাসনের অধিকারী নন, প্রজারাই রাজাকে রাজ্যশাসনের অধিকার দিয়েছেন। মণ্টেস্কু, ভলটেয়ার, রুশো ও অন্যান্য দার্শনিক সাহিত্যিকদের রচনাবলী ফরাসী জনসাধারণের কল্পনাকে আরও উদ্দীপ্ত করে। এঁদের রচনা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব নিয়ে আসতে সাহায্য করেনি। সত্য ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এঁদের রচনা বিপ্লবের জন্য অনুকূল মানসিক ক্ষেত্র পরোক্ষভাবে তৈরি করে দেয়। এঁরা কেউই সরাসরি বিপ্লবের কথা বলেন নি। বরঞ্চ এঁদের মধ্যে অনেকেই স্বৈররাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ওপর হতে সংস্কার সাধন হোক এই চাইতেন। তাঁদের পাঠকরাও বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং তাঁদের অধিকাংশ বুর্জোয়াপন্থী ছিলেন। প্রতিষ্ঠিত সরকারের ভাগ্যের সাথে তাঁদের ভাগ্যও জড়িত

জ্ঞানদীপ্তির যুগ

* 'The Revolution was all of one piece and their seeds had already sown by events, the conflicts and ideas which attended its outbreak.'—The New Cambridge Modern History Vol VIII.

ছিল এবং তৎকালীন অবস্থা তাঁদের অসুখীর কারণ ছিল না। প্রকৃত বিপ্লব যখন ঘটল তখন দার্শনিকদের মতবাদগুলি বিপ্লবীদের লক্ষ্যস্থলে পৌছাবার নিশানা দিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে যেটি সবচেয়ে মূল্যবান ছিল এবং যার ফলে জনসাধারণ বিপ্লবী হল সেটি হচ্ছে বৈপ্লবিক অবস্থা বা পরিবেশ এবং এই বৈপ্লবিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন দার্শনিকরা নন, ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই। ফ্রান্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ছিলেন রাজা নিজে। আর সেই রাজাই চরম আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হলেন। ষোড়শ লুই ভাল মানুষ ছিলেন। কিন্তু যে বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ় সঙ্কল্প থাকলে রাজশক্তিকে রক্ষা করা যেত তা তাঁর ছিল না। পনের বছর চেষ্টা করেও তিনি দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে পারলেন না। এই সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকজন অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে আর্থিক সঙ্কট হতে রাজতন্ত্রকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ফ্রান্সের কর নীতিতে বৈষম্য অত্যধিক ছিল। উচ্চশ্রেণীকে কর দিতে হত না। কর আদায়ের ব্যাপারেও অব্যবস্থা ছিল। এই অর্থের অধিকাংশই রাজসভার বিলাস ব্যসনে (১) যুদ্ধ ও শাসন পরিচালনার জন্য ব্যয় হত। ফ্রান্স তখনকার দিনে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ বলে গণ্য হত—বিপুল জনসাধারণ এবং সম্পদশালী ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে ফ্রান্স পরিচিত ছিল। তার বৈদেশিক বাণিজ্য ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের তুলনায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরাক্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যথেষ্ট অর্থসম্পদ ও শিক্ষা-সংস্কৃতি ছিল এবং কৃষককুলও অন্যান্য দেশের কৃষক কুলের চেয়ে সম্পদশালী ছিল। ফ্রান্সের কৃষিযোগ্য জমির দুই তৃতীয়াংশের তারাই মালিক ছিল এবং এই জমিতে তারা নিজেরাই চাষ-আবাদ করত। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের এই উন্নতমানের অবস্থা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সহায়ক হল। আমরা জানি, যে জুতা ব্যবহার করে, সেই জানে জুতোর কাঁটা কোথায় বিঁধছে, যে জুতো ব্যবহার করে না, সে এ সম্বন্ধে কিছু ভাবতে পারে না। ফরাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই উক্তিটি প্রযোজ্য। কারণ তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, ব্যক্তি স্বাধীনতাও তারা কিছুটা ভোগ করত। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তারা আরও অধিকার পাবার জন্য সচেষ্ট হল এবং এই অধিকার তারা যাতে পেতে পারে তার জন্য তারা তাদের চালু অধিকারগুলি কিছু ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হল না। তারা প্রচলিত শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজের পরিবর্তন চাইল, অসাম্য, অনাচার ও অবিচারের প্রতিকার চাইল এবং দক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানাল এবং সব থেকে যে জিনিস তারা **চাইল না** সেটি হচ্ছে বিপ্লব।

বৈপ্লবিক অবস্থা কিভাবে দেখা দিল

ষোড়শ লুই-এর দায়িত্ব—ষোড়শ লুই যখন স্টেটস জেনারেল সভার আহ্বান করলেন তখন তাঁর জনপ্রিয়তা খুব বৃদ্ধি পেল। তাঁর এই ঘোষণায় অধিকাংশ ফরাসী জনসাধারণ মনে করল যে এতদিনে দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তিত হবে। কারণ তাঁরা মনে করত যে রাজার কর্তব্য হচ্ছে আপামর জনসাধারণের মঙ্গল সাধন করা, সংখ্যালঘু অভিজাতকের সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করা নয়। এই সময় ফ্রান্সে যেমন উল্লেখ যোগ্য কোন ব্যক্তি বিপ্লব চাইছিল না, তেমনি কেউই প্রজাতন্ত্রও কামনা করছিল না। ১৭৯২-এর আগে জনসাধারণ প্রজাতন্ত্রের দিকে ঝোঁকেনি। অতএব ১৭৯২ পর্যন্ত প্রায় সকল সংস্কারপন্থীই রাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে সংস্কার আনবার চেষ্টা করেন।

তবুও রাজার বহু প্রশংসিত ষ্টেটস জেনারেল আহ্বানের ঘোষণা বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করল। এর কারণ হল ফ্রান্সের ঘুণে ধরা রাজনৈতিক ও সরকারী ব্যবস্থা তার অর্থ-নৈতিক সামাজিক কাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা (মধ্যবিত্ত শ্রেণী) দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা ছিল কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের কোন স্থান ছিল না। অভিজাত শ্রেণী এবং মুষ্টিমেয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবান ছিলেন কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন স্থান ছিল না। পরাক্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যথেষ্ট অর্থ সম্পদ ও শিক্ষা সংস্কৃতি থাকলেও তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কিছুই ছিল না। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় উচ্চপদ পাবার যোগ্যতা থাকতেও তারা বঞ্চিত ছিল। ষ্টেটস জেনারেল সভা আহ্বানের ফলে তারা তাদের দাবিগুলি ভালভাবে পেশ করতে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব ছিল তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যকরী রূপে প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক হল। তারা জনসাধারণের মনে গণতান্ত্রিক সংস্কারের আশাই শুধু উদ্দীপিত করল না, যারা ফ্রান্সের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল তাদের দলে টানতে সক্ষম হল। অতএব ষোড়শ লুই বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে ভাবরাজ্য হতে বাস্তবে রূপায়িত করলেন এবং নির্বুদ্ধিতার ফলে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটতে দিলেন যার ফলে নিজের ও রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সঙ্কটপূর্ণ করে তুললেন এবং ফরাসী জনসাধারণের মনে প্রজাতন্ত্রী ভাব দানা বাঁধতে থাকল।

ষ্টেটস জেনারেলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১২১৪। এই মহাসভায় উচ্চ শ্রেণীর যাজক প্রতিনিধি ৩০৮ জন, অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি ২৮৫ জন এবং তৃতীয় শ্রেণী—অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিলেন ৬২১ জন। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী ষ্টেটস জেনারেলের প্রতিনিধিবর্গ পৃথকভাবে বিভিন্ন পক্ষে গিয়ে প্রস্তাবাদি আলোচনা

করতেন এবং নিজ নিজ শ্রেণীর মতামত ব্যক্ত করতেন। কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময়ে শ্রেণী হিসেবে ভোট নেওয়া হত—কোন সদস্যের ব্যক্তিগত ভাবে একটি করে ভোট ছিল না। ফলে সাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া যেত না, কারণ প্রথম দুশ্রেণী সকল সময়েই বিরোধিতা করত। একারণে ষ্টেটস জেনারেলের অধিবেশন শুরু হবার সাথে সাথেই তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা পুরানো ব্যবস্থা নাকচ করতে চাইল এবং প্রত্যেক সদস্যের ভোট স্বতন্ত্রভাবে নেওয়া হক বলে দাবি করল। তাঁরা আরও দাবি করল যে তিনটি শ্রেণী একই সাথে সাধারণ কক্ষে বসে প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করবে। ষোড়শ লুই এই সময় নির্বোধের ন্যায় কাজ করলেন। তিনি অভিজাত শ্রেণী ও যাজক সম্প্রদায়ের সাথে একজোটে তৃতীয় শ্রেণীব দাবি মানতে সম্মত হলেন না। ফলে ষ্টেস্টস জেনারেল আহ্বান করে লুই যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা নিজের বুদ্ধির দোষে নষ্ট করলেন। দীর্ঘ ৫সপ্তাহ অচল অবস্থার পরে তৃতীয় শ্রেণী নিজেদের প্রকৃত গণ প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করলেন এবং অপর দুশ্রেণীর সম্মতি ছাড়াই তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি বর্গকে ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ বলে ঘোষণা করল (১৭ই জুন ১৭৮৯)।

ঘটনা প্রবাহের এই দ্রুত পরিণতি লক্ষ্য করে ষোডশ লুই ভীত হলেন এবং আর একটি ভুল পন্থা অবলম্বন করলেন যাব ফলে জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধে গেল। তিনি অভিজাত শ্রেণীর পরামর্শে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য পণ্ড করার জন্য ষ্টেটস জেনারেল অধিবেশন স্থগিত রাখলেন। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের এটি জানানো হল না। তাঁরা যথারীতি অধিবেশনে যোগদান করবার জন্য এসে সভা কক্ষের দরজা বন্ধ দেখলেন। ক্রুদ্ধ প্রতিনিধিরা নিকটবর্তী টেনিস-কোর্টে গিয়ে সমবেত হয়ে শপথ নিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ঠিক হল যে, যতদিন ফ্রান্সের জন্য একটি নতুন সংবিধান তাঁরা প্রণয়ন করতে না পারবেন ততদিন তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলবেন এবং কোনমতেই তাঁরা তাঁদের অধিবেশন বন্ধ করতে দেবেন না—ষোড়শ লুই-এর ভুল নীতির ফলে এটি সম্ভব হল। রাজা ছাড়াই জনপ্রতিনিধিরা দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কথা ভাবতে শুরু করলে। দুর্বলচিত্ত লুই নিজের পূর্বনীতিতে অটল থাকতে পারলেন না ; তিনি পুনরায় ষ্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করলেন, তবে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিদের জানিয়ে দিলেন যে পুরানো প্রথার কোনরূপ পরিবর্তন চলবেনা ভোটগণনা পদ্ধতি আগেকার মতন চলবে এবং একই কক্ষে তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিরা বসতে পারবে। এর ফলে তৃতীয়

শ্রেণীর জনসাধারণ রাজার ওপর আরও রুষ্ট হল এবং নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারক বলে মনে করল ? রাজার ক্ষমতা সীমিত করবার প্রস্তাব তুলল। অবশেষে লুই তৃতীয় শ্রেণীর দাবির নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু এটি এত বিলম্বে করলেন যখন অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। ফ্রান্সের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্যারিসের জনতার আবির্ভাব হয়েছে বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত অবিচারের বিরুদ্ধে তারা মাথা তুলে দাঁড়াল। রাজধানী প্যারিস এবং অন্যান্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিরাট জনতা ধ্বংসমূলক কাজে ব্যাপৃত হল। এমনকি জনসাধারণ রাজধানী প্যারিসের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিল এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীকরূপ ব্যাষ্টিল-এর দুর্গ আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিল। জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক-বিক্ষোভ চলতে থাকল। অভিজাত শ্রেণী ভীত হয়ে সমস্ত শ্রেণীর সমস্ত অধিকার বিসর্জন দিয়ে প্রাচীন যুগকে বিদায় দিল। বুভুক্ষু মহিলাদের এক গণ মিছিল জোর-পূর্বক রাজপরিবারকে ভার্সাই হতে ধরে নিয়ে এল এবং প্যারিসে আটক করে রাখল। সংক্ষেপে ফ্রান্সে বিপ্লব দেখা দিল। আর এই বিপ্লবের জন্য কৃতিত্ব হল রাজার। তিনিই তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা বিপ্লব সম্ভব করলেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, ডেভিড টমসনের উক্তিটি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন যোগ্য। আর কোথাও হক বা না হক, ফ্রান্সে মার্জিত রাজতন্ত্রের অবকাশ ছিল। জনসাধারণ ও তাদের নেতাদের রাজতন্ত্রে বিশ্বাসও ছিল। কিন্তু কল্যাণমুখী রাজতন্ত্র বাস্তবে রূপায়িত হবার সম্ভাবনা ছিল কম। যে কর্মপন্থায় এটি দেখা দিতে পারত সে কর্মপন্থা নেবার মত সাহস ষোড়শ লুই-এর ছিল না এবং তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশও এর অনুকূল ছিল না। ফলে আঠারো শতকের শেষার্ধে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটাতে রাজাই সাহায্য করলেন।

Q. 8. Give a brief account of the course of the French Revolution from 1789 to 1795 (C. U. 1954)

Ans. বিভিন্ন কারণে ফ্রান্সের রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। ষোড়শ লুই ভাল মানুষ ছিলেন। কিন্তু যে বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ় সঙ্কল্প থাকলে তিনি রাজশক্তিকে আসন্ন পতন হতে রক্ষা করতে পারতেন, তা তাঁর ছিল না। পনর বছর চেষ্টা করেও তিনি দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে পারলেন না।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি ফরাসী জাতির নিকট আবেদন জানালেন এবং ষ্টেটস জেনারেল নামক মহাসভা আহ্বান করলেন। ফলে রাজা অজ্ঞাতসারে দৈবস্বত্ব

শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করলেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই বাস্তিল কারাগারের পতন যুগান্তকারী ফরাসী বিপ্লবের সূচনা করল।

১৭৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে শীতকালে ফ্রান্সে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল হতে নির্বাচক মণ্ডলী নিজ নিজ অঞ্চলের অবস্থা বর্ণনা করে এবং নানা বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করে সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবগতির জন্য বিবরণী পাঠাল। এ সব বিবরণী ও সুপারিশকে ফরাসী ভাষায় বলা হয় ক্যাহিয়ার্স (cahiers)। এগুলি হতে তৎকালীন ফরাসী জনসাধারণের অভাবঅভিযোগ সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। তবে এগুলি রাজদ্রোহমূলক ছিল না।

ক্যাহিয়ার্স

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে স্টেটস্ জেনারেল-এর অধিবেশন বসল। সমাজের 'তৃতীয় শ্রেণী' হতে যে সব প্রতিনিধি এ সভায় এলেন তাঁরা সকলেই জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। তাঁরা প্রথমেই দাবি করলেন যে, সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিরা একত্রে বসবে এবং জনপ্রতি একটি ভোট দানের অধিকার থাকতে হবে। রাজা ও অভিজাত শ্রেণী এতে বাধা দিল। অবশেষে বিরক্ত হয়ে 'তৃতীয় শ্রেণী' নিজেদের 'জাতীয় পরিষদ' বলে ঘোষণা করল এবং অন্যান্য শ্রেণীকে জাতীয় সংস্কারে আত্মনিয়োগ করবার জন্য আহ্বান জানাল। রাজা প্রথমে বাধা দিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত সভাকক্ষ তালাবদ্ধ করে দিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা যখন এটি দেখলেন তখন তাঁরা পার্শ্ববর্তী টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হলেন এবং সমবেত সকলে একটি কঠিন শপথ গ্রহণ করলেন। দেশের জন্য উপযুক্ত সংবিধান রচনা না করে তাঁরা জাতীয় পরিষদ ছেড়ে যাবেন না। এই শপথ গ্রহণ পর্ব ইতিহাসে টেনিস কোর্ট শপথ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অনেকের মতে এই ঘটনা হতেই ফরাসী বিপ্লব শুরু হল।

স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন

জাতীয় পরিষদ গঠন

টেনিস কোর্ট শপথ

এরপর তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা রাজকীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের বাণী প্রচার করলেন। রাজা এদের দাবি উপেক্ষা করে এক ঘোষণা জারি করলেন যে তিন শ্রেণী যেন পৃথক ভাবে ভোট দেয়। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর নেতা মিরাবোঁ জবাব দিলেন, আমরা এখানে জনসাধারণের ইচ্ছাক্রমে এসেছি এবং শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আমরা এস্থান হতে সরব না। চাপে পড়ে রাজা তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিদের একই কক্ষে অধিবেশনে সমবেত হতে দিলেন। ফলে স্টেটস জেনারেল সভা জাতীয়

জাতীয় সংবিধান সভা গঠন

সংবিধান সভায় পরিণত হল। এই সভা ফ্রান্সের সংবিধান রচনায় আত্মনিয়োগ করল। কিন্তু এটি শান্তিপূর্ণভাবে হল না। জুলাই মাসে হঠাৎ এক গুজব রটল যে প্যারিসের জনসাধারণকে জব্দ করবার জন্য রাজা অনেক সৈন্য আমদানী করছেন। এই গুজব ফ্রান্সের জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করল। প্যারিসের জনসাধারণ হিংসার পথ বেছে নিল।

বাস্তিলের পতন

প্যারিসে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে জনতা রাজার স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গ অধিকার করে ধ্বংস করে দিল। বাস্তিলের পতন পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আধুনিক ঐতিহাসিকরা বাস্তিল আক্রমণকেই ফরাসী বিপ্লবের শুরু বলে মনে করেন।

কম্যুন ও জাতীয় রক্ষীদল

বিপ্লবের প্রসার : ইতিমধ্যে কম্যুন নামে জনসাধারণের এক প্রতিনিধি সভা প্যারিস শহরে পৌরশাসনের ভার নিল। সাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় রক্ষীদল নামে এক বেসরকারী সৈন্য দলের সৃষ্টি হল। প্যারিসের দেখাদেখি ফ্রান্সের অন্যান্য শহরেও কম্যুন ও জাতীয় রক্ষীদল গড়া হল। গ্রামাঞ্চলে অভিজাতদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভিযান শুরু হল।

নারী ভুখা মিছিল

এর ভেতর একদিন প্যারিসের দরিদ্র নারীরা ক্রোধ ও ক্ষুধায় উন্মত্ত হয়ে লাঠি, ডাণ্ডা প্রভৃতি নিয়ে খাদ্যের জন্য চীৎকার করতে করতে ১২ মাইল পথ হেঁটে ভার্সাই রাজপ্রাসাদে পৌছায় এবং রানীর কয়েকটি পরিচারিকাকে হত্যা করে। পরে রাজপরিবার সহ প্যারিসে ফিরে আসে। নারী-বাহিনীর এই অভিযান হতেই প্যারিস হ'ল বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র এবং প্যারিসের সর্বহারা হল বিপ্লবের নিয়ামক শক্তি। রাজ পরিবার এই যে প্যারিসে গেলেন আর সেখান হতে বের হতে পারেন নি। তাঁদের বন্দীদশা শুরু হল।

সংবিধান সভার কার্যাবলী

নতুন শাসনতন্ত্র : এদিকে **'জাতীয় সংবিধান সভা'** মহা উৎসাহে নতুন শাসনতন্ত্র তৈরী করতে প্রবৃত্ত হল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা রাষ্ট্রের লক্ষ্য বলে গৃহীত হল। অভিজাত ও যাজকদের বিশেষ সুবিধাগুলি লুপ্ত করা হল। সকলে আইনের চক্ষে সমান ও সকলেই ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ বলে ঘোষণা করা হল। রাজার শক্তি নিয়ন্ত্রিত করা হল। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশটিকে ৮৩টি বিভাগে ভাগ করা হল। সংক্ষেপে, ফ্রান্সে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র স্থাপন করা হল।

সংবিধান সভার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ হল ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্যের ঘোষণা। 'মানুষের ও নাগরিক অধিকার সমূহের ঘোষণা' নামক সনদে বলা হল মানুষ স্বাধীন হয়ে এবং সকলের সমঅধিকার নিয়ে জন্মায়। 'স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও অত্যাচারকে বাধা দেওয়া' তাদের অধিকার। বাক্-স্বাধীনতা সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি এই ঘোষণায় স্বীকৃতি লাভ করে।

অধিকার পত্র

সংবিধান সভা অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে ফ্রান্সকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। ফ্রান্সের চার্চ দেশের ভূ-সম্পত্তির $\frac{1}{5}$ অংশের মালিক ছিল। সংবিধান সভা চার্চের এ সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এবং এই সম্পত্তির জামিনত্বে কাগজী মুদ্রা প্রবর্তন করল। ধর্মযাজকদের রাষ্ট্রের বেতনভুক্ কর্মচারী বলে ঘোষণা করা হল।

প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা : সংবিধান সভা যখন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যস্ত, তখন মিরাবোঁ ষোড়শ লুই-এর পরামর্শদাতা হন। তিনি রাজাকে বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে ফ্রান্সে রাজশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মিরাবোঁর মৃত্যু হয়। ফলে ষোড়শ লুইকে সুপরামর্শ দেবার আর কেউ রইল না।

ইতিমধ্যে ফরাসী জনসাধারণের ভাবমানসে রাজকীয় মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। ফরাসী সংবাদপত্রগুলি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু করে। প্যারিসের সর্বহারাদের ঔদ্ধত্য দিন দিন বাড়তে থাকে। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ষোড়শ লুই থাকতে চাইলেন না। তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে জুন গোপনে ফ্রান্স হতে পালাতে চেষ্টা করেন কিন্তু ভেয়ারনে নামক জায়গায় ধরা পডলেন। এর ফল রাজতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক হল এবং প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারা শক্তি সঞ্চয় করল।

রাজার পলায়ন প্রচেষ্টা

ষোড়শ লুইয়ের পালাবার সময় হতেই ইউরোপীয় দেশগুলি ফরাসী বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে পড়ল।

ফরাসী রাণী মেরী এন্টোয়েনেট-এর ভ্রাতা অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড প্যাডুয়া নামক জায়গা হতে এক ঘোষণা জারি করলেন। এই ঘোষণাপত্রে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের এই বলে অনুরোধ করলেন যে তাঁরা যেন লুই-এর সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা বলে মনে করেন। প্রাশিয়ার রাজা এই আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং লিওপোল্ড-এর সাথে পিল্‌নিজ নামক স্থানে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। বৈঠক শেষে উভয়ে এক যুক্ত

বহিঃশত্রুর সাথে যুদ্ধারম্ভ

বিবৃতি প্রকাশ করলেন। এটিকে পিলনিজের ঘোষণা বলা হয়। এতে বলা হল যে, লুই-এর বিপদ ইউরোপীয় রাজাদের বিপদ-স্বরূপ। ইউরোপের রাজাদের সাহায্য পেলেই অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ফরাসী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

এদিকে ষোড়শ লুই অনিচ্ছার সাথে নতুন সংবিধান মেনে নিলেন। সংবিধান সভার কাজ শেষ হল। নতুন আইন সভা কাজ শুরু করল।

আইনসভা: নতুন আইনসভার সদস্যরা সকলেই ছিল শাসন-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। রোব্‌স্‌পিয়ারের প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান সভার কেউ-ই আইন সভার সদস্য হতে পারল না। আইনসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৪৫ জন। তারা প্রথম হতেই রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে চারিটি রাজনৈতিক দল দেখা দিল। যাঁরা নতুন শাসনতন্ত্র মেনে চলতে চাইল তাদের ফিউলাণ্টস বা সংবিধানপন্থী বলা হল। তারা আইনসভার গৃহের দক্ষিণ দিকে বসত। এই সভাগৃহের বাঁ দিকে যারা বসতে শুরু করল তাদের মধ্যে দুটি দল ছিল—জেকোবিন ও গিরণ্ডিস্ট।* আর যারা সভাগৃহের মাঝখানের আসনে বসত তারা ছিল মধ্যপন্থী নিরপেক্ষ দল।

আইনসভার রাজনৈতিক দলসমূহ

আইনসভাকে বেশ কয়টি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথমত, যে সব ধর্মযাজক নতুন শাসনতন্ত্র মানতে চাইল না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, দ্বিতীয়ত 'ইমিগ্রি' অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীর যে সব লোক বিদেশে চলে গিয়ে বিপ্লব-বিরোধী কাজ করছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অবশেষে আইনসভার অধিকাংশ সদস্য ফরাসী বিপ্লব বিরোধী রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই মনস্থ করল এবং এর আগে যে সব ধর্মযাজক নতুন শাসনতন্ত্র মানতে রাজী হয়নি তাদের পেনশন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বন্ধ করে দিল এবং দেশত্যাগী অভিজাতদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশে ফিরতে নির্দেশ দিল। অন্যথায় তাদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করল। রাজা ষোড়শ লুই আইনসভার এ দুটি আইন-ই ভিটো করলেন।

সমস্যা

ষোড়শ লুই-এর এই বিপ্লব-বিরোধী কাজে প্যারিসে এক প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। এক বিরাট মারমুখী জনতা রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করল। কিছুদিন পর

*আজকাল রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদল বলতে যা বোঝায় তা ফ্রান্সের আইন সভার সদস্যদের বসবার পদ্ধতি হতেই দেখা দিয়েছে।

রাজা তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে আইন সভাগৃহে আশ্রয় নিলেন। ইতিমধ্যে প্যারিসে 'বিপ্লবী কম্যুন' নামে জনতার এক নতুন সভা স্থাপন করা হল। এই সভা প্যারিসের নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। এরকম অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ডিউক অব ব্রান্সউইক এক ঘোষণা জারি করলেন যে, প্যারিসবাসী যদি রাজপরিবারের কোন ক্ষতিসাধন করে তবে তিনি সমুচিত শাস্তির বিধান করবেন।

ব্রান্সউইক ঘোষণা

ব্রান্সউইকের ঘোষণা প্যারিসের জনসাধারণকে আরও উত্তেজিত করল। তারা রাজতন্ত্রের অবসান চাইল এবং আইনসভা আক্রমণ করে সদস্যদের রাজতন্ত্র বাতিল করতে বাধ্য করল। উচ্ছৃঙ্খল জনতার জয় হল। রাজপরিবার টেম্পল নামক জেলখানায় বন্দী হলেন। ষোড়শ লুই-এর পদচ্যুতির সাথে সাথে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল বলা যায়। এদিকে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ান সৈন্যদল প্যারিসের দিকে এগিয়ে আসতে থাকায় প্যারিসের বিপ্লবী কম্যুন সন্দেহবশে কয়েক হাজার লোককে বন্দী করে এবং ১৭৯২-এর সেপ্টেম্বর মাসে তাদের হত্যা করে। এটি 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড

ষোড়শ লুই-এর পদচ্যুতির ফলে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র বাতিল হয়ে গেল। ন্যাশনাল কন্‌ভেন্‌শন নামে এক জাতীয় সভার ওপর নতুন শাসনতন্ত্র তৈরির ভার এসে পড়ল। এই জাতীয় কন্‌ভেন্‌শন প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারে নির্বাচিত হবে বলে বলা হল।

জাতীয় কন্‌ভেনশন আহ্বান

জাতীয় কন্‌ভেন্‌শন: ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই জাতীয় সভার অধিবেশন বসে। এই সময় ফ্রান্সের অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন ছিল। বিদেশী শত্রু কর্তৃক ফ্রান্স আক্রান্ত এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও শোচনীয় ছিল। প্রতি-বিপ্লবী দল শক্তি সঞ্চয় করে বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে।

বিভিন্ন দল

জাতীয় কন্‌ভেন্‌শনে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ছিল গিরণ্ডিস্ট ও জেকোবিন। এই দুটি দলের মধ্যে শাসনতন্ত্র নিয়ে কলহ দেখা দিল। গিরণ্ডিস্ট দল চাইল ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা বাড়ানো। জেকোবিন দল এর বিরোধী ছিল এবং প্যারিসের উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করল।

জাতীয় কন্‌ভেনশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের 'জনমত' তৈরী করা।

প্রথমেই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা হল। এর পর বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী এবং ওজন ও পরিমাপের জন্য 'মেট্রিক পদ্ধতি' গৃহীত হ'ল। শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হল। সবশেষে ষোড়শ লুইকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। ১৭৯৩-এর ২১শে জানুয়ারী হতভাগ্য ষোড়শ লুই প্রাণ হারালেন। এর পর গিরণ্ডিস্ট দলকে ক্ষমতার আসন হতে সরিয়ে জেকোবিন দল প্রাধান্য স্থাপন করল।

কার্যাবলী

ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের পর ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া স্পেন প্রভৃতি ছয়টি রাষ্ট্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফরাসী বাহিনী সর্বত্র পরাজিত হতে থাকল। এধারে ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও রাজতন্ত্রের পক্ষে আন্দোলন চলছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সে বিদ্রোহ দেখা দিল। বাইরে সংঘবদ্ধ শত্রু এবং ভেতরে বিদ্রোহ—এরা ফলে যে সঙ্কটের উদ্ভব হল তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা দিল '**সন্ত্রাসের রাজত্ব**'। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতি-বিপ্লবীশক্তি ধ্বংস করা। এর জন্য শক্তির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন বাইরের শত্রুকে নিধন করা হয়েছিল, তেমনি গিলোটিনের সাহায্যে ভেতরের শত্রু নিধন করা হয়।

সন্ত্রাসের রাজত্ব

সন্ত্রাস রাজত্বের সংগঠনের মধ্যে ছিল 'সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি'। দেশে শান্তি রক্ষার কাজ ও পুলিশী ক্ষমতা এটিকে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ছিল 'জন-নিরাপত্তা কমিটি'। তৃতীয়ত ছিল 'বিপ্লবী বিচারালয়'। চতুর্থত ছিল বিপ্লব স্কোয়ার-এ মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা। পঞ্চমত ছিল 'সন্দেহের আইন'। এই আইনের বলে যে কোন লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার ক্ষমতা-জননিরাপত্তা কমিটির ছিল। সন্ত্রাস রাজত্বকালে এক বছরের মধ্যে প্রায় ৫০০০ হাজার নাগরিকের গিলোটিনের তলায় প্রাণ যায়। এই সময় রোবস্পিয়ার ছিলেন ফ্রান্সের সর্বাধিনায়ক। এই শাসন কাল অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। রোবস্পিয়ারের পতনের সাথে সাথে সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হয়। যাই হোক্ সন্ত্রাস রাজত্বকালে ফ্রান্সে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এই শাসনব্যবস্থা স্থাপিত না হলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুর চাপে ফ্রান্স ধ্বংস হয়ে যেত।

সংগঠন

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌ভেন্‌শন ভেঙে দিয়ে 'ডাইরেক্টরী' নামে এক নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হন। এই শাসনব্যবস্থা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারল না। এর ফলে এগিয়ে এলেন এক যুগন্ধর পুরুষ। তাঁর নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সেনাবাহিনীর সহায়তায় ডাইরেক্টরীর অবসান ঘটল।

অবসান

Q. 9 Critically examine the work of the French Constituent Assembly. Discuss its success in solving the political and social problems of the day. Comment on the importance of the Declaration of the Right of Man and Citizens.

Ans. ১৭৮৯-এর অক্টোবর মাসের সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার পর জাতীয় সভা ফ্রান্সের জন্য এক সংবিধান রচনায় মনোযোগী হল। সংবিধান রচনার উপযোগী সময়ও অবশ্য দেশে দেখা দিল—প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের ভীতি দূর হল, প্যারিসের খাদ্য সঙ্কটের অবসান ঘটেছে; অভিজাতরা তাদের বিশেষ সুবিধাগুলি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার ফলে কৃষককুল সন্তুষ্ট—এমত অবস্থায় জাতীয় সভা তাড়াতাড়ি নতুন সংবিধান প্রবর্তনের চেষ্টা করল।

ভূমিকা

ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা : অবস্থার চাপে পড়ে ষোড়শ লুই তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিদের একই কক্ষে অধিবেশনে সমবেত হতে দিলেন। ফলে ষ্টেটস জেনারেল সভা জাতীয় সভায় বা সংবিধান সভায় পরিণত হল (১৭ জুন, ১৭৮৯) এই সভার সম্মুখে বিবিধ সমস্যা ছিল এবং এই সমস্যাগুলির মীমাংসার জন্য জাতীয় সভা তৎপর হল। আগষ্ট মাসে জমিদাররা স্বেচ্ছায় তাদের সামন্ততান্ত্রিক অধিকারগুলি ত্যাগ করল এবং ধর্মযাজকরাও তাদের পুরানো অধিকারগুলি ছেড়ে দিলেন। এই অধিকারগুলি তাঁরা বিনা খেসারতে ছেড়ে দিলেও তাঁরা কয়েকটি ব্যাপারে খেসারত পাবে বলে বলা হল। অভিজাতদের এই হৃদয় পরিবর্তন এত দেরিতে এল যে তার কোন সুফল পাওয়া গেল না। বিপ্লব শান্তিপূর্ণভাবে ঘটল না। ফ্রান্সের জনসাধারণ তখন হিংসার পথ বেছে নিয়েছে এবং বাস্তিলের পতন ঘটেছে। জাতীয় সভা প্রথমে এদিকটায় নজর দিতে চায়নি। জাতীয় সভা ষোড়শ লুইকে ফরাসী স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা বলে আখ্যায়িত করল এবং ফ্রান্সের সামন্ততন্ত্রের বিনাশ ঘটেছে বলে ঘোষণা করল। কিন্তু ফরাসী জনসাধারণ মনে করল যে রাজার বা অভিজাতদের এতে কৃতিত্ব নেই বরঞ্চ জনসাধারণই তাদের সক্রিয় আন্দোলনের দ্বারা তাদের হারানো স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছে এবং জাতীয় সভা নয়, কৃষক সম্প্রদায়ই সামন্ত প্রথার বিলোপ সাধন করেছে।

জনসাধারণের মনোভাব

এই নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাতীয় সভা জনসাধারণের সাথে সংযোগ রাখতে পারল না এবং জাতীয় সভা যে জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি তাও প্রমাণ করতে পারল না।

নতুন সংবিধান: মানবাধিকার ঘোষণা: নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের শুরুতে জাতীয় সভা ইংলণ্ডের ম্যাগনাকার্টা ও আমেরিকায় স্বাধীনতা ঘোষণার অনুকরণে মানুষ ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা পত্র প্রচার করল (Declaration of the Rights of Man and Citizen) এই ঘোষণাপত্রে ফরাসী নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলির উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় যে,—মানুষ স্বাধীন ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মূলতঃ প্রজাদের মধ্যে নিহিত; আইন জনসাধারণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি, সুতরাং আইনের চোখে সকলেই সমান, ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, বেআইনী ভাবে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ করা যাবে না। এছাড়া, সম্পত্তি ভোগের স্বাধীনতা অন্যায় অত্যাচারের বিরোধিতা করা এবং ধর্মমত অনুসরণের স্বাধীনতা স্বীকার করা হল। এই ঘোষণাটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। যুগে যুগে ফরাসী জনসাধারণকে এটি প্রেরণা জুগিয়েছে এবং এমন কি ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের মুখবন্ধে এই ঘোষণার উল্লিখিত নীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হয়েছে।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে এটি একটি ঘোষণা ছিল—কতকগুলি সার্বিক নীতি নির্ধারণ করা হয় যার ওপর ভিত্তি করে জাতীয় সভা ফরাসী সমাজ ও সরকারকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল। দ্বিতীয়, এটি হল অধিকারসমূহের ঘোষণা নাগরিকদের কর্তব্যের এতে উল্লেখ ছিল না। তৃতীয়ত, এটি হল মানবাধিকারের ঘোষণা; কেবলমাত্র ফরাসী জনসাধারণের কথাই চিন্তা করা হয়নি, সর্বদেশের শোষিত মানুষের কথা চিন্তা করা হয়েছে। ঘোষণার এই সর্বজনীনতা বা আন্তর্জাতিকতার মূল্য পরবর্তী কালে আরও স্পষ্টভাবে দেখা দেবে। সবশেষে বলা যায় যে এই ঘোষণায় যে সব নাগরিক অধিকারগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি তৎকালীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করল। তারা এগুলি পাবার জন্যই বহুদিন হতে চেষ্টা করে আসছিল।

ঘোষণাটির তাৎপর্য

এই ঘোষণাটিকে অবাস্তব বলা চলে না। তৎকালীন ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় এই ঘোষণা জারি করা হয়। সে কারণে ঘোষণাটির ব্যবহারিক দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটিতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উল্লেখ করা হয়নি, কারণ এই স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণী হস্তগত করেছিল। ঘোষণাটিতে দল গড়বার ও সভা ডাকবার স্বাধীনতা, শিক্ষা নেবার স্বাধীনতা (১) সামাজিক সাম্যের কথার উল্লেখ নেই। কারণ পুরানো রাজতন্ত্র নষ্ট করবার জন্য এগুলির প্রকৃত মূল্য তখন বিশেষ ছিল না। এই ঘোষণাটিকে অবশ্য

গণতন্ত্রের ঘোষণাপত্র বলা যায় না। পূর্ণবয়স্ক ভোটাধিকারের কোন উল্লেখ করা হয়নি। তৃতীয় ষ্টেটের প্রতিনিধিরা এবং ক্যাহিয়ার্সগুলি যে সব অধিকার দাবি করে আসছিল সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা এই ঘোষণাটিতে করা হয়। ষোড়শ লুই এই ঘোষণায় প্রথমে সম্মতি দেননি। পরে অবশ্য এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যার ফলে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি: মানুষ ও নাগরিকের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা-পত্র প্রকাশের পর সংবিধান সভা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটি নতুন সংবিধান রচনা করল। এই সংবিধান রচনায় এ বি সিইয়েশ-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নতুন সংবিধানে বলা হল যে ফ্রান্স রাজা ও একটি আইন সভা দ্বারা শাসিত হবে। রাজার ক্ষমতা একেবারে সীমিত করে দেওয়া হল। বংশগত রাজতন্ত্র টিকিয়ে রাখা হল এবং রাজাকে শাসন-বিভাগের প্রধান বলে ঘোষণা করা হল। আইন সভার বাইরে হতে তিনি মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন বলে বলা হল। সামরিক বিভাগের তিনিই সর্বাধিনায়ক থাকবেন এবং মন্ত্রীরা তাঁর নিকট দায়ী থাকবে বলে উল্লেখ করা হল। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা বা সন্ধি স্থাপনের অধিকার হতে রাজাকে বঞ্চিত করা হল। এই ক্ষমতা দেওয়া হল আইন সভাকে। রাজপরিবারের ব্যয় যাতে সীমা ছাড়িয়ে যেতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল।

রাজার ক্ষমতা

দেশের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হল ৭৪৫ জন সদস্য নিয়ে এক কক্ষ-বিশিষ্ট আইন সভার ওপর। এই সভার সদস্যরা জনসাধারণের ভোটের দ্বারা দুবছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। জনসাধারণের ভোটাধিকার নির্ধারিত হল নির্দিষ্ট প্রত্যক্ষ কর প্রদানের ভিত্তিতে। নাগরিকদের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় (Active and Passive) এই দুভাগে ভাগ করা হল। এর ফলে গোটা দেশে মাত্র ৩৫ হাজার নাগরিক ভোটাধিকার পেল। আইন সভা দেশের সমস্ত আইন প্রণয়ন করবে। আইন সভায় গৃহীত আইন নাকচ করবার অধিকার রাজাকে দেওয়া হল না। তবে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবার অধিকার রাজাকে দেওয়া হল। তবে আইন সভার তিনটি অধিবেশনে গৃহীত হলে রাজার সম্মতি ব্যতীতই নির্দিষ্ট আইনটি প্রযুক্ত হবে বলে বলা হল।

আইনসভা ও ভোটাধিকার

শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা: শাসন ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন আনা হল। ফ্রান্সের পুরানো শাসন বিভাগ বাতিল করে তার জায়গায় সমআয়তন ও সমানাধিকার বিশিষ্ট ৮৩টি ডিপার্টমেন্টে সমগ্র দেশকে বিভক্ত করা হল। প্রত্যেক

ডিপার্টমেণ্ট কয়েকটি জেলায় এবং প্রত্যেক জেলা কয়েকটি ক্যানটনে এবং এক একটি ক্যানটন কয়েকটি কমিউনে বিভক্ত হল। স্থির হল যে ডিপার্টমেণ্ট হতে কমিউন পর্যন্ত শাসিত হবে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা। এর ফলে শাসন কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকৃত হল এবং জনসাধারণ প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক হল।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগেও এক বিরাট পরিবর্তন আনা হল। জমিদারদের বিচারালয়ের বিলোপ সাধন করে বিচার বিভাগ পুনর্গঠিত হল। সর্বনিম্ন আদালত হতে সর্বোচ্চ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা হল। আটক ব্যক্তিদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করা হল এবং বেআইনী ভাবে ধরপাকড করা নিষিদ্ধ হল। বিচারকরা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন বলে বলা হল। গোটা দেশে একই আইন চালু করার চেষ্টা করা হল।

রাজস্ব

রাজস্ব বিভাগেও পরিবর্তন আনা হল। কমিউনগুলিকে নিজ নিজ এলাকায় খাজনা ধার্য করবার ও আদায় করবার দায়িত্ব দেওয়া হল। পরোক্ষ কর তুলে দেওয়া হল। নিজ নিজ অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবার ভার কমিউনগুলির ওপর বর্তাল এবং এর জন্য প্রত্যেকটি কমিউনই স্থানীয় রক্ষীবাহিনী গঠন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেল। স্মরণ রাখতে হবে যে ব্যাস্টিলের পতনের পর গ্রামাঞ্চলে কৃষকসম্প্রদায় সামন্তবিরোধী সংগ্রাম শুরু করে যার ফলে সামন্তজীবনের সকল চিহ্নই ফ্রান্স হতে উঠে যায়। এই বিপ্লবকে সার্থক করবার জন্য নগরে ও গ্রামে সংগ্রামী জনতার নেতৃত্বে কমিউন গড়ে ওঠে। ১৭৯০এ ফ্রান্সে সর্বসমেত ৪৩৩৬০টি কমিউন ছিল।

চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

অর্থনৈতিক সংস্কার : ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুরবস্থা কিন্তু সহজে দূর করা গেল না, বরঞ্চ বিপ্লব শুরু হবার ফলে এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। জাতীয় সভা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসানের জন্য একটি নতুন উপায় গ্রহণ করল। ফ্রান্সের চার্চের অধিকারে বিপুল ভু-সম্পত্তি ছিল। জাতীয় সভা চার্চের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এই সকল সম্পত্তির আনুমানিক মূল্যের ভিত্তিতে আসাইনেট (Assignat) নামক একপ্রকার কাগজের নোটের প্রচলন করল। এর ফলে সাময়িকভাবে সরকারের আথিক দুর্গতি দূর হল।

চার্চের কেবল ভু-সম্পত্তিই বাজেয়াপ্ত করা হল না যাজকাশ্রম ও ধর্মসংগঠনগুলি ভেঙে দেওয়া হল। ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি গৃহীত হল। চার্চ তার ধর্মসম্বন্ধীয় পুর্বেকার কর আদায়ের ক্ষমতা হারাল। যাজক সম্প্রদায়কে সর্বপ্রকারে সরকারী

নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য 'Civil Constitution of the Clergy' রচনা করা হল। এই ব্যবস্থা অনুসারে চার্চের পৃথক সত্তা লোপ করা হল। স্থির হল যে, এরপর বিশপ ও গ্রাম্যযাজকরা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হবে এবং তারা প্রত্যেকেই সরকারের বেতনভুক্ কর্মচারীরূপে গণ্য হবে। ধর্মযাজক নিয়োগ ব্যাপারে পোপের কোন হাত থাকবে না। এছাড়া ক্যাথলিক ধর্মযাজক নির্বাচনে প্রোটেস্টাণ্টরাও অধিকার পেল। চার্চ সংগঠনেও পরিবর্তন আনা হল। ডাওসেসগুলি পুনর্গঠিত হল। Civil Constitution of the Clergy ধর্মভীরু জনসাধারণের একদিকে যেমন ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করল, অন্যদিকে প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে জোরদার করল। পোপ এই ব্যবস্থার নিন্দা করলে এটি সাংঘাতিক রূপ ধারণ করল।

ধর্মসম্বন্ধীয়

সংবিধান সভার কার্যাবলীর গুরুত্ব ও সমালোচনা: সংবিধান সভা বা জাতীয় পরিষদের কার্যাবলীর গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল। এর প্রধান কৃতিত্ব হল ফ্রান্সে এক নতুন যুগের সূচনা, যে যুগে রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থাকবে না বলে মনে করা হল। ফ্রান্সের সমাজজীবনে যে সব বৈষম্যমূলক বিধিব্যবস্থা চলে আসছিল সেগুলির অবসান ঘটান হল। জাতীয় সভার সবিশেষ চেষ্টার ফলে পুরাতন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটল এবং প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হল। জাতীয় সভা ফ্রান্স তথা ইউরোপকে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান প্রদান করল যে সংবিধানে মন্তেস্কু প্রস্তাবিত ক্ষমতা-বিভাজন নীতিকে মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া ফ্রান্সের পুরানো প্রদেশগুলি তুলে দিয়ে সমান আয়তন ও সমান সুবিধাভোগী ডিপার্টমেন্টের প্রবর্তন করাতে প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিকতার বিলোপ ঘটে এবং এক ঐক্যবদ্ধ জাতির আবির্ভাব হল।

ভাল দিক

সংবিধান সভার কার্যাবলী অবশ্য ত্রুটিশূন্য ছিল না। এই সভা বাস্তব অবস্থার দিকে বিশেষ নজর না দিয়ে ভাবাবেগ ও আদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল বলে এর প্রবর্তিত নতুন সংবিধান ও অন্যান্য কার্যাবলীতে বহু দোষত্রুটি থেকে যায়।

ত্রুটি

প্রথমত, নতুন শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের শাসন বিভাগকে দুর্বল করার ফলে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা কার্যকরী হতে পারেনি। রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা রাজা ও মন্ত্রীগণের ওপর দেওয়া হয়। কিন্তু রাজার হাতে আইন তৈরী করার ক্ষমতা বা এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এর ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থা যে দুর্বল হয়ে পড়বেই তা সংবিধান সভার সদস্যরা বুঝতে পারেননি। শাসন পরিচালনার অধিকারী-

মন্ত্রীদের আইন সভার সদস্য হতে না দেওয়ায় মন্ত্রীদের সাথে জনসাধারণের সরাসরি যোগাযোগ যে বন্ধ হয়ে যাবে তা চিন্তা করা হল না। রাজাকে সাময়িকভাবে আইন স্থগিত রাখার ক্ষমতা দিয়ে রাজার অবস্থা আরও শোচনীয় করা হল। ভবিষ্যতে রাজা ও আইনসভার মধ্যে মতবিরোধ ও ভুল বোঝাবুঝির পথ প্রশস্ত করা হল।

দ্বিতীয়ত, আর্থিক সংগতির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রবর্তিত করার ফলে জাতীয় সভা তার পূর্বেকার বহুঘোষিত মানবাধিকার ঘোষণার নীতি জলাঞ্জলি দিল। ফ্রান্সের বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র অল্পসংখ্যক নাগরিক ভোটাধিকার পেল এবং প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব বুর্জোয়া শ্রেণীর কুক্ষিগত হল। জনসাধারণের নিকট জাতীয় সভার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেল এবং লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হল।*

তৃতীয়তঃ বিচার-বিভাগে যে সব সংস্কার সাধন করা হল তাতেও ত্রুটি ছিল বহু। বিচারক নিয়োগের অধিকার জনসাধারণের হাতে দেওয়ায় বিচার-বিভাগে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হল। বিচারকদের স্বাধীন মতামত বলে কিছু থাকল না; তাদেব মধ্যে জনতাকে তুষ্ট করার প্রবণতা দেখা দিল।

চতুর্থত, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অকস্মাৎ আমূল পরিবর্তন আনার ফলে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হল। তাছাড়া শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দক্ষ লোকের অভাব হল। তদুপরি, অত্যধিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল।

পঞ্চমত, 'Civil Constitution of the Clergy' প্রবর্তনের ফলে প্রতি-বিপ্লবী শক্তি আরও শক্তিশালী হল এবং বিপ্লব-বিরোধী তৎপরতা বিশেষভাবে চলতে থাকল। নিম্নপর্যায়ের যাজকগণ বিপ্লবকে গ্রহণ করেছিল। এসব যাজকদের জনসাধারণের ওপর বিশেষ প্রভাব ছিল। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং সমস্ত যাজকদের সরকারী কর্মচারীতে পরিণত করার ফলে যাজক সম্প্রদায় বিপ্লবের বিরুদ্ধে গেল। তারা ধর্মভীরু জনসাধারণকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল, ফলে ভবিষ্যতে নানাস্থানে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল।

জাতীয় সভার অর্থনৈতিক, শুল্ক ও রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি কৃষক সম্প্রদায়কে নিরাশ এবং বিপ্লব-বিরোধী করে তুলল।

*"Despite its great achievements in constructive reform, the Assembly had long forfeited popular support by the exclusiveness of its concern for the narrow interests of the middle-class notables............it was a tired and discredited Assembly which closed its doors at the end of September. "New Camb. Modern *History* Vol. VIII

উপসংহারে বলা যায় যে সংবিধান সভা রোবসপিয়রের প্রস্তাব গ্রহণ করে খুবই ভুল করল। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে সংবিধান সভার কোন সদস্য নতুন আইন সভার সদস্য হতে পারবে না। ফলে সংবিধানসভার অভিজ্ঞ সদস্যরা দেশসেবা হতে বঞ্চিত হল এবং জনসাধারণও তাদের নিকট হতে যা আশা করছিল তা হতে বঞ্চিত হল নতুন আইন সভার সদস্য সকলেই অনভিজ্ঞ হওয়ায় সংবিধানকে কার্যকরী করার দিকে তাদের ইচ্ছা ছিল না। ফলে সংবিধান সভার কার্যাবলী সম্পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারল না।

মন্তব্য

Q. 10. Describe the work of the Legislative Assembly. Why did constitutional monarchy fail in France? Account for the fall of monarchy in France.

Ans. **আইন সভার কার্যাবলী :** ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর নতুন সংবিধান অনুসারে আইনসভার অধিবেশন শুরু হল। ৭৪৫ জন এই সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে শাসনকার্যে ওয়াকিবহাল লোকের সংখ্যা নগণ্য ছিল। সংবিধান সভার কোনো সদস্য এই সভার সদস্য হতে পারলেন না। অবশ্য আইন সভার সদস্যরা বিদ্যাবুদ্ধিতে সংবিধান সভার সদস্যদের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের হলেও তাঁরা ধনী ছিলেন না। আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, ডাক্তারদের সংখ্যাই আইন সভার সদস্যদের মধ্যে বেশি ছিল। কয়েকজন উদারনৈতিক অভিজাত ও যাজক অবশ্য সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। এই আইন সভায় সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মপন্থা অনুযায়ী প্রধানতঃ তিনটি দল ছিল—শাসনতান্ত্রিক (Feuillants বা constitutionalist), গিরণ্ডিষ্ট ও জেকোবিন। এছাড়া বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দলগুলির মধ্যে ছিল বহু মধ্যপন্থী সদস্য—এদের সেণ্টার দল বলা যায়। এদের সংখ্যা ছিল ৩৫০। শাসনতান্ত্রিক দল ১৭৯১-এর সংবিধানকে পুরোপুরিভাবে চালু রাখতে ইচ্ছুক ছিল। তারা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ চাইত না। গিরণ্ডিষ্ট দল উগ্র বামপন্থী না হলেও রাজতন্ত্র পছন্দ করত না। জেকোবিন দল উগ্র বামপন্থী ছিল। এদের সংগঠনও যেমন সুদৃঢ় ছিল তেমনি কার্যক্রমও খুবই উগ্র ছিল। এদের প্রভাব প্যারিসেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের স্বরূপ

আইন সভার কার্যাবলী : আইন সভাকে প্রথমেই প্রতি-বিপ্লবী দুটি শক্তির সাথে বোঝাপড়া করতে হল। প্রথমত ফ্রান্সের যে সমস্ত ধর্ম যাজক Civil Constitution of the Clergy মেনে নেয়নি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হল। দ্বিতীয়ত, যে সব অভিজাত ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় দেশ হতে পালিয়ে গিয়ে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বিপ্লব বিরোধী

সমস্যা

কার্যে লিপ্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। এই অভিজাতদের Emigre বা দেশত্যাগী বলা হত।

Civil Constitution-এর বিরোধী ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে আইন সভা এই মর্মে ব্যবস্থা গ্রহণ করল যে এরূপ যাজকরা সরকারী বৃত্তি ও পেনশন পাবে না এবং কোন অশান্তি ঘটলে তাদের দায়ী করা হবে এবং রাষ্ট্রদ্রোহী বলে গণ্য হবে।

সমস্যার সমাধান

দেশত্যাগী অভিজাতদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল তাতে বলা হল যে দেশত্যাগীরা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দেশে ফিরে না এলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সরকারের হাতে ধরা পডলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ষোড়শ লুই তাঁর পরামর্শদাতাদের কথা শুনে আইন সভার এ দুটি প্রস্তাব তাঁর 'ভিটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাময়িক ভাবে নাকচ করে দিলেন। ফলে বামপন্থী দল ক্ষিপ্ত হল, প্যারিসের জনতার ক্ষোভ ফেটে পডল। তারা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে রাজাকে প্রস্তাব দুটি মেনে নিতে বাধ্য করল। ফরাসী বিপ্লব বাঁকা পথ গ্রহণ করল।

আইন সভার বৈদেশিক নীতি ঃ এই সময় বিপ্লবী ফ্রান্সের সাথে ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সংগ্রাম শুরু হল। এতদিন অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি ফরাসী বিপ্লবের ঘটনাবলী নিরপেক্ষ দর্শকের মত লক্ষ্য করে আসছিল। কিন্তু বিপ্লবী ফ্রান্স যখন কেবলমাত্র ফ্রান্সেই নয় সমগ্র ইউরোপে বিপ্লবের আদর্শ ছডাতে চাইল তখন এসব রাষ্ট্র আর চুপ করে বসে রইল না, বিপ্লবী ফ্রান্সকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করল।

বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের ইচ্ছা

আইন সভার সংবিধান-পন্থীরা যুদ্ধ চাইছিল। গিরণ্ডিস্ট দলও যুদ্ধ চাইল। তারা যুদ্ধের মাধ্যমেই ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ ইউরোপের প্রসারিত করা যাবে বলে মনে করল। জেকোবিন দল কিন্তু যুদ্ধের বিরোধী ছিল। এই দল মনে করল যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হবে। কিন্তু সংবিধানপন্থী ও গিরণ্ডিস্ট দলেরই জয় হল। ১৭৯২ এর মার্চমাসে বিপ্লবী ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

যুদ্ধনীতি

যুদ্ধের প্রথমদিকে ফরাসী বাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হল। অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ইতিমধ্যে প্যারিসের মারমুখী জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল। রাজা তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে আইন সভায় আশ্রয় নিলেন। ইতিমধ্যে প্যারিসে 'বিপ্লবী কমিউন' নামে জনতা এক নতুন সভা স্থাপন করে প্যারিসের নাগরিক জীবনকে

ফলাফল

নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। এই কমিউন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র স্থাপনে উদ্যোগী হল। এরকম অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ডিউক অব ব্রান্সউইক এক ঘোষণা জারী করলেন যে, প্যারিসবাসী যদি রাজপরিবারের কোন ক্ষতি সাধন করে তবে তিনি সমুচিত শাস্তির বিধান করবেন। এই ঘোষণা প্যারিসের জনসাধারণকে আবও উত্তেজিত করল। তারা রাজতন্ত্রের অবসান চাইল এবং আইন সভা আক্রমণ করে সদস্যদের রাজতন্ত্র বাতিল করতে বাধ্য করল। উচ্ছৃঙ্খল জনতার জয় হল। রাজপরিবার টেম্পল নামক জেলখানায় বন্দী হলেন। ষোড়শ লুই-এর পদচ্যুতির সাথে সাথে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল বলা যায়। আইন সভা বাতিল করে পুরুষের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় কনভেনশন ডাকা হল।

Q. 11. Discuss the role of Mirabeau in the French Revolution. *Or*, Examine critically the role of Mirabeau in the French Revolution.

Ans. ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ও সুবক্তা মিরাবোঁ ১৭৪৯-এর মার্চে জন্মগ্রহণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর পূর্বপুরুষরা অভিজাত শ্রেণীর খেতাব (মারকুইস) পান। মিরাবোঁ যখন তিন বছরের শিশু তখন তাঁর বসন্ত রোগ হয় এবং এর ফলে তাঁর মুখমণ্ডল কুৎসিত আকার ধারণ করে। এর পর যে কোন কারণেই হোক তাঁর পিতার স্নেহ হতে তিনি বঞ্চিত হতে থাকেন। বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করে মিরাবোঁ অশ্বারোহী সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেন (১৭৬৭)। এই সময় এক প্রণয় ঘটিত ব্যাপারে তিনি জড়িয়ে পড়েন এবং তাঁর পিতা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে লেত্রি ডি কেশে (Letters de Cachet)-এর বলে তাঁকে এক দ্বীপে অন্তর্রীণ করে রাখবার ব্যবস্থা করেন। এখানে স্মরণযোগ্য যে লেত্রি ডি কেশে কেবল মাত্র রাজাই ব্যবহার করতেন না, অভিজাত শ্রেণীর পরিবারের প্রধানগণ নিজ নিজ পরিবারের অবাধ্য ও দুষ্ক্রিয় সন্তানদের সংশোধন করবার জন্য এর দ্বারা জেলখানায় আটক রাখতে পারতেন। মিরাবোঁ যেরূপ দুর্দান্ত স্বভাবের ছিলেন তার জন্য তাঁকে অন্তরীণে পাঠানো তাঁর পিতার পক্ষে অন্যায় ছিল না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মিরাবোঁকে আমরা অন্যরূপে দেখতে পাই। এই সময় হতে যে সব গুণের জন্য তিনি ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন সেগুলি ফুটে উঠতে থাকে।

ব্যক্তিগত জীবন

অন্তরীণ অবস্থা কাটিয়ে মিরাবোঁ পুনরায় সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেন এবং কর্সিকা দখলে কৃতিত্ব দেখান। এরপর তিনি কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে

লেত্রি ডি কেশে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য। এই পুস্তিকায় তিনি ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থাকে দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই সমালোচনা করলেন না, সাংবিধানিক দিক হতেও এটি কিরূপ বেআইনী ছিল তার উল্লেখ করলেন। এই রচনাটির মধ্যে মিরাবোঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, ইতিহাসনিষ্ঠ মন, দার্শনিক প্রত্যক্ষণ এবং সাবলীল রচনাশৈলীর ও বলিষ্ঠ মতবাদের নিদর্শন মেলে। এবং এগুলির জন্য মিরাবোঁ ফরাসী বিপ্লবের প্রথমদিকে বিপ্লবী ফ্রান্সের নেতা হতে পেরেছিলেন।

লেখক হিসেবে

বিপ্লব শুরু হবার পূর্বে-মিরাবোঁ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং কিছুদিনের জন্য ইংল্যাণ্ডে বসবাস করেন। এই সময় তিনি হুইগদলের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক চক্রের সদস্য হন। সার গিলবার্ট ইলিয়াট, লর্ড ল্যান্সডাউন ও স্যার স্যামুয়েল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্যার স্যামুয়েল মিরাবোঁ সম্বন্ধে তাঁর আত্মচরিতে যা লিখেছেন তা হতে মিরাবোঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে পারা যায়।

বিদেশ ভ্রমণ

মিরাবোঁ হচ্ছেন একজন সুরুচিসম্পন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি। তৎকালীন স্বনামধন্য প্রায় সমস্ত লোকের সাথেই তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি গবিত অবশ্যই ছিলেন এবং নিজের সম্বন্ধে খুবই উচ্চ আশা পোষণ করতেন। তিনি তাঁর লেখনী ও কার্যাবলীর দ্বারা জনসাধারণের ভাল করতে চাইতেন, এবং কখনো কারও ক্ষতি করার চেষ্টা করতেন না। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনো চেষ্টা করেন নি এবং লক্ষ্যে পৌছাতে যে উপায় গ্রহণ করা হবে তা যেন সৎ হয় সেকথা তিনি বলতেন। পরবর্তীকালে এবং তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এ গুণ দেখতে পাওয়া যায়নি, তিনি কখনো অর্থ নিয়ে মতামত প্রকাশ করতেন না বা নিজের আদর্শ হতে বিচ্যুত হতেন না।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মিরাবোঁ পররাষ্ট্র দপ্তরে চাকরি পান এবং ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারগেনিজের নজরে আসেন। প্রাশিয়ার রাজদরবারে ফরাসী দূত হিসেবে তিনি প্রায় বছর খানেক থাকেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি বৃত্তান্ত রচনা করেন। কূটনীতিজ্ঞ হিসেবে কিন্তু মিরাবোঁ বিশেষ নাম করতে পারেননি। এবং কূটনীতিতে যে সব গুণ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয় তা তাঁর ছিল না। এর একটা কারণ হল তিনি নিজেকে এত বড মনে করতেন যার ফলে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে বিশেষ নজর দিতেন না।

রাজকর্মচারী হিসেবে

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে স্টেটস জেনারেল মহাসভা আহ্বান করার সাথে সাথেই মিরাবোঁর এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়। তিনি বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে কতটা দক্ষ ছিলেন তা সকলে বুঝতে পারল।

রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

মিরাবোঁ প্রথমে প্রভেন্স প্রদেশ হতে অভিজাত শ্রেণীর মধ্য হতে স্টেটস জেনারেলে নির্বাচিত হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি তৃতীয় শ্রেণী থেকে নির্বাচিত হন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মে স্টেটস জেনারেলের উদ্বোধনের দিন তিনি উপস্থিত ছিলেন। এবং এই দিন হতে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কটি বছর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সংবিধান সভার সঙ্কটময় সময়ে তাঁর অবদান অল্প নয়। যদিও তাঁর সকল প্রচেষ্টা সফল হয়নি তবু এটা উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলিতে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

স্টেটস জেনারেল সদস্য হিসেবে

মিরাবোঁর যুক্তিনিষ্ঠ মতামতগুলি বিশেষ ভাবে স্মরণ করবার মত। তিনি কেবলমাত্র রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, সুবক্তাও ছিলেন। প্রথম হতেই মিরাবোঁর মত ছিল যে সরকারের কর্তব্য হল দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যার ফলে অধিকাংশ লোক শান্তিপুর্ণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবে এবং এর জন্য দক্ষ ও ক্ষমতাশালী সরকারের প্রয়োজন, একারণেই তিনি সরকারের শাসন বিভাগকে ক্ষমতাশালী করতে চেয়েছিলেন এবং সংবিধানেও তাঁর মতবাদের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এটা তিনি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করতেন যে সরকারকে ক্ষমতাশালী হতে হলে তাকে জনসাধারণের প্রিয়ভাজন বা আস্থা অর্জন করতেই হবে। তিনি ইংরাজদের শাসনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন বলে অনুরূপ শাসনতন্ত্র ফ্রান্সে প্রবর্তন করতে আগ্রহী হন।

রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে

স্টেটস জেনারেলের প্রথম কয়েকমাসের ইতিহাস মিরাবোঁর ইতিহাস। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা অতি সহজেই স্টেটস জেনারেলের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে গণ্য হলেন। তাঁর প্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতার ফলে স্টেটস জেনারেল জাতীয় পরিষদে পরিণত হল এবং ষোড়শ লুই ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি স্টেটস জেনারেলের পুরানো কাঠামো ও অধিবেশন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আনলেন। রাজাকে প্যারিস হতে সৈন্য সরিয়ে নিতে বাধ্য করলেন। বাস্তিলের পতনের পর যখন বিপ্লবের সফলতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল, তিনি তখন সংবিধান সভাকে তাত্ত্বিক আন্দোলন হতে বিরত হয়ে বাস্তবধর্মী নীতি গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি সামন্ত প্রথা বিলোপ সাধনের জন্য তৎকালীন ফ্রান্সের অবস্থা অনুযায়ী এর বাস্তবধর্মী সংবিধান প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানালেন। **যখন দেশে অরাজকতা দেখা দিয়েছে সে সময় মানবের অধিকার ঘোষণার কোন মূল্য নেই বলে তিনি অভিমত দেন।** কিন্তু তাঁর মতামত উপেক্ষা করা হয় এবং সংবিধান

সভা এই নিয়েই প্রায় দুমাস ধরে তাত্ত্বিক আলোচনা চালায়। এর ফলস্বরূপ দেখা গেল ভার্সাই প্রাসাদ অভিমুখে জঙ্গী জনতার অভিযান এবং রাজা ও তাঁর পরিবারবর্গের বন্দীদশার শুরু। মিরাবোঁ দেখলেন তাঁর বাগ্মিতা যখন কার্যকরী হচ্ছেনা তখন তিনি এমন উপায় অবলম্বন করতে চেষ্টা করলেন যার ফলে সংবিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা তাঁকে সাহায্য করে। তিনি গ্রেটবৃটেনের মন্ত্রিসভার মত একটি শক্তিশালী মন্ত্রিসভা ফ্রান্সে স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রস্তাব দিলেন। এবং এই মন্ত্রিসভা জাতীয়-পরিষদের নিকট জবাবদিহি থাকবে বলে উল্লেখ করলেন। অবশ্য, জাতীয় পরিষদের সদস্যরা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হবে, জনসাধারণের ভোটাধিকার প্রসারিত করা হবে। এ সম্বন্ধে তিনি ল্যাফায়েট ও নেকার-এর সহযোগিতা পাবার চেষ্টা করেন। নিজে মন্ত্রী হবারও সখ তাঁর প্রথমে ছিল কিন্তু মেরী এ্যান্টোনেট তাঁকে একেবারেই পছন্দ করবেন না বলে তাঁর এই মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি।

বিপ্লব যখন বিপথগামী হল এবং প্যারিসের জনতা ফ্রান্সের রাজনীতি পরিচালিত করতে থাকল সেই সময় বিপ্লব সম্বন্ধে মিরাবোঁর মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর অভিমত

তিনি রক্তাক্ত বিপ্লব চাননি, তিনি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কিরূপ হওয়া উচিৎ সে সম্বন্ধে এক খসড়া প্রণয়ন করেন। তাঁর এই খসড়া প্রস্তাবে দেখা যায় যে তিনি রাজার নজরবন্দী অবস্থা মোটেই পছন্দ করেননি এবং তাঁর মতে রাজার উচিত হল প্যারিসের জনতার হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য ফ্রান্সের প্রদেশগুলির জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান করা এবং ফ্রান্সের কোন প্রাদেশিক সদরে তাঁর কর্মদপ্তর স্থাপন করা দরকার। তাঁর মতে রুয়েন নগরে এই কর্মদপ্তর স্থাপন করলে ভাল হয়। এখান হতে রাজা এক গণপরিষদ আহ্বান করবেন। কেবলমাত্র অভিজাতদের ওপর নির্ভর করলে রাজা নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন। একারণে জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করার জন্য তাঁকে চেষ্টা করতে হবে। গণপরিষদে রাজা গণতন্ত্রকে মেনে নেবেন এবং নিজেকে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে ঘোষণা করবেন।

মিরাবোঁর এই পরিকল্পনা হতভাগ্য ষোড়শ লুই বুঝতে পারলেন না, বোঝবার মত রাজনীতিক বুদ্ধি তাঁর ছিল না। মিরাবোঁর এই পরিকল্পনা কিন্তু কার্যকরী হলনা। জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অনেকে এটি পছন্দ করেনি এবং এই পরিকল্পনাটি অকার্যকরী হয়ে পড়ে যখন নতুন সংবিধানে ঠিক হয় যে আইন-সভার কোন সদস্য মন্ত্রী হতে পারবে না। এই শর্তের ফলে মিরাবোঁ সরকার ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা অকালে নষ্ট হয়ে গেল।

আইনসভায় মিরাবোঁর স্থান হল না ; ১৭৯০ হতে ১৭৯১ এর এপ্রিল (মৃত্যু দিন পর্যন্ত) মিরাবোঁ ষোড়শ লুইকে বিপদ হতে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এর ফলে বিপ্লবী নেতারা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন। রাজসভার হয়ে তিনি বিভিন্ন রিপোর্ট রচনা করেন। এর পরিবর্তে তাঁর ঋণ শোধ করে দেন রাজা। কিন্তু এটা ঠিকই যে মিরাবোঁ কখনো ঘুষ নেননি বা অর্থ তাকে কিনতে পারেনি, তাঁর আদর্শ হতে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি এবং কখনো তাকে রাজতন্ত্রীতে পরিণত করতে পারেনি। তিনি নিজেকে মন্ত্রী বলে মনে করতেন কারণ তাঁর মতে মন্ত্রী হবার সমস্ত গুণাবলীই তাঁর ছিল। এবং মন্ত্রী হিসেবেই তিনি রাজার হয়ে বিভিন্ন রিপোর্ট লিখতেন। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মিরাবোঁ যদি একাজ না করতেন তাহলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যেত।

নতুন সংবিধান সম্বন্ধে তাঁর অভিমত

সংবিধান সভা ফ্রান্সের জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করে তার প্রয়োজনীয় ধারাগুলি সম্বন্ধে মিরাবোঁর অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজার 'ভিটো' ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি যে মত ব্যক্ত করেন তা খুবই বাস্তবধর্মী ছিল। এবিষয়ে তিনি মনে করেন যে রাজার absolute veto থাকা উচিৎ, কারণ নতুন সংবিধানে রাজার ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছিল। suspensive veto ক্ষমতা দিয়ে রাজার আরও জনপ্রিয়তা নষ্ট করা হবে বলে তিনি বলেছিলেন। নতুন আইন সভার কার্য পরিচালনার রীতি নীতি সম্বন্ধে তিনি এক প্রস্তাব দেন কিন্তু তাও নাকচ হয়ে যায়। যুদ্ধ ও শান্তি সম্বন্ধে তিনি রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব পছন্দ করতেন এবং তাঁর এই প্রস্তাব নতুন সংবিধানে স্থান পায়। ফ্রান্সের আর্থিক দুরবস্থা দূর করার জন্য তিনি জমির বদলে এসাইনেট নামে কাগজের নোট চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু তিনি এই নোটের সংখ্যা সীমিত করার পক্ষপাতী ছিলেন, যতটা জমি বিক্রয় করা হবে, সেই জমির মূল্যের অর্ধেকের বেশি কাগজের নোট বাজারে ছাড়া হবে না বলে তিনি মত দেন। তাঁর এই মত কিছুকিছু গ্রহণ করা হয় কিন্তু পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়নি বলে পরবর্তীকালে ফ্রান্সকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে

ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধেও তাঁর অভিমত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এক্ষেত্রে বাইরের কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় এবং তাদের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারও নেই। তবে এটা তিনি জানতেন যে ফ্রান্সের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি ফরাসী বিপ্লবকে ভাল চোখে দেখছে না, তারা মনে করছে যে

এই বিপ্লবের বহ্নি হতে তাদের দেশও রক্ষা পাবে না যদি না এটিকে ফ্রান্সেই নির্বাপিত করা না যায়। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বিদেশী শক্তিগুলি যাতে হস্তক্ষেপ না করে তার জন্য মিরাবোঁ বিশেষ চেষ্টা করেন এবং যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এবিষয়ে তিনি কৃতকার্যও হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে ফরাসী বৈদেশিক দপ্তরে যেরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা যায় তাতে বোঝা যায় যে মিরাবোঁর কৃতিত্ব কতখানি ছিল।

১৭৯১-এর প্রথম হতেই মিরাবোঁর শরীর খারাপ হতে থাকে এবং নিয়তই মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পান। তিনি বেঁচে থাকতে সবিশেষ চেষ্টা করেন কারণ তিনি জানতেন তাঁর ওপর বিপ্লবের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা খানিকটা নির্ভর করছিল। তিনি যে কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর পর বোঝা গেল। ২রা এপ্রিল, ১৭৯১ তারিখে মিরাবোঁ দেহরক্ষা করলেন।

বলা বাহুল্য যে ফ্রান্সে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎও অন্ধকার হল। কিন্তু এটা ঠিক বলা যায় না, কারণ মেরী এণ্টয়েনেট ও তাঁর পারিষদবর্গের কার্যাবলী বহু আগেই রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছিল। রাজা ও রানীর বিদেশে পলায়নের চেষ্টা সমগ্র ফ্রান্সে এক রাজতন্ত্র-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করল। রাজা যে দেশদ্রোহী তা সকলে মেনে নিল। মিরাবোঁ এর বিরোধী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন জনসাধারণের সাথে রাজার সরাসরি সম্বন্ধ স্থাপন—বিদেশে পলায়ন বা অভিজাতদের সাহায্য গ্রহণ নয়। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব কাহারও মনঃপূত হয়নি। এর ফলে সন্ত্রাস শাসন দেখা দেবে। মিরাবোঁর প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হলে এটি হয়ত ঘটত না। তাছাড়া জাতীয় সভায় ও সংবিধান রচনায় মিরাবোঁর অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু এক্ষেত্রেও তাঁর প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করা হয়নি। তিনি এক শক্তিশালী শাসনবিভাগ চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বদলে নতুন সংবিধানে শাসনবিভাগকে ক্লীব করা হয়, যার ফলে ফ্রান্সে অরাজকতা দেখা দেয় এবং জনতার খেয়াল খুশির ওপর সবকিছু নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যদি পরবর্তী ঘটনাগুলির দ্বারা কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিপক্কতার বিচার করা যায় তাহলে এটা অবশ্যই বলা চলে যে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস মিরাবোঁর ইতিহাস।

মিরাবোঁ ও রাজতন্ত্র

বাগ্মী হিসেবে মিরাবোঁ অনন্য। ফ্রান্সের ইতিহাসে তাঁর সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। ইংলণ্ডের বার্ক-এর তিনি সমগোত্রীয়। কাজেই তাঁকে মহৎ মিরাবোঁ বলা যেতে পারে।

Q. 12. Write a short account of the achievement of the Convention.

Ans. ভামীর (Valmy) যুদ্ধ জয়ের পর আইনসভা 'কনভেনশন' নামে এক নতুন সরকারের পথ করে দিল। 'কনভেনশন' ফ্রান্সের জন্য এক নতুন সংবিধান তৈরি করে।

কনভেনশনের সদস্যরা প্রায় পূর্ণবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ভোট দেবার প্রবণতা ছিল না বললেই হয়। মোট ভোট দেবার অধিকারীদের এক দশমাংশ কেবলমাত্র ভোট দিয়েছিল। আইনজীবীদের মধ্যে থেকেই সদস্য বেশি নির্বাচিত হলেন। ৭৫০ জন সদস্যদের মধ্যে মাত্র দুজন ছিলেন প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। ১৭৯৫-এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত কনভেনশন টিকে ছিল। এই সময়টিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—**গিরণ্ডিন কনভেনশন** (জুন ১৭৯৩ পর্যন্ত), **বিপ্লবী সরকার** (জুলাই ১৭৯৪), এবং **থার্মিডোরিয়ান রিএকশন**।

ভূমিকা

কনভেনশনের কার্যাবলী: কনভেনশনের প্রথম কাজ হল রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করা। এর আগেই প্যারিসের জনতার চাপে রাজা ষোড়শ লুইকে বন্দী করা হয়েছিল। কনভেনশনের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যরা প্যারিসের জনতার দাবি উপেক্ষা করতে পারল না। গিরণ্ডিনরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন চাইলেন না, কারণ তাঁরা পুঁজিপতি ও ব্যবসাদারদের মুখপত্র ছিলেন। জেকোবিন বা মাউণ্টেনরা এর বিরোধিতা করল এবং জনতার দাবি তারা আরও জোরদার করল। তারা অর্থনৈতিক পরিবর্তন চাইল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের লক্ষ্য

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীদের (প্লেন) নির্দিষ্ট কোন নীতি ছিল না, কনভেনশনের মধ্যে আমাদের যুগের মত কোন রাজনৈতিক দল ছিল না এবং ফ্রান্সেও ছিল না। তবুও সব সদস্যই দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং বৈদেশিক আক্রমণ রদ করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তাঁরা সকলেই চাইছিলেন বিপ্লবের ফলে যে সব নতুন ব্যবস্থা ও প্রথা দেখা দিয়েছিল সেগুলি যেন টিকে থাকে। প্রথম দিকে কনভেনশন কিছুটা সাফল্য অর্জন করল। বিদেশী শত্রু হটে গেল এবং বিপ্লবী সৈন্য বেলজিয়াম, রাইনল্যাণ্ড, স্যাভয় ও নীসে প্রবেশ করল। এসব অঞ্চল গণভোটের মাধ্যমে ফ্রান্সের সাথে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কনভেনশন তাদের দাবি মেনে নিল। এবং গিরণ্ডিনদের প্রভাবে কনভেনশন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের প্রতি এক ঘোষণা

যুদ্ধনীতি ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোট

জারী করে। এতে বলা হয় যে বিপ্লবী ফ্রান্স ইউরোপের জনসাধারণকে তাদের স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় সক্রিয় সাহায্য করবে। ফলে ইউরোপের রাজন্যবর্গ শংকিত হল। এর পর ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের ফলে তারা আরও ভীতত্রস্ত হয়ে পড়ল। তুরস্ক, নরওয়ে এবং সুইজারল্যাণ্ড ব্যতীত প্রায় সব রাষ্ট্রই বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রজোট স্থাপন করে এবং ফ্রান্সের সাথে শীঘ্রই যুদ্ধ বেধে উঠল।

ইতিমধ্যে কনভেনশনের ভেতর সদস্যদের মধ্যে কলহ ও মতপার্থক্য দেখা দিল। গিরণ্ডিনরা রাজাকে বাঁচাতে চাইল। ফলে জেকোবিনরা তাদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করল। এদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রজোটের সামরিক শক্তির সামনে ফরাসী সৈন্য দাঁড়াতে পারল না। যেহেতু গিরণ্ডিনরা এই যুদ্ধ চেয়েছিল, সেকারণে যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য তাদের দায়ী করা হল। জেকোবিনরা ক্রুদ্ধ জনতাকে বশে এনে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করল। কনভেনশনের ২৯ জন গিরণ্ডিন সদস্য এবং দুজন মন্ত্রীকে বন্দী করা হল। ফ্রান্সের প্রদেশসমূহে গিরণ্ডিনরা বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহের সাথে কৃষক সম্প্রদায়ও কনভেনশনের বিরুদ্ধে যোগ দিল। ভিণ্ডি ও তার আশেপাশের কৃষক বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারন করে। ফ্রান্সের ৮৩টি ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে ৬০টিতে জেকোবিন প্রভাবিত কনভেনশনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। এই সংগ্রাম কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সংগ্রাম ছিল না, এটি ছিল দুটি পরস্পরবিরোধী সামাজিক গোষ্ঠীর সংগ্রাম—একদিকে রাজতন্ত্রীদের সাহায্যপুষ্ট উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অন্যদিকে জনতার সাহায্যপুষ্ট নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী। শেষোক্ত শ্রেণীটি জয়যুক্ত হল।

আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল

এই বিপ্লবী সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। প্রথমতঃ শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া হল কনভেনশনের দুটি কমিটির ওপর—জননিরাপত্তা কমিটি এবং সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি (Committee of Public Security and Committee of General Security)। শেষোক্ত কমিটিকে এমনভাবে গড়ে তোলা হল যাতে এটি এক বছরের জন্য স্বেচ্ছাচারিতার সাথে ফ্রান্স শাসন করতে পারে। বারজন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গড়ে উঠল। অবশ্য বারজন সদস্যই এক রকম নীতির পক্ষপাতী ছিল না। ফলে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করতে সমর্থ হল। ভবিষ্যতে যাতে কোন বিদ্রোহ দেখা না দেয় তার জন্য সন্ত্রাস শাসন প্রবর্তিত হল।

সন্ত্রাস শাসন

এক ঘোষণার দ্বারা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বন্দী করা হল। কিছু দিনের মধ্যেই প্রায় ৪ লক্ষ লোককে কেবলমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বন্দী করা হয়। এদের বিচার করবার জন্য প্রথমে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। কিন্তু এই ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের পছন্দ না হওয়ায় এটির বদলে বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল গঠিত হল এবং বিচারের নামে প্রহসন চলতে থাকল। কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় ৪০ হাজার লোকের প্রাণ নেওয়া হল। এদের মধ্যে মেহনতী মানুষের সংখ্যাই বেশি ছিল। অবশ্য অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সংখ্যক নামকরা লোক প্রাণ হারাল।

দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য কনভেনশন চেষ্টা করে। দ্রব্যমূল্য যাতে স্থিতিশীল থাকে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রথমত, জিনিসপত্রের আমদানির ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হল। বিপ্লবী রক্ষীদল ও কমিটিদ্বয় সন্ত্রাসকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে বাধ্য করল। প্যারিস ও অন্যান্য শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং প্রথা প্রবর্তিত হল এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। বিপ্লবী জনতা কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হল না। তারা বিত্তবানদের ওপর অধিক কর এবং সম্পত্তির পুনর্বণ্টন দাবি করল। এমন কি তারা ক্যাথলিক ধর্মেরও আমূল পরিবর্তন চাইল। কনভেনশন অবশ্য ওটিতে রাজী হল না। ধর্মের ক্ষেত্রে কনভেনশন সতর্কভাবে চলল। কনভেনশনকে অবশ্য বিপ্লবী পঞ্জিকা গ্রহণ করতে হল যেটিকে বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা খৃষ্টান-বিরোধী কাজ বলে মনে করা হয়। প্যারিসের সর্বহারাদের বিনামূল্যে সম্পত্তি বিতরণের ব্যবস্থা করা হল। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বিভিন্ন কার্যাবলী

ইতিমধ্যে কমিটিদ্বয়ের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। দাঁতো ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বন্দী করে বিচারের নামে হত্যা করা হল।

এরপর জননিরাপত্তা কমিটির নেতৃত্ব করেন রোবসপিয়ার। তিনি জনতাকে হাত করে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতে চাইলেন। তিনি অবশ্য কয়েকটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

সন্ত্রাস শাসনের ফলে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ প্রশমিত হল এবং ১৭৯৪-এর জুন মাসে ফরাসী সৈন্যবাহিনী ফ্লিউরস-এর যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করে বেলজিয়ামে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করলো। গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি এবং বহিঃশত্রুর পরাজয় সন্ত্রাস শাসনের অবসান ঘটাবার পক্ষে সহায়ক হল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই রোবসপিয়রের নেতৃত্বে

সন্ত্রাসশাসন আরও নিপীড়নমূলক হল। এই নতুন সন্ত্রাসশাসন অধিকাংশ ফরাসী জনসাধারণ পছন্দ করল না। ফলে একদিকে জননিরাপত্তা কমিটি এবং সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। অন্যদিকে জননিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ১৭৯৪-এর জুলাই মাসে জননিরাপত্তা কমিটিকে উৎখাত করা হল; রোবসপিয়ার ব্যর্থ-চেষ্টা করলেন সন্ত্রাস রাজত্বকে টিকিয়ে রাখবার জন্য। ফলে তাঁকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হল।

সন্ত্রাস শাসনের অবসান

রোবসপিয়ারের পতনের সাথে সাথে সন্ত্রাস শাসনের অবসান ঘটল। খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং মজুরি নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেওয়া হল, সামাজিক ক্ষেত্রে যে সব আইনবিধি প্রবর্তন করা হয়েছিল তাও উঠিয়ে দেওয়া হল। ১৭৯৩-এর সংবিধান খুবই বিপ্লবাত্মক বলে বাতিল করা হল। শাসন ক্ষমতা তিনটি কমিটির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল—জননিরাপত্তা কমিটির অধিকাংশ ক্ষমতা দেওয়া হল আইন প্রণয়নকারী কমিটির ওপর। অন্যান্য কমিটির ক্ষমতাও কমিয়ে দেওয়া হল। বিপ্লবী ক্লাবগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। দেশে এক দারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল। আর্থিক দিক হতে আমানতকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল, শ্রমিকরা অনাহারের সম্মুখীন হল। ১৭৯৫-এর মার্চে জনসাধারণের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং তাদের রোষবহ্নি দাবানলের ন্যায় দেশব্যাপী ব্যাপ্ত হল। কনভেনশনের বৈঠক চলাকালীন জনতা দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ১৭৯৩ এর সংবিধান চালু করতে এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যনিয়ন্ত্রণের দাবি জানাল। জাতীয় রক্ষীবাহিনী এই জনতা ছত্রভঙ্গ করে দিতে সমর্থ হল। কনভেনশনের বামপন্থী সদস্যদের বন্দী করা হল। জনতা আবার কনভেনশন আক্রমণ করল কিন্তু কনভেনশন তাদের দাবি মানল না। বরঞ্চ জনতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ব্যবস্থা গড়ে তুললো। বিভিন্ন স্থানে বামপন্থীদের গ্রেপ্তার করে গিলোটিন করা হল। সংক্ষেপে ফ্রান্সে শ্বেতবিভীষিকার শাসন শুরু হল (white terror)। গণ-অভ্যুত্থান ধ্বংস করা হল এবং বুর্জোয়ারা শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করল। ১৭৯৩-এর সংবিধানের বদলে এক নতুন সংবিধান রচনা করা হবে বলে ঘোষণা করা হল। রাজতন্ত্রীরা এই সময় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। প্যারিসের রাজতন্ত্রীদের অভ্যুত্থান অল্পবয়সী জেনারেল বোনাপার্টি ধ্বংস করে দিলেন।

প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

জনতার রোষ

থার্মিডোরিয়ান কনভেনশন কয়েকটি কালজয়ী কার্যও করেছিল। প্রথমত, ১৭৯০ হতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে সংকটের উদ্ভব ঘটে তার পরিসমাপ্তি ঘটল—চার্চকে

রাষ্ট্র হতে পৃথক করে দেওয়া হল। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এর প্রভাব দেখা দেয়। যদিও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি তবুও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্কুল (Central Schools) স্থাপনের ফলে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। কয়েকটি পলিটেকনিকও স্থাপিত হল। বুদ্ধিজীবীরা এসবের জন্য গর্ব অনুভব করলেন। ফরাসীদের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ জাতি বলে মনে করা হল। যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী হবার ফলে এই ধারণা আরও জোরদার হল।

কার্যাবলী

এক নয়া সংবিধান রচনা কনভেনশনের অন্তিম কাজ। এই সংবিধান ১৭৯৫-এর আগস্ট মাসে গৃহীত হল এবং গণভোটের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত নেওয়া হল। এই সংবিধানটি ১৭৯৩-এর সংবিধান অপেক্ষা কম গণতান্ত্রিক। সম্পত্তির ওপর ভিত্তি করে ভোটাধিকার দেওয়া হল। ১৭৯০-এর মানবাধিকার ঘোষণার পরিবর্তে **অধিকার ও কর্তব্যের** ঘোষণা জারি করা হল এবং সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যাংশটি বাদ দেওয়া হল—'Men are born free and with equal rights,' অবশ্য আইনের চোখে সকলে সমান বলে মেনে নেওয়া হল। শিক্ষা পাবার অধিকাব, কাজ পাবার অধিকার, রাষ্ট্রের সাহায্য পাবার অধিকার এবং বিদ্রোহ করবার অধিকারগুলি নস্যাৎ করে দেওয়া হল। সম্পত্তি ভোগের অধিকার মেনে নেওয়া হল—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করা হল।

নতুন সংবিধান

ডাইরেকটরী শাসন-ব্যবস্থা

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দুটি কক্ষের ওপর দেওয়া হল—৫০০ জন সদস্য-বিশিষ্ট আইন পরিষদ এবং ২৫০ জন সদস্য-বিশিষ্ট কাউন্সিল অব এলডারস্। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা **৫ জন ডাইরেক্টারের** হাতে দেওয়া হল এবং এদের নামানুসারে এই সরকারের নাম হল **ডাইরেক্টারী শাসন ব্যবস্থা**।

আইন পরিষদ ৫ বছরেরর জন্য এঁদের নির্বাচন করবেন বলে ঠিক হল। এক এক জনকে প্রতি বছর অবসর নিতে হত। ১৭৯১-এর সংবিধানে রাজাকে যেরকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে এঁদের ক্ষমতা বেশি ছিল। ডাইরেক্টররা মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারতেন। পররাষ্ট্রনীতি, সমরবিভাগ, পুলিস ব্যবস্থা ও বেসামরিক শাসন এঁদের দ্বারা পরিচালিত হত। অর্থ-বিভাগ এঁদের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল। ১৭৯১-এর শাসনতান্ত্রিক কাঠামো টিকিয়ে রাখা হল। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করা হল না। প্রত্যেক ক্যান্টনে একটি করে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করা হল। কমিউনগুলি হতে কাউন্সিল তুলে দেওয়া হল। এর বদলে একজন নির্বাচিত

মিউনিসিপ্যাল এজেণ্ট ও তার সহকারী কমিউনের দৈনন্দিন শাসন পরিচালনা করতে থাকল। সংক্ষেপে ১৭৯৩-এর এককেন্দ্রিক সরকারের চেয়ে ডাইরেক্‌টারী সরকার কিছুটা নমনীয় বলে মনে হয়। বিচার-ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন করা হল না। সংবিধান রচয়িতারা সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন যাতে সন্ত্রাস শাসন আর দেখা দিতে না পারে।

Q. 14. Analyse the nature and character of the Reign of Terror. Was it "a Dictatorship of Distress?" Did terror save France?

Ans. প্রতিবিপ্লবী শক্তি ধ্বংস করবার জন্য এবং ভবিষ্যতে যাতে কোন বিদ্রোহ ঘটতে না পারে তার জন্য প্যারিসের উন্মত্ত জনতা ১৭৯৩-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ত্রাস-শাসনের প্রবর্তন করে। অবশ্য ১৭৯৩ এর মার্চ মাস হতেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জেলখানায় পাঠান শুরু হয়। ১৭৯২-এর সেপ্টেম্বরের এক ঘোষণার দ্বারা সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদের আটক করবার কথা জানান হয়। এই ঘোষণার ফলে ঠিক কতজনকে আটক করা হয় তা জানা যায় না। তবে ৩ লক্ষ হতে ৫ লক্ষ লোককে জেলখানায় পাঠান হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। এই আটক ব্যক্তিদের বিচার করবার জন্য কয়েকটি বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হল এবং বিচারের নামে হত্যাকাণ্ড অবাধে চলতে থাকল। প্রায় ৪০ হাজার তথাকথিত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। এদের মধ্যে মেহনতী মানুষের সংখ্যাই বেশি ছিল।

সন্ত্রাস শাসনের পটভূমিকা

গিরণ্ডিস্টদের পতনে জেকোবিনরা ক্ষমতা পেল। এই সময় ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে বিপ্লব-বিরোধী অভ্যুত্থান প্রবলভাবে দেখা দেয়। বিদেশী শত্রুরাও চারদিক হতে ফ্রান্সের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করল। এই সঙ্কট-জনক পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল জাতীয় ঐক্যের। জাতীয় ঐক্যের বিরোধিতা যারা করছিল তাদের দেশদ্রোহী বলে মনে করে তাদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হল। যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করে যেমন শত্রুকে দুর্বল ও নিশ্চিহ্ন করা হয়ে থাকে, ঘরের শত্রুকে ধ্বংস করবার জন্য জননিরাপত্তা কমিটি ও গিলোটিনের প্রবর্তন করা হল। যেহেতু কনভেনশনের দ্বারা রচিত প্রাথমিক সংবিধান দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য কার্যকরী করা সম্ভব নয় বলে মনে করা হল, সেকারণে কনভেনশনই ঘোষণা করল যে যুদ্ধ শেষ এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন না হওয়া পর্যন্ত 'বিপ্লবী' অর্থাৎ অস্বাভাবিক সরকারের হাতেই ফ্রান্সের

কেন দেখা দিল

শাসন পরিচালনার ভার থাকবে। এই বিপ্লবী সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করল। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা দেওয়া হল জননিরাপত্তা কমিটি এবং সাধারণ নিরাপত্তা কমিটির ওপর। কয়েকমাসের মধ্যে জন-নিরাপত্তা কমিটিই প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স শাসন করতে থাকল। দেশকে আভ্যন্তরীণ শত্রুদের হাত হতে রক্ষা করবার জন্য সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাজার হাজার লোকের প্রাণ লওয়া হল। এর ফলে কিন্তু প্রতিবিপ্লবী শক্তি নষ্ট হয়ে গেল এবং বিপ্লব কিছুটা জয়যুক্ত হল। জননিরাপত্তা কমিটির **শোণিতাক্ত শাসনকাল ইতিহাসে সন্ত্রাস শাসন বলে খ্যাত।**

লক্ষ্য

সন্ত্রাস শাসনের সংস্থাগুলির মধ্যে সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি, জননিরাপত্তা কমিটি, বিপ্লবী বিচারালয়, বিপ্লব স্কোয়ার এবং সন্দেহের আইন প্রধান ছিল।

সন্ত্রাস-শাসনের ফলে ফ্রান্সে এককেন্দ্রিক সরকার স্থাপিত হল। গৃহযুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য এই সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করল। যে সব অঞ্চলে প্রতি-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল সেগুলি নিশ্চিহ্ন করা হল। সামরিক বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হল। ১৮ হতে ২৫ বছরের মধ্যে সমস্ত অবিবাহিত সবল যুবকদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। জনসাধারণকে যুদ্ধজয়ে সক্রিয় সাহায্য করবার জন্য বলা হল। এর ফলে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠল। এই সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত ও খাদ্য যোগান দেবার সমস্যা দেখা দিল। অবশ্য ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সই একমাত্র দেশ ছিল যার পক্ষে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভবও ছিল। ফ্রান্সে নানা শিল্প গড়ে উঠেছিল। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকরা নানারূপ আবিষ্কার করে ফ্রান্সকে সামরিক দিক হতে শক্তিশালী হতে সাহায্য করলেন। ফলে ১৭৯৪-এর বসন্তকালেই ফ্রান্স তার শত্রুদের চেয়ে সামরিক দিক হতে শক্তিশালী হয়ে উঠল। ফলে যুদ্ধের গতি ফ্রান্সের অনুকূলে পরিবর্তিত হল। ইংলণ্ডের সৈন্য-বাহিনী ডানকার্ক এর অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হল এবং ওখান হতে সরে গেল। টুলো হতেও ইংরেজ সৈন্য হটে যেতে বাধ্য হল। অষ্ট্রিয়া অয়াটিগনিস্ (Wattignis) নামক স্থানে পরাজিত হল এবং প্রাশিয়া ফ্লিউরাস-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফ্রান্সের হাতে বেলজিয়াম ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ১৭৯৫-এ স্পেন ও প্রাশিয়া ফ্রান্সের সাথে বেসেলের (Basel) সন্ধি স্বাক্ষরিত করল। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যে রাষ্ট্রজোট গড়ে উঠেছিল তা-ভেঙে গেল। কেবলমাত্র ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া এবং সার্ভিয়া সরকারীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করল না।

কার্যাবলী

যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য

দেশে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য সন্ত্রাস শাসন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথমত, জিনিসপত্রের উৎপাদন ও বিতরণের ওপর কড়া নজর রাখা হল। বড় বড় শহরগুলিতে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা রাখা হল এবং সর্বহারা-দের মধ্যে বিনামূল্যে সম্পত্তি বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হল। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এই ব্যবস্থা করা হয়। যদিও এটি কার্যে-পরিণত করতে বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল কিন্তু সর্বহারারা এতে বেশ সন্তুষ্ট হল।

আভ্যন্তরীণ নীতি

সন্ত্রাস শাসনের অবসান: দেশের অভ্যন্তরে প্রতি-বিপ্লবী শক্তি নির্মূল ও যুদ্ধজয়ের ফলে জেকোবিন দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। সন্ত্রাস শাসনের তিন জন নেতা তিনটি উপদলের নেতৃত্বে করতেন। এদের মধ্যে হিবার্ট ছিলেন সর্ব হারাদের নেতা, দাঁতো ছিলেন জেকোবিন দলের মধ্যে নরম পন্থীদের নেতা, আর রোবস্‌পিয়র ছিলেন জননিরাপত্তা কমিটির সর্বেসর্বা। হিবার্ট ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা চরমপন্থী ছিলেন। তাঁরা ধর্ম হতে শুরু করে সব কিছুর পরিবর্তন দাবি করলেন। দাঁতো ও তাঁর অনুগামীরা সন্ত্রাস-শাসনের অবসান চাইছিলেন। তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। রোবস্‌-পিয়র দ্বিমুখো নীতি গ্রহণ করলেন—একদিকে হিবার্টিস্টদের গ্রেপ্তার করে প্রাণদণ্ড দিলেন, অন্যদিকে দাঁতো ও তাঁর অনুচরদের গিলোটিনে পাঠালেন। হিবার্ট ও দাঁতোর মৃত্যুর পর রোবস্‌পিয়র ফ্রান্সের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা হলেন। কিন্তু এর ভেতর প্যারিসের জনসাধারণ রোবস্‌পিয়রের শাসনের বিরুদ্ধে চলে গেল। গৃহযুদ্ধের পরি-সমাপ্তি এবং বহিঃশত্রুর পরাজয় সন্ত্রাস শাসনের অবসান ঘটাবার পক্ষে সহায়ক হল।

আভ্যন্তরীণ বিরোধ

ঠিক এই সময়েই রোবস্‌পিয়রের নেতৃত্বে সন্ত্রাস শাসন আরও নিপীড়নমূলক হল। এই শাসন স্থায়ী করবার জন্য তিনি সর্ব রকমের চেষ্টা করলেন। ১৭৯৪ এর ১০ জুন এক ঘোষণার দ্বারা বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের কর্মপদ্ধতি আরও সংক্ষিপ্ত করা হল। অপরাধীদের নিজ পক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হল না। ফলে বেশি সংখ্যায় গিলোটিন হতে থাকল। এই নতুন সন্ত্রাস শাসন দেখা দিল যখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসছিল এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যাগুলির সমাধান অন্তত সাময়িক ভাবে হয়ে গিয়েছিল। ফ্রান্সের অধিকাংশ লোকই সন্ত্রাস শাসনের অবসান চাইল এবং রোবসপিয়রকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য চেষ্টা করা হল। প্যারিসের জনতাও দুটি কারণে রোবসপিয়রের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গেল—তাদের নেতাদের গিলোটিনের

চরম সন্ত্রাস শাসন

অবসান

এবং মজুরির হার কমিয়ে দেবার জন্য। বিপ্লবী পঞ্জিকার থার্মিডোর মাসের দুটি দিনে (২৭শে ও ২৮ শে জুলাই, ১৭৯৪) রোবসপিয়র-বিরোধী আন্দোলন সক্রিয় হল।

থার্মিডোরিয়ান প্রতিক্রিয়া

রোবসপিয়র ব্যর্থ চেষ্টা করলেন সন্ত্রাস-শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য। ফলে তাঁকে এবং তাঁর অনুচরদের গ্রেপ্তার করে পরের দিন গিলোটিন করা হল। এটিকে থার্মিডোরিয়ান প্রতিক্রিয়া (Thermidorion Reaction) বলা হয়। থার্মিডোরিয়ান সরকার প্যারিসের কমিউন ভেঙে দিলেন, বিপ্লবী ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা স্থগিত রাখা হল, জননিরাপত্তা কমিটির কার্যপরিধি সীমিত করা হল এবং জেকোবিন ক্লাব বন্ধ করে দেওয়া হল। গিরণ্ডিস্টরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসতে পারলেন।

সন্ত্রাস শাসনের স্বরূপ : ১৭৯৩-এর অক্টোবর হতে ১৭৯৪ এর জুলাই পর্যন্ত সন্ত্রাস রাজত্ব ফ্রান্সে চালু ছিল। এটি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক এবং নিপীড়ন-দমনমূলক ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক, কখনই কোন সামাজিক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার কল্পনা বা নীতি এর ছিল না। সংক্ষেপে সন্ত্রাস শাসন হল আত্মরক্ষামূলক এক ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স ও বিপ্লবকে রক্ষা করা। যে দুটি কমিটির ওপর আভ্যন্তরীণ শত্রু ধ্বংস করবার দায়িত্ব ছিল সে দুটি কমিটিই আবার বহিঃশত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ ও জলেস্থলে ইউরোপীয় কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার দায়িত্ব নিয়েছিল। বলা বাহুল্য এ দুটি কমিটি তাদের দায়িত্ব ভালভাবে বহন করতে সক্ষম হয় এবং ফ্রান্সের জনসাধারণেরও সক্রিয় সহযোগিতা পায়। বহু বেকার যুবক সৈন্য বাহিনীতে সহজেই চাকরি পেল।*

হত্যা, ভীতি প্রদর্শন ও জোর জবরদস্তি সন্ত্রাস শাসনের শাসন পরিচালনার প্রধান নীতি ছিল। হিংসা ও সন্ত্রাস শাসন চেয়েছিল কিছু সংখ্যক লোক—শ্রমিক, দরিদ্র জনসাধারণ ও দোকানদাররা। জাতীয় শঙ্কা এরূপ প্রকট হয়েছিল যে কিছু সংখ্যক বুর্জোয়ারা এদিকে ঝুঁকে পড়ে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নস্যাৎ করে দেওয়া হয় এবং সামাজিক সাম্য স্থাপন করবার জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা লোপ করা হল।

সাফল্য

বিদেশী শত্রুর ফ্রান্স আক্রমণ সন্ত্রাস শাসন স্থাপনের সহায়ক হল। যুদ্ধ ভিন্ন সন্ত্রাস শাসন দেখা দিত না। আবার সন্ত্রাস শাসন না প্রবর্তিত হলে যুদ্ধ জয়ও হত না এবং নেপোলিয়নের পক্ষে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হত না।

*"The Reign of Terror was essentially political and repressive and its aim was in no way as has sometimes been asserted, to wipe out a social class." The New Cambridge Modern History, Vol. IX.

সন্ত্রাস-শাসন কালকে 'Dictatorship of Distress' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদ, ষড়যন্ত্র, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ফ্রান্সের ভাগ্য যখন নির্ধারণের চেষ্টা করতে থাকল তখন সন্ত্রাস শাসনের মত এক এককেন্দ্রিক সরকারের প্রয়োজন ছিল। আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে প্রজাতন্ত্রকে বাঁচান সম্ভব হত না। কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ফ্রান্সে বিপ্লব ব্যর্থ হত এবং দেশের সমস্ত-শক্তি সংহত করে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করা যেত না। জাতীয় ঐক্য যখন স্বাভাবিক ভাবে আনা সম্ভব হচ্ছিল না তখন এক অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে জাতীয় ঐক্য বন্ধন এবং জনসাধারণকে রাষ্ট্রানুগত করা ভিন্ন অন্য কোন পথ ছিল না। এবং সন্ত্রাস-শাসন এক অস্বাভাবিক উপায়ে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিহত ও বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল।*

মন্তব্য

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাস-শাসন কিন্তু ফরাসী-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে প্রায় গোটা ইউরোপ বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল। ফরাসী বিপ্লব প্রথমে যাঁরা অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁরা বিপ্লবের এই শোণিতাক্ত পরিণতি দেখে শঙ্কিত হলেন। সন্ত্রাস-শাসন এদিক হতে বিপ্লবের ক্ষতি করল। এমনকি বিভিন্ন দেশের উদারপন্থীরা কোনরূপ পরিবর্তন পছন্দ করলেন না, কারণ তাঁরা মনে করলেন যে পরিবর্তন অর্থই অরাজকতা।

Q. 15. Critically discuss the role of Robespierre in the French Revolution.

Ans. বিপ্লবী-ফ্রান্সের নেতাদের মধ্যে রোবস্পিয়রই বিশেষভাবে পরিচিত। জেকোবিন দলের তিনি ছিলেন স্তম্ভস্বরূপ। অল্পকালের জন্য তিনি ফ্রান্সের সর্বময় কর্তা হয়েছিলেন।

ভূমিকা

প্রথম জীবনে রোবস্পিয়র ছিলেন উকিল। বিপ্লব শুরু হওয়ার সাথে সাথে তিনি নিজ কর্ম ত্যাগ করে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। ফ্রান্সে একনায়কত্ব স্থাপনের ইচ্ছাও তাঁর ছিল। তিনি চরম বামপন্থী ছিলেন এবং রুশোর অবাস্তব মতবাদকে কার্যে পরিণত করতে প্রয়াসী হন।

জীবনী

১৭৮৯ খৃঃ রোবসপিয়র সংবিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং এই সময়

*'The Reign of Terror was a marvellous product of Statesmanship. And it saved France.' Riker

হতে সন্ত্রাস রাজত্বকালের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ফরাসী বিপ্লবের উত্থানপতনের সাথে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেন। জেকোবিন ক্লাবের মাধ্যমে তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্যারিসের বিপ্লবী জনতা তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নেয় এবং জাতীয় কনভেনশনে তিনিই ছিলেন প্যারিসের জনতার প্রধান প্রতিনিধি। আইন সভার বিলোপ সাধনের জন্য তাঁর অবদান ছিল প্রচুর। রাজার মৃত্যুদণ্ডের জন্য তিনিই বেশি দায়ী ছিলেন। গিরণ্ডিস্টদের ক্ষমতা হতে সরিয়ে দেওয়ার মূলে ছিলেন রোবস্পিয়র। সন্ত্রাস রাজত্ব কালের শেষ দিকে তিনি ছিলেন ফ্রান্সের সর্বাধিনায়ক। দাঁতো-র প্রাণদণ্ডের পর তিনি আরও অবাধে সন্ত্রাস রাজত্ব চালাতে থাকেন। পরিশেষে তাঁর শাসনে অধিকাংশ ফরাসী জনসাধারণ অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদের সাধারণতন্ত্রের শত্রু বলে অভিযুক্ত করে। জাতীয় কনভেনশনের আদেশে তাঁকে গিলোটিনে প্রাণ হারাতে হয়।

রাজনৈতিক কর্মজীবন

বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে রোবসপিয়র ছিলেন সবচেয়ে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন রক্তাক্ত বিপ্লবের মূর্ত প্রতিমূর্তি। মিরাবোঁ সুবক্তা ও রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন সত্য কিন্তু জনপ্রিয়তা ও বিপ্লবের আদর্শে নিষ্ঠাবান হিসেবে রোবসপিয়র মিরাবোঁর চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। এমন কি এ বিষয়ে মারাট ও দাঁতো তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন পুরোপুরি-ভাবে বিপ্লব-সৃষ্ট পুরুষপ্রধান। জনসাধারণের সার্বভৌমত্বে তিনি ছিলেন পূর্ণ বিশ্বাসী এবং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা যে অবিভাজ্য তা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

বিপ্লবী নেতা হিসেবে

বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ যখন ভয়াবহ রূপ নিল এবং ফ্রান্সের আইনসভা এই বিপদ হতে ফ্রান্সকে রক্ষা করবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারল না, তখনই জনতা হস্তক্ষেপ করল এবং এই বিপদ হতে দেশকে রক্ষা করবার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হল। প্রদেশসমূহ হতে বিভিন্ন নেতার নেতৃত্বে রক্ষীবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদল প্যারিসে জমায়েত হল। প্রাদেশিক রক্ষীবাহিনীর নেতাদের মধ্যে অধিকাংশই উগ্র বামপন্থী ও প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা একজোটে লুই-এর ভিটো ক্ষমতা নাকচ করে দেবার জন্য দাবি তুললেন। রোবসপিয়র ঠিক এই সময় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি প্রাদেশিক রক্ষীবাহিনীকে আইন সভার অসম্মতি সত্ত্বেও প্যারিসে থাকতে বললেন এবং জেকোবিন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হবে সে সম্বন্ধে তাদের অবহিত

করলেন। ২৯শে জুলাই জেকোবিন ক্লাবে তিনি এক বক্তৃতার মাধ্যমে এই ক্লাবের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। এই প্রথম তিনি ১৭৯১-এর সংবিধানের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন এবং সংবিধানের স্বরূপ, শাসন বিভাগ ও আইন সভার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিষোদ্গার করলেন। এই বুর্জোয়া সংবিধান ধ্বংস করে এবং বিপ্লবী শাসনতন্ত্রের খসড়াও তিনি উত্থাপিত করেন। তাঁর এই নয়া পরিকল্পনায় প্রজাতন্ত্রের কথা বলা হয় এবং আইন সভার বদলে সাবলীল ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক জাতীয় কনভেনশন স্থাপনের উল্লেখ থাকে। ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে রোবসপিয়র তাঁর এই পরিকল্পনা পেশ করলেন। এর পর হতেই রোবসপিয়র ফ্রান্সের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং বিপ্লবের সার্থক রূপায়ণে ব্রতী হন।

ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের পর ফ্রান্সের কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতা যখন যুদ্ধের দ্বারা বিপ্লবকে প্রসারিত করতে চাইলেন এবং নতুন নতুন দেশ জয় করতে ইচ্ছুক হলেন, রোবসপিয়র এই সর্বনাশা নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য তখন কেউ গ্রাহ্য করলেন না। বিপ্লবী ফ্রান্স ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফলে প্রায় গোটা ইউরোপকে ফ্রান্স তার শত্রুতে পরিণত করিল।

রোবসপিয়রের বিপ্লবী একনায়কত্বের সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল মূলতঃ তিনটি—জেকোবিন ক্লাব, কমিউন এবং সাধারণ নিরাপত্তা ও জন নিরাপত্তা কমিটিদ্বয়। রোবসপিয়র মাত্র চারমাস নিরাপত্তা কমিটির নেতৃত্ব করেন। এই সময় প্যারিসের জনসাধারণের ওপর এই কমিটির প্রভাব কমে যায়—হিবার্ট, দাঁতো ও অন্যান্য নেতাদের গিলোটিন করার ফলে। সেন্ট জাস্ট লিখেছেন: 'বিপ্লব হিমশীতল হয়ে গিয়েছে'। রোবসপিয়র কিন্তু সন্ত্রাসকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবের চরম লক্ষ্যে ধর্মের মাধ্যমে পৌঁছাতে চাইলেন। জনসাধারণকে হাত করে তিনি একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করতে চাইলেন (The Cult of Supreme Being)। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কয়েকটি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হল। যখন আভ্যন্তরীণ শান্তি মোটামুটি বজায় ছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রান্সের শত্রু পরাজিত হল ঠিক সেই সময়েই রোবসপিয়র সন্ত্রাস-শাসন আরও নিপীড়নমূলক করলেন। আর এই নতুন সন্ত্রাস শাসন দেখা দিল যখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসছিল।

পতন

জনসাধারণ এর অবসান চাইল। ফলে ১৭৯৪-এর ২৭শে জুলাই জননিরাপত্তা কমিটিকে উৎখাত করা হল। রোবসপিয়র সন্ত্রাস শাসন টিকিয়ে

রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তাঁকে ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের আটক করে পরের দিন গিলোটিন করা হল। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হল।

Q. 16. Discuss the achievements and failings of the Directory? What was its true nature? Why did it succumb to the coup of the 18th Brumaire? *Or*, Give an account of the internal and external policies of the Directory in France.

Ans. থার্মিডোরিয়ান প্রতিক্রিয়ার আমলে ফ্রান্সের জন্য এক নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই নয়া সংবিধানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দুটি কক্ষের ওপর দেওয়া হয়—৫০০ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ এবং ২৫০ জন সদস্য বিশিষ্ট বিজ্ঞ সভা। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ৫ জন ডিরেক্টরের হাতে ন্যস্ত হল। এদের নামানুসারে এই সরকারের নাম হল ডাইরেক্টরী শাসন ব্যবস্থা। এই নয়া সংবিধানে ক্ষমতা বিভাজন নীতি গ্রহণ করা হলেও কার্যকরী করা গেল না। আইন-পরিষদ ও ডাইরেক্টরদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। সংকট সময়ে সরকার কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণের অধিকার সংবিধানে না থাকায় এক সংকট কালে এই সংবিধান নস্যাৎ হয়ে গেল।

ভূমিকা

ডাইরেক্টরীর আমলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও শোচনীয় হয়। প্যারিসে জীবনযাত্রা ব্যয়ের মান কল্পনাতীতভাবে বেড়ে যায়। ১৭৯০-এর তুলনায় ১৭৯৫-এর নভেম্বরে মূল্যমান ৫ হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। গরীব জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার সীমা রইল না। মেহনতী জনতার নেতা ব্যাবুফ এই সরকারকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রাজতন্ত্রীরাও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করল। ডাইরেক্টরীর রাজনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল না। এটি কেবলমাত্র আংশিকভাবে বুর্জোয়াদের ওপর নির্ভর করতে পারত। আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য ডাইরেক্টরী যুদ্ধনীতি গ্রহণ করল এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকল।

আভ্যন্তরীণ নীতি

বিভিন্ন সমস্যা

ডাইরেক্টরীকে কয়েকটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তগত করতে হয়। প্রথম অভ্যুত্থান (coup) অনুষ্ঠিত হয় ১৭৯৭-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে। এই অভ্যুত্থান প্রথম ডাইরেক্টরীর পরিসমাপ্তি ঘটায়, যেটি—দু'বছর ধরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফ্রান্সে শাসন করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। প্রথম ডাইরেক্টরী কনভেনশনের নৃপতি হত্যাকারীদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রীরা

স্বৈরতন্ত্রী শাসন প্রবর্তন

বিশেষ করে স্থান পায়। চরম বামপন্থী নেতা ব্যাবুফ কিন্তু এই সরকারকে মেনে নিলেন না। তিনি সাম্যবাদী সরকার স্থাপনের জন্য চেষ্টা চালাতে থাকলেন। তাঁকে বন্দী করবার নির্দেশ দেওয়া হলে তিনি আত্মগোপন করেন। ব্যাবুফই প্রথম রাজনৈতিক নেতা যিনি বিপ্লবকে বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টা চালান। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাবুফের মতবাদ প্রসারে সাহায্য করল। কাগজের নোটের কোন মূল্যই রইল না। নতুন কাগজের নোট বের করা হল। এতে কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হ'ল না। এদিকে সরকার ব্যাবুফপন্থীদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করল। ব্যাবুফ ও তাঁর অনুচরদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। ব্যাবুফপন্থীদের আন্দোলনের ফলে ডাইরেক্টরী শাসনের নীতির পরিবর্তন ঘটল।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

জেকোবিন নীতি ত্যাগ করে এই সরকার নরমপন্থী হল। ১৭৯৭-এর নির্বাচনে নরমপন্থীদের জয় হল এবং চরমপন্থী ডাইরেক্টর লিটরনর নির্বাচনে পরাজিত হলেন। নতুন আইন সভা যুদ্ধের বদলে শান্তি চাইল। রাজতন্ত্রীরা এর বিরোধিতা করল না। তারা মনে করল যে শান্তি স্থাপিত হলে অষ্টাদশ লুই-এর পক্ষে ফ্রান্সে ফিরে আসা সম্ভব হবে। কিন্তু ডাইরেক্টররা শান্তি চাইলেন না। তাঁরা আরও তীব্রভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইলেন। তাঁরা মনে করলেন যে যুদ্ধের দ্বারাই প্রজাতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও নীতি সফল হবে।

সমস্যা সমাধানের জন্য যুদ্ধনীতি গ্রহণ

১৭৯৬-এর যুদ্ধজয়গুলি প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী করল। ইটালীতে বোনাপার্টির জয়যাত্রা, জার্মানীতে ফরাসী সৈন্য বাহিনীর পরাজয়ের গ্লানি ঢেকে দিল। অধিকৃত অঞ্চল হতে অর্থ আমদানির ফলে ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল হল। নেপোলিয়ন ইটালীতে কর বৃদ্ধি করে প্রচুর অর্থ পেলেন এবং সেই অর্থ ফ্রান্সে পাঠান হল। ফলে ফ্রান্সের কোন দল বা সরকারের পক্ষে নেপোলিয়নকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হল না। এদিকে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি ঘটল। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হঠাৎ কমে গেল। শহরের গরীব অধিবাসীদের এতে সুবিধা হলেও কৃষকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটল। কর আদায় ঠিকভাবে করা গেল না। রাজতন্ত্রীরাও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইলো। ডাইরেক্টরীর অধিকাংশ সদস্য প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে এর বিরোধিতা করলেন এবং সেনাপতি হোচের সাহায্যে বিপক্ষদলকে সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত করলেন। এরপর রাজতন্ত্রীরা রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলবার চেষ্টা করলে ডাই-রেক্টরী নেপোলিয়নের সাহায্যে অন্যতম ডাইরেক্টর বারথেলাম সহ নেতাদের গ্রেপ্তার

বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ ও তার প্রতিক্রিয়া

করলেন। পরিষদের ১৯৮ জন ডেপুটির নির্বাচন নাকচ করে দেওয়া হল এবং এদের মধ্যে ৩২ জনকে নির্বাসনে পাঠান হল। প্রতিক্রিয়াশীল যাজক ও এমিগ্রাদের বিরুদ্ধে পুরানো আইন পুনরায় চালু করা হল। অবশ্য সংবিধানে কোন পরিবর্তন আনা হল না। ডাইরেক্টরদের মধ্যে সকলেই প্রজাতন্ত্রী রইলেন। কিন্তু এর ফলে ডাইরেক্টরীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেলনা। সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। স্বাধীনভাবে কোন কিছু করার ক্ষমতা রইল না। এই সময় হতে ডাইরেক্টরীর বৈদেশিক নীতি নেপোলিয়ন নির্ধারণ করতে থাকলেন। অস্ট্রিয়ার সাথে কম্পোফার্মি-ও ও লুনিভিলের সন্ধি দুটি থেকে এটি বোঝা যায়। তিনি ফ্রান্সে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন কিন্তু তখনও ঠিক সময় হয়নি বলে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

১৭৯৭-এর অভ্যুত্থানের পর হতে ফ্রান্সের কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ সংবিধান পরিবর্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে দৃঢপ্রতিজ্ঞ হলেন। যেহেতু সংবিধান সংশোধন সময় সাপেক্ষ ছিল সে কারণে তাঁরা অপর একটি অভ্যুত্থানের অপেক্ষায় রইলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টার সেইজ বললেন—'তিনি একটি তরবারির খোঁজে আছেন'—নেপোলিয়নকেই এই তরবারি বলে মনে করা হল।

পতন: মিশর হতে নেপোলিয়ন প্যারিসে ফিরে এসে দেখলেন জনসাধারণ তাঁকে বীর নেতারূপেই মনে রেখেছে। জাতির পরিত্রাতা হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করা হল। তিনি এই সুযোগের সদব্যবহার করলেন। ফরাসী জনতার কোন অংশই তখন ডাইরেক্টরী শাসনের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সরকারের নীতিতে ক্ষুব্ধ ছিল। ব্যবুরুফপন্থীরা বিক্ষুব্ধ এবং অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিকরা পোপের রাজ্য অধিকার করে নেবার ফলে রুষ্ট হয়েছিল। সংক্ষেপে জনসাধারণ ডাইরেক্টরী শাসনের অবসান চাইল। নেপোলিয়ন এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। ১৭৯৯-এর ৯ই নভেম্বর তাঁর নেতৃত্বে এক অভ্যুত্থান ঘটল। ফ্রান্সে এক নতুন সরকার স্থাপিত হল। এর নাম হল কনসালেট। কনসালেটের ওপর নতুন সংবিধান রচনার ভার দেওয়া হল। নেপোলিয়ন সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করলেন। সেইজ ভেবেছিলেন তিনিই ফ্রান্সের শাসক হবেন কিন্তু তা সম্ভব হল না।

বৈদেশিক নীতি: বৈদেশিক ক্ষেত্রে ডাইরেক্টরী কনভেনশনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলল। কনভেনশন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম রাষ্ট্রজোট ভেঙে দিতে সক্ষম হয়। এর ফলে ডাইরেক্টরীর পক্ষে যুদ্ধ নীতি পরিচালনা করা সহজতর হয়। ইংল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে ডাইরেক্টরী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নীতি গ্রহণ করে। তাছাড়া বৈদেশিক যুদ্ধ চলতে থাকলে আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে

পারবে না বলে মনে করা হল। জার্মানীর মধ্য দিয়ে অষ্ট্রিয়া আক্রমণের ভার সেনাপতি জরদুর ও মোরোর হাতে দেওয়া হল। আর ইটালী অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হল নেপোলিয়নের ওপর।

সেনাপতি হয়ে নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়াকে ইটালী হতে বিতাড়িত করবার জন্য সসৈন্যে ইটালী আক্রমণ করলেন। তড়িৎ গতিতে তিনি ইটালীতে গিয়ে উপনীত হলেন। তাঁর আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সার্ডিনিয়া, স্যাভয় ও নিস্ ফ্রান্সের হাতে তুলে দিয়ে সন্ধি করল। সার্ডিনিয়া পরাজিত হলে নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়াকে লম্বার্ডি হতে বিতাড়িত করার জন্য এগিয়ে গেলেন। অষ্ট্রিয়ার সৈন্য বাহিনী বাধা দিলেও নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্য বাহিনীর গতিরোধ করতে পারল না। তিনি সসৈন্যে মিলান শহরে প্রবেশ করলে মিলানবাসীরা তাঁকে তাদের পরিত্রাতা হিসেবে গ্রহণ করল। এর পর তিনি আরকোলা ও রিভোলীর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করলেন। এরপর তিনি ভিনিস হস্তগত করলেন। এইভাবে লম্বাডি ও ভিনিস হতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করার ফলে গোটা ইটালী ফ্রান্সের আওতায় চলে এল।

নেপোলিয়ানের ইটালী অভিযান

এরপর নেপোলিয়ন পোপ অধিকৃত অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালালেন এবং খুব সহজেই পোপকে টলেনশিও (Tolentio)-র সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে পোপ আভিগনে (Avignon) ফ্রান্সের দাবি মেনে নিলেন। এছাড়া পোপের নিকট হতে নেপোলিয়ন প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পেলেন। পোপের নিকট হতে যে সব অঞ্চল নেপোলিয়ন হস্তগত করলেন সেগুলির সমবায়ে Cisalpine Republic নামে এক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র স্থাপন করলেন। ইটালীর অভিযান সম্পূর্ণ করার পরে নেপোলিয়ন আল্পস পর্বত অতিক্রম করে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অষ্ট্রিয়ার রাজা উপায়ান্তর না দেখে নেপোলিয়ানের সাথে কাম্পো-ফর্মিও (Compo Formio)-র সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তিনি ফ্রান্সকে বেলজিয়াম ছেড়ে দিলে রাইন নদী পর্যন্ত ফ্রান্সের সীমানা মেনে নিলেন এবং উত্তর ইটালীর লম্বার্ডি, ভিনিসিয়ার কতকাংশ, মডেনা প্রভৃতি অঞ্চল (Cisal Pine Republic)-এর সাথে যুক্ত করা হল এবং অষ্ট্রিয়া এটি মেনে নিল। এ ছাড়া, নেপোলিয়ন জেনোয়ায় লাইগুরিয়ান রিপাবলিক নামে যে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র স্থাপন করেছিলেন তা অষ্ট্রিয়াকে মেনে নিতে হল। অষ্ট্রিয়া কর্তৃক এইসব মেনে নেবার বিনিময়ে নেপোলিয়ন

ইটালী অভিযানের ফলাফল

অষ্ট্রিয়াকে ভিনিস, ইস্ট্রিয়া ও ডালমেশিয়ায় অবস্থিত ভিনিসিয়ান স্থান সমূহ অধিকার করার সুযোগ দিলেন।

প্রাচ্য অভিযান : ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মিশর জয় করতে যান। মাল্টা দ্বীপটি দখল করে তিনি মিশরে উপস্থিত হলেন।

মিশরে

নেপোলিয়ন মনে করলেন যে মিশর জয় করলে ইংল্যাণ্ডের প্রাচ্যের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এই পরোক্ষ আঘাতের ফলে ইংল্যাণ্ডের যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে তার ফলে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হবে। মিশরের শাসকবর্গ তাঁর গতিরোধ করতে পারল না। পিরামিডের যুদ্ধে তিনি মিশরীয় সৈন্যদের পরাজিত করলেন। এই যুদ্ধজয়ের ফলে মিশরে ফ্রান্সের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। মিশর হতে নেপোলিয়ন সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হলেন। সিরিয়ায় কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তিনি 'একার' নগরী দখল করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডের নৌ-সেনাপতি নেলসনের সুদক্ষ পরিচালনায় বৃটিশ নৌবহর নীল নদের উপকূলে অবস্থিত নেপোলিয়নের নৌবহরকে আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দেয়। এই নৌযুদ্ধকে নীল নদের যুদ্ধ বা আবুকির বে-র যুদ্ধ বলা হয়। এই নৌযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নেপোলিয়নের পক্ষে জলপথে ফ্রান্সে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব হল। তিনি সসৈন্যে স্থলপথে ফিরে আসবার জন্য সিরিয়া দখল করবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তিনি স্বল্পসংখ্যক সৈন্য সহ কোনক্রমে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ফিরে এলেন।

বৈদেশিক নীতিতে বিপর্যয় : ইতিমধ্যে ডাইরেক্টরীর ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতির ফলে ফ্রান্স-বিরোধী দ্বিতীয় রাষ্ট্রজোট স্থাপিত হল। এই সময় ফ্রান্স নিজেকে বাঁচাবার জন্য কয়েকটি তাঁবেদার প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করে—ব্যাটাভিয়ান রিপাবলিক (হল্যাণ্ড) ; সিসলপাইন রিপাবলিক (মিলান), লাইগুরিয়ান রিপাবলিক (জেনোয়া) রোমান রিপাবলিক (পোপের রাজ্য), পার্থিনোপ্যান রিপাবলিক (নেপল্‌স্ ও সিসিলি)

ফ্রান্সের যুদ্ধে পরাজয় ও তার প্রতিক্রিয়া

এবং হ্বালভেটিক রিপাবলিক (সুইজারল্যাণ্ড)। এই সব তাঁবেদার রাষ্ট্র স্থাপন করার ফলে ইউরোপে রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ ভীত-ত্রস্ত হল এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার সাথে রাশিয়া যোগ দিল। রাশিয়ার সেনাপতি সুভোরফ-এর নেতৃত্বে রুশ-বাহিনী ইটালী আক্রমণ করলে ফরাসী বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। জার্মানী হতেও ফরাসী বাহিনী বিতাড়িত হল। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ডাইরেক্টরীর এই অসাফল্য এর পতনের অন্যতম কারণ।

Q. 17. Give a critical analysis of the constitutional provisions of the Consulate. *Or*, **Discuss internal successes of the Consulate.** *Or*, **Describe Napoleon's administrative achievements as a first Consul,** *Or*, **Form an estimate of Napoleon's civil qualities and his civil administration in France.**

Ans. ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর নেপোলিয়ন সামরিক শক্তির সাহায্যে বলপূর্বক ডাইরেক্টরী ভেঙে দিলেন। ফ্রান্সে কনসালেট নামে এক নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। এই সরকারের ওপর নতুন সংবিধান রচনার ভার দেওয়া হল। কনসালেটকে ফ্রান্সে চতুর্থ শাসন-ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এই নয়া সংবিধান Constitution of the Year, VIII নামেও পরিচিত। এই সংবিধান অনুসারে দশ বছরের জন্য মনোনীত তিনজন কন্সাল নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র সমিতির ওপর রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা দেওয়া হল। প্রকারান্তরে নেপোলিয়ন সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করলেন।

নতুন সংবিধান

প্রথম কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ন : কনসালেট শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়েছিল নেপোলিয়নের জন্য। তাঁর নিরবচ্ছিন্ন জয়যাত্রা এই সরকারকে মহীয়ান করল। আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা এবং বিদেশে ফ্রান্সের প্রভাব বজায় থাকবে বলে জনসাধারণ মনে করল। নেপোলিয়নের বয়স তখন মাত্র ৩০ বছর কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা এই সরকারকে জনপ্রিয় করে তুললো। কিন্তু তাঁর সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর নির্ধারিত লক্ষ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তাঁকে বিপ্লবের প্রতিমূর্তি বলে মনে করা হল। এর চেয়েও তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক। হয়তো বা তিনি জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন। তাঁকেই ভলটেয়ারের মানসপুত্র বলা যেতে পারে। তিনি জনতার ইচ্ছা বা সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। পরিষদীয় গণতন্ত্রে তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তিনি প্রজ্ঞার চেয়ে প্রজ্ঞানুশীলনে নির্ভর করতেন এবং প্রতিভাধরদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন। অঙ্কবিদ, আইনবিদ্ ও কূটনীতিবিদদের তিনি সম্মান করতেন। তিনি মনে করতেন যে সামরিক শক্তি ভিত্তিক স্থির লক্ষ্যে উপনীত হবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন শক্তিই দাঁড়াতে পারে না তিনি জনতাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন, তবে বিশ্বাস করতেন যে জনতাকে খুব সহজেই পরিচালিত করা যায়। তাঁকে সর্বাপেক্ষা অধিক বেসামরিক সৈন্যাধ্যক্ষ বলা হয়। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে

তাঁর প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস

ব্যক্তিগত গুণাবলী

নেপোলিয়নকে যেভাবেই চিত্রিত করা হোক না কেন আসলে তিনি সৈনিক ছিলেন।

নতুন শাসনের স্বরূপ: কনসালেটের আমলে যে একনায়কতন্ত্র তিনি স্থাপন করলেন সেটি হল সামরিক একনায়কতন্ত্র—এটি যদিও সংবিধানের দ্বারা ঢাকবার চেষ্টা করা হয়। এই নতুন সংবিধানে মানবিক অধিকারগুলি সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না, সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর উল্লেখ রইল না। তবে এটা বলা হল যে এমিগ্রাদের বিরুদ্ধে আইন নাকচ করা হল এবং জাতীয় ভূসম্পত্তির আর হাতবদল হবে না।

কনসালেট শাসন-ব্যবস্থা: প্রথম কনসাল হিসেবে নেপোলিয়নের হাতে আইন প্রণয়ন ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হল। আর দুজন কনসালের প্রকৃত-পক্ষে কোন ক্ষমতা ছিল না। প্রথম কনসালই আইনের প্রস্তাবনা করতে পারতেন, মন্ত্রী, সেনাপতি, উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেট এবং কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়োগ করতেন। অন্যান্য পরিষদগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচনে তাঁর হাত ছিল।

প্রথম কনসাল

পূর্বেকার মত এই নয়া সংবিধানটি গণভোটের মাধ্যমে গৃহীত হল। সংবিধানটির চেয়ে মূল্যবান হল কনসালেটের শাসনতান্ত্রিক কার্যাবলী এবং যে নীতির ওপর ভিত্তি করে এই সংস্কারগুলি প্রবর্তন করা হয়েছিল। আইন-পরিষদকে কাউন্সিল অব্ স্টেট, ট্রিবিউনেট, লেজিসলেটিভ বডি, সিনেট—এই চারটি সংস্থায় বিভক্ত করা হল। পূর্বে আইন-পরিষদের হাতে যে সব ক্ষমতা ও অধিকার ছিল তা এই চারটি সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। কাউন্সিল অব্ স্টেট শাসনতন্ত্রের মাথা স্বরূপ ছিল। এই সভা আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করত। নেপোলিয়ন এটিতে কেবলমাত্র প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করলেন। এই সভার দুরকমের দায়িত্ব ছিল—আইনের খসড়া তৈরি করা এবং শাসন বিষয়ক মতপার্থক্য দূর করা। প্রথম প্রথম নেপোলিয়ন এই সভার বৈঠকে যোগ দিতেন, পরে এর কার্যাবলী সম্বন্ধে নিজেকে অবহিত রাখতেন। ট্রিবিউনেট কেবলমাত্র প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারত। লেজিসলেটিভ বডি প্রস্তাবিত আইনটি ভোটাধিক্যে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারত এবং সিনেটের কাজ ছিল আইনটি শাসনতন্ত্রের এক্তিয়ারের মধ্যে আছে কিনা তা দেখে গ্রহণ বা বর্জন করা।

বিভিন্ন পরিষদ

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা: নয়া সংবিধানে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায়

বিশেষ পরিবর্তন আনা হল না। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের শাসন ব্যাপারে প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করার দায়িত্ব নেপোলিয়ন নিজ হস্তে গ্রহণ করলেন। এ সব কর্মচারী তাদের কার্যাবলীর জন্য তাঁর নিকট দায়ী থাকত। এদের প্রিফেক্ট বা সাব প্রিফেক্ট বলা হত। এরা চতুর্দশ লুই-এর আমলের ইনটেন্‌ড্যান্টদের কথা মনে এনে দেয়। সংক্ষেপে, নেপোলিয়ন প্রথম কনসাল হিসেবে ফ্রান্সের শাসন-ব্যবস্থা আরও কেন্দ্রীভূত করলেন। শাসন ব্যাপারে প্রত্যেক প্রিফেক্টকে জেলা ভিত্তিক দুটি কাউন্সিল সাহায্য করত। ছোট কমিউনগুলিতে শাসনকার্য পরিচালনায় জন্য মেয়র থাকত এবং প্রিফেক্টরা মেয়র নিযুক্ত করতেন। বড় বড় কমিউনগুলির মেয়র নিযুক্ত করতেন স্বয়ং নেপোলিয়ন।

বিচার ও পুলিশ-বিভাগে পরিবর্তন : বিচার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হল। বিচারক নিয়োগে নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল করে দেওয়া হল। বিচারকরা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন বলে ঠিক হল। স্থায়ী বিচারকদের কর্মচ্যুত করা সহজসাধ্য থাকল না। ক্রমিক ক্ষমতা-বিশিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হল। আপিল কোর্টের সংখ্যা বাড়ানো হল। এ বিষয়ে একটি সুপ্রীম কোর্টও স্থাপন করা হল। পুলিশের ক্ষমতা অবশ্য কমানো হল না। ফলে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে আটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।

অর্থনৈতিক সংস্কার : আথিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হল। প্রত্যক্ষ কর আদায়ের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করা হল। অপ্রত্যক্ষ করও বাড়ানো হল। দেশের মুদ্রানীতি পরিচালনা করবার জন্য ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স স্থাপিত হল। এই ব্যাঙ্ক আথিক ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তনে সমর্থ হল। রাজস্বখাতে ব্যয় যথাসম্ভব কমানো হল। শাসনকার্যে এত মিতব্যয়িতার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল।*

সামাজিক সংস্কার : ফ্রান্স হতে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করবার জন্য নেপোলিয়ন বিশেষভাবে সচেষ্ট হলেন। তাঁর সরকার নানারূপ গঠনমূলক কাজে হাত দিল। রাস্তাঘাট নির্মিত হল। অসংখ্য সেতু তৈরি করা হল। জলাভূমি নিষ্কাশন করা হল। বন্দরগুলিকে প্রসারিত করে রপ্তানি বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলল। প্যারিসকে নতুনভাবে সাজানো হল।

শিক্ষাক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হল। শিক্ষকতা কার্যকে জাতিগঠনের কার্য বলে মনে করা হল। এই সময় ফ্রান্সের জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরি করা হয়। প্রাথমিক

* 'Never had a Great State been run more economically'.—*David Thomson.*

হতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চারটি পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত স্তরে ভাগ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি কমিউনে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সুব্যবস্থা করা হল। মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনে বিশেষ নজর দেওয়া হল। কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করা হল। আধুনিক কলেজের ন্যায় লিসি (lycee) নামক উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল। ১৮০৮-এ নেপোলিয়ন ফরাসী শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ইউনিভারসিটি অব ফ্রান্স প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সমস্ত শিক্ষকদের আনা হল। হাসপাতাল ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো হল।

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার

সামরিক বিভাগ: সামরিক বিভাগ ঢেলে সাজানো হল। এই বিভাগের ওপর নেপোলিয়নের বিশেষ নজর ছিল। প্রতিভা ও দক্ষতাকে এই বিভাগে উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি বলে গণ্য করা হল। সামরিক বিভাগের কর্মচারীদের শিক্ষিত করবার জন্য সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হল।

এই সংস্কারগুলি বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য প্রয়োজন ছিল অসংখ্য দক্ষ কর্মচারীর। নেপোলিয়ন দল-নিরপেক্ষভাবে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। ফলে সকল শ্রেণীর লোকেরাই নেপোলিয়নের শাসন সানন্দে মেনে নিল। অভিজাতদের হাত করবার জন্য তিনি নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং এমিগ্রারা যাতে দেশে ফিরতে পারে তার ব্যবস্থা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে অতীতের রাজনৈতিক মতবাদের জন্য একজনকেও পীড়ন করা হবে না। অবশ্য যারা তাঁরা শাসন মেনে নিল না তাদের ওপর অত্যাচার আরও জোরদার হল।

দক্ষ কর্মচারী নিয়োগ

ধর্মব্যাপারে সংস্কার: ধর্মব্যাপারে নেপোলিয়ন বিশেষ আগ্রহ দেখালেন এবং পোপের সাথে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য সবিশেষ উৎসাহী হলেন। তিনি মনে করতেন যে জনসাধারণ ধর্মের জন্য কাঙাল; তাদের নিকট ধর্ম একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস। তাছাড়া, তাঁর নতুন শাসন-ব্যবস্থার পিছনে যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সমর্থন থাকে তার জন্যও তিনি বিশেষভাবে অগ্রণী হলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি পোপের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এই চুক্তিটিকে Concordat বলা হয়। এই চুক্তিতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে ফ্রান্সের ধর্ম বলে মেনে নেওয়া হল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ হতে ফরাসী যাজক সম্প্রদায় রাষ্ট্রের নিকট হতে কোন আর্থিক সাহায্য পাচ্ছিল না। নেপোলিয়ন তাদের ব্যয়ভার

পোপের সাথে মিটমাট

বহনে সম্মত হলেন। ঠিক হল যে উচ্চপদস্থ যাজকদের প্রথমে মনোনীত করবেন প্রথম কনসাল পরে পোপ এটি অনুমোদন করে তাদের ধর্মীয় শাসনাধিকার দেবেন, নিম্নপদস্থ যাজকদের নিয়োগ করবেন বিশপরা কিন্তু এটি অনুমোদন করবেন প্রথম কনসাল। এর বিনিময়ে বিপ্লবের সময় চার্চের যে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল পোপ তার বৈধতা স্বীকার করে নিলেন। এই ব্যবস্থায় নেপোলিয়নের দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। চার্চের সাথে আপসের ফলে যেমন ফ্রান্সের ধর্ম সম্বন্ধীয় আভ্যন্তরীণ বিরোধ বন্ধ হল, তেমনি ধর্মপ্রাণ ফরাসী জনসাধারণ ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ওপর শ্রদ্ধাশীল হল। Civil constitution of the Clergy গৃহীত হবার পর হতে বিপ্লবী সরকারের সাথে চার্চের যে কলহ শুরু হয় তা concordat-এর দ্বারা দূরীভূত হল। নেপোলিয়ন ধর্মোপাসনার সর্বজনীন স্বাধীনতাও স্বীকার করে নেন।

কোড নেপোলিয়ন: নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক ও স্থায়ী কাজ হল—ন্যায়সংহিতা বা কোড নেপোলিয়নের প্রণয়ন। সংবিধান সভা সর্বপ্রথম এক সুসংবদ্ধ আইন-বিধি প্রণয়নের চেষ্টা করে এবং কনভেনশন এই চেষ্টা বাস্তবে পরিণত করার দিকে অনেকটা এগিয়ে যায়। ডাইরেক্টরীর আমলে এটিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি। নেপোলিয়ন প্রথম কনসাল হয়ে এদিকে নজর দেন। তিনি ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আইন-গুলির মধ্যে সুষম সমন্বয় সাধনের দ্বারা সমগ্র ফ্রান্সের জন্য এক আইন বিধির সঙ্কলনের জন্য মনোযোগী হলেন এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দেশের জন্য এক আইনবিধি তৈরি সম্ভব হল।

এর স্বরূপ ও মূল্য

মোট পাঁচটি আইনবিধি মিলে কোড নেপোলিয়ন সৃষ্ট হল। এর মধ্যে ছিল civil code, code of civil procedure, code of criminal procedure, penal code এবং commercial code. এটির মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ ও সুফলগুলি কালজয়ী করার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্মোপাসনার স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের চেতনা এটির মধ্যে বিধৃত হয়ে রয়েছে। সাম্যের ক্ষেত্রে কোডটি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলো যে আইনের চোখে সকলেই সমান। অবশ্য সম্পত্তি ভোগের অধিকার ব্যক্তি-মানুষকে দেওয়া হল। মজুরি সম্বন্ধে এই কোডে কিছু বলা হয়নি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অজুহাতে নিয়োগকারীদের ওপর কর্মচারীদের ভাগ্য ছেড়ে দেওয়া হয়। স্ত্রীজাতির ক্ষেত্রে সাম্য ধারণা প্রযুক্ত নয় বলে এই কোড মেনে নেয়। পুরুষের সমান নারীকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হল না। উপনিবেশে দাসপ্রথা

পুনরায় চালু করা হল। Concordat-এর ন্যায় কোডটিও পুরানো রাজতন্ত্র ও বিপ্লবের মধ্যে একট রফাস্বরূপ। অবশ্য রাজতন্ত্রের সাথে বিপ্লবের সংঘর্ষে কোড বিপ্লবকেই শক্তিশালী করেছে। অবশ্য কোড নেপোলিয়নের ঐতিহাসিক মূল্য অগ্রাহ্য করা যায় না। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান—এই মৌলিক নীতির ভিত্তিতে যে বিধানাবলী রচনা করা হয়েছিল পরবর্তীকালে ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্র এটিকে অনুসরণ করে আইনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছিল। ইউরোপের যে সব অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারে আসে সেগুলিতে আইনবিধি প্রচলিত হবার ফলে ওই অঞ্চলগুলি মধ্যযুগীয় সমাজ-ব্যবস্থা হতে মুক্ত হল। এসব অঞ্চলে ভূমিদাস প্রথার অবসান, জুরি দ্বারা বিচার প্রভৃতি ব্যবস্থা স্থায়ী হল। এই আইনবিধি প্রণয়নের ব্যাপারে নেপো-লিয়নের অবদানের কথা অস্বীকার যায় না বলেই তাঁকে দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান রূপে আখ্যাত করা হয়েছে।

অন্যান্য ব্যবস্থা : সরকারী কাজে নিযুক্ত যে সব সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী নির্দিষ্ট কর্তব্যসাধনেব দ্বারা আদর্শ দেশসেবার পরিচয় দিতে পারবেন তাঁদের Legion of Honour প্রদানের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সম্মানের বন্দোবস্ত করা হল।

সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের ফলে যে সব পরিবর্তন আনা হয়েছিল তা রক্ষা করা হল। ভূমিদাস প্রথা এবং সামন্ত প্রথার অবসান ঘটল। বিপ্লবের ফলে ভূমিব্যবস্থার যে পরিবর্তন আনা হয়েছিল তা টিকিয়ে রাখা হল। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি এবং কারিগরী উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হল। শুল্ক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা হল। প্রত্যক্ষ কর ছাড়া আর কোন প্রকার কর নেওয়া হল না। ব্যবসাদারদের অতি মুনাফা যাতে না হয় সেদিকে কড়া নজর রাখা হল।

প্রথম কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ন যে সব যুগান্তকারী সংস্কার প্রবর্তন করেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি কালজয়ী হয়েছে। তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত, নেপোলিয়ন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি, জনসাধারণের মঙ্গলের সবিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আংশিকভাবে আস্থাশীল ছিলেন। তিনি সাম্যনীতির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সংস্কারমূলক কার্যে হাত দিয়েছিলেন। আইনের সমদর্শিতা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান, জাতীয় শিক্ষার প্রচলন, গুণানুসারে উন্নতির সুযোগ ইত্যাদির মূলে সাম্যনীতিই মানদণ্ড ছিল। কিন্তু এই সব সুযোগসুবিধা ফরাসী জনসাধারণ পেল তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে

মন্তব্য

বিসর্জন দিয়ে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি কাজে লাগালেন সুনাগরিক তৈরি করার জন্য নয়, অনুগত নাগরিক তৈরি করার জন্য। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতা তিনি কেড়ে নেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার চিহ্নও তিনি রাখেন নি। দ্বিতীয়ত, তিনি ফ্রান্সে এক শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে সংস্কারগুলির প্রবর্তিত করেন নি। তাঁর সংস্কারগুলির দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বিশেষভাবে লাভবান হল। ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণী তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তৎপর হল। আর্থিক বাণিজ্যিক ও রাজস্ব ক্ষেত্রে যে সব সংস্কার তিনি প্রবর্তিত করেন সেগুলির দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বিশেষভাবে উপকৃত হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষেত্রে সভ্য, রীতিবদ্ধ ও সমুন্নত শাসন ব্যবস্থার পত্তন করেন।

Q. 18. Describe the foreign policy of the Consulate.

Ans প্রথম কনসাল হবার অব্যবহিত পরেই নেপোলিয়ন সামরিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দৃঢপ্রতিজ্ঞ হলেন। ডাইরেক্টরীর ত্রুস্ত পররাষ্ট্রনীতির সুযোগে ইংলণ্ড পুনরায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়াকে সহযোগী করে এক রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করে। এর ফলে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটতে থাকে। জার্মানী ও ইটালী হতে ফরাসী সৈন্য পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। অবশ্য নেপোলিয়ন ক্ষমতা হস্তগত করার পূর্বেই ফ্রান্স বিদেশী রাষ্ট্রজোটের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। রাশিয়ার জার পল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গঠিত রাষ্ট্রজোট পরিত্যাগ করেন। একারণে ফ্রান্সের প্রধান শত্রুর মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া টিকে থাকল।

ফ্রান্সের গৌরব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা

নেপোলিয়ন প্রথমে এই দুটি শক্তির সাথে শান্তি স্থাপনের জন্য এক প্রস্তাব পাঠান কিন্তু তাঁর প্রস্তাব ইংল্যাণ্ড বা অষ্ট্রিয়া কেউই গ্রহণ করল না। ফলে নেপোলিয়ন সামরিক শক্তির দ্বারা এই দুই শত্রুকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইংল্যাণ্ড সমুদ্রের অপর পারে অবস্থিত বলে এবং নৌশক্তিতে ফ্রান্সের চেয়ে শক্তিশালী বলে নেপোলিয়নের সমস্ত রোষ অষ্ট্রিয়ার ওপর পড়ল। তিনি সেনাপতি মোরো (Moreau)-কে জার্মানীর ভেতর দিয়ে অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করবার জন্য পাঠালেন এবং নিজে ইটালী হতে অষ্ট্রিয়াকে বহিষ্কারের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অসীম সাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়ে নেপোলিয়ন সসৈন্যে আল্পসের সেণ্ট্ বার্নর্ডে গিরিবর্ত্ম অতিক্রম

প্রথমে শান্তি প্রস্তাব

যুদ্ধনীতি

করে ইটালীতে অস্ট্রিয়ান সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করবার জন্য মারেংগোর রণক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ানদের সম্মুখীন হলেন। অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। আবার হোয়েনলিণ্ডেন (Hohen-linden)-এর যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী সেনাপতি মোরো অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করলেন। এ দুটি চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সের সাথে সন্ধি স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হলেন এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে লুনেভিলে (Luneville) সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অস্ট্রিয়া কেবলমাত্র কম্পো-ফর্মিও-র সন্ধির শর্তগুলিই মেনে নিল না, ইটালীতে নেপোলিয়ন যে সব পরিবর্তন আনলেন সেগুলি এবং ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্ররূপে হল্যাণ্ডকে বাটাভিয়ান সাধারণতন্ত্রে পরিবর্তন ইত্যাদি মেনে নিল। এছাড়া অস্ট্রিয়া রাইন নদীকে ফ্রান্সের পূর্ব-সীমানা বলে মেনে নিল। অনেকে লুনিভিলের সন্ধিটির শর্তগুলিকে কম্পো-ফর্মিও-র সন্ধির শর্তগুলির পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেন। কিন্তু বিশেষভাবে দেখলে বোঝা যায় যে লুনিভিলের সন্ধির শর্তগুলি অস্ট্রিয়ার পক্ষে আরও ক্ষতি-কারক ও অসম্মানজনক হল। ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য লোপ পেল। ট্যাসকানির ডিউক তাঁর রাজ্য হারালেন। জার্মানীতে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং অস্ট্রিয়া তা মেনে নিল। তিনশো জার্মান রাষ্ট্রের জায়গায় মাত্র চল্লিশটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠবার মত পরিবেশ সৃষ্টি হল।

অস্ট্রিয়ার পরাজয়

ফ্রান্সের সুবিধা

প্রথম কন্সাল হয়ে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের যাতে প্রসার ঘটে সেদিকে নজর দেন। এই সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। ফ্রান্সের নৌ-শক্তি বাড়াবার দিকে সবিশেষ নজর দিলেন। সান ডোমিনিগো দ্বীপে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তৎপর হন। স্পেনের নিকট হতে তিনি লুসিয়ানা অধিকার করে ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পত্তন করলেন। এছাড়া ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের জন্যও তিনি এক পরিকল্পনা তৈরি করেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সাথে নৌশক্তিতে পাল্লা দেবার মত দক্ষতা তিনি সঞ্চয় করতে পারলেন না। একারণে ইংল্যাণ্ডকে একঘরে করবার জন্য কূটনীতির আশ্রয় নিলেন। শত্রুপক্ষের জিনিসপত্র বহন করছে এই সন্দেহে ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ জাহাজগুলি সমুদ্রপথে সমস্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাণিজ্য জাহাজ তল্লাস করতে শুরু করে। এই অন্যায় তল্লাসের জন্য সমস্ত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র রুষ্ট হল। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির এই মনোভাবের সুযোগ নেপোলিয়ন সম্পূর্ণ গ্রহণ করলেন। ফলে রাশিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন

ঔপনিবেশিক নীতি

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

ও ফ্রান্স একজোট হয়ে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সশস্ত্র নিরপেক্ষতা (Armed Neutrality) এর সৃষ্টি করল। এর উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করা। ইংল্যাণ্ড অবশ্য এতে ভীত হল না। বরঞ্চ তৎপরতার সাথে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এ হানা দিয়ে গোলাবর্ষণ করল এবং ডেনমার্কের যুদ্ধজাহাজগুলি আটক করল। এর ভেতর রাশিয়ার জার পলের মৃত্যুর ফলে সশস্ত্র নিরপেক্ষতা ভেঙে গেল এবং ইংল্যাণ্ড সমূহ বিপদের হাত হতে রক্ষা পেল। মিশরেও ফরাসী সৈন্যবাহিনী কৃতিত্ব দেখাতে পারল না। এসবদিক বিবেচনা করে নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডের সাথে শান্তি স্থাপনের জন্য আগ্রহী হলেন। তাছাড়া তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর আভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলি কার্যকরী হবে না যদি-না তিনি অন্তত কিছুদিনের জন্য সামরিক তৎপরতা বন্ধ না রাখেন। ইংল্যাণ্ডও দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে **অ্যামিয়েন্সের সন্ধিপত্র** স্বাক্ষরিত হল। এই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইংল্যাণ্ড সিংহল ও ত্রিনিদাদ ব্যতীত ফ্রান্স ও তার মিত্রপক্ষের যে সমস্ত স্থান দখল করেছিল তা ফিরিয়ে দিল। এছাডা চুক্তি স্বাক্ষরের তিন মাসের মধ্যে বৃটেন মাণ্টা দ্বীপ পরিত্যাগ করবে এবং মাণ্টা দ্বীপটিকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। তুরস্ককে মিশর ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যুদ্ধবন্দী বিনিময় হবে এবং দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব যাতে বৃদ্ধি পায় তার চেষ্টা করা হবে। অ্যামিয়েন্সের সন্ধি নেপোলিয়নের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এই সন্ধিতে ফ্রান্স এতদিন ইউরোপের যে সব অঞ্চল হস্তগত করেছিল ইংল্যাণ্ড তা মেনে নিল। সংক্ষেপে ইউরোপের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের আর কোন হাত রইল না। এমন কি বেলজিয়ামের ওপরও ফ্রান্সের অধিকার ইংল্যাণ্ড মেনে নিল।

ইংল্যাণ্ডের পাল্টা জবাব

ইংল্যাণ্ডের সাথে মৈত্রীচুক্তি

অ্যামিয়েন্সের সন্ধির তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে অ্যামিয়েন্সের সন্ধি একটি সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি মাত্র, কারণ ফ্রান্স ও বৃটেনের মধ্যে যে স্বার্থসংঘাত ছিল তা দূর করার চেষ্টা করা হয়নি। প্যারিস ও লণ্ডনের জনসাধারণ এই চুক্তিটিকে সাদরে গ্রহণ করল কিন্তু যতই দিন যেতে থাকল ততই তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ল। তিনটি ঘটনা ঘটার ফলে বৃটেন যুদ্ধ শুরু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রথমত, ইংরেজরা শংকিত হল নেপোলিয়নের উপনিবেশ বাড়াবার নীতির ফলে। লুসিয়ানা দখলে আনার ফলে মিসিসিপি নদীর মোহনা ফ্রান্সের আওতায় চলে যায় এবং ফরাসী গিয়ানায় সীমানা বৃদ্ধির জন্য আমাজন নদীর মোহনাও ফ্রান্সের

মৈত্রীচুক্তিতে ভাঙন

প্রভাবাধীনে আসে। তাছাড়া, হাইতি, টোবাগো, ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে ফরাসী তৎপরতা বৃটেনকে ভীত করল। দ্বিতীয়ত, নেপোলিয়ন ঘোষণা করলেন যে তিনি তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতি সমান আগ্রহী রয়েছেন। তৃতীয়ত, নেপোলিয়ন ফ্রান্সকে অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করবার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা নিলেন। বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্য যাতে ফরাসী বাজারে না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা হল। ফলে ফ্রান্স ও তার প্রভাবাধীনে যে সব রাষ্ট্র ছিল সেগুলিতে বৃটিশ পণ্য যেতে পারল না। একারণে গ্রেট বৃটেন যুদ্ধ শুরু করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল।

Q. 19. How do you explain the establishment of monarchy in France under Napoleon and its retention for years so soon after the execution of the Bourbon King? *Or*, How do you account for the submission of France to the rule of the Emperor.

Ans : ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জনসাধারণ ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডে উল্লসিত হয় এবং প্রজাতন্ত্রকে সাদরে আহ্বান জানায়। কিন্তু এই ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে সেই ফরাসী জনসাধারণই ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নকে তাদের সম্রাট হিসেবে সাগ্রহে মেনে নিল। আপাতদৃষ্টিতে ফরাসী জনসাধারণের মানসপ্রকৃতির এই পরিবর্তন খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু ১৭৯৩ হতে ১৮০৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ফরাসী জনসাধারণের ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নকে তাদের সম্রাট হিসেবে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। নেপোলিয়ন তৎকালীন অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। অবশ্য এর জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হতে হয়েছিল।

ভূমিকা

সম্রাট হিসেবে মেনে নেবার কারণ: কেন ফরাসী জনসাধারণ নেপোলিয়নকে সম্রাট হিসেবে মেনে নিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে প্রথমত ফরাসী বিপ্লব ফরাসীদের মনে এক বিরাট আশা জাগিয়ে ছিল এবং এই আশাই বিপ্লবের চালিকা শক্তি ছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বিশেষ করে কনভেনশনের শেষ কয়েক বছর ও ডাইরেক্টরীর আমলে জনসাধারণের এই আশা নিরাশায় পরিণত হল। আশাহত ফরাসী জনাসাধারণ তাদের সামনে মৃত্যুর করাল হাতছানি ছাড়া কিছু দেখল না। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে নেপোলিয়ন তাঁর যুগন্ধর প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হলেন এবং ফরাসী জনসাধারণকে এক সঞ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। জনসাধারণ নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হল, আত্মনির্ভরতা ফিরে পেল এবং নেতা হিসেবে

আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা ও হতাশা

নেপোলিয়নকে মেনে নিতে দ্বিধা করল না। প্রথম কনসাল হিসেবে নেপোলিয়ন যে সব জনহিতকর সংস্কার প্রবর্তন করলেন সেগুলি তাঁকে সম্রাট হবার পক্ষে সহায়তা করল। দ্বিতীয়ত শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্রজোটের আক্রমণের সম্মুখীন ফ্রান্সকে হতে হয়েছিল। নেপোলিয়ম বিদেশী শত্রুদের পরাজিত করে ফ্রান্সকে শুধু আক্রমণের ভীতি হতেই রক্ষা করলেন না, তাঁর সামরিক সাফল্য ইউরোপে ফ্রান্সের গৌরব ও প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি করল। অতএব নেপোলিয়ন যখন শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে দেশকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে নিয়ে গেলেন এবং ফ্রান্সের ভূলুণ্ঠিত রাজমুকুট নিজে গ্রহণ করতে চাইলেন তখন জনসাধারণ নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের ত্রাতা হিসেবে তাদের সম্রাট বলে মেনে নিতে দ্বিধা করল না। দেশের দীর্ঘকালের কন্সালকে ফরাসী জনমত স্বাভাবিকভাবেই সম্রাট বলে গ্রহণ করল। তৃতীয়ত, জনসাধারণ নেপোলিয়নকে ফরাসী বিপ্লব-সৃষ্ট নেতা হিসেবেই মনে করত এবং তাঁর হাতে বিপ্লব-প্রসূত পরিবর্তনগুলি অটুট থাকবে বলে বিশ্বাস করত। প্রথম কন্সাল রূপে নেপোলিয়ন যেভাবে ফ্রান্সের উন্নতি সাধন করলেন তাতে জনসাধারণের প্রত্যাশা আরও দৃঢ়তর হল। নেপোলিয়ন বিপ্লবী পরিবর্তনগুলি বাস্তবে রূপান্তরিত করলেন এবং জন্মকৌলিন্যের বদলে গুণকৌলিন্যকে তাঁর যাবতীয় সংস্কারের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। এই কাজের দ্বারা বিপ্লবী আদর্শের প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তা তিনি প্রমাণিত করলেন। জনসাধারণ ভাবল যে বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সন্তান নেপোলিয়ন সম্রাট হলে বিপ্লবী আদর্শ ফ্রান্সের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রসারিত হতে পারবে। চতুর্থত, নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভা, প্রখর ব্যক্তিত্ব ও কর্মশক্তি ফরাসী জনসাধারণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। তাঁর রুচিস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বে বুদ্ধি ও কল্পনার সুষম সমন্বয় ঘটেছিল। সেনাপতি হিসেবে তিনি দেশের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন, ফলে ফরাসী গণমানসে তিনি যে স্থান পান তা কয়েক বছরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে পরিণত হয়। এর ফলে তাঁকেই ফ্রান্সের সর্বাধিক গৌরববর্ধনের মূলাধার বলে মনে করা হল এবং তাঁকে সম্রাট বলে মেনে নেবার ব্যাপারে জনসাধারণের দ্বিধা রইল না।

শত্রুভীতি এবং সেনাপতি হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব

বিপ্লবী হিসেবে তাঁর অবদান

তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী

পরিশেষে বলা যায় যে নেপোলিয়ন ক্ষমতা হস্তগত করে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হলেন। এবং ধীরে ধীরে এদিকে অগ্রসর হলেন।

বুর্জোয়া শ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায়, যাজকবৃন্দ ও অভিজাতদের সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ষড়যন্ত্র বিনাশ করবার অজুহাতে বিরোধী পক্ষকে সম্পূর্ণভাবে দমন করলেন। প্রথম কন্সাল হিসেবে যে ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী তিনি হলেন তারই পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্রাট হবার ফলে।

মন্তব্য

Q. 20. Napolean once described himself as the 'Revolution and at another time he claimed to have destroyed the Revolution in France.' Critically examine the statements.

Or, **'Napolean was the child of Revolution'.—Explain.**

Ans. নেপোলিয়নের কার্যাবলীর মধ্যে ফরাসী বিপ্লব কতটা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। এবিষয়ে নেপোলিয়নের 'I am the Revolution' অর্থাৎ 'আমার মধ্যেই বিপ্লবের আদর্শ মূর্ত হয়েছে'—এই উক্তিটি বিশেষ মূল্যবান। পরবর্তীকালের অনেক ঐতিহাসিক নেপোলিয়নের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে তাঁকে ফরাসী বিপ্লবের উত্তরসাধক বলে আখ্যাত করেছেন। আবার নেপোলিয়ন অন্য এক সময় মন্তব্য করেছিলেন—'I have destroyed the Revolution' [আমি বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি]। নেপোলিয়নের এই উক্তিটি তাঁর পূর্ব উক্তিটির সম্পূর্ণ বিপরীত। পরস্পর-বিরোধী এই উক্তি দুটি হতে বিপ্লব সম্বন্ধে নেপোলিয়নের প্রকৃত মনোভাব ও বিপ্লবের আদর্শকে প্রসারিত করবার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার মাত্রা নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। তবুও নিরপেক্ষ ভাবে তাঁর কার্যাবলীর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে নেপোলিয়নের উক্তি দুটিরই যথেষ্ট মূল্য রয়েছে।

ভূমিকা

বিপ্লবী হিসেবে : ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলি বিপ্লবী ফ্রান্সকে ধ্বংস করবার জন্য বিশেষ তৎপর হয়। নেপোলিয়ন এসব রাষ্ট্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যুদস্ত করে ফ্রান্স তথা বিপ্লবকে রক্ষা করেন। ফ্রান্সের শত্রু রাষ্ট্রগুলি যদি যুদ্ধে জয়ী হত তা হলে ফ্রান্স আবার পুরানো স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রে ফিরে যেত। নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভার জন্য ফ্রান্সের শত্রুদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। ফ্রান্স তথা বিপ্লব জয়ী হল। সুতরাং একথা বলা চলে যে নেপোলিয়ন বিপ্লবকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেছিলেন।

শত্রুকে পরাজিত করে

রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম বিঘোষিত নীতি। নেপোলিয়ন এই নীতিকে ফ্রান্সে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে

কার্যকরী করার ব্যবস্থা করেন এবং বিশেষ সফলতাও অর্জন করেন। তিনি শাসনতান্ত্রিক বৈষম্যমূলক প্রথা রদ করে দেন। বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করে বিপ্লবের সাম্যনীতিটিকে কালজয়ী করার ব্যবস্থা করলেন। বিপ্লব ও জ্ঞানদীপ্তির অংশীদার ছিলেন বলে তাঁর নীতিতে উদারতা ও আন্তর্জাতিকতার প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। বিপ্লবী ফ্রান্স সকল মানুষের অধিকারের ঘোষণা জারি করেছিল, কেবলমাত্র ফরাসীদের জন্য নয়, ফ্রান্সের বাইরে যে সব অঞ্চলে নেপোলিযনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় সে সব অঞ্চলে একই প্রকারের উদার আইন-কানুন প্রচলিত করা হল। কোড-নেপোলিয়নেব মাধ্যমে বিপ্লব প্রসূত চিন্তাধারা, শাসন-তান্ত্রিক আইন কানুন ইউবোপের ফরাসী প্রভাবিত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। সুদূর পোল্যাণ্ড ও ইলিরিয়া প্রদেশও এর আওতায় চলে এল। আইনের দৃষ্টিতে ভেদ নেই, গুণানুসারে সকলেই সরকাবী কাজের উপযুক্ত--এই নীতিকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করলেন। বংশমর্যাদা ও অর্থকৌলিন্য না থাকলেও ব্যক্তিমানুষ যে নিজের প্রতিভা বলে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হতে পারে—এই আদর্শের মূর্ত প্রতীক ছিলেন নেপোলিয়ন স্বয়ং। সংক্ষেপে বলা যায় যে নেপোলিয়ন তাঁর কার্যাবলী দ্বারা ফরাসী বিপ্লবের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শকে স্থায়ী করতে সচেষ্ট হন এবং বেশ কিছুটা সফলতাও অর্জন করেন। ফ্রান্সের বাইবে বিপ্লবী আদর্শকে সম্প্রসারিত করার বলিষ্ঠ চেষ্টা তিনিই প্রথম কবেন।

বিভিন্ন সংস্কার

বিপ্লবের হন্তারক হিসেবে: কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে নেপোলিয়ন বিপ্লবের বহু আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। বিপ্লবের খারাপ দিকের সাথে, রক্তপাতের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেছিল বলে তিনি একদিকে যেমন জনতা পছন্দ করতেন না, অন্যদিকে জনসাধারণের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তিনি তুলে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন এবং সম্রাট হবার পর ফ্রান্স হতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা লোপ করে দিলেন। পুরানো রাজতন্ত্রেব মত তিনিও একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তুললেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলে কিছু রাখলেন না। এমনকি রঙ্গমঞ্চও সরকাবী নিয়ন্ত্রণে আনা হল এবং যাবতীয় স্বায়ত্তশাসন খর্ব করে একনায়কতন্ত্র চালু করলেন। একদিকে তিনি যেমন ফরাসী জাতীয়তাবাদকে রক্ষা করে বিপ্লবের সুফলকে স্থায়ী করলেন, অন্যদিকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা হরণ করে বিপ্লবের মৈত্রী আদর্শকে জলাঞ্জলি দিলেন। তাছাড়া

জনসাধারণের স্বাধীনতা লোপ করে

ফরাসী বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করে জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পণ করা। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে এই আদর্শ সফলতার পথে চলতে শুরু করে। কিন্তু প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হল না বা জনসাধারণও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হল না। ফলে নেপোলিয়ন প্রথমে কন্সাল হিসেবে ক্ষমতা হস্তগত করলেন এবং পরে সম্রাট হিসেবে ফ্রান্সের সর্বময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করলেন। সুতরাং ফরাসী বিপ্লব শুরু হয়েছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসানে—তার পরিণতি ঘটল নেপোলিয়নের একনায়ক শাসনে। এদিক হতে দেখলে নেপোলিয়ন বিপ্লবকে ধ্বংস করেছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে

সম্রাট হয়ে

উপসংহারে বলা যায় যে নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম আদর্শ সাম্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম কন্সাল হিসেবে তিনি বিপ্লবের মৈত্রী আদর্শকেও বাস্তবে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। অবশ্য সম্রাট হবার পর এই আদর্শটির প্রতি তাঁর আগ্রহ কমে যায়। কিন্তু প্রথম হতেই তিনি বিপ্লবের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। গণতন্ত্রের পরিবর্তে তিনি স্বৈরতন্ত্র প্রবর্তন করেন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করেন।

মন্তব্য

Q. 21. Give a short account on internal and external policy of Napoleon as Emperor of the French.

Ans. **আভ্যন্তরীণ নীতি :** ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন সম্রাট উপাধি গ্রহণ করলেন।

ফরাসী জনসাধারণ সাগ্রহে এটি মেনে নিল। এর ফলে সাংবিধানিক কিছু পরিবর্তন ঘটল। প্রজাতন্ত্রী সরকার নতুন সম্রাটের ওপর নির্ভর করল। নেপোলিয়ন হলেন ফরাসীদের সম্রাট। প্রজাতন্ত্রী সরকারের কাঠামো অটুট রাখা হল যদিও নেপোলিয়নের ক্ষমতা আরও বাড়ানো হল। পরিষদ তিনটির ক্ষমতা আরও কমে গেল এবং কাউন্সিল অব স্টেটের প্রভাবও কমে গেল। পুরানো রাজতন্ত্রের মত নেপোলিয়নও একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তুললেন। তিনি জাঁকজমকপূর্ণ রাজ্যাভিষেকের অনুকূলে ছিলেন এবং পোপের নিকট হতে রাজমুকুট গ্রহণ করবেন বলে স্থির করলেন। ফ্রান্সের জাতীয় পতাকায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হল এবং রাজভক্তদের জন্য বিভিন্ন পদবী ও সম্মানের প্রবর্তন করা হল।

বিভিন্ন পরিবর্তন

নেপোলিয়নের পরিবারবর্গের জন্য প্রিন্স পদবী অনুমোদন করা হল। বংশানুক্রমিক অভিজাত শ্রেণীর প্রবর্তন করা হল। অবশ্য এদের বিশেষ অধিকার বলে কিছু রইল না। নেপোলিয়ন পুরানো অভিজাত শ্রেণীকে নতুন অভিজাত শ্রেণীর সাথে একীভূত করতে চেষ্টা করেন।

নেপোলিয়নের এসব কার্যে প্রজাতন্ত্রীরা রুষ্ট হল, রাজতন্ত্রীরাও সন্তুষ্ট হল না। সম্রাট তাঁর শাসনকে জনপ্রিয় করবার জন্য প্রচার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করলেন। সংবাদপত্রের ওপর কড়া নজর রাখা হল এবং কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে মাত্র একটি করে পত্রিকা বের করার অনুমতি দেওয়া হল। পত্রপত্রিকায় রাজনৈতিক বিষয়ক কোন কিছু প্রকাশ করতে হলে সরকারী ভাষ্যই দিতে হবে বলে ঘোষণা হল। যে সব লেখক নেপোলিয়নের শাসনের পক্ষে লেখনী ধারণ করলেন তাঁরা পুরস্কৃত হলেন আর যারা বিরুদ্ধাচরণ করলেন তাঁদের লাঞ্ছনা ও অপমানের বোঝা বাড়তে থাকল; সৃষ্টিধর্মী রচনা প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হল। ম্যাডাম স্টেল, সাটুব্রিয়াও প্রভৃতি লেখক-লেখিকাদের ওপর নির্যাতন শুরু হল। রঙ্গমঞ্চও সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হল। এত চেষ্টা করেও কিন্তু মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা স্পৃহা নষ্ট করা গেল না; সরকার-বিরোধীদের ধ্বংস করা গেল না, জেলখানাগুলি বিরোধী মতবাদীদের দ্বারা পূর্ণ রইল।

বৈদেশিক নীতি: সম্রাট নেপোলিয়নের একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রথমদিকে তাঁর বৈদেশিক নীতিকে সাফল্যের পথে নিয়ে গেল। তিনি বৈদেশিক নীতিতে যুদ্ধ নীতি গ্রহণ করলেন। তাঁর এই যুদ্ধ একটানাভাবে তাঁর পতনের দিন পর্যন্ত চলেছিল। ইউরোপীয় স্থলভূমিতে যুদ্ধ কখনো কখনো বন্ধ থাকলেও জলপথে ও উপনিবেশে এই যুদ্ধ একটানাভাবে চলতে থাকে। ১৮০৬ সালে নেপোলিয়ন গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তন করলেন। এর দ্বারা তিনি ইউরোপীয় বাজার হতে গ্রেট বৃটেনের পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে ফ্রান্সকে ইউরোপীয় অর্থ নৈতিক বাজারে মধ্যমণি করতে চাইলেন। অর্থাৎ ইউরোপীয় অর্থনীতি ফরাসী বুর্জোয়া শিল্পপতি ও ব্যবসাদারদের সুবিধার জন্য লাগাতে চাইলেন।

সম্রাট নেপোলিয়ন কখনই অত্যাচারী শাসক ছিলেন না। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তাঁর শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য তিনি যা ভাল মনে করতেন সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করতেন। পদ্ধতিতে ভুল থাকতে পারে,

সমালোচনারও যোগ্য হতে পারে কিন্তু তাই বলে সম্রাট হিসেবে তাঁর শাসনকে শয়তানী শাসন বলা যায় না। তাঁর রুচিস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বে বিচারশক্তি ও কল্পনার সুষম সমন্বয় ঘটেছিল। সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়ন ভুলে যাননি যে তিনি হলেন প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবেরই সন্তান।

মন্তব্য

Q. 22. What was continental system and how did it contribute to Napoleon's downfall. *Or*, Give a brief historical analysis of the continental system showing how it contributed to the downfall of Napoleon. Critically discuss the policy of Napoleon towards England.

Ans. ইংল্যাণ্ডের সাথে মোকাবিলা করবার ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন যে বিপ্লবকে ঘৃণা করতেন সেই বিপ্লবের নীতিকেই গ্রহণ করেন। কনভেনশনের ন্যায় তিনিও বৃটিশ সরকারকে কয়েক জন অত্যাচারী ব্যবসাদারদের সরকার মনে করতেন এবং এই সরকারের অত্যাচারী শাসন হতে ইংরেজ জনসাধারণ মুক্তি পেতে চায় বলে তিনি মনে করেন। ইংরেজ সামরিক বিভাগে নিয়মানুবর্তিতার জন্য যে সব অমানুষিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত তা শুনে তিনি স্তম্ভিত হন। ইংরেজ সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপানের আধিক্য তাঁকে বিস্মিত করে। তাঁর সম্বন্ধে বৃটিশ সংবাদপত্রে যে সব আজগুবি সংবাদ ছাপানো এবং কুৎসা রটানো হচ্ছিল সেগুলি তাঁর নিকট অসহ্য বলে মনে হল। তাছাড়া বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে যেরূপ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল এবং কাগজের নোটের মূল্য যে ভাবে কমে যায় এবং যৌবনে যেরূপ আর্থিক কষ্ট তিনি পান, তার জন্য তিনি অর্থজোগানদারকারীদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হন। ইংল্যাণ্ডের বিরাট জাতীয় ঋণ এবং ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে কাগজের নোটের প্রবর্তনের ফলে নেপোলিয়ন মনে করলেন যে ইংল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা ও ফ্রান্সের ন্যায় সঙ্গীন হয়ে পড়েছে এবং ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করা তাঁর পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না।

পটভূমিকা

ইংরেজ সরকারের প্রতি ঘৃণা

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক সংগ্রাম তিনি কনভেনশনের নিকট হতে পান এবং ট্রাফালগারের যুদ্ধের পর মহাদেশীয় যে অবরোধ প্রথা (Continental System) তিনি চালু করেন তা উপরিউক্ত ধারণা হতে দেখা দেয়।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম : অ্যামিয়েন্সের সন্ধির পর তিনি

ইংল্যাণ্ডকে ইউরোপের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উভয় ক্ষেত্র হতেই বিতাড়িত করতে অগ্রণী হলেন। এদিকে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি করতে ব্যর্থ হল এবং অন্যদিকে নেপোলিয়ন ইউরোপে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হলেন, ফলে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বেধে উঠল। ইংল্যাণ্ডের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব না হলেও তাঁর ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতার পক্ষে সম্ভব হল না। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দেই তিনি ডাইরেক্টরীকে ইংল্যাণ্ড অভিযানের ভালমন্দদিক সম্বন্ধে অবহিত করেন। তিনি ফ্রান্সের নৌবল বৃদ্ধির কথা চিন্তা করেন এবং ফ্রান্সের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের নৌবলের মোকাবিলা করা যে অসম্ভব নয় তা তিনি বিশ্বাস করতেন। এর কারণ হল নৌ-বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের নৌশক্তিব যে অধঃপতন ঘটেছিল তা তিনি মানতেন না এবং ইংল্যাণ্ড নৌযুদ্ধে যে নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল তার খবরও রাখতেন না। ট্রাফালগারের যুদ্ধেব পুর্বে ফরাসী নৌসেনাপতি দুঃখের সাথে বলেছিলেন—নৌযুদ্ধে আমরা পুরানো কৌশল এখনো মেনে চলি এবং শত্রু তার জয়ের জন্য যা চায় আমরা ঠিক তাই-ই করে থাকি।

ইংল্যাণ্ডের সাথে পুনরায় যুদ্ধ শুরু

ফ্রান্সের দুর্বল নৌশক্তি

১৮০৩ হতে ১৮০৫ এর মধ্যে নেপোলিয়ন যে ভাবে সামরিক প্রস্তুতি চালালেন তা হতে অনুমান করা কঠিন নয় যে তিনি ইংল্যাণ্ড অভিযানের কথা ভালভাবেই চিন্তা করেছিলেন। তিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যাণ্ড দখল করার পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেন কিন্তু নানা কারণে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। এরপর ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের যোগদানের ফলে এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। নেপোলিয়নের পরিকল্পনা ভালভাবে শুরু হলেও ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনীকে ভূমধ্যসাগর হতে সরাতে পারলেন না।

নৌযুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়

ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনীকে বেশ কিছু বছরের জন্য নিরপেক্ষ করল। কিন্তু নেপোলিয়ন এই পরাজয় স্বীকার করলেন না। তিনি স্প্যানিশ নৌবাহিনী পুনর্গঠন করে ইংল্যাণ্ডের সাথে মোকাবিলা করবেন মনে করলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড যে ডেনমার্কের নৌবাহিনী জোর করে দখল করে নিল তার পিছনে ফ্রান্সের নৌশক্তির ভীতিই কাজ করেছিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী নৌবাহিনীতে ৩৫ খানি যুদ্ধ জাহাজ ছিল, ১৮১২ তে নৌবাহিনী ১০২টি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে গড়ে উঠবে বলে মনে করলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী নৌবাহিনীতে ৭১টি

জাহাজ ছিল, সেই জায়গায় ইংল্যাণ্ডের জাহাজের সংখ্যা ছিল ২৩৫। এ থেকে বোঝা যায় যে নেপোলিয়নের পক্ষে ইংল্যাণ্ডকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করা অসম্ভব ছিল।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম (Continental system) নৌশক্তিতে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করা সম্ভব না হলেও অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা তাকে পরাজিত করা সম্ভব হবে বলে নেপোলিয়ন মনে করলেন। এনার যুদ্ধে প্রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে এবং রাশিয়ার সাথে টিলসিটের সন্ধির ফলে ইউরোপের উত্তর উপকূলভাগে নেপোলিয়নের আওতায় আসে, আর এই পথেই ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্য চলত। ১৮০৬-এ তিনি বার্লিন ডিগ্রি ঘোষণা করলেন। এই ডিগ্রির দ্বারা ঘোষণা করা হল যে গ্রেট বৃটেনকে অবরোধ করা হয়েছে; তার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করা হল। বৃটেনের পণ্য বা বৃটেনের হতে আমদানী যে কোন জিনিস বজোয়াপ্ত করা হবে। মহাকেশীর অবরোধ স্রুরু হল বৃটেনের রপ্তানির ওপর আমদানীর ওপর নয়। অর্থাৎ এটি অবরোধ নয় বৃটিশ পণ্য বর্জন বলা যেতে পারে।* নেপোলিয়ন তাঁর ভ্রাতাকে এই সময় বলে ছিলেন যে তিনি স্থলবাহিনীরা সাহায্যে সামুদ্রিক প্রাধান্য স্থাপন করতে চান। ১৮০৭ এ তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, শীঘ্রই ইংরেজরা না খেতে পেয়ে আত্মসমর্পণ করবে কারণ বৃটিশ পণ্য বোঝাই জাহাজগুলি মাঝ সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে কোন বন্দরের খোঁজে। বৃটিশ অর্থনীতি পরীক্ষা করে তিনি দেখালেন যে বৃটেনের রপ্তানি বন্ধ করতে পারলে তার অর্থনীতি ভেঙে পড়বে, ইউরোপের মিত্রদের অর্থসাহায্য করতে পারবে না; বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাবে। ফলে বিপ্লব দেখা দেবে বা জনসাধারণের দাবির নিকট ইংরেজ সরকার নতিস্বীকার করবে। ইংরেজরা কিন্তু প্রথমে বার্লিন ঘোষণাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল—এ যেন বামনের চাঁদ ধরবার ইচ্ছা বলে মনে করল। নেপোলিয়নের নৌশক্তি প্রবল না থাকার ফলে বার্লিন ঘোষণা ঠিকভাবে কার্যকরীও হল না। বৃটিশ পণ্য হল্যাণ্ড ও উত্তর জার্মানীর বিভিন্ন বন্দর হতে ইউরোপের নানা অঞ্চলে ঠিকই রপ্তানি হল। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃটিশ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। সে কারণে ইউরোপীয় বাজার সঙ্কুচিত হলেও ইংরেজদের খুব ক্ষতি হল না। বৃটিশ রপ্তানির শতকরা ৩৩ ভাগ যেত

বার্লিন ডিগ্রি ও তার তাৎপর্য

---

*'The continental system thus inaugurated was aimed at exports, not imports, t was in fact, a boycott, not a blockade.'—The New Cambridge Modern History Vol IX

ইউরোপে, ৪০ ভাগ বিভিন্ন উপনিবেশে এবং ২৭ ভাগ আমেরিকায় কিন্তু টিলজিটের সন্ধির পর (১৮০৭) মহাদেশীয় অবরোধপ্রথা কঠোর হল এবং বৃটেনের আর্থিক ক্ষতি হতে লাগল। এই সময় নেপোলিয়ন বলেছিলেন যে মহাদেশীয় অবরোধপ্রথা কেবলমাত্র শূন্যগর্ভ কথা নয়। এই সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বৃটেনের সম্পর্কের বিশেষ অবনতি ঘটে। ফলে আমেরিকায় বৃটিশ পণ্যের রপ্তানি কমে যায়। বৃটিশ পণ্যের ইউরোপ ও আমেরিকার বাজার যদি একসাথে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বৃটেনের অর্থনীতিতে চরম বিপর্যয় দেখা দেবে।

ইংল্যাণ্ডে প্রতিক্রিয়া

ইংরেজ সরকার বার্লিন ডিগ্রির উত্তর হিসেবে **অডার্স-ইন কাউন্সিল** জারি করেন ১৮০৭-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। এতে বলা হল যে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে কোন ইংরেজ বন্দরে লাইসেন্স নিয়ে যাতায়াত করতে হবে। এর উত্তরে নেপোলিয়ন ফন্টেনব্লু ও মিলান ডিগ্রির দ্বারা নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির উপর চাপ দিলেন এই বলে যে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জাহাজগুলি অডার্স ইন কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে চললে সেগুলিকে বৃটিশ জাহাজ বলে গণ্য করা হবে।

ইংল্যাণ্ডের পাল্টা ব্যবস্থা ও নেপোলিয়নের নতুন নির্দেশ

কন্টিনেন্টাল ব্যবস্থার সাফল্য: যদিও মোটামুটিভাবে দেখলে ১৮০৭-এ বৃটেনের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু বছরের শেষ দিকে বৃটিশ পণ্যের রপ্তানি বেশ কমে গেল। ১৮০৮-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই অবস্থা চলল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই চরম দুরবস্থা হতে বৃটেন কিছুটা রক্ষা পেল পেনিনসুলার যুদ্ধের ফলে। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলিতে বৃটেন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাল। এই সুযোগে অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করল। ওয়াগরামের যুদ্ধের সময় (১৮০৯) উত্তর ইউরোপের ওপর নেপোলিয়ন তাঁর প্রাধান্য হারালেন। এর ফলে বৃটেনের রপ্তানি খুবই বৃদ্ধি পেল। নেপোলিয়ন তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ-নীতির পরিবর্তন করলেন। চোরাকারবার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নেপোলিয়ন নিজেই বৃটেনের সাথে উচ্চ শুল্কে এবং ফরাসী মদ্য ও সিল্কের বদলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দিলেন। এই লাইসেন্স পদ্ধতি ট্রিয়াননের ডিগ্রি দ্বারা বিধিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু এর দ্বারা বৃটিশ পণ্যের আমদানি কিছুই বৃদ্ধি পেল না। ওয়াগরামের যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন ইউরোপের ওপর নতুন করে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি ফন্টেনব্লুর দ্বিতীয় ডিগ্রি দ্বারা (১৮১০) বৃটিশ শিল্পদ্রব্য বাজেয়াপ্ত ও নষ্ট করবার নির্দেশ দিলেন। বেআইনি আমদানি বন্ধ ও ধ্বংস করবার জন্যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বসান হল। এই ব্যবস্থা বৃটিশ অর্থনীতিকে

ইংল্যাণ্ডের দুরবস্থা

বিশেষভাবে আঘাত করল এবং গ্রেটবৃটেন শীঘ্রই এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল।

বহু শিল্পপতি দেউলিয়া হয়ে গেল। বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং জনসাধারণের দুরবস্থা চরমে উঠলো। গ্রেটবৃটেনকে গম আমদানি করতে হল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও তার কলহ যুদ্ধে পরিণত হল। নেপোলিয়ন গ্রেটবৃটেনের আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে আত্মসমর্পণের দিন গুণতে থাকলেন। তিনি ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডকে সোনার বিনিময়ে ইংল্যাণ্ডকে গম আমদানির অনুমতি দিলেন। এই অনুমতি দিয়ে তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করেননি। এটা বন্ধ রাখতে পারলে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা কি হত বলা শক্ত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে গ্রেটবৃটেনের রপ্তানি বাণিজ্যের ইতিহাসে কালো বছর বলা যেতে পারে এবং নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান ব্যর্থ হওয়া পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের আর্থিক দুর্গতি অব্যাহত রইল।

ব্যর্থতার কারণ: উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে নেপোলিয়নের মহাদেশীয় অবরোধপ্রথা ব্যর্থ হত না, যদি তিনি এটি দৃঢ়ভাবে এবং একটানাভাবে বলবৎ রাখতেন। সর্বসাকুল্যে তিন বছরের বেশি এটিকে প্রয়োগ করা হয়নি এবং এই তিন বছর আবার একটানাভাবে চালিয়ে যাওয়া হয়নি। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন যে রাশিয়ার পরাজয় ঘটলে ইংল্যাণ্ডও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। তাঁর এই ধারণা ভ্রান্ত ছিল না। তবে তিনি ইংরেজ চরিত্র ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতিকে যতটা ঘুণে ধরা তিনি মনে করেছিলেন ঠিক ততটা ছিল না। বরঞ্চ ইংল্যাণ্ডের আর্থিক বুনিয়াদ ছিল দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে এই সময় শিল্পে যেরূপ উন্নতি ঘটেছিল সে সম্বন্ধেও নেপোলিয়ন অবহিত ছিলেন না। অন্যদিকে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথার জন্য নেপোলিয়নকে মূল্য দিতে হল প্রচুর। তিনি কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ডকে পঙ্গু করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন ফ্রান্সকে ইউরোপের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মধ্যমণি করতে, ইংল্যাণ্ডের জায়গায় ফ্রান্সকে বসাতে।

এর দ্বারা তিনি ফরাসী বুর্জোয়াদের সুবিধা ও লাভবান করতে চাইলেন। কিন্তু ফ্রান্সের ওই সময় যা শিল্পোন্নতি ঘটেছিল তার দ্বারা ইউরোপের চাহিদা মেটানো অসম্ভব ছিল। ফরাসী অর্থনীতিও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ফরাসী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি কাঁচামালের অভাবে বন্ধ হবার উপক্রম হয় অন্যদিকে ইউরোপীয় দেশগুলির চড়াদামে ফরাসী পণ্য কেনবার মত আর্থিক অবস্থাও ছিল না, যুদ্ধের

খেসারত দিতেই তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের বৈদেশিক বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে যায়। ফ্রান্সের মার্সাই বোর্দো প্রভৃতি বন্দরগুলি অকেজো হয়ে রইল এবং এই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিল। শেষের দিকে শিল্পপতিরাও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হল।

মহাদেশীয় অবরোধপ্রথা কিছুটা সাফল্য লাভ করত যদি ইউরোপে তিনি শুল্ক মুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবর্তন করতেন তাহলে হয়ত ইউরোপীয় জনসাধারণ তাঁকে এবিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করত। কিন্তু তিনি এটি করেননি। বরঞ্চ ফরাসী ব্যবসায়ীদের নানা সুবিধে দিয়ে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করলেন। মেটারনিক এই সময় বলেছিলেন যে মহাদেশীয় অবরোধপ্রথা ইংল্যাণ্ডের ক্ষতি না করে উন্নতির গোড়াপত্তন করবে।

ফলাফল : মহাদেশীয় অবরোধপ্রথার মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র থাকবার ফলে বিশেষ কার্যকরী হল না। নেপোলিয়নও এই ব্যবস্থা একটানা ভাবে চালিয়ে যেতে পারলেন না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা নেপোলিয়ন-বিরোধী হয়ে পড়ে। এদের শাস্তি দেবার জন্য নেপোলিয়ন অন্যায় ও দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে তাঁকে ধন ও জনক্ষয়-কারী বহু যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। একদিকে যেমন ফ্রান্সের শক্তির অপচয় হতে লাগল, অন্যদিকে ইউরোপের সর্বত্র তাঁর নীতির বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকল। এবং এ অসন্তোষ কালক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি করল। এই রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে নেপোলিয়ন সফলতা লাভ করতে পারলেন না।

কন্টিনেণ্টাল সিস্টেম নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। মহাদেশীয় অবরোধপ্রথা ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে জনসাধারণকে এক দুরবস্থার সম্মুখীন করল। নেপোলিয়ন পোপের রাজ্য দিয়ে যাতে বৃটিশ পণ্য আমদানী হতে না পারে তার জন্য ওই রাজ্য দখল করে নেন। এর ফলে সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায় তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এই অবরোধ প্রথার ফলে ইংল্যাণ্ড যখন চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার সম্মুখীন হল তখন হল্যাণ্ডের রাজা লুই বোনাপার্টি (নেপোলিয়নের ভ্রাতা) যখন নিজের রাজ্যকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন তখন তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে হল্যাণ্ডকে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হল। সুইডেন ও রাশিয়া তাঁর নীতিতে ক্ষুব্ধ হল। পর্তুগাল ইংল্যাণ্ডের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে মনস্থ করলে নেপোলিয়ন পর্তুগাল অধিকার করবার জন্য স্পেনের

পতনের জন্য কতটা দায়ী

মধ্যদিয়ে পর্তুগাল আক্রমণ করবার মনস্থ করলেন। এর ফলে সৃষ্টি হল দীর্ঘস্থায়ী সর্বনাশা পেনিনসুলার যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধই তাঁর এবং তাঁর সাম্রাজ্যের মৃত্যু-ঘণ্টা বাজাল। অতএব মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা প্রবর্তন করে নেপোলিয়ন ভুল করেছিলেন। আর এই ভুল হতেই তাঁর পতনের সূচনা।

Q. 23. Explain the causes of the Peninsular war. How did the war react on the fortunes of Napoleon? What was the nature of the Peninsular war?

Ans. মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা কার্যকরী করে ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করবার জন্য

ভূমিকা

নেপোলিয়ন আইবেরিয়ান উপদ্বীপের (স্পেন ও পর্তুগাল) ওপর নিজের প্রভাব স্থাপন করবার চেষ্টা করলেন।

তিনি পর্তুগালকে ইংল্যাণ্ডের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবার জন্য নির্দেশ দিলেন কারণ এই সময় পর্তুগালের মাধ্যমে বৃটিশ পণ্য বেআইনিভাবে ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে আমদানি হতে থাকে। তিনি পর্তুগালকে এসম্বন্ধে সজাগ করে দেন এবং পর্তুগালের রাজাকে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্য নির্দেশ দেন। পর্তুগালের রাজা এই নির্দেশ মানতে রাজি না হওয়ায় নেপোলিয়ন পর্তুগাল আক্রমণ করতে উদ্যোগী হলেন। পর্তুগালে ফরাসী সৈন্য প্রেরণ করতে হলে স্পেনের মধ্যে দিয়ে পাঠাতে হবেই বলে তিনি স্পেন রাজার সাথে এক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধির দ্বারা ঠিক হয় যে ফ্রান্স ও স্পেন উভয়ে পর্তুগাল ও তার উপনিবেশগুলি ভাগাভাগি করে নেবে, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী ফরাসী সৈন্য পর্তুগালে প্রবেশ করল এবং অচিরে সমগ্র পর্তুগাল ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

স্পেনে অধিকার স্থাপন: পর্তুগাল দখল করবার পর নেপোলিয়ন স্পেন কুক্ষিগত করতে চেষ্টা করলেন। স্পেন কখনো সরাসরি নেপোলিয়নের বিরোধিতা করেনি। একারণে স্পেন আক্রমণ ও অধিকার করার ইচ্ছার পিছনে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী নীতিই বিশেষ কার্যকরী ছিল।

ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের শাসন ফ্রান্সে অব্যাহত রাখবার জন্য ও স্পেন জয় তাঁর নিকট অপরিহার্য বলে মনে হল। তিনি মনে করলেন যে স্পেনে বুরবোঁর ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে নেপোলিয়নকে অসুবিধায় ফেলতে পারে। একারণে তিনি স্পেনে নিজের অধিকার স্থাপন করতে চাইলেন। প্রথমে তিনি সরাসরি স্পেন দখল করলেন না; পর্তুগালে তাঁর অধিকার দৃঢ় করবার অজুহাতে স্পেনের বিভিন্ন স্থানে ফরাসী সৈন্য জমায়েত করে রাখলেন। এর ভেতর

স্পেনরাজ চতুর্থ চার্লস ও তাঁর পুত্র ফার্ডিন্যাণ্ডের মধ্যে কলহ দেখা দিল। নেপোলিয়ন মধ্যস্থতার ভান করে উভয়কে তাঁর নিকট নিজ নিজ অভিযোগ পেশ করতে বললেন।

ভ্রাতাকে সিংহাসনে স্থাপন

এর পর তিনি স্পেনরাজ চতুর্থ চার্লসকে পেনসন নিয়ে সিংহাসন ছেড়ে দিতে বললেন এবং পুত্র ফার্ডিন্যাণ্ডকে কারাগারে পাঠালেন। স্পেনের সিংহাসন এভাবে খালি হওয়ায় তিনি তাঁর ভাই জোসেফ বোনাপার্টিকে স্পেনের সিংহাসনে বসালেন। জোসেফ খুব তাড়াতাড়ি স্পেনে বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করলেন।

স্পেনবাসীর বিরোধিতা : নেপোলিয়নের এই বেআইনি কাজ কিছুসংখ্যক স্পেনবাসী নীরবে মেনে নিল না। স্পেনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি খুবই প্রবল ছিল। জনসাধারণের ওপর চার্চের প্রভাব ছিল অসীম। এই চার্চ ও অভিজাত শ্রেণী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে গেল। স্পেনে উদার মতাবলম্বী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেনি, ফলে স্বৈরাচারী রাজা এবং ক্যাথলিক চার্চ জনসাধারণকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে

স্পেনে মধ্যযুগীয় অবস্থা

সমর্থ হল। স্পেনবাসী তাদের অধিকার সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন ছিল না। তাদের নেতারা ছিল পুরানোপন্থী মধ্যযুগীয় বিধি ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক। একারণে জোসেফ যখন নেপোলিয়নের নির্দেশিত বিভিন্ন প্রগতিমূলক আইনকানুন ও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করতে চাইলেন তখন ধর্মভীরু কৃষক সম্প্রদায় ও জমিদাররা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে আঠারো শতকের শেষার্ধে জ্ঞানদীপ্ত স্পেন রাজ

এই যুদ্ধের স্বরূপ

তৃতীয় চার্লস যখন স্পেনকে আধুনিক রাষ্ট্রে উন্নীত করতে চান তখনও জনসাধারণ তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। নেপোলিয়ন স্পেনীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন তার মধ্যে কিছুটা সত্য রয়েছে—নতুনের বিরুদ্ধে পুরাতনের সংগ্রাম—পুরোহিতদের ও প্রতিক্রিয়াশীলদের যুদ্ধ। এটা বোঝা যাবে যদি আমরা দেখি যে স্পেনীয় সৈন্যরা কিসের জন্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল—স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের জন্য। নেপোলিয়নের পতনের পর পদচ্যুত রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড যখন স্পেনে ফিরে এলেন তখন স্পেনবাসীরা এই ব'লে তাঁকে স্বাগত জানাল—'স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র জিন্দাবাদ; আধুনিক সংবিধান নিপাত যাক।' এটা

নেপোলিয়নের ভুল নীতি

মনে করলে ভুল হবে যে নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপের ফলেই স্পেনের জনসাধারণ এরূপ করে ছিল। তবে নেপোলিয়ন অহেতুক স্পেনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে খুবই ভুল করেন। নিজের ভাইকে স্পেনের সিংহাসনে বসান অন্যায় হয়েছিল। এর ফলে অজস্র

অর্থব্যয় হয় এবং এক বিরাট সৈন্যদল স্পেনে আটকে পড়ে। এই সৈন্যদলকে যদি তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে নিয়োগ করতে পারতেন তাহলে ইতিহাসের ধারা অন্যপথে হয়ত প্রবাহিত হত। এবং এই ভুল তিনি বুঝতে পারেন সেণ্ট হেলেনায়।*

যুদ্ধের ফলাফল: স্পেনের বা পেনিনসুলার যুদ্ধে ফ্রান্সের ভাগ্য বিপর্যয় নেপোলিয়ন ও তাঁর সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। প্রথমত: এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন সর্বপ্রথম জনসাধারণ পুষ্ট প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন। তাঁর ভাইকে স্পেনের সিংহাসনে জোর করে বসানোর জন্য ক্যাথলিক চার্চ ও অভিজাত শ্রেণী তীব্র প্রতিবাদ জানাল। আর এই ক্যাথলিক চার্চ তথা পুরোহিত তন্ত্রের ধর্মভীরু জনসাধারণের ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। ফলে তারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় প্রতিরোধ শক্তির সৃষ্টি করল। স্পেনের প্রত্যেক প্রদেশে জুণ্টা বা প্রতিরোধ কমিটি গড়ে উঠলো। ইংল্যাণ্ডও এই সুযোগ হাতছাড়া করল না। স্পেনবাসীর সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেল। নেপোলিয়নের অজেয় বাহিনীর রণচাতুর্য নিষ্ফল হল।

স্পেনে নেপোলিয়নের পরাজয় ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার জনসাধারণ মনে করল যে নেপোলিয়ন অজেয় নন। ফলে

পতনের জন্য কর্তা। দায়ী

নেপোলিয়ন-বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম এসব অঞ্চলে দেখা দিল যার নিকট নেপোলিয়নের সমস্ত রণকৌশল ও শক্তিসামর্থ্য ব্যর্থ হল। ভূলুণ্ঠিত ইউরোপীয় শক্তিগুলি মাথা তুলে দাঁড়াল।

পেনিনসুলার যুদ্ধে অজস্র অর্থ ও লোকক্ষয় হওয়ায় নেপোলিয়ন ইউরোপের অন্যান্য রণক্ষেত্রে সবশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে পারলেন না। ফলে তাঁর পতন অনিবার্যরূপে দেখা দিল।

ঔরংজীবের ভারতসাম্রাজ্য-দেহকে দক্ষিণের ক্ষত যেমন বিষাক্ত করে পতনোন্মুখী করেছিল তেমনি স্পেনের ক্ষত (Spanish ulcer) নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য-দেহকে বিষাক্ত করে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেল।

পেনিনসুলার যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ: নেপোলিয়ন

'I embarked very badly on the Spanish affair, I confess, the immorality or it was too potent, the injustice too cynical; the whole thing wears an ugly look.'

কেবলমাত্র স্পেনের ঘটনাবলীর দিকে মনোযোগী হতে পারেননি বলে স্পেনে ফরাসী সৈন্য সুদক্ষ যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে নেতৃত্ব হতে বঞ্চিত হয়। ফরাসী সেনাপতিদের মধ্যেও মতানৈক্য ঘটে। ফলে যুদ্ধের অগ্রগতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

নেপোলিয়ন স্পেনের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ঠিকভাবে বিচার করতে পারেননি। তিনি এটিকে পুরোহিতদের ও প্রতিক্রিয়াশীলদের যুদ্ধ বলে মনে করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে স্পেনের জনসাধারণ তাঁর প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক সংস্কারগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মালেই তারা কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কিন্তু এটি বাস্তবে দেখা দিল না। নেপোলিয়নের কার্যাবলী তারা জাতীয় অপমান বলে মনে করল। তাছাড়া স্পেনের সমাজ ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারগুলি সম্বন্ধে তাঁর সীমাবদ্ধ জ্ঞান ছিল একারণে অনেক সময় গণতান্ত্রিক প্রজাহিতৈষী সংস্কারও ব্যর্থ হয় এবং জনসাধারণই এগুলির বিরোধিতা করে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের ভাগ্যেও এরূপ ঘটেছিল। অতএব নেপোলিয়নের উচিত ছিল গণমানসের মান সম্বন্ধে নিজেকে অবহিত রাখা। তাছাড়া ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ং স্পেনে যান কিন্তু স্পেনের বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন না করেই ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সেনাপতি মাসেনাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠাননি। এটি যদি করতেন তাহলে হয়ত ইংরেজ সেনাপতির রক্ষাপ্রাচীর ধ্বংস করা সম্ভব হত।

স্পেনের প্রাকৃতিক অবস্থাও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে গেল। এই পর্বতসঙ্কুল ও অজানা দেশে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর পক্ষে স্পেনবাসীর সহযোগিতা ভিন্ন টিকে থাকা অসম্ভব হল। পর্বতের বাধা, গেরিলা যুদ্ধের সহায়ক হল, অন্যদিকে বিরাট সামরিক অভিযান ও খাদ্য সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবার ফলে ফরাসী সৈন্যের পক্ষে এক হতাশ ব্যঞ্জক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল।

Q. 24. Napoleon's Empire was not an interruption but an extension of the Revolution. Critically examine the nature of Napoleon's Empire.

Ans. নেপোলিয়ন ইউরোপের মানচিত্রে নতুন পরিবর্তন আনেন। ইংল্যাণ্ড ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইউরোপ তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনাধীনে আসে। তিনি নিজে ছিলেন ফ্রান্সের সম্রাট ও ইটালীর রাজা। ভ্রাতা জোসেফ নেপলস্ এর রাজা।

গৌরব শীর্ষে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য (১৮০৭)
১ – মেক্‌লেন্‌বুর্গ ডাচি
২ – ওয়েষ্ট ফেলিয়া রাজ্য
৩ – রাইন কনফেডারেশন
৪ – সুইস্ প্রজাতন্ত্র
৫ – ইতালী রাজ্য
৬ – নেপল্‌স্ রাজ্য
৭ – ওয়ারস ডাচি
ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন
ফ্রান্সের অনুগত
ফ্রান্সের মিত্র
স্বাধীন
ডেনমার্ক
ইংল্যাণ্ড
প্রাশিয়া
ফ্রান্স
অষ্ট্রিয়া
স্পেন
১৫°
০°
৪৫°
৩৫°
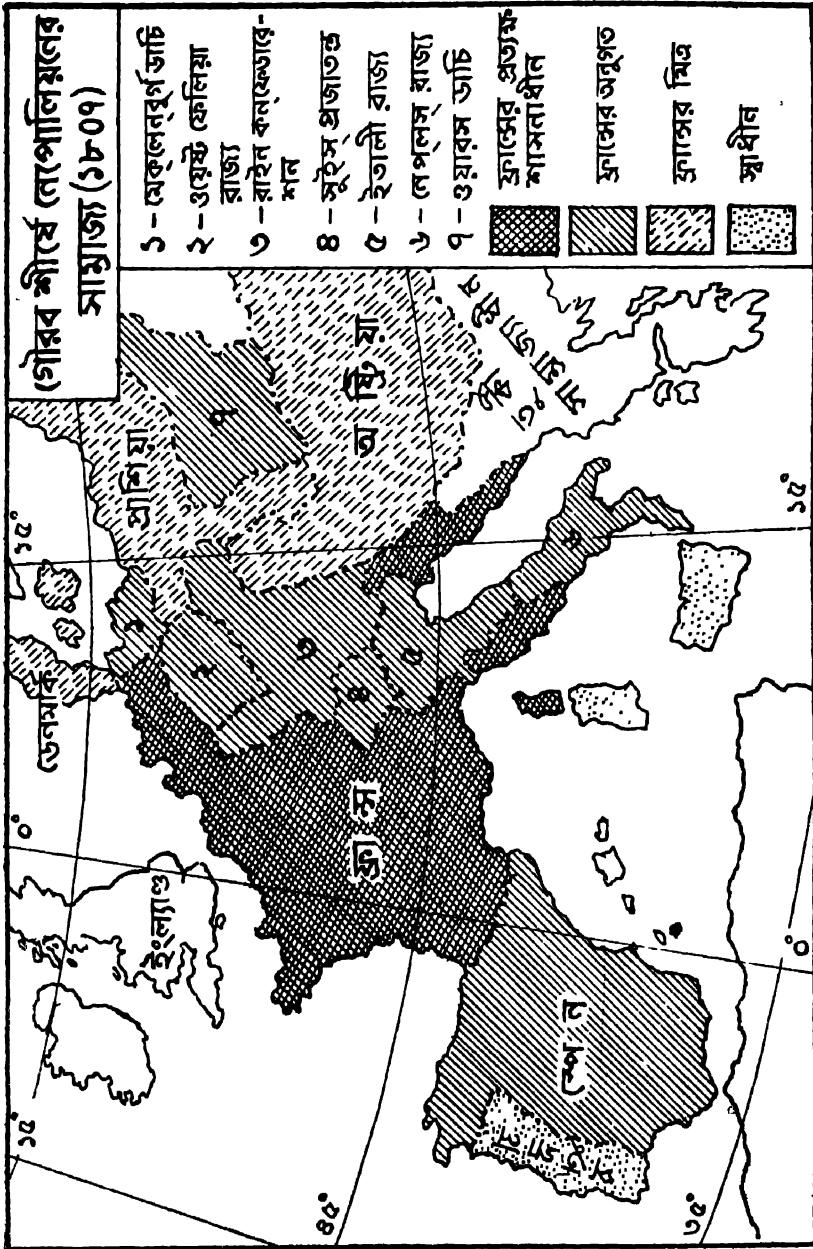
ভগ্নিপতি লুই হল্যাণ্ডের রাজা, ভ্রাতা জেরোম ওয়েস্টফেলিয়ার রাজা। ভগ্নি এলিন লুকার শাসনকর্ত্রী। ডালমেশিয়া ও ইস্ট্রিয়া নামক প্রদেশদ্বয় নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত হচ্ছিল। জার্মানীকে তিনি পুনর্গঠিত করে নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখলেন। জার্মানীতে তেরটি রাষ্ট্রের সম্মেলনে এক কনফেডারেসি গড়ে তুললেন। পরে এই সংখ্যা বেড়ে বত্রিশটি হয়। এই যুক্তরাষ্ট্র নেপোলিয়নকে তাদের পালক বলে মেনে নিল। প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার ক্ষমতা তিনি খর্ব করেন। ডাচি অব ওয়ারশ বলে নতুন রাজ্যটি তাঁর আওতায় থেকে যায়। এর পর তিনি স্পেন ও পর্তুগাল দখল করেন। ইউরোপের এই বিরাট অংশে নেপোলিয়ন একাধিপত্য স্থাপন করলেন। অনেকে একারণে প্রশ্ন করে থাকেন এই বলে যে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের পরিপন্থী কিনা। তাঁর সাম্রাজ্য বিপ্লবের গতি রুদ্ধ করে ছিল কিনা। এর উত্তরে বলা যায় যে প্রথমত নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য এক-দিনে গড়ে ওঠেনি বা নেপোলিয়নই তার স্রষ্টা ছিলেন না। কনভেনসনের আমল হতেই বিপ্লবী ফ্রান্স সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করে। এর পিছনে অন্যতম কারণ ছিল ফরাসী আদর্শকে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেওয়া। বলা বাহুল্য যে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ফলেই ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক নীতিগুলি বিস্তারলাভ করে এবং এর ফলে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। ইটালী ও জার্মানীতে তাঁর শাসন জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম করে নেয়। বিপ্লব ও জ্ঞানদীপ্তির অংশীদার ছিলেন বলে নেপোলিয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারতা ও আন্তর্জাতিকতার প্রভাব দেখা যায়। বিপ্লবী ফ্রান্স সকল মানুষের অধিকারের কথা ঘোষণা জারি করেছিল, কেবলমাত্র ফরাসীদের জন্য নয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মনে হল ইউরোপে পুরানো রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের আবির্ভাব ঘটতে চলেছে। এই নতুন ইউরোপে একই রকমের আইন কানুন ও শাসনের ফলে নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটবে। কোড নেপোলিয়নের প্রসারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হল। আর এর মাধ্যমেই বিপ্লব প্রসূত চিন্তধারা ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত হল। সুদূর পোল্যাণ্ড ও ইলিরিয়া প্রদেশ ও এর আওতায় চলে এল। নেপোলিয়ন ভাবতেও পারেননি যে পুরানো রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে জাতীয়তাবাদ প্রবল হবে।

সাম্রাজ্যের পরিসর ও শাসনব্যবস্থা

বিপ্লবের আদর্শ প্রচারিত হ'ল

জাতীয়তাবাদ দেখা দিল

নাগরিকদের সুবিধা

আধুনিক যুগের সূচনা হ'ল

তাঁর সমসাময়িক চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও এটা বুঝতে পারেননি। মনীষী গ্যাটেও এটি অনুমান করতে পারেননি।

সেনাপতি হিসেবে নেপোলিয়ন জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করেন। ইটালীর জনসাধারণের মনে তিনি এই ভাব এনে দেন। সম্রাট হবার কিছুদিনের মধ্যে তিনি অবশ্য এই নীতির পরিবর্তন করেন। নিজের আত্মীয় স্বজনদের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা হিসেবে জোর করে বসিয়ে দিলেন।

ইটালীতে

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইটালী মধ্যযুগীয় আবহাওয়া কাটিয়ে উঠল। আধুনিক আইনকানুন ও শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ইটালীবাসীদের মনে এক নতুন চেতনা দেখা দিল সমগ্র ইটালী সম্বন্ধে তারা চিন্তা করতে শুরু করল।

জার্মানীতে

জার্মানীতে নেপোলিয়ন চতুর্দশ লুই-এর নীতি অনুসরণ করেন—জার্মানীকে দুর্বল করে রাখা তাঁর নীতি হয়ে দাঁড়াল। জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতি হবে বলে তিনি মনে করলেন। কনফেডারেশন অব রাইন স্থাপন করেন সত্য কিন্তু এই কনফেডারেশনের আওতায় বেশ কয়টি স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে যায়। প্রাশিয়ার শক্তি তিনি ঠিক ভাবে বিচার করতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন যে প্রাশিয়া তাঁর অনুগত রাষ্ট্র হিসেবে থাকবে। পোল্যাণ্ড সীমান্তেও তিনি উদার মনোভাবের পরিচয় দেননি। জার্মানীতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের জন্য বুদ্ধিজীবীরা দায়ী ছিলেন। জাতীয়তাবাদ প্রসারের ফলে জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার বদলে আধুনিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল এবং জার্মান জনসাধারণ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। অস্ট্রিয়াতেও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার আনা হল। জাতীয়তাবাদ অবশ্য এখানে দেখা দেয়নি এবং ফরাসী বিরোধী নীতিও কার্যকরী হয়নি। মধ্য ইউরোপের জনসাধারণ ও স্পেনের ন্যায় ফরাসী বিরোধী ছিল না। মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে জাতীয়তাবাদ লক্ষ্য করা যায়। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যেহেতু স্পেনে প্রথম সশস্ত্র আন্দোলন ঘটে সে কারণে ঐতিহাসিকরা এটিকে সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের লড়াই বলে মনে করেন এবং স্পেনবাসীদের ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের পুরোধারূপে কল্পনা করা হয়। স্পেনের ইতিহাস ও স্পেনীয় যুদ্ধের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে এই ধারণা যে কত ভুল তা বোঝা যায়।

অস্ট্রিয়াতে

সাম্রাজ্যের বিপ্লব বিরোধী নীতি

অবশ্য নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য যে জাতীয়তাবিরোধী ছিল ১৮১০-এর পর এটি তীব্রভাবে বোঝা গেল। বড়ই

পরিতাপের বিষয় যে সম্রাট নেপোলিয়ন জাতীয়তাবাদের প্রতি মনোযোগী হননি, যে জাতীয়তাবাদকে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেণ্ট হেলেনায় তিনি বলেছিলেন যে তিনি সমগ্র জীবন ধরে জনসাধারণের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। কিন্তু তাঁর সম্রাট হিসেবে কার্যাবলীর পর্যালোচনা করলে এটি যে তৈরি গল্প তা সহজেই মনে হয়।

Q. 25. Explain the causes or the breakdown of the Franco-Russian alliance and its results.

Ans. **রুশ-ফরাসী বিচ্ছেদের কারণ :** ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। ইউরোপের সকল রাষ্ট্রই তাঁর একাধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হল। টিলসিটের সন্ধির ফলে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার পশ্চিম ইউরোপে নেপোলিয়নের প্রভাব মেনে নিলেন। জার্মানী, ইটালী ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে নেপোলিয়ন যে সব পরিবর্তন সাধন করেছিলেন তা স্বীকার করে নিলেন। কারণ টিলসিটের সন্ধিতে একটি গোপন শর্তও ছিল। এই সর্ত অনুযায়ী আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের মধ্যে ইউরোপের আধিপত্য বণ্টন করার ব্যবস্থা হয়। রাশিয়ার জার নেপোলিয়নকে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করবেন। আর এর বদলে নেপোলিয়ন সুইডেন ও তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর রাশিয়ার আধিপত্য মেনে নেবেন। সংক্ষেপে ফ্রান্স পশ্চিম ইউরোপের আর রাশিয়া পূর্ব-ইউরোপের মধ্যমণি হবে। জার আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বে বিমোহিত হয়ে এ পরিকল্পনা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে তাঁর পূর্বগামী পিটার ও ক্যাথারিনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে।

বিচ্ছেদের বিভিন্ন কারণ

জার আলেকজাণ্ডারের সাথে নেপোলিয়নের বন্ধুত্ব বেশিদিন স্থায়ী হল না। এর পিছনে অবশ্য অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারের নিকট হতে যতটা সাহায্য চাইলেন এর প্রতিদানে কিন্তু তিনি আলেকজাণ্ডারকে ততটা সাহায্য করতে চাইলেন না। অর্থাৎ টিলসিটের সন্ধির পর দুজনের মধ্যে যে সমঝোতার ভাব দেখা দেয়, কয় বছরের মধ্যেই সেটির অভাব পরিলক্ষিত হয়। কার্যকালে দেখা গেল রাশিয়ার দায়িত্ব বেশি এবং ফ্রান্সের দাবি বেশি। আর এটা যখন প্রকট হয়ে উঠল তখন নেপোলিয়নের সাথে রাশিয়ার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয়ত পেনিনসুলার যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে

নেপোলিয়নের রুশ-বিরোধী নীতি

নেপোলিয়নের প্রতিশ্রুত সাহায্য পাবে না বলে সন্দেহ করল। তার এ সন্দেহ যে অমূলক নয় তা সে শীঘ্রই বুঝতে পারল। তৃতীয়ত, পর্তুগাল ও স্পেনে ফরাসী বাহিনী যেভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল তা দেখে জার আলেকজাণ্ডারের নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তার পরিবর্তন ঘটল। ফরাসী বাহিনী যে অপরাজেয় নয় তা তিনি বুঝতে পারলেন। চতুর্থত, পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে নেপোলিয়ন ও জারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হল। নেপোলিয়ন প্রাশিয়াকে পরাজিত করে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার অধিকৃত পোল্যাণ্ডের অংশবিশেষ নিয়ে যে রাজ্যটি স্থাপন করেছিলেন (গ্রাণ্ডডাচি অব ওয়ারস) তা জার ভাল চোখে দেখলেন না। তাঁর সর্বদাই সন্দেহ হতে লাগল যে নেপোলিয়ন রাশিয়াকে বাধা দেবার জন্য পোল্যাণ্ডকে একটি বাফার স্টেট হিসেবে রাখতে চান। এই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হল নেপোলিয়ন যখন ওয়াগ্রামের যুদ্ধে অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে তার নিকট হতে গ্যালেসিয়া অঞ্চল কেড়ে নিয়ে ডাচি অব ওয়ারসর সাথে যুক্ত করলেন। পঞ্চমত, মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা কঠোরভাবে প্রয়োগ করার জন্য নেপোলিয়ন জারের ভগ্নিপতি ডিউক অব্ ওল্ডেনবার্গের নিকট হতে ওল্ডেনবার্গ রাজ্যটি কেড়ে নেন। এতে জার খুব রাগান্বিত হলেন। সর্বোপরি নেপোলিয়ন ও আলেকজাণ্ডারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাল মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা। জার যদিও কন্টিনেন্টাল ব্যবস্থাকে কার্যকরী করবার জন্য নেপোলিয়নকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু যতই দিন যেতে থাকল তিনি বুঝতে পারলেন যে ইংল্যাণ্ডের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করা রাশিয়ার পক্ষে অসম্ভব। এতে ইংল্যাণ্ডের চেয়ে রাশিয়ার ক্ষতি খুবই বেশি। একারণে তিনি নেপোলিয়নের সুবিধার জন্য নিজের দেশের দুঃখদুর্দশা বাড়াতে চাইলেন না। তিনি মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা মানতে চাইলেন না। আর রাশিয়া যদি এটি না মানে তাহলে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের গোটা পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং নেপোলিয়নও জারের এই মতিগতিতে রুষ্ট হলেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের রাগ ফেটে পড়ল যখন জার নেপোলিয়নকে এক চরম চিঠি দিয়ে দাবি করলেন যে রাশিয়া প্রভৃতি দেশের স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করবার অধিকার স্বীকার করতে হবে এবং রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশগুলি হতে ফরাসী সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। নেপোলিয়ন দুর্বিনীত জারকে

স্পেনীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে

মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা

সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১৮১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে রাশিয়া আক্রমণ করলেন। রুশগণ সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল না। তারা যে সকল জায়গা পরিত্যাগ করল সেগুলি পুড়িয়ে দিতে থাকল। এর ফলে নেপোলিয়ন তাঁর বিশাল বাহিনীর জন্য খাদ্য ও আশ্রয় পেলেন না। তিনি বিফল মনোরথ হয়ে দেশে ফিরতে আরম্ভ করলেন। শীতে অনাহারে ও শত্রুর আক্রমণে তাঁর অজেয় বাহিনী একেবারে ধ্বংস হল। নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান বিফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'মুক্তি সংগ্রাম' আরম্ভ হয়।

মস্কো অভিযান

মস্কো অভিযান নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ। এই অভিযান ব্যর্থ হওয়াতে নেপোলিয়নের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে পূর্বেকার ধারণা লোপ পেল। অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করল।

Q. 26. What were the causes of Napoleon's downfall ?

Ans নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ তাঁর চরিত্র ও নীতির মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অসাধারণ। তিনি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে যে রাজনৈতিক ও মানসিক প্রস্তুতি দরকার তা তাঁর ছিল না বা হয়নি। এই কারণে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও তিনি তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন নি। তাঁর নীতির যে ভুলত্রুটি ছিল তা তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন অবশ্য বহু পরে।

ভূমিকা

নেপোলিয়ন তাঁর নির্বাসন কালে সখেদে বলেছিলেন যে তাঁর পতনের কারণ তিনটি—**উপদ্বীপের যুদ্ধ, পোপের সহিত কলহ** এবং **রাশিয়া অভিযান**। এর সাথে আরও কয়েকটি কারণ যোগ করা যেতে পারে—কন্টিনেণ্ট্যাল সিস্টেম, ফরাসী বিজিত দেশ সমূহের নবজাগ্রত জাতীয় সম্মানবোধ, ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তি এবং বিশ্বাসঘাতকতা।

পতনের কারণ

স্পেনের সহিত যুদ্ধঃ স্পেনের সহিত যুদ্ধ করতে গিয়ে নেপোলিয়ন চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন। তিনি তাঁর ভ্রাতাকে স্পেনবাসীর বিরোধিতা সত্ত্বেও স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করায় স্পেনবাসীর জাতীয় সম্মানে আঘাত লাগে এবং তারা জীবনপণ করে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। স্পেনে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এখানে উদার মতাবলম্বী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়নি। ফলে স্বেচ্ছাচারী অভিজাত শ্রেণী

স্পেনের সাথে যুদ্ধ

ও গোঁড়াপন্থী ক্যাথলিক চার্চ জনসাধারণকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে সমর্থ হল। এই সম্মিলিত শক্তিকে নেপোলিয়ন ধ্বংস করতে পারলেন না—নিজের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করলেন। তিনি নিজেই পরবর্তীকালে তাঁর এই নীতিকে **স্পেনীয় ক্ষত** নাম দেন। তিনি স্পেনের সিংহাসনে নিজের ভাইকে বসাবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করেন এবং এক বিরাট সৈন্যবাহিনী স্পেনে আটকে থাকল। এই সৈন্যদলকে যদি তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে নিয়োগ করতে পারতেন তাহলে ইতিহাসের ধারা হয়ত অন্যপথে প্রবাহিত হত।

ইউরোপের রাজন্যবর্গের প্রতি খারাপ ব্যবহার: নেপোলিয়নের পক্ষে ইউরোপের শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হওয়ায় তাঁর পতন দ্রুততর হ'ল। তিনি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গকে সমগোত্রীয় বলে মনে না করে তাঁর অধীনস্থ বলে মনে করতে থাকেন এবং নিজেকে সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা বলে জাহির করেন। ইউরোপের রাজন্যবর্গ এটি একেবারেই স্বীকার করতে রাজি হলেন না। তাঁরা একজোটে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের সাধারণ শত্রুকে পরাজিত করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। এই নবজাগ্রত রাজশক্তি নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ।

সাম্রাজ্যের স্ববিরোধী নীতি: নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ হল তাঁর সাম্রাজ্যের স্ববিরোধী নীতি। তিনি বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সসৈন্যে প্রবেশ করেন। সেনাপতি হিসেবে তিনি জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্রাট হবার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই নীতির পরিবর্তন করেন। জাতীয়তাবাদের আদর্শের সাথে তাঁর সাম্রাজ্যের আদর্শের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হল। ১৮১০-এর পর এই বিরোধ তীব্রভাবে দেখা দিল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাতীয়তাবাদী আদর্শকে কাজে লাগাল। নেপোলিয়ন এই সমবেত শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও স্পেনে এই শক্তি দৃঢ়তর হবার ফলে তাঁর পতন ঘনিয়ে এল।

জাতীয়তাবাদ ও জনসাধারণের ঘৃণা: অনেকের মতে নেপোলিয়নের পতন ঘটেছিল জাগ্রত জাতীয়তাবাদের জন্য। ফরাসীদের দৃষ্টান্তে জার্মান, ইটালিয়ান ও অষ্ট্রিয়ানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়। স্পেনে এটি বিশেষভাবে দেখা যায়। রাজশক্তির সাথে এই জাতীয়তাবাদের যখন মিলন হল তখন নেপোলিয়ন আর দেশ জয় করতে পারলেন না। লিপজিগের যুদ্ধকে Battle of Nations বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরা এটি

মানতে চান না। তাঁদের মতে লিপজিগের যুদ্ধকে Battle of Nations বলা যায় না। স্পেনেও জাতীয়তাবাদ দেখা যায়নি। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে এটি লক্ষ্য করা যায়। অতএব তাঁর সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল জাগ্রত জাতীয়তাবাদের জন্য নয়, সামরিক এবং নব-কূটনৈতিক ঘটনাবলীর ছিল। তবে পরিতাপের বিষয় যে সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়ন জাতীয়তাবাদের প্রতি কোন মনোযোগ দেননি, যে জাতীয়তাবাদকে তিনি সেনাপতি হিসেবে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেণ্ট হেলেনায় তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর জীবনে জনসাধারণের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু সম্রাট হিসেবে তাঁর কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে এটি যে তৈরি গল্প তা সহজেই মনে হয়। তবে এটা ঠিক যে ইউরোপের জনসাধারণের মনে তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে এক ঘৃণার সৃষ্টি করে। তাঁর অর্থনৈতিক নীতির ফলে জন-সাধারণের আর্থিক অবস্থা চরমে পৌছায়। ইউরোপের মেহনতী মানুষ তাঁকে এবং তাঁর শাসনকে ধিক্কার দিল যখন তারা দেখল তাঁর বিঘোষিত গালভরা নীতির সাথে অত্যাচারী ফরাসী শাসনের কোন সংগতি নেই। বরঞ্চ জনসাধারণকে সর্বদিকে শোষণ করাই হল তাঁর শাসনের মূল নীতি বা লক্ষ্য। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান ঘটল। এগুলি অবশ্য দেখা দিল অর্থনৈতিক কারণের জন্য। এগুলির মধ্যে সঠিক রূপ খুজে পাওয়া দুষ্কর। তবে নেপোলিয়নের শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে ঘৃণার ভাব দেখা দিল সেটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কাজে লাগাল।

পোপের সাথে সম্পর্ক: নেপোলিয়ন যখন কনসাল নিযুক্ত হন তখন পোপের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পোপের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন এবং তাঁর রাজ্য দখল করেন এবং পোপকে বন্দীরূপে ফ্রান্সে আনেন। পোপের প্রতি এই ব্যবহারে ক্যাথলিক জনসাধারণ তাঁর প্রতি বিরক্ত ও রুষ্ট হয় এবং তাঁর বিরোধিতা করে। ফ্রান্সের গোড়াপন্থী ক্যাথলিকরা তাঁর শাসন পছন্দ করল না। স্পেনের ধর্মভীরু জনসাধারণকে চার্চই তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল। পোপের প্রতি খারাপ ব্যবহারের ফলে এগুলি দেখা গেল।

পোপের সাথে সম্পর্ক

মস্কো অভিযান: রাশিয়ার সহযোগিতার প্রকৃত মূল্য উপেক্ষা করে রাশিয়াকে শত্রুতে পরিণত করা নেপোলিয়নের পক্ষে ঠিক হয় নি। তার রুশ-বিরোধী নীতির ফলে জার তাঁর উপর বিতৃষ্ণ হলেন এবং নেপোলিয়ন-বিরোধী দলে যোগদান

করলেন। রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের মনোমালিন্য উপস্থিত হলে তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রুশদেশে প্রবেশ করেন। রুশগণ সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল না। তারা যে সকল জায়গা পরিত্যাগ করল সেগুলি পুড়িয়ে দিতে থাকল। এর ফলে নেপোলিয়ন তাঁর বিশাল বাহিনীর জন্য খাদ্য ও আশ্রয় পেলেন না। তিনি বিফল মনোরথ হয়ে দেশে ফিরতে আরম্ভ করলেন। শীতে, অনাহারে শত্রুর আক্রমণে তাঁর অজেয় বাহিনী একেবারে ধ্বংস হল। নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান বিফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'মুক্তি সংগ্রাম' আরম্ভ হয়।

মস্কো অভিযান

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম: ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করবার জন্য নেপোলিয়ন কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম প্রবর্তন করেন কিন্তু এর ফল বিপরীতই হয়। তাঁর ধ্বংসই ত্বরান্বিত করে। এই নীতির ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় ও সকলে তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম যখন তিনি কার্যকরী করতে সচেষ্ট হন তখন তাঁর শত্রু সংখ্যা বেড়ে যায়। এই ব্যবস্থার ফলে ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি এবং জনসাধারণ এক অর্থনৈতিক দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্লভ ও দুর্মূল্য হওয়াতে নেপোলিয়নের শাসন ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সারা ইউরোপে এক ঘৃণ্য মনোভাবের সৃষ্টি হল। পর্তুগাল আক্রমণ, পোপের সাথে বিবাদ সেখানে হস্তক্ষেপ এবং রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ এর ফলে দেখা দিল।

কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম

ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তি: ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির প্রাধান্য নেপোলিয়নের পতনের অপর একটি কারণ। স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন অপরাজেয় থাকলেও সমুদ্রবক্ষে বারংবার তিনি ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার অভিপ্রায়ে তিনি যখন প্রাচ্য পরিকল্পনা নেন তখন নীল নদের যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড তাঁকে পরাজিত করে। ফলে তাঁর প্রাচ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনীকে বেশ কিছু বছরের জন্য নিরাপদ করল। নেপোলিয়নের পক্ষে ইংল্যাণ্ডকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করা অসম্ভব হল। নেপোলিয়ন কিন্তু এতে দমলেন না। তিনি অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করা সম্ভব হবে বলে মনে করলেন এবং তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা চালু করলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ল ইংল্যাণ্ডের নৌ-শ্রেষ্ঠত্বের জন্য।

ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তি

তবে এটা মনে রাখতে হবে যে ইংল্যাণ্ডের নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের সাথে ইংরেজদের অনমনীয় মনোভাব ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম যুক্ত হবার ফলেই নেপোলিয়নের বহু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

বিশ্বাসঘাতকতা : ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের মিত্রভাবাপন্ন নরপতি এবং নেপোলিয়নের ফরাসী বন্ধুবর্গের বিশ্বাসঘাতকতাও নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ বলে ধরা যেতে পারে। স্পেন ও রাশিয়ায় তাঁর পরাজয়ের সংবাদে এঁরা নেপোলিয়নের পতন অবশ্যম্ভাবী ভেবে নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করেন এবং নিজেদের ভাগ্য সুনিশ্চিত করবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালাতে থাকেন। কারণ এঁদের সাহায্য নেপোলিয়নের নিকট অপরিহার্য ছিল ঠিক সেই সময়েই এরা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। উদাহরণ স্বরূপ জেনারেল বার্ণাডোটের নাম করা যেতে পারে। বার্ণাডোটে নেপোলিয়নের মতই ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সেনাপতি ছিলেন এবং পরে নেপোলিয়নের একজন বিশ্বস্ত ও দক্ষ সেনাপতি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন। অষ্টারলিজের যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন তাঁকে প্রিন্স উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের ডায়েট বার্ণডোটকে সুইডেনের রাজা হিসেবে নির্বাচিত করে। সুইডেনবাসী ভেবেছিল যে বার্ণডোটকে রাজা করলে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যে থাকার সব সুযোগ সুবিধা তারা আগে পাবে। নেপোলিয়নও এতে সন্তুষ্ট হলেন এই কারণে যে তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা খুবই কার্যকরী হবে বার্ণাডোটেকে সুইডেনের সিংহাসনে বসালে। কিন্তু সুইডেনের সিংহাসনে বসার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার সাথে সাথে বার্ণাডোটে নেপোলিয়নের শত্রুতা সাধনে ব্রতী হলেন। তিনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করলেন এবং নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে শেষ অভিযানে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ফ্রান্সের ভেতরে নেপোলিয়নের তথাকথিত মিত্ররাও তাঁর পতনের জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করতে থাকল। এদের মধ্যে কূটনীতিজ্ঞ ট্যালের‍াঁ (Talleyrand) এবং পুলিশ প্রধান ফুচে (Fouche) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই রাশিয়ায় নেপোলিয়নের ভাগ্য বিপর্যয়ে উল্লসিত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবার জন্য নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এরা নেপোলিয়নের স্থানে বুরবোঁ বংশীয় অষ্টাদশ লুইকে সিংহাসনে বসাবার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাখলেন। এ হতে বোঝা যায় নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য কত ভঙ্গুর ছিল। তাঁর একটু ভাগ্য বিপর্যয়ের সাথে সাথেই তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁকে ত্যাগ করল। একথা বললে অন্যায় হবে না যে নেপোলিয়নের ফরাসী সিংহাসনে স্থায়িত্বের প্রধান শর্ত ছিল—নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধজয়

যেটি নেপোলিয়নের মত প্রতিভার পক্ষে ও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। ফলে তাঁর বন্ধুপ্রতিম কিছুসংখ্যক সেনাপতি ও বেসামরিক কর্মচারীরা তাঁর প্রতি আর আনুগত্য দেখান প্রয়োজন বলে মনে করল না। সুতরাং দেশের ও বিদেশের বন্ধুদের বিশ্বাস-ঘাতকতা তাঁর পতনের জন্য নিশ্চয়ই দায়ী ছিল।

অন্যান্য কারণ: পরিশেষে বলা যায় যে ওয়াটার্লু যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর সমর নীতির ভুলত্রুটি তাঁর পতনের জন্য কিছুটা দায়ী। ওয়াটার্লু যুদ্ধের দুদিন আগে তিনিও তাঁর সেনাপতি নে (Ney) যথাক্রমে লিগনীতে ব্লুচারের প্রাশিয়ান বাহিনীকে ও কোয়াটার ব্রাসে ওয়েলিংটনের বৃটিশ বাহিনীকে পরাজিত করেন কিন্তু নেপোলিয়ন এই সময় বুঝতে পারেননি যে পরাজিত উভয় বাহিনী আবার মিলিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। ফলে তিনি এই দুই বাহিনীর পশ্চাৎধাবন না করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন, অবশ্য এই সময় তিনি শারীরিক ব্যাধিতে ভুগছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁর সেনাপতি গ্রাউচিকে বুচারের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে ছিলেন। ভুল বোঝাবুঝির ফলে গ্রাউচি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে সমর্থ হলেন না। ফলে ওয়াটার্লুতে তাঁর নিশ্চিত জয়লাভ সম্পূর্ণ পরাজয়ে পরিণত হল।

Q. 27. Briefly describe the career of Napoleon and estimate his achievements.

Ans. নেপোলিয়ন তাঁর শেষ যুদ্ধে জয়ী হলেন সেণ্ট হেলেনায়। এখানে তিনি তথাকথিত Napoleonic legend গড়ে তুললেন যার ফলে তাঁর কার্যাবলীর নতুন ভাবে মূল্যায়ন শুরু হল এবং তাঁকে উদারনৈতিক ও গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী বলে মনে করা হতে লাগল। পরবর্তীকালে বোনাপার্টিজম একটি রাজনৈতিক মতবাদে পরিগ্রত হল এবং এই মতবাদ দিন দিন শক্তি সঞ্চয় করতে থাকল। এর ফলেই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট হতে পারলেন। একদিকে নেপোলিয়ন ছিলেন তাঁর যুগেরই সন্তান, আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন যুগ-প্রবর্তক বা যুগ-স্রষ্টা।

প্রথম জীবন: ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্সিকা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে এক ব্যবহারজীবীর গৃহে নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুড়িবৎসর বয়সে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার খুবই অনুরাগ ছিল। ফরাসী দার্শনিকদের লেখা তিনি পড়তে ভালবাসতেন।

অভ্যুত্থান: নেপোলিয়ন বিপ্লব আরম্ভ হবার পর তুঁলোতে (Toulon) যে যুদ্ধ হয় তাতে কৃতিত্ব দেখান। বিপ্লবের সময় প্যারিসের জনসাধারণ বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। সরকারের কোন কাজই তাদের মনঃপুত হচ্ছিল না। এরূপ উন্মত্ত

জনতাকে নেপোলিয়ন অসীম সাহসের সহিত দমন করেন ও কনভেনশন নামক সরকারকে রক্ষা করেন। এর পরই তাঁর ভাগ্যোন্নতি আরম্ভ হয়। ইটালীতে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বভার তাঁকে দেওয়া হয়।

ইটালীতে যুদ্ধ: সেনাপতি হয়ে নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ইটালী আক্রমণ করলেন। তিনি ইটালীতে অস্ট্রিয়ার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে পর পর ভীষণভাবে পরাজিত করেন এবং অস্ট্রিয়াকে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। তাঁর সামরিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ইউরোপ চমকিত হল।

প্রাচ্য অভিযান: ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মিশর জয় করতে যান। মাল্টা দ্বীপটি দখল করে তিনি মিশরে উপস্থিত হলেন। মিশরের শাসকগণ তাঁর গতিরোধ করতে পারল না। মিশর হতে তিনি সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হলেন কিন্তু ইংরাজ নৌ-সেনাপতি লর্ড নেলসন নীলনদের যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করেন এবং নেপোলিয়নের ভারতবর্ষ প্রভৃতি জয়ের বাসনা নষ্ট করে দিলেন।

প্রথম কন্সাল: ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে এলেন এবং ডিরেক্টরদের দূর করে **প্রথম কনসাল** নামে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের কর্তৃত্ব পেলেন। এই সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রজোট গঠিত হয়, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া একজোটে বিপ্লবী ফ্রান্সকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। নেপোলিয়ন **ম্যারেঙ্গোর** যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সৈন্য ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। জার্মানিতেও অস্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটল। রাষ্ট্রজোট ভেঙে গেল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। ইটালীতে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। নেপোলিয়নের সফল কূটনীতির ফলে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্র ফ্রান্সের পক্ষে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করল। নৌ যুদ্ধে কিন্তু নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করতে পারলেন না। শেষে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক সন্ধি হল। এটিকে **আমিয়েন্সের সন্ধি** বলে। এর ফলে ফ্রান্সের অধিকার বেলজিয়াম ও রাইন নদীর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করল।

নেপোলিয়ন পাঁচ বৎসরকাল প্রথম কন্সালরূপে ফ্রান্স শাসন করেন। তিনি ফ্রান্সের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি সমগ্র দেশটি ৮৩টি প্রদেশে ভাগ করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন প্রিফেক্ট নিযুক্ত করেন। বিচারবিভাগেরও পরিবর্তন সাধন করেন। সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি নিজেই নিযুক্ত করতেন। তিনি মুদ্রানীতির পরিবর্তন করেন এবং 'ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স' স্থাপন করেন। তিনি এবং তাঁর

নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ সংস্কার

কর্মচারীবৃন্দ জনসাধারণকে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করলেন। শাসন কার্য হতে অমিতব্যয়িতা ও দুর্নীতি দূর করলেন। নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরী করে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সংস্কার হল **আইন-বিধি** বা **Code Napoleon. 'আইনের চক্ষে সকলেই সমান'**—এটাই তিনি প্রবর্তন করলেন। সরলভাবে সংকলিত এই আইনবিধি বিপ্লবের সামাজিক সাফল্যকে নিশ্চিত করল। এতে নাগরিকদের সমতা, সহনশীলতা, উত্তরাধিকার বিষয়ে সমতা, ভূমিদাসদের মুক্তি এবং সামন্ত প্রথাব ও বিশেষাধিকারের উচ্ছেদ সাধন করা হল। পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের আইন-কানুন এই আইন-বিধির অনুকরণে তৈরী করা হয়েছে। তিনি ধর্মব্যাপারে পোপের সহিত এক সুমীমাংসায় উপনীত হন। শিক্ষা ব্যাপাবেও তিনি আগ্রহ দেখান। সংক্ষেপে, **নেপোলিয়ন শাসনকার্যেও অসামান্য কৃতিত্ব দেখান**। নেপোলিয়ন প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় যদিও জনসাধারণের বিশেষ হাত ছিল না, তবুও দ্রুত ও সর্বত্র একই ভাবে শাসনকার্য চলতে থাকায় তারা খুবই উপকৃত হল। নেপোলিয়নের সামরিক কীর্তি বেশিদিন টেকেনি, কিন্তু তাঁর শাসনসংস্কার অমরত্ব লাভ করেছে।

সম্রাটরূপে: ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফরাসী দেশের সম্রাটপদে নিজেকে অভিষিক্ত করালেন। এইবার তিনি স্থির করলেন যে, ইংল্যাণ্ড আক্রমণ না করলে যুদ্ধ শেষ হবে না। কিন্তু শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে ইংল্যাণ্ড রক্ষা পায়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে **ট্রাফালগারের যুদ্ধে** ইংরাজ নৌ-সেনাপতি নেলসন ফ্রান্সের নৌবাহিনী ধ্বংস কবলেন। নেপোলিয়ন জলপথে ইংল্যাণ্ড আক্রমণের কথা আর চিন্তা কবেননি। স্থলপথে কিন্তু তাঁব গতিরোধ কেউই করতে পারল না। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হয়। অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড এর প্রধান প্রধান সদস্য ছিল। নেপোলিয়ন **অস্টার্লিজের** যুদ্ধে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্মিলিত বাহিনী বিধ্বস্ত করলেন। এর পর **এনার** (Zena) যুদ্ধে প্রাশিয়াকে পরাজিত করলেন। রাশিয়ার জাব আলেকজাণ্ডার পরাভূত হয়ে সন্ধি করলেন। এটিকে **টিলসিটের সন্ধি** (১৮০৭) বলে। এইরূপে নেপোলিয়ন ইউরোপে একাধিপত্য স্থাপন করলেন। টিলসিটের সন্ধির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জার আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের মধ্যে ইউরোপের আধিপত্য বণ্টন করবার গোপন চুক্তি। এর দ্বারা ঠিক হল যে নেপোলিয়ন পশ্চিম ইউরোপের আর রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা হবেন। টিলসিটের সন্ধিতে (১৮০৭) নেপোলিয়নের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সর্বোচ্চ-শিখরে উপনীত হল। ইংল্যাণ্ড ছাড়া তাঁর নিকট

কেহ অপরাজিত থাকল না। ফলে তিনি ইউরোপের মানচিত্রে নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন আনলেন।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। ইউরোপের সকল রাষ্ট্রই তাঁর একাধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হল। তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীগণ বিভিন্ন দেশের রাজা বা রানীরূপে গণ্য হলেন। কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ড তাঁকে ইউরোপের কর্তারূপে স্বীকার করল না। তিনি ইংল্যাণ্ডকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাইলেন। এবং তাকে ভাতে মারতে চেষ্টা করলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডকে শায়েস্তা করবার জন্য Continental System বা এক বাণিজ্যিক অবরোধ প্রথা স্থাপন করলেন। এর মূল কথা হল ইউরোপের কোন দেশকে ইংল্যাণ্ডের সহিত বাণিজ্য করতে না দিয়ে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক বিপর্যয় আনা। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার্লিন নগর হতে এক হুকুমনামা জারী করে এই অবরোধ প্রথা ঘোষণা করেন। এর প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ডও এক হুকুমনামা জারি করল যে কোন রাষ্ট্রের জাহাজ ইংল্যাণ্ডের বন্দরে না এসে ফরাসী বন্দরে যেতে পারবে না।

ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা

এর পর নেপোলিয়ন মিলান ডিক্রি ঘোষণা করলেন। যে সব নিরপেক্ষ দেশ ফরাসী সাম্রাজ্যের সাথে বাণিজ্য করবে, তাদের পক্ষে কোন ইংরেজ বন্দরে যাওয়া নিষিদ্ধ হল।

'কণ্টিনেণ্টাল ব্যবস্থা' কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ডের পণ্য বর্জন করবার জন্যই গ্রহণ করা হয়নি। ফরাসী পণ্য যাতে বাজার পায় এবং ফরাসী ধনিকশ্রেণী যাতে আয় বৃদ্ধির সুযোগ পায় তার জন্যও এই ব্যবস্থার মারফত সবিশেষ চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু বৃটিশ পণ্যবিহীন ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করবার মত ক্ষমতা তখন ফরাসী উৎপাদন ব্যবস্থার ছিল না। এদিকে নৌশক্তির প্রাধান্যের ফলে ইংরেজরা তাদের ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করল। কিন্তু নেপোলিয়ন তাঁর আদেশগুলি কার্যকরী করতে পারলেন না। সুতরাং এই ব্যবস্থার ফলে ইউরোপের জনসাধারণের দুর্দশা চরমে উঠল। যেহেতু ইংল্যাণ্ডের পণ্য ছাড়া ইউরোপের চলত না সে কারণে চোরা আমদানি-রপ্তানি প্রচণ্ডভাবে চলতে থাকল। নেপোলিয়ন এটি বন্ধ করতে চাইলেন—সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিক্ষোভ দেখা দিল এবং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হল।

নেপোলিয়নের পতন: Continental System-এর ফলে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছিল সন্দেহ নাই কিন্তু ইউরোপের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক

বিপর্যয় দেখা দেয়। একটির পর একটি নেপোলিয়নের মিত্রদেশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে, স্পেন ও পর্তুগাল বিদ্রোহ করে। এটিকে উপদ্বীপের যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে পারেননি। কারণ স্পেন-বাসীদের অনুসরণ করে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের জনসাধারণ বিদ্রোহ করল। এর ভেতর নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করলেন (১৮১২ খ্রীঃ) কিন্তু রাশিয়ায় তাঁর চরম পরাজয় ঘটল। তাঁর সৈন্যদল বিনষ্ট হল। তাঁর ছয়লক্ষ সৈন্যের বিরাট বাহিনীর মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে। এই পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড বিদ্রোহ করল। সুইডেনও এতে যোগদান করে। ইংল্যাণ্ডের সাথে যুদ্ধ আগে হতেই চলছিল। সম্মিলিত শক্তির নিকট নেপোলিয়ন পরাজিত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তাঁকে **এলবা দ্বীপে** নির্বাসিত করা হল। ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে এগার মাস থাকবার পর গোপনে পুনরায় ফ্রান্সে ফিরে এলেন। ফরাসী সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ তাঁকে সম্রাট বলে গ্রহণ করল। কিন্তু ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের ঠিক একশো দিন পরে ইংরাজ, প্রাশিয়ান ও বেলজিয়ামের সমবেত সৈন্যদলের ওয়াটারলুর যুদ্ধে (১৮১৫) নেপোলিয়ন শেষবারের মত পরাজিত হন। তাঁকে সুদূর **সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে** নির্বাসিত করা হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানসার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাঁর দেহ ফ্রান্সে নিয়ে আসা হয়। তাঁর সমাধি-মন্দির একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

নেপোলিয়নের পতন

কৃতিত্ব: নেপোলিয়ন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। তাঁর সংগঠন শক্তির তুলনা হয় না। তাঁর নেতৃত্বে ফ্রান্স ঐক্যবদ্ধ হয়। দেশে শক্তিশালী ও সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্স ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বুরবোঁ রাজাদের অপদার্থ নীতির ফলে যে শোচনীয় দুরবস্থা হয়েছিল তার অবসান ঘটে। এ কারণে অন্যান্য ত্রুটি সত্ত্বেও নেপোলিয়নের যুগ ফ্রান্সের শৌর্য ও মহাগৌরবের যুগ।

ফ্রান্স

ইউরোপের ইতিহাসেও নেপোলিয়নের অবদান রয়েছে, তাঁর যুগন্ধর প্রতিভা ইউরোপের ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ইউরোপীয় সভ্যতা এক নতুন বলে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে যেতে থাকল। নেপোলিয়ন ছাড়া সাম্রাজ্য যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি এটাও মনে রাখতে হবে যে নেপোলিয়নের আবির্ভাব না ঘটলেও ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্রগতি থমকে থাকত না, এগিয়ে যেতই। অবশ্য এই অগ্রগতি খুবই তাড়াতাড়ি না হয়ে ধীরে ধীরে

ইউরোপ

ঘটত। ইউরোপে পুরানো শাসনব্যবস্থার অবসান হতই। অবশ্য এটি হঠাৎ না হয়ে ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণভাবে ঘটত।

বিপ্লব ও জ্ঞানদীপ্তির অংশীদার ছিলেন বলে নেপোলিয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারতা ও আন্তরিকতা দেখা যায়। কোড নেপোলিয়নের-এর প্রসারের জন্য নেপোলিয়ন খুবই সচেষ্ট হন এবং এর মাধ্যমেই বিপ্লব-প্রসূত চিন্তাধারা ও শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি প্রথমে অনুমান করতে পারেননি যে পুরানো রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের ফলে জাতীয়তাবাদ প্রবল হবে।

তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইটালি মধ্যযুগীয় আবহাওয়া কাটিয়ে উঠল। আধুনিক আইন-কানুন, শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ইটালিবাসীদের মনে এক নব চেতনা দেখা দিল। তারা প্রাদেশিকতাব উর্ধ্বে নিজেদের চিন্তাধারাকে নিয়ে যেতে পারল। জার্মানীতেও নতুন চিন্তাধারার প্রসার ঘটল। বিভিন্ন রাষ্ট্রে মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থার বদলে আধুনিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এবং রাইনের রাষ্ট্রপুথ সৃষ্টি করে জার্মানীকে তার রাজনৈতিক ঐক্যের পথে অনেকটা এগিয়ে দেন। অষ্ট্রিয়াতেও শাসন ব্যবস্থায় সংস্কার আনা হল। নেপোলিয়নের সংস্পর্শে এসে অষ্ট্রিয়া ও স্পেন লাভবান হল।

Q 28. Critically estimate Napoleon as a General and an administrator.

Ans নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভাই তাঁকে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। যে সব যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছিলেন সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অনেকে অবশ্য বলে থাকেন যে নেপোলিয়ন প্রতিভাবান সেনাপতি ছিলেন না। শত্রুদের দুর্বলতাই তাঁর জয়ের কারণ ছিল।

সেনাপতি হিসেবে অদ্বিতীয়

অস্টারলিজ, ওয়াগরাম প্রভৃতি রণক্ষেত্রের ইতিহাস পড়লে কিন্তু অন্যরকম অভিমত পোষণ করতে হয়। এক ওয়াগরামের যুদ্ধেই অষ্ট্রিয়া যে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে তার সংখ্যা নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফরাসী বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি ছিল। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনী তাঁর রণনীতির নিকট দাঁড়াতে পারল না। আবার অনেকের মতে নেপোলিয়ন সামরিক বিভাগে নতুন নতুন অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এই অভিমতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নেপোলিয়ন প্রথম হতেই সামরিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং তৎকালীন খ্যাতনামা

বিভিন্ন অভিমতের খণ্ডন

বৈজ্ঞানিকদের সাথে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলেন। পদাতিক বাহিনীকে তিনি খুবই শক্তিশালী করেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন ছোটখাটো ব্যাপারে তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি কেবল সামগ্রিকভাবে যুদ্ধটি বিচার করতেন এবং নিজের আয়ত্তে রাখতেন। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্য তিনি ইম্পিরিয়াল বাহিনী গঠন করেন। তাঁর যুদ্ধজয়ের পিছনে এই বাহিনীর অবদান যথেষ্ট ছিল।

যুদ্ধজয়ের কৌশল

নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কোন নীতি বা পদ্ধতি মেনে চলতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্য দুরকমের কৌশল তিনি প্রয়োগ করতেন—(ক) শত্রুর পিছনে আক্রমণ করে তার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা, (খ) শত্রুবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আঘাত করে তাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া এবং পরে খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত করা। ওয়াটারলুর যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের পরিকল্পনা হিসেবে চমৎকার কিন্তু এই যুদ্ধ ঠিক ভাবে পরিচালিত না হবার ফলে তিনি পরাজিত হন।

নেপোলিয়ন তাঁর সেনাপতিদের গুণাবলীর মূল্যায়ন ঠিকভাবে করতে পারতেন। তিনি রাজনীতিতে সেনাপতিদের হস্তক্ষেপ একেবারে পছন্দ করতেন না।

শাসক হিসেবে

নেপোলিয়ন কেবলমাত্র সেনাপতি হিসেবেই বড় ছিলেন না। লোকচরিত্র নির্ণয় করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসীম এবং ঠিক লোককে ঠিক জায়গায় নিয়োগ করবার সহজাত বুদ্ধি তাঁর মধ্যে ছিল। দেশশাসন করবার জন্য যে সব গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন সেগুলির অধিকারী তিনি ছিলেন। প্রথম কনসাল হিসেবে তিনি প্রত্যহ ১৮ ঘণ্টা কাজ করতেন। তাঁর পনের বছর শাসন কালে তিনি প্রায় ৮০০০০ চিঠি ও নির্দেশাদি লিখেছিলেন—প্রত্যহ প্রায় পনেরটি করে। তিনি এক সময় বলেছিলেন 'ক্ষমতা (power) আমার রানী।' বেহালাবাদক যেমন তার বেহালাকে ভালবাসে, তিনি তেমনি ক্ষমতাকে ভালবাসেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের শান্তি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সমস্ত কিছু তাঁর ভাগ্যের নিকট উৎসর্গ করেছিলেন।

ব্যক্তিগত ক্ষমতা

এরূপ দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কি করে খাটতে পারতেন? তাঁর দেহ দানবের মত ছিল না যে তিনি অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতার জন্য এরূপ খাটতে পারতেন। তবে মনে হয় দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি এবং খুবই সংবেদনশীল স্নায়ুতৎপরতা তাঁর এই অস্বাভাবিক কর্মক্ষমতার মূল কারণ ছিল। পরে অবশ্য এর জন্য তাঁকে খেসারত দিতে হয়েছিল—তাঁকে অকালবার্ধক্যে পায়। সন্ন্যাস রোগের কবলেও তিনি পড়েন।

মলিন নামে এক মন্ত্রী লিখেছেন যে, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্র হতেও তিনি পুরোপুরি ভাবে ফ্রান্স শাসন করতেন। সরকারী সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে নিজেকে অবহিত রাখতেন। মন্ত্রীরা তাঁর নির্দেশবাহক ছিলেন মাত্র। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা ছিল খুবই অনাড়ম্বর, সহজ ও সরল। পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তিনি লক্ষ্য দিতেন না এবং বিলাসিতা বলে কিছু তাঁর ছিল না। রাজনীতি বা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে স্ত্রীলোকের হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না।

নেপোলিয়নকে কখনই অত্যাচারী শাসক বলা যায় না। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তাঁর শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি যা ভাল মনে করতেন সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করতেন। পদ্ধতিতে ভুল থাকতে পারে, সমালোচনা করা যেতে পারে কিন্তু তাই বলে তাঁর শাসনকে শয়তানী শাসন বলা যায় না। তাঁর রুচিস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বে বুদ্ধি ও কল্পনার সুষম সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন বিপ্লবের সন্তান। সাহিত্যের অনুরাগী তিনি ছিলেন এবং নিজেও সাহিত্য চর্চা করতেন।

বিপ্লবের খারাপ দিকের সাথে, রক্তপাতের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল বলে তিনি জনতা পছন্দ করতেন না। তবে অসংখ্য গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দোষত্রুটি ছিল এবং তাঁর নীতিতেও স্ববিরোধী গুণ দেখা যায়। তিনি তাঁর বংশগতি ও পরিবেশ হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। তাঁর নীতিতে কর্সিকা-গন্ধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নেপোলিয়ন এক অসাধারণ যুগন্ধর পুরুষ, তাঁর কৃতিত্ব এবং অবদানকে ছোট করে দেখবার অবকাশ নেই। ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসে তিনি অনন্য।

Q. 29. Discuss the results of the French Revolution. *Or*, **What were the social and political results of the French Revolution ?**

Ans. ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে। এর প্রাণকেন্দ্র ফ্রান্স হলেও এই বিপ্লব ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সীমিত হয়নি। এই বিপ্লবের আদর্শ ক্রমশঃ ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশগুলিতে প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত হয় এবং এই সব মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণ বিপ্লবী ধ্যান ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাচীনত্ব ও পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায়; বিপ্লবের বহুঘোষিত স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ইউরোপের ইতিহাসকে এক নতুন পথে পরিচালিত করে। ইউরোপের জনসাধারণ

'স্বাধীনতা'র অর্থ করল জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ভূমিদাস প্রথার অবসান। 'সাম্যে'র অর্থ কবল বিশেষ সুবিধার অবসান আর 'মৈত্রী' বলতে বুঝল জাতীয়তাবাদ।

ফ্রান্সে: ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের পতনের পরে ফ্রান্সে পুরানো রাজতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও বিপ্লবের সুফলগুলি থেকে যায়। সামন্ততান্ত্রিক বিশেষাধিকার, ভূমিদাসত্ব, সামাজিক বৈষম্য, চার্চের প্রাচীন ক্ষমতা, অযৌক্তিক কর-ব্যবস্থা, বিচার ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের অযোগ্যতা ফ্রান্সে আর ফিরে এল না। ফ্রান্স ইউরোপের বিপ্লবী চিন্তাধারার পীঠস্থানরূপে পরিগণিত হল। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিপ্লবী ফরাসী জনসাধারণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের নিকট উদাহরণ-স্বরূপ হল। ফ্রান্সে শাসনতন্ত্র ক্রমেই গণতান্ত্রিক হতে থাকে এবং ব্যক্তির মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃতি লাভ করে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহনশীলতা জোরদার হল এবং আইনের সাম্য দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হল, সামাজিক ক্ষেত্রে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও বিশেষ অধিকার বলে কিছু রইল না। বিপ্লবের সময় অভিজাত ও চার্চের যে সব ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে বিলিব্যবস্থা করা হয়েছিল তার ফলে এক স্বাধীন কৃষক সমাজের সৃষ্টি হল।

ইউরোপে: বিপ্লবের ভাবাদর্শ ফ্রান্স হতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়নের বিজয়াভিযান প্রাচীন শাসন ব্যবস্থা ও সমাজের উচ্ছেদ সাধন করে, শাসনতান্ত্রিক অধিকার ও দুর্নীতি বিলোপ পেয়ে আইনের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণের সর্বজনীন অধিকার—এইসব মৌলিক অধিকার বাস্তবায়িত করবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণ সচেতন হল। স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা সর্বত্র নিন্দিত হল এবং উদারনৈতিক মতবাদ ও গণতন্ত্র সর্বত্র আদর্শরূপে স্বীকৃত হল। এগুলি কার্যকরী করবাব জন্য জনসাধারণ আন্দোলন শুরু করল।

জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করবার প্রচেষ্টাও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ হতে গ্রহণ করা হয়। এই আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জার্মানী, ইটালী, তুরস্কের অধিকৃত বল্কান অঞ্চলের জনসাধারণ আন্দোলন জোরদার করে। এবং এই নীতির ভিত্তিতে গ্রীস, বেলজিয়াম ও বল্কান রাজ্যসমূহ স্বাধীন হয় এবং জার্মানী ও ইটালীতে রাজনৈতিক ঐক্য সম্ভবপর হয়।

সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় আন্দোলন চলতে থাকে। কোড নেপোলিয়নের ফলে 'আইনের চোখে সকলে সমান' প্রবর্তিত হয়। ভূমিদাস প্রথা

চিরতরে লুপ্ত হল। সামাজিক ও আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ধর্ম নৈতিক ব্যাপারেও অসহিষ্ণু ও অনুদার নীতি লোপ পেল। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হল। ইউরোপের সমাজজীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিসচেতনতা বিশেষভাবে স্থান পেল। ব্যক্তিমানুষকে তাঁর দায়িত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করল, এবং নৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লব নিয়ে এল। ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তি বিদ্যায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। প্রত্যেক দেশে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠলো। সংক্ষেপে ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ মধ্যযুগীয় আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেল।

More Questions with Hints

Q. 1 How far was the Revolution in France in 1789 precipitated by economic factors ?

Ans. ফরাসী বিপ্লবের বহুবিধ কারণ ছিল—অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন একটিমাত্র কারণে বিপ্লব সংঘটিত হয়নি, বহু কারণের সমন্বয়েই বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। তবে কারণগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক কারণ অন্যান্য কারণের তুলনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্যই ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেল মহাসভা ডাকতে বাধ্য হন এবং সরকারের অর্থনৈতিক দেউলিয়া অবস্থাকে অবলম্বন করেই বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ। তাছাড়া ফ্রান্সে অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায় কোনরকম কর দিত না। সামন্ততন্ত্রের নীতি অনুসারে কৃষকরা বেগার খেটে মরত, আর ধনাঢ্য অভিজাতরা নিশ্চিন্ত বিলাসে কালাতিপাত করত। দেশের ভাল জমি তাদের দখলে ছিল। রাষ্ট্রের ভালো চাকরি তারাই পেত। রাষ্ট্রের সমগ্র আয়ের প্রায় সমস্তটাই সাধারণ প্রজাদের নিকট হতে নেওয়া হত। রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত কর ছাড়াও জনসাধারণের নিকট হতে 'ধর্ম কর' আদায় করা হত। কর সংগ্রহ পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। বণিক-শিল্পপতিদের অবস্থাও ভাল ছিল না। আভ্যন্তরীণ করভার, নানারূপ শুল্ক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করে। একারণে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকার-বিরোধী মনোভাব বিশেষভাবে দেখা দিল। আয়ব্যয়ের অরাজকতা ও ক্রমাগত রাজস্ব ঘাটতির ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। এবং এর ফলে বিপ্লব তাড়াতাড়ি দেখা দিল। ষোড়শ লুই যদি সুবিধাভোগী সমাজকে সুবিধা ত্যাগ

করতে বাধ্য করে অর্থনৈতিক সংস্কারে যত্নবান হতেন তা হলে হয়ত বিপ্লব রোধ করা সম্ভব হত।

Q. 2. 'The train which had been laid by philosophy was fired by finance.'—Discuss.

Ans. শুরুতে ফরাসী বিপ্লব রাজতন্ত্র-বিরোধী ছিল না। এর সূচনা হয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবিতে এবং ষোড়শ লুই-এর সরকারের অর্থনৈতিক দেউলিয়া অবস্থাকে অবলম্বন করে এর প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু বিপ্লবের অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি দার্শনিকরা বহু আগে হতেই তৈরি করেছিলেন। আঠারো শতকের দর্শন যৌক্তিক ভাব আশ্রয়ে তদানীন্তন সমাজের অসারতাকে প্রমাণ করেছিল। প্রচলিত সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা যে যুক্তিহীন তা দার্শনিকরা তাঁদের রচনায় প্রকাশ করেন। তাঁদের রচনা প্রাচীন ব্যবস্থার মূল ভিত্তিকেই টলিয়ে দিল। এদিক হতে দেখলে দার্শনিকগণ একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে বিপ্লবকে পরিচালিত করবার সুযোগ করে দেন, অন্যদিকে প্রাচীন ব্যবস্থাকে নানাদিক হতে হেয় প্রতিপন্ন করে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। আর ঠিক সময়েই বৈপ্লবিক অবস্থাকে বিস্ফোরিত করল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া অবস্থা।

Q. 3. Analyse the socio-economic causes of the French Revolution.

Ans. 6 নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক পরিচ্ছেদগুলি দেখ।

Q. 4. 'The flow of ideas which directed France towards Revolution was composed of two streams'. Discuss

Ans. ইংল্যাণ্ডের ১৬৮৮ খৃঃ-এর গৌরবময় বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ফরাসী বিপ্লবের সহায়ক হয়েছিল। ১৬৮৮ খৃঃ-এর গৌরবময় বিপ্লবে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের জয় সূচিত হয়। এই বিপ্লবের ফলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। এই বিপ্লব নিঃসন্দেহে ফরাসী জনসাধারণকে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র লোপ করবার প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করে। আমরা জানি শুরুতে ফরাসী বিপ্লবের রূপ প্রজাতান্ত্রিক ছিল না। ইংরেজদের ন্যায় তারাও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চালু করবার জন্য তৎপর হয়। ১৭৯১-এর সংবিধানে এটি রূপ পরিগ্রহ করে। তাছাড়া সতেরো শতকের ইংরেজ

দার্শনিক জন লকের (Locke)-এর 'জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব' মতবাদ ফরাসী দার্শনিকদের প্রভাবিত করে।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামও ফরাসী জনসাধারণকে বিপ্লবমুখী করে তোলে। যে সব ফরাসী যুবক ঔপনিবেশিকদের পক্ষে স্বাধীনতা সমরে যোগ দেয় তারা আমেরিকা হতে এই শিক্ষালাভ করে যে প্রজাদের কল্যাণের জন্য প্রজারাই দেশ শাসন করবার মালিক এবং প্রয়োজন হলে বিপ্লব ন্যায্য। ফ্রান্সে ফিরে এসে তাবা স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে লাগল।

এছাড়া আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেওরায় ফ্রান্সের রাজকোষ নিঃশেষিত হল; ফ্রান্সে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল এবং এই বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য নিরুপায় ষোড়শ লুই স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকলেন। এই স্টেটস জেনারেলের অধিবেশনকে কেন্দ্র করেই ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হল।

Q. 5. 'It was hope which made the Revolution'. Discuss.

Ans. 6 নং প্রশ্নের সামাজিক কারণ দেখ।

Q. 6. Why did constitutional mornarchy fail in France ?

Ans. ১৭৮৯ খৃঃ-এ ফ্রান্সের অধিকাংশ লোকই বিপ্লব চায়নি তারা স্বৈরতন্ত্রের বদলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে যেসব ঘটনা ঘটতে থাকল, তার ফলে ফ্রান্স হতে রাজতন্ত্র সাময়িকভাবে লোপ পেল। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের কারণ হিসেবে বলা যায় যে প্রথমত, দেশত্যাগীদের বিপ্লব বিরোধী কার্যকলাপ এবং তাদের এসবের পিছনে রাজার হাত ছিল বলে জনসাধারণ সন্দেহ করতে লাগল। দ্বিতীয়তঃ, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড প্যাডুয়া নামক জায়গা হতে এক ঘোষণা জারি করলেন। এই ঘোষণা পত্রে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের এই বলে অনুরোধ করলেন যে তাঁরা যেন লুই-এর সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা বলে মনে করেন। প্রাশিয়ার রাজা এই ডাকে সাড়া দিলেন এবং লিওপোল্ড-এর সাথে পিল্‌নিজ নামক স্থানে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। বৈঠক শেষে উভয়ে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করলেন। এটিকে পিল্‌নিজের ঘোষণা বলা হয়। এতে বলা হয় যে লুই-এর বিপদ ইউরোপীয় রাজাদের বিপদস্বরূপ। ইউরোপীয় রাজাদের সাহায্য পেলেই অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ফরাসী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। তৃতীয়তঃ, ফরাসী সংবাদপত্রগুলি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বিষোদ্গার করতে শুরু করে। প্যারিসের সর্বহারাদের ঔদ্ধত্য দিন দিন বাড়তে থাকে। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ষোড়শ লুই থাকতে চাইলেন না। তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ গোপনে ফ্রান্স হতে পালাতে

চেষ্টা করেন কিন্তু ধরা পড়েন। এর ফল রাজতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক হল এবং প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারা শক্তিসঞ্চয় করল। চতুর্থতঃ লুই আইনসভা কর্তৃক গৃহীত ধর্মযাজক ও 'ইমিগ্রা'দের বিরুদ্ধে দুটি আইন ভিটো করেন, ফলে প্যারিসে এক প্রচণ্ড গণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। জেকোবিন দলের রাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচার জনতাকে মারমুখী করল। লুই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আইনসভাগৃহে আশ্রয় নিলেন। পঞ্চমতঃ, এরূপ অবস্থার ভেতর অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার সৈনাধ্যক্ষ ডিউক অব ব্রান্সউইক এক ঘোষণা জারি করলেন যে প্যারিসবাসী যদি রাজপরিবারেব কোন ক্ষতি সাধন করে তবে তিনি সমুচিত শাস্তির বিধান করবেন। এই ঘোষণা প্যারিসের জনসাধারণকে আরও উত্তেজিত করল। রাজতন্ত্রের অবসান চাইল এবং আইনসভা আক্রমণ করে সদস্যদের রাজতন্ত্র বাতিল করতে বাধ্য করল। পরিশেষে বলা যায় যে ষোড়শ লুই-এর দুর্বলতা ও অদূরদর্শিতা রাজতন্ত্রের পতন ঘনিয়ে আনে। বিপ্লবের প্রথম হতেই তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা ধরা পড়ে—প্রথমে যে কোন প্রস্তাব নাকচ করতেন কিন্তু পরে জনতার চাপে স্বীকার করতে বাধ্য হতেন।

Q. 7. The Republic in France in 1792 was the result of two factors—the Austro-Prussian Invasion and the Parisian Jacobinism.

Ans. আগের প্রশ্নের উত্তর দেখ।

Q. 8. Assess the achievements of Revolutionary France from 1789 to 1793.

Ans. ১৭৮৯-১৭৯৩—এই বছর ক'টির গুরুত্ব বহু কারণে স্মরণীয়—সামন্ততান্ত্রিক ফ্রান্সের রূপান্তর—রাজতান্ত্রিক ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ—স্টেটস জেনারেল-এ থার্ড স্টেটের জয়লাভ—আইনসভা ও তার কার্যাবলী—সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ—মানবাধিকারের সনদ—নতুন সংবিধান—যাজকদের আইন—বৈদেশিক আক্রমণ—প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

Q. 9. Trace the rise and fall of Jacobinism in France.

Ans. ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে জ্যাকোবিন দলের উত্থান ও পতন এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জ্যাকোবিন দল নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য সচেষ্ট ছিল। এই দল প্রজাতন্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। এই দলের বৈশিষ্ট্য-

গুলির মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি, প্রগাঢ় দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবাদ এবং অনলস পরিশ্রমক্ষমতা উল্লেখ করা যেতে পারে। রুশোর রাজনৈতিক আদর্শকে এই দল পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করার চেষ্টা করে। জনসাধারণের সার্বভৌম ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই দল নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালায়। যদিও এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল কিন্তু তবুও ভবিষ্যৎ ফ্রান্সে এবং সমগ্র ইউরোপে মেহনতী জনতা তাদের জন্মগত অধিকারগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উৎসাহ পেয়েছিল এই দলের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি হতে। উনিশ শতকে জ্যাকোবিনিজম প্রতিক্রিয়াশীলদের নিকট ভীতিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ এই শতাব্দীতে এটি একটি স্থায়ী এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

Society of the Friends of the Constitution হতে জ্যাকোবিন দলের উৎপত্তি। মিরাবো, লাফায়েৎ, সিয়েস প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতারা প্রথম দিকে এই ক্লাবের নেতা ছিলেন। এই দলটিকে প্রকৃত বামপন্থী দল বলা যায় না। বরঞ্চ এর প্রতিদ্বন্দ্বী দল Cordelier ছিল বেশি বামপন্থী। কিন্তু বিপ্লব যখন রক্তাক্ত পথ গ্রহণ করল তখন এই দলও এর আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন নিয়ে এল। বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে এই দলের নেতারা জাতীয় সভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে এই দল বিপ্লবের সাথে তাল রেখে চলতে শুরু করল এবং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এই দলের স্বৈরাচারী শাসন দেখা দিল সন্ত্রাস রাজত্বের মাধ্যমে। নরমপন্থীদের পরাজিত করে উগ্রপন্থী রোবসপিয়র তাঁর একক-শাসন স্থায়িভাবে স্থাপন করতে চেষ্টা করার ফলে এই দলের পতন ঘটে।

জ্যাকোবিন দলের ক্ষমতা প্রাপ্তির কারণ তৎকালীন ফরাসী দেশে রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে নিহিত ছিল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার ফ্রান্স আক্রমণ এক নিদারুণ সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সমস্যা আরও তীব্র হয় রাজা রানী ও অভিজাতদের ষড়যন্ত্রের ফলে। নতুন আইনসভার সদস্যরা অনভিজ্ঞ ছিলেন বলে এই জাতীয় সঙ্কট হতে ফ্রান্সকে রক্ষা করবার জন্য সুব্যবস্থা নিতে পারলেন না। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা উগ্রপন্থীদের হাতে চলে গেল। এই নেতারা প্যারিসের জনতাকে হাত করে বিপ্লবকে বিপথগামী করলেন। অন্যদিকে আইনসভার জ্যাকোবিন সদস্যরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদের চেষ্টা চালালেন এবং তাঁরাই অবশেষে জয়যুক্ত হলেন। আইনসভা বাধ্য হয়ে রাজতন্ত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করল। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সে জনমত তৈরী করা। প্রথমেই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা হল। ষোড়শ লুই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। এজন্য অবশ্য জ্যাকোবিন দলই

বিশেষভাবে দায়ী। জাতীয় কনভেনশনে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ছিল গিরণ্ডিন ও জ্যাকোবিন। জ্যাকোবিন দলের সাথে গিরণ্ডিস্ট দলের শাসনতন্ত্র নিয়ে কলহ দেখা দিল। শেষোক্ত দলটি চাইল ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্ত শাসন ক্ষমতা বাড়ানো। জ্যাকোবিন দল এর বিরোধী ছিল এবং প্যারিসের উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করল এবং সহজেই গিরণ্ডিস্ট দলকে ক্ষমতার আসন হতে সরিয়ে প্রাধান্য স্থাপন করল। গিরণ্ডিস্ট দলের পতনের ফলে ফ্রান্সে জ্যাকোবিন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং ম্যারাট, দাঁতো ও রোবসপিয়রের নেতৃত্বে ফ্রান্সে ভয়াবহ সন্ত্রাস রাজত্ব শুরু হল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে জ্যাকোবিন দলের মধ্যে ঘরোয়া বিরোধ দেখা দিল। বিদেশী শত্রুদের পরাজয় ও আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীদের ধ্বংস করার ফলে এই বিরোধ তীব্র হল। সন্ত্রাস রাজত্বের তিনজন নেতাকে ঘিরে তিনটি উপদল দেখা দিল। রোবসপিয়র, হির্বার্ট ও দাঁতো। এই তিনজন ছিলেন তিনটি উপদলের নেতা। রোবসপিয়র অন্য দুজনকে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ হতে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলেন। প্রথমে তিনি হির্বার্ট ও তাঁর উপদলকে দাঁতোর সাহায্যে ধ্বংস করলেন। পরে দাঁতো ও তাঁর উপদল তাঁর হাত হতে রেহাই পেল না। দাঁতো জ্যাকোবিন দলের মধ্যে নরমপন্থী ছিলেন। তিনি দেশের সঙ্কটাবস্থা দূর হয়েছে বলে সন্ত্রাস শাসনের অবসান চাইলেন। রোবসপিয়র ও তাঁর দল এটি চাইছিল না বলে দাঁতো ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দেশদ্রোহী বলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। দাঁতোর প্রাণদণ্ডের ফলে রোবসপিয়র ফ্রান্সের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা হলেন। তিনি কিন্তু বেশিদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারলেন না। জনসাধারণ সন্ত্রাস শাসন আর সমর্থন করল না। ফলে রোবসপিয়রের ও তাঁর অনুচরদের গিলোটিনে প্রাণ দিতে হল। রোবসপিয়রের মৃত্যুর সাথে সাথে উগ্রপন্থী জ্যাকোবিনদের ক্ষমতা চলে গেল এবং কিছুদিনের মধ্যেই জ্যাকোবিন দল রাজনীতি হতে সরে পড়তে বাধ্য হল। জ্যাকোবিন দল রাজনীতি হতে অপসারিত হলেও এর আদর্শ-গণমানসে চিরস্থায়ী আসন লাভ করল।

Q. 10. To what extent did the policy of Napoleon coincide with the purpose of the French Revolution ?

Ans. [নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লব—বিপ্লবের মধ্যেই তাঁর অভ্যুত্থান—শাসন-সংস্কারের বিপ্লবী চরিত্র—তাঁর শাসন-সংস্কার—বিপ্লবের চিরস্থায়ী ফল—ইউরোপে বিপ্লবের অগ্রদূত—সমালোচনা—নেপোলিয়নের বিপ্লব-বিরোধী চরিত্র]।

Q. 11. Describe Napoleon as a conqueror upto Austerlitz.

Ans. [সেনাপতি হিসেবে—সামরিক কৃতিত্বের সূত্রপাত—ক্রমোন্নতি—ডাইরেক্টরী শাসনকালে তাঁর সামরিক কৃতিত্ব—ইটালী অভিযান—অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ—মিশর অভিযান—প্রত্যাবর্তন—প্রথম কনসাল হিসেবে—দ্বিতীয় কোয়ালিশন—রাশিয়ার পশ্চাদপসরণ—ম্যারেঙ্গার জয় ও লুনেভিলের যুদ্ধ ও সন্ধি—আমিয়েন্স-এর সন্ধি—ইংল্যাণ্ডের সাথে যুদ্ধ—তৃতীয় কোয়ালিশন—আলম-এর যুদ্ধ—অস্টারলিজের যুদ্ধ]

Q. 12. What were the lasting contributions of Napoleon to France and to Europe.

Ans. [নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লব—ফ্রান্সে শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন—আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন—কোড নেপোলিয়ন ও কনকডাট—নেপোলিয়নের সামরিক বিজয়ের দ্বারা ইউরোপের পরিবর্তন—ইউরোপের রূপান্তর—জার্মানী ও ইটালীতে পরিবর্তন—নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য—ফরাসী বিপ্লবের ইউরোপীয় পর্ব—বিপ্লবী ভাবধারার প্রসার—বিভিন্ন দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন—জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়]

Q. 13. 'Two nations did most to overthrow Napoleon—England and Russia.' Explain.

Ans. পতনের জন্য বিভিন্ন কারণ—তাঁর শত্রুদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার স্থান—**ইংল্যাণ্ডের কৃতিত্ব**—বিভিন্ন রাষ্ট্রজোট গঠনে নেতৃত্ব—একাকী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—বিভিন্ন নৌযুদ্ধে পরাজিত করা—কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেম ব্যর্থ করা—পেনিনসুলার যুদ্ধে স্পেনকে সাহায্য—ওয়াটারলু যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতির নিকট নেপোলিয়নের চরম পরাজয়।

রাশিয়ার কৃতিত্ব—জার আলেকজাণ্ডারের সাথে মতবিরোধ এবং মস্কো অভিযান নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে টিলসিটে জার আলেকজাণ্ডার এবং নেপোলিয়নের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল তা নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই নেপোলিয়নের সাথে জারের নানা কারণে মতবিরোধ দেখা দিল। জার নেপোলিয়নের নিকট হতে যেরূপ সাহায্য আশা করছিলেন তা পেলেন না, বরঞ্চ ফ্রান্সের সুবিধার জন্য তাঁকে ও তাঁর প্রজাবর্গকে নানারূপ কষ্টস্বীকার করতে হল। কণ্টিনেণ্টাল সিস্টেমের ফলে জার

নেপোলিয়নের সাথে বন্ধুত্বের অবসান ঘটালেন। জারকে শাস্তি দেবার জন্য ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন তাঁর সর্বনাশা রাশিয়া অভিযান শুরু করলেন। কিন্তু রাশিয়ায় তাঁর চরম পরাজয় ঘটল। তাঁর সৈন্যদল বিনষ্ট হল। তাঁর ছয় লক্ষের বিরাট বাহিনীর মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে। এই পরাজয়ের ফলে একদিকে যেমন তাঁর সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটল, অন্যদিকে অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড বিদ্রোহ করল। সুইডেনও এতে যোগ দিল। ইংল্যাণ্ডের সাথে যুদ্ধ আগে হতেই চলছিল। সম্মিলিত শক্তির নিকট নেপোলিয়ন পরাজিত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন।

Q. 14. Assess the importance of the part played by the British Navy in the wars against Napoleon.

Ans. [ইংল্যাণ্ড প্রধান শত্রু—নেপোলিয়নের শাসন শুরু হতে তাঁর চরম পরাজয়ের দিন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের শত্রুতা—ইংল্যাণ্ডকে নেপোলিয়ন পরাজিত করতে পারেন নি—ইংল্যাণ্ডের অপরাজিত থাকার মূলে তার নৌশক্তি—ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তিই তাঁর প্রাচ্য অভিযান ও পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়—তাঁর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যও বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির জন্য—নেপোলিয়নের সরাসরি ইংল্যাণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির জন্য এবং ট্রাফালগারের যুদ্ধের ফলে—তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা কার্যকরী হল না ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির জন্য—স্পেনবাসীদের ইংল্যাণ্ড সাহায্য করতে পারল তার নৌশক্তির জন্য।

একাদশ অধ্যায়

ভিয়েনা সম্মেলন, পবিত্র চুক্তি, কনসার্ট অব ইউরোপ

সূচনা : ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ইউরোপকে যেমন কেবলমাত্র ভৌগোলিক সংজ্ঞা বলা যায় না, তেমনি এক ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতিপরায়ণ সুসভ্য জনসাধারণ নিয়ে গঠিত একটি মহাদেশও বলা যায় না। ১৮১৫-র ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী দুটি শক্তির মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চলছিল —একটি শক্তি হল ঐতিহ্যধর্মী, অন্যটি হল পরিবর্তন-প্রয়াসী। রাজতন্ত্র, চার্চ, জমিদার শ্রেণী এবং জনসাধারণের শান্তি অক্ষুন্ন রাখবার উদগ্র কামনা ছিল ঐতিহ্যধর্মীদের। প্রায় ২৫ বছর অবিরাম বিপ্লব ও যুদ্ধের মধ্যে কালাতিপাত করে জনসাধারণ যে কোন মূল্যে শান্তি কামনা করল এবং তাদের এই শান্তি কামনাকে কাজে লাগাল প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবর্গ। পরিবর্তনধর্মী শক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল অস্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং শহর ভিত্তিক সভ্যতা, জাতীয়তাবাদ, উদারনৈতিকতাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। এ দুটি শক্তির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম চলেছিল এবং পরিশেষে পরিবর্তনধর্মী শক্তিরই জয় হয়।

Q. 1. Describe the settlement of Vienna (1815) *Or*, Give a critical estimate of the work of the Congress of Vienna ; *Or*, The foundations of European States system of the 19th century was laid at Vienna in 1815.

Ans. ভিয়েনা সম্মেলন : নেপোলিয়ন তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা ইউরোপে এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করেন, ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তন এনেছিলেন, নতুন নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পতনের পর ইউরোপে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয় এবং তার সমাধানের জন্য সমবেত চেষ্টা করা হয়। ভিয়েনা সম্মেলন এই সমবেত চেষ্টাকে রূপদান করে।

ভিয়েনা সম্মেলন একটি সাধারণ সম্মেলন বা সভা ছিল না। সরকারীভাবে এর কোন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেননি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্থাপিত অনেকগুলি

সন্ধি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত ও পুনরনুমোদিত হয় এবং এটাই ভিয়েনার শান্তি ব্যবস্থা বলে পরিচিত।

ভিয়েনা সম্মেলন চারটি পরস্পর সংযুক্ত ব্যবস্থায় ইউরোপের মানচিত্র পুনর্গঠিত করতে চাইল। শাউমণ্ট-এর সন্ধিতে ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং প্রাশিয়া নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপের মানচিত্র পুনর্গঠন করবার জন্যে একজোট হয়েছিল। তারা এই চুক্তির দ্বারা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ছকে নিল। প্রথমতঃ, নেপোলিয়নকে পরাজিত করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর অন্তত ২০ বৎসর তারা একজোটে ইউরোপে শান্তি বজায় রাখবে এবং নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা রাষ্ট্রচতুষ্টয় টিকিয়ে রাখবে। তৃতীয়তঃ, তারা ঠিক করল ফ্রান্সে পুনরায় বুরবোঁ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের এলবা দ্বীপে অন্তরীণ হবার পর এই চারটি শক্তি প্যারিসের প্রথম চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্সকে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের সীমানায় ফিরে যাবার কথা বলা হয়। ফলে বেলজিয়াম ও রাইন নদীর পশ্চিম তীর ফ্রান্সের অধিকারমুক্ত হল। নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপ হতে ফিরে এসে যখন পুনরায় যুদ্ধ শুরু করলেন এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হলেন তখন এই চারটি শক্তি প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি স্বাক্ষরিত করে। এই সন্ধিতে ফ্রান্সকে বিশেষভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। তাকে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের সীমানায় যেতে বাধ্য করা হল।

সম্মেলনের ভিত্তি

নেপোলিয়নকে যে সব রাষ্ট্র পরাজিত করেছিল সেই রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা ভিয়েনা শহরে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। তুর্কী সাম্রাজ্য ছাড়া আর সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে যোগ দেন। ফ্রান্সের প্রতিনিধিও এখানে স্থান পান। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস এই বৈঠকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভিয়েনা শহরে আনন্দের স্রোত বয়ে চলল। উৎসব, নাচগান, ভোজসভায় ভিয়েনানগরী মুখর হল। এর মধ্যেই চলল ইউরোপ পুনর্গঠনের চেষ্টা। অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন। বহু সংখ্যক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেও কার্যকালে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিনিধিরাই যা ঠিক করলেন তা-ই গৃহীত হল।

১৮১৫-এ ইউরোপের ভাগ্য পরিচালকরা

নেপোলিয়ন ইউরোপের প্রচলিত মানচিত্রে সাংঘাতিকভাবে পরিবর্তন এনেছিলেন। সুতরাং ইউরোপের মানচিত্রকে পুনর্গঠিত করা এবং বিভিন্ন স্থানের

রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাক-বিপ্লব অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ভিয়েনা সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য হল। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের আবির্ভাব ইউরোপের প্রাচীন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছিল। এটির পুনর্বিন্যাস করা স্বভাবতঃই এক কঠিন সমস্যা ছিল। ভিয়েনা সম্মেলনের যোগদানকারী রাজনীতিবিদরা নেপোলিয়ন-সৃষ্ট মানচিত্রের পরিবর্তন সাধন করে উনিশ শতকের ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

ইউরোপের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা

ভিয়েনা বৈঠকের সমস্যা : ভিয়েনা সম্মেলন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমতঃ ইউরোপকে পুনর্গঠন করার সমস্যা, দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যৎ ফরাসী ভীতি হতে ইউরোপকে রক্ষা করা; তৃতীয়ত, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ভবিষ্যতে লাভালাভের প্রশ্নে যে সব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলি মেনে চলা; চতুর্থত, পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। পঞ্চমত, জার্মানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। সবশেষে ছিল ক্ষতিপুরণ ও শক্তিসাম্য রক্ষা করার সমস্যা। পোল্যাণ্ড ও স্যাক্সনির ভবিষ্যৎ নিয়ে রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে এরূপ মতবিরোধ দেখা দিল যার ফলে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হল। এমনকি অষ্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মনস্থ করে। এই তিন রাষ্ট্রের ভাবগতিক দেখে রাশিয়া পোল্যাণ্ডের ওপর তার দাবির কিছুটা কমাল, অনুরূপভাবে প্রাশিয়াও স্যাক্সনির ওপর তার দাবী কমাতে বাধ্য হল।

এলবা দ্বীপ হতে নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় যুদ্ধ শুরু হওয়ায় ভিয়েনা সম্মেলনের কাজে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটাল। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর পুনরায় ভিয়েনা সম্মেলনের কাজ শুরু হল এবং ৮ই জুন (১৮১৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ভিয়েনা সন্ধিতে স্বাক্ষর করল।

ভিয়েনা সন্ধির শর্তাবলী :

(ক) **অস্ট্রিয়া** এই সন্ধির ফলে ইটালীতে লম্বাডি ও ভেনেসিয়া পেল। তাছাড়া ফরাসী অধিকৃত ইলিরিয়া ও ডালমেশিয়া, বেভেরিয়ার নিকট হতে স্যালজবুর্গ ও টাইরল এবং গ্যালিসিয়া প্রভৃতি রাজ্যাংশ অষ্ট্রিয়ার ভাগে পড়ল।

(খ) **প্রাশিয়া** পশ্চিম পমারেনিয়া, পোল্যাণ্ডের পোজেন, ডানজিগ, স্যাক্সনির উত্তরাংশ এবং রাইন অঞ্চলের প্রদেশগুলি লাভ করল।

(গ) অরেঞ্জ বংশীয় রাজার শাসনাধীনে পূর্বেকার প্রজাতান্ত্রিক **হল্যাণ্ড** ও

বেলজিয়ামকে একত্রিত করে নেদারল্যাণ্ড রাজ্য গঠন করা হল। এই রাজ্য সিংহল ও উত্তমাশা আন্তরীপ বাদে পূর্বেকার ডাচ উপনিবেশগুলি ফিরে পেল।

(ঘ) **জার্মানীতে** নেপোলিয়ন যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তার পরিবর্তন করা হল। জার্মানীতে বহু আলোচনার পর ৩৯টি স্বাধীন রাজ্য নিয়ে (৪টি স্বাধীন শহরসহ) একটি অসংবদ্ধ যৌথরাজ্য গঠন করা হল। এই যৌথরাজ্যে অষ্ট্রিয়ার ক্ষমতা স্বীকৃত হল। অবশ্য এই কনফেডারেশনে Diet নামে একটি প্রতিনিধি সভার সৃষ্টি করল। এই Diet জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধির বদলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মনোনীত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হল।

(ঙ) নেপোলিয়ন সৃষ্ট গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারস নিয়ে **পোল্যাণ্ড** রাজ্য গঠিত হল। এবং এই রাজ্যটি রাশিয়ানদের হাতে তুলে দেওয়া হল। রাশিয়ার জার এই রাজ্যটির রাজা হলেন। জার আলেকজাণ্ডার অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দেন। তিনি এক সংবিধান মারফৎ পোল্যাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসনের পূর্ণ অধিকার দিলেন। পোলিশ ভাষাই এই রাজ্যের সরকারী ভাষা বলে গণ্য হল এবং পোল্যাণ্ডের নিজস্ব প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিবর্তন আনা হল না। এমনকি পোল্যাণ্ড রাজ্য নিজস্ব এক সৈন্যবাহিনীও গঠন করবার অনুমতি পেল।

ক্রাকো একটি স্বাধীন নগরে পরিণত হল। অবশ্য অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া এটিকে রক্ষা করবে বলে প্রতিশ্রুত ছিল।

পোল্যাণ্ড রাজ্য ছাড়া **রাশিয়া** ফিনল্যাণ্ড ও তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ছোট ছোট স্থান লাভ করল।

ইংল্যাণ্ড মাল্টা, হেলিগোল্যাণ্ড, কেপকলোনী, সিংহল ও আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ লাভ করল। ইংল্যাণ্ড প্রধানতঃ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল, সেকারণে সে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য পেয়ে সন্তুষ্ট হল।

সুইডেন নরওয়ে পেল। অবশ্য নরওয়ের জন্য পৃথক সংবিধান সুইডেনকে মেনে নিতে হল। **ডেনমার্ককে** লুয়েকবার্গ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

২২টি ক্যাণ্টন নিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে একটি স্বাধীন কনফেডারেশন গঠিত হল। জেনেভা, ওয়ালিস ও নিউস্যাটেল এই কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হল। স্পেন, সার্ডিনিয়া, টাসকেনি, মডেনা এবং পোপের রাজ্যে প্রাক-বিপ্লব যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পুনঃস্থাপিত হল। নেপলস-এ বুরবোঁ বংশীয় রাজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন।

ইটালী পুনরায় বহুরাজ্যে বিভক্ত হয়ে ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত হল। স্যাভয়, পীডমণ্ট ও জেনোয়া ভিক্টর ইমানুয়েলকে, টাসকোনি ও মডেনা হাপসবার্গ

ইউরোপ-১৮১৫
(ভিয়েনার বন্দোবস্ত অনুসারে)
আটলাণ্টিক মহাসাগর
গ্রেটব্রিটেন
রাশিয়া
জার্মানি
ফ্রান্স
অস্ট্রিয়া
হাঙ্গেরী
কৃষ্ণসাগর
অটোমান সাম্রাজ্য
পারস্য
স্পেন
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
জিব্রালটার
আইওনিয়ান
ভূমধ্যসাগর
আফ্রিকা
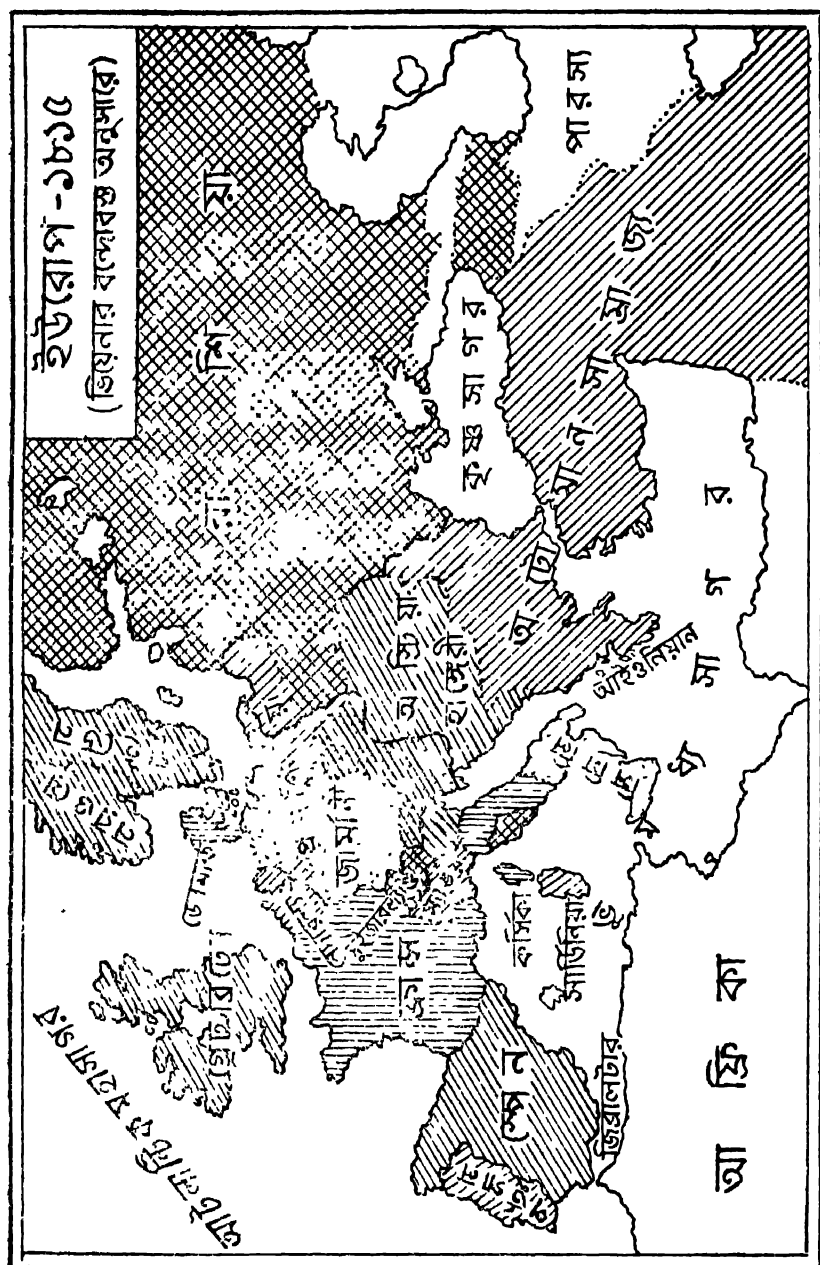
বংশোদ্ভূত যুবরাজকে এবং নেপলস ও সিসিলি পূর্বতন বুরবোঁ রাজাকে দেওয়া হল। এছাড়া পোপের রাজ্যে পোপের ক্ষমতা ফিরে এল।

মন্তব্য : ভিয়েনা সম্মেলন এইভাবে নেপোলিয়নোত্তর ইউরোপের রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস ঘটাল। এবং ইউরোপের এই পুনর্বিন্যাস পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর টিকে ছিল। ভিয়েনা সম্মেলন যে ভাবে ইউরোপের মানচিত্র অঙ্কিত করল সেই মানচিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। এদিক হতে দেখলে ভিয়েনা সম্মেলন উনিশ শতকের ইউরোপীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করে। ভিয়েনা ব্যবস্থাকে নানাদিক হতে সমালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই ব্যবস্থাকে বেশ সুচিন্তিত ও রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক বলা যেতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে প্রায় ৪০ বছর ইউরোপে শান্তি বজায় থাকে। আর এই শান্তিই তখন ইউরোপের প্রয়োজন এবং ইউরোপীয়দের কাম্য ছিল।

Q. 2 'Three chief principles moulded the Vienna Settlement'—Explain. Or, Briefly describe the principles underlying European Settlement of the Congress of Vienna 1815.

Ans : ভিয়েনা সম্মেলন আন্তর্জাতিক সমাবেশ হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সম্মেলনের মাধ্যমে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির যৌথ প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা চলে। আর এই প্রচেষ্টা হল নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের পুনর্গঠন ও স্থায়ী শান্তি রক্ষা করার জন্য।

ভূমিকা

আমাদের যুগে জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষা করবার যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে উনিশ শতকের প্রথম পাদে ভিয়েনা সম্মেলনে তার সূত্রপাত হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে বলতে গেলে ভিয়েনা সম্মেলন-কৃত ব্যবস্থা থেকেই ইউরোপে উনিশ শতকের পদক্ষেপ শুরু হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনে ইউরোপের তৎকালীন নামকরা রাজনীতিবিদ্‌রা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁরা যা ঘোষণা করেছিলেন তা মহান আদর্শের দ্বারা সিঞ্চিত ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাত্র, স্থায়ী শান্তিরক্ষায় যৌথ প্রচেষ্টা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতি প্রভৃতি সম্মেলনের ঘোষিত নীতির মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু সম্মেলন-কৃত ভিয়েনা ব্যবস্থাটি পর্যালোচনা করলে এই বহু-ঘোষিত নীতিগুলির কার্যকারিতা প্রমাণ করে না। এই ব্যবস্থায় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দের জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং বিপ্লব-বিরোধী

মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। ঘোষিত নীতি ও কার্যের অসামঞ্জস্য ভিয়েনা সম্মেলনের একটি বিশেষ দিক।

বিভিন্ন সমস্যা: ভিয়েনা সম্মেলনের প্রধান সমস্যা ছিল ইউরোপের পুনর্গঠন। এর সাথে বহু জটিল প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল। যে ফ্রান্স ইউরোপীয় সমস্যা সৃষ্টি করেছিল তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, জার্মানী ও পোলাণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা, স্যাক্সনি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং পূর্বাপর বিভিন্ন সন্ধিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্মেলনের হাজার রকমের সমস্যার মধ্যে প্রধান ছিল। এগুলির মধ্যে একবার পোলাণ্ড ও স্যাক্সনির সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে, কারণ বিজয়ী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এ দুটির ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিল। রাশিয়া ও প্রাশিয়া একজোটে ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াল। ফ্রান্সকে দলে টেনে ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া অবশ্য এ দু'টি সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়।

এই সমস্যাগুলি দেখা দেবার কারণ হল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ছিল। তাদের মধ্যে যে ঐক্যবোধ দেখা দিয়েছিল সেটা খুবই সাময়িক ছিল। এবং এই ঐক্যবোধের কারণ ছিল নেপোলিয়ন-ভীতি। নেপোলিয়নের পরাজয়ের সাথে সাথে এই ভীতি যখন চলে গেল তখন স্বভাবতঃই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হল, সামগ্রিক ইউরোপীয় বা সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করল না। এত জটিলতা থাকা সত্ত্বেও আলোচনার মাধ্যমে বহু সমস্যার সমাধান হল এবং সম্মেলনের ফলে এক স্থায়ী ব্যবস্থায় সকলে সম্মতি দিল।

মূলগত নীতি: উপরিউক্ত সমস্যাগুলি সাধনের জন্য ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করলেন, যথা—(ক) আইনগত উত্তরাধিকার নীতি (legitimacy), (খ) শক্তিসাম্য নীতি (balance of power), (গ) পুরস্কার দানের নীতি (reward) এবং স্থিতাবস্থা নীতি (status-quo)। সম্মেলনের নেতৃবর্গ ঘোষণা করলেন যে উপযুক্ত শক্তি বণ্টনের ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া আরও ঘোষণা করলেন যে ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠন তাঁরা করতে চান। কিন্তু তাঁরা গালভরা আদর্শের কথা উল্লেখ করলেও আসলে পরাজিত রাষ্ট্রগুলির সম্পত্তি কুক্ষিগত করাই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।

তিনটি নীতি

শক্তিসাম্য নীতির প্রয়োগ: শক্তিসাম্য নীতি প্রয়োগ করবার সময়

সর্বাগ্রে এল ফ্রান্সের কথা। নতুন ফরাসী রাজ্য গঠিত হল ১৭৯০-এর সীমা রেখাকে ভিত্তি করে। এই নতুন ফ্রান্স ভবিষ্যতে যাতে আর শান্তির বিঘ্নস্বরূপ না হতে পারে তার জন্য প্রথমত এর সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলি পাঁচ বছরের জন্য বিজয়ী বাহিনীর দখলে থাকবে বলে স্থির করা হল। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হল। তৃতীয়ত, ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী দেশগুলিকে শক্তিশালী করা হল। উত্তর সীমান্তে হল্যাণ্ডকে শক্তিশালী করার জন্য অস্ট্রিয়ার নিকট হতে বেলজিয়ামকে নিয়ে হল্যাণ্ডের সাথে জুড়ে দেওয়া হল। পূর্বসীমান্তে প্রাশিয়াকে রাইন অঞ্চল দেওয়া হল। জার্মানীতে একটি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করা হল। জার্মানীতে স্বাধীন রষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৯টি। এই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হল অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া হল সহ-সভাপতি। আলপাইন অঞ্চলে পিডমণ্টকে শক্তিশালী করার জন্য এর সাথে জেনোয়াকে জুড়ে দেওয়া হল এবং ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য স্থাপন করা হল। এছাড়া যাতে কোন একটি রাষ্ট্র বিশেষ শক্তিশালী না হতে পারে ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল।

সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

আইনগত উত্তরাধিকারের নীতির প্রয়োগ: আইনগত উত্তরাধিকারের নীতি অনুসারে ফ্রান্স, স্পেন ও দুই সিসিলি রাজ্যে বুরবোঁরা সিংহাসন ফিরে পেল। হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ বংশ, সার্ডিনিয়া ও পিডমণ্টে স্যাভয় বংশ তাদের অধিকার ফিরে পেল। ইটালীতে পোপ তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। রাইন অঞ্চলের বিতাড়িত জার্মান রাজারা নিজ নিজ রাজ্য ফিরে পেল। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই নীতির প্রয়োগ করা হল না। ইংল্যাণ্ড যুদ্ধের সময় ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও স্পেনের যে সব উপনিবেশ দখল করেছিল সেগুলি আর ওই সমস্ত দেশকে ফিরিয়ে দেওয়া হল না। তেমনি ভেনিস ও জেনোয়ার প্রজাতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথাই উঠল না। এই নীতি প্রয়োগের দ্বারা ইউরোপে প্রাক্ বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশে বিপ্লব-পূর্ব যুগের রাজবংশকে পুনঃস্থাপন করা হল। এই নীতি গৃহীত হবার ফলে ইউরোপে রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থীদের জয় সূচনা করল।

পুরাতন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগ: বিজয়ীদের ক্ষতিপূরণ করবার উদ্দেশ্যে প্রাশিয়াকে পোমেরানিয়া, স্যাক্সনীর দুই তৃতীয়াংশ, ওয়েস্টফেলিয়া এবং প্রায় সমগ্র রাইন অঞ্চল পোসেন, থর্ন এবং ড্যানজিগ দেওয়া হল। রাশিয়া পেল পোল্যাণ্ডের এক বিস্তীর্ণ

অংশ এবং সম্পূর্ণ ফিনল্যাণ্ড। অস্ট্রিয়া বেলজিয়াম ছেড়ে দিয়ে ইটালীতে লম্বার্ডি-ভেনেসিয়া নিল। এছাড়া টাইরল, সালসবার্গ প্রভৃতি অঞ্চলও অস্ট্রিয়ার হাতে গেল। এর ফলে আল্পস্ হতে এড্রিয়াটিক পর্যন্ত অস্ট্রিয়া রাজ্য বিস্তৃত হল। ইটালীর টাস্কানি, পার্মা, মডেনা প্রভৃতি রাজ্যগুলিতেও হ্যাপসবুর্গ বংশের অধিকার স্থাপন করা হল। সুইডেনকে নরওয়ে দেওয়া হল। ব্যাভেরিয়াকেও কয়েকটি অঞ্চল দেওয়া হল।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চালিয়েছিল বলে ইংল্যাণ্ড মাল্টা, মরিশাস, হেলিগোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু অংশ এবং সিংহল দ্বীপ পেল। নেপোলিয়নকে সাহায্য করার অপরাধের শাস্তি হিসেবে স্যাক্সনির কিছু অংশ কেড়ে নেওয়া হল। নেপোলিয়ন সৃষ্ট দুটি রাষ্ট্র Grand Duchy of Warsaw ও ওয়েস্টফেলিয়ার বিলোপ সাধন করা হল। ফ্রান্সকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া হল না। এর কারণ হল জার আলেকজাণ্ডারের অমত এবং কৌশলী ফরাসী কূটনীতিজ্ঞ ট্যালির্যাঁ-র তৎপরতা।

সমালোচনা: ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলীর বহু সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয় যে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ নিজেদের প্রস্তাবিত নীতিগুলিও ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করেননি। আইনগত উত্তরাধিকার নীতি জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত শাস্তিনীতি খামখেয়ালিমত প্রয়োগ করা হয়। ডেনমার্ককে শাস্তি দেওয়া হল কিন্তু ব্যাভেরিয়াকে দেওয়া হল না। তৃতীয়ত বৃহৎ রাজ্যগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেছিল। অস্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি নিন্দনীয়ভাবে প্রকাশ পায়। এবং ফলে ছোট ছোট রাষ্ট্রের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া হয়। নরওয়ে, বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড, পোমেরানিয়া স্যাক্সনী, পোল্যাণ্ড, লম্বার্ডি, ভেনেসিয়া প্রভৃতি রাজ্যগুলির স্বার্থ চিন্তা করাই হল না।

ভিয়েনা সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আলোচনা

চতুর্থত ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রনায়কগণ প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি নিয়ে ইউরোপের পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। তাঁরা সকলেই স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁদের স্বার্থান্বেষী মন সুষ্ঠুভাবে পুনর্গঠনের কাজে বাধাস্বরূপ হয়। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সম্মান তাঁরা রক্ষা করেননি। হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামের ভুক্তিকরণ কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নয়। এইজন্য পরবর্তীকালে বেলজিয়ামে বিদ্রোহ হয়েছিল; ইটালীর জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন।

ইটালীতে রাজনৈতিক ঐক্য না-আসা পর্যন্ত অশান্তি দূর হয় নি। এ কারণে অনেকে ভিয়েনা সম্মেলনকে 'জাতিদের নিলাম স্থান ও রাষ্ট্রনায়কদের তূর্যনাদ' বলেছেন।

শক্তিসাম্য ও আইনগত উত্তরাধিকার নীতি দুটি অনুসরণ করে ভিয়েনা সম্মেলন প্রাক-বিপ্লব যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করল এবং ইউরোপে আঠারো শতকের মৃতপ্রায় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করতে গিয়ে যুগধর্মকে অস্বীকার করল। আদর্শের দিক হতে ভিয়েনা সম্মেলন তথা ব্যবস্থা ফরাসী বিপ্লবের অবদানকে অস্বীকার করে। ফরাসী বিপ্লব ইউরোপীয় গণমানসে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে ভিয়েনা ব্যবস্থায় তার উপযুক্ত স্থান হল না। চিরাচরিত রাজনীতি ও চিন্তাধারায় অভ্যস্ত ইউরোপীয় কূটনীতিবিদ্‌রা নতুন যুগের পদধ্বনি শুনতে পেলেন না। এমনকি তাঁরা শিল্প বিপ্লব প্রসূত অবস্থার দিকেও নজর দেননি। ভিয়েনা ব্যবস্থার শর্তগুলিতে অর্থনৈতিক বিষয়ের নামগন্ধ নেই, কেবলমাত্র রাষ্ট্রসমূহের সীমানা সংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

প্রথমত, যে জাতীয়তাবাদের অবহেলা ভিয়েনা সম্মেলনের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান অভিযোগ ভিয়েনা সম্মেলনের সময় সেই জাতীয়তাবাদ ইউরোপের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়নি। ফরাসী বিপ্লব জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের উন্মেষে সাহায্য

পক্ষে

করেছিল কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র ছিল পরবর্তী যুগের ঘটনা। ভিয়েনা সম্মেলনের সময় এ দুটি শক্তির শৈশবকাল চলছিল। দ্বিতীয়ত, নেপোলিয়ন পরাজিত হয়েছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের অবদান ছিল না বললেই হয়। সুতরাং ভিয়েনা সম্মেলন জাতীয়তাবাদকে অগ্রাহ্য করেছিল, পদদলিত করেছিল বলা ঠিক নয়। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বা পশ্চাদ্‌ দৃষ্টির সাহায্যে কোন পূর্ব ঘটনাকে বিচার করা ঠিক নয়। তৃতীয়ত, ভিয়েনা ব্যবস্থার পক্ষে বলা যায় যে এই ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রায় ৫০ বছর ইউরোপীয় শান্তি বজায় রেখেছিল। এবং এই শান্তিই তখন ইউরোপের আর্থিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন এবং ইউরোপীয়দের কাম্য ছিল। কোন শান্তি চুক্তিই বহুদিন ধরে শান্তি রক্ষা করতে পারে না, অতএব পরিবর্তী কালের ঘটনা দেখে ভিয়েনা ব্যবস্থা সমালোচনা করা অন্যায়। চতুর্থত, পুরানো ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে কার্যতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয়নি। বিপ্লবের যুগে বা নেপোলিয়নের আমলে যে সব সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল ভিয়েনা সম্মেলন তাদের কয়েকটিকে স্বীকার করে নিয়েছিল। যেমন, রাশিয়াকে ইউরোপের অন্যতম

প্রধান শক্তি হিসেবে মেনে নেওয়া হল। পশ্চিম ইউরোপের ব্যাপারে রাশিয়ার আগ্রহ সম্বন্ধে অবহেলা করা হল না। নেপোলিয়ন পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন করেন, ভিয়েনা সম্মেলন সেটি মেনে নেয়। সুইডেনকে কেবলমাত্র স্কাণ্ডিনেভীয় শক্তি হিসেবে গণ্য করা হল কারণ সুইডেনের অন্তঃসারশূন্যতা সম্মেলন লক্ষ্য করেছিল। নেপোলিয়ন জার্মানীতে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনেন তা প্রায় রেখে দেওয়া হল। Confederation-এর সৃষ্টিতে এটি বোঝা যায়। সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপ্লবী পরিবর্তনকে কিছুটা স্বীকার করা হয়। যেমন দেশান্তরী অভিজাত শ্রেণী নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে সামন্তপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন করতে বা জমিসংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিবর্তন বা বাতিল করতে তাদের দেওয়া হল না। যে সব দেশে কোড নেপোলিয়ন চালু হয়েছিল সে সব দেশে তা টিকে রইল। কোড নেপোলিয়নে যে সামাজিক বা অর্থনৈতিক সাম্য মেনে নেওয়া হয়েছিল সেগুলি হতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হল না। পঞ্চমত, ভিয়েনা সম্মেলনকে কেবলমাত্র নিন্দা ও সমালোচনা করে এর অবদানকে অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ কয়েকটি বিষয়ে ভিয়েনা সম্মেলন তথা ব্যবস্থার সাফল্য সম্বন্ধে প্রশংসা না করে পারা যায় না। খুব কম সময়ের মধ্যে এই সম্মেলন বহু সমস্যার সমাধান করে। তৎকালীন অবস্থায় এছাড়া অপর কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। ষষ্ঠত, ভিয়েনা ব্যবস্থা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির যৌথ গ্যারান্টির আওতায় রাখা হয়, এবং এর ফলে 'জাতিসংঘ' ও জাতিপুঞ্জের অগ্রদূত 'ইউরোপীয় সংঘ' স্থাপিত হয়। সপ্তমত, এই ব্যবস্থার মধ্যে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার বীজ উপ্ত ছিল। জেনোয়া সার্ডিনিয়া-পিডমণ্ট রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হওয়ায় এটি ইটালীর শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হল। ফলে এই রাজ্যটিকে কেন্দ্র করে ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্যসাধন সম্ভব হয়েছিল। জার্মানীতে প্রাশিয়াকে শক্তিশালী করার ফলে জার্মানীর অধিনায়কত্ব অষ্ট্রিয়ার হাতছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হল। এর ফলে প্রাশিয়ার পক্ষে ভবিষ্যতে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য নিয়ে আসা সহজ হল।

উপসংহারে বলা যায় যে, ভিয়েনা ব্যবস্থা একটি বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এটির প্রধান ত্রুটি হল যে এই ব্যবস্থা পরিবর্তন যে একমাত্র সত্য তা মানতে রাজী হল না। যুগের সাথে তাল রেখে চলবার মত ক্ষমতা না থাকায় এটি পরবর্তীকালে টিকে থাকতে পারল না। যথাপূর্বং নীতিতে পূর্ণ আস্থা রাখার ফলে ভিয়েনা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিদেশে আন্দোলন শুরু হল। একারণে বলা হয় যে উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাস

প্রধানতঃ ভিয়েনা ব্যবস্থার রদবদলের ইতিহাস ; তবে অধুনা আমরা যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছি তাতে 'ভিয়েনা সম্মেলন' যে ব্যর্থ হয়েছিল বলতে লজ্জাবোধ করি। গত মহাযুদ্ধ ২১ বছর হল শেষ হয়েছে। আজও পরাজিত রাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি। পুনরায় যুদ্ধের কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জগতের শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। অতএব ভিয়েনা সম্মেলনকে পরবর্তীকালের ঘটনার দ্বারা বিচার করলে চলবে না। তখনকার রাষ্ট্রনায়কগণকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মহাপুরুষ ভাবলে ভুলই করা হবে।

Q. 3. What do you mean by the Holy Alliance? Was it a treaty? Why did it fail? Briefly describe the history of Holy Alliance and explain the causes of its failure.

Ans. পবিত্র চুক্তি: ভিয়েনা সম্মেলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠতে পারে ভেবে বৃহৎ শক্তিবর্গ ভিয়েনা সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রয়োগ ও টিকিয়ে রাখবার জন্য স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলবার চেষ্টা করল। পবিত্র মৈত্রীতে এই প্রচেষ্টার রূপ পেল।

পবিত্র চুক্তির উদ্যোক্তা ছিলেন রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার। তিনি আদর্শবাদী ও স্বপ্নবিলাসী ছিলেন। তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদাভাবে দেখতেন না।

পবিত্র চুক্তির নীতি

ফরাসী বিপ্লব তাঁর নিকট একটি অধর্মীয় ঘটনা মাত্র ছিল। তিনি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা একটি ভ্রাতৃসংঘ স্থাপন করতে চাইলেন। ফলে 'পবিত্র চুক্তির' সৃষ্টি হল। প্রথমে এটি রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সম্রাটদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৮১৫-এর ২৬শে সেপ্টেম্বর এটি সরকারীভাবে ঘোষিত হল। এতে বলা হল যে, ন্যায়, দয়া ও শান্তি—খৃষ্টধর্মের এই তিনটি মহান নীতির ওপর ভিত্তি করে ইউরোপের রাজন্যবর্গ তাঁদের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা করবেন। চুক্তিবদ্ধ সকল রাজা এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। ভ্রাতাদের ন্যায় তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করবেন, এবং পরিবার সমূহের পিতাদের ন্যায় তাঁরা তাঁদের প্রজাদের ধর্ম, ন্যায় ও শান্তির পথে চালিত করবেন।

পোপ ও তুরস্কের সুলতান ভিন্ন ইউরোপের অন্য সকল রাজাকে এই পবিত্র চুক্তি গ্রহণ করবার জন্য বলা হল। ইংল্যাণ্ডের শাসক ব্যতীত অন্য সকল রাজা এই ঘোষণা গ্রহণ করলেন। কিন্তু একমাত্র আলেকজাণ্ডার ছাড়া আর

চুক্তি সম্বন্ধে ধারণা

কেউই এটির প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করে নি। মেটারনিক এটিকে 'বাগাড়ম্বর' বলে বিদ্রূপ করেছিলেন; ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসেলরে এটিকে 'মহান রহস্য ও অর্থহীনতার একটি খণ্ড' বলে মনে

করলেন। পরবর্তী কালে প্রগতিশীল লোকেরা এটিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অস্ত্র বলে মনে করত।

পবিত্র চুক্তিতে নৈতিকতা, ন্যায় ও সদ্ভাব ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচালিত করবার প্রয়াস দেখা যায়। উদ্দেশ্যের দিক হতে এটি প্রগতি-বিরোধী ছিল না। কিন্তু মেটারনিক পরিচালিত চতুঃশক্তি চুক্তির সাথে পবিত্র চুক্তিটি জড়িয়ে থাকার ফলে এটির মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

পবিত্র চুক্তিটিকে ঠিক 'চুক্তি' বা 'সন্ধি' বলা যায় না। এটি আলেকজাণ্ডার কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক গৃহীত একটি মহান ঘোষণা মাত্র। কেননা, প্রত্যেক চুক্তি বা সন্ধিতে স্বাক্ষরকারীরা কয়েকটি দায়িত্ব ও সুযোগসুবিধা ভোগ করে থাকে। তাছাড়া প্রত্যেক চুক্তির উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা সুনির্দিষ্ট থাকে এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। 'পবিত্র চুক্তি'-র ক্ষেত্রে এরূপ কিছু দেখা যায় না; কয়েকটি অবাস্তব নীতি ও আদর্শের কথা এটিতে দেখা যায়।

চুক্তি বলা যায় কিনা

পবিত্র চুক্তি ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। এর বিফলতার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, প্রথমত খৃষ্টধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত রাজন্যবর্গের মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করা তখন সম্ভব ছিল না। সে যুগের নেতারা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মূল্য বুঝতেন না। দ্বিতীয়ত, চতুঃশক্তি চুক্তি কার্যতঃ প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা ছিল এবং ১৮১৫ হতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের সর্বপ্রকার স্বাধীন মতবাদ ও জাতীয় আন্দোলনকে দাবিয়ে রেখেছিল। পবিত্র চুক্তির সাথে চতুঃশক্তি চুক্তির অভিন্নতা-বোধ হতে ইউরোপের জনমত পবিত্র চুক্তিকে নিপীড়ন যন্ত্রের প্রতীক বলে মনে করল। সুতরাং কি রাষ্ট্রশক্তি, কি জনমত, কারও সহানুভূতি লাভ করতে পারেনি বলে পবিত্র চুক্তি ব্যর্থ হল। তৃতীয়ত, ইংল্যাণ্ডের মত শক্তিশালী দেশ এতে যোগ না দেওয়ায় এটির সমূহ ক্ষতি হল। চতুর্থত, এক আলেকজাণ্ডার ভিন্ন অন্য কেউ এটি অকপটভাবে গ্রহণ করেন নি। পরিশেষে বলা যায় যে পবিত্র চুক্তিটি ভিয়েনা সম্মেলনের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে গিয়েছিল। এই চুক্তিটি ইউরোপকে একটি ঐক্যবদ্ধ খৃষ্টান মহাদেশ বলে মনে করে, যে মহাদেশে সম-মনা রাজ্যগুলি রাজতন্ত্রের আওতায় শাসিত হচ্ছে। বাস্তবে যদি এই অবস্থা থাকত তা হলে পবিত্র চুক্তি কার্যকরী হত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থসংঘাত পুরোপুরিভাবে ছিল এবং একারণেই শক্তিসাম্য নীতি ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল। আর শক্তিসাম্য নীতি

ব্যর্থতার কারণ

কখনই সম-মনা রাজ্যসমূহের কথা বলে না। সুতরাং পবিত্র চুক্তিটি ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত শক্তিসাম্য নীতিকে অগ্রাহ্য করেছিল। আর এটিকে অগ্রাহ্য করার অর্থ হল যে বাস্তবকে অগ্রাহ্য করা। ফলে পবিত্র চুক্তি ব্যর্থ হল। কিন্তু এটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র-চুক্তি ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে এটি আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল এবং হেগ সম্মেলনই (১৮৯৯, ১৯০৭) এর সাফল্যের পরিচয়।

Q. 4. What do you mean by the Concert of Europe? What were its activities? Why did it fail? *Or*, Examine the origin, the procedure and the causes of the breakdown of the Concert of Europe. *Or*, Briefly describe the history of the Quadruple Alliance and explain the causes of its failure

Ans. **চতুঃশক্তি-চুক্তি : ইউরোপীয় সংঘ কি?** ফরাসী-ভীতি নেপোলিয়নের পতনের পর এবং ভিয়েনা সম্মেলনের পরও দূরীভূত হয় নি। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা যাতে শান্তি ব্যাহত করতে না পারে তার জন্য সব-ইউরোপীয় পর্যায়ে এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হল। প্রধান চারটি শক্তি (ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া) পরস্পর এক চুক্তিপত্র সম্পাদিত করল। একে চতুঃশক্তি চুক্তি (Quadruple Alliance) বলা হয়। একে ভিত্তি করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে মিলন-নীতি স্থাপিত হল তাই Concert of Europe বা 'ইউরোপীয় সংঘ' নামে খ্যাত। ইউরোপের কূটনীতিবিদরা ইউরোপের শান্তি অব্যাহত রাখবার জন্য যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্স যাতে আর সমগ্র ইউরোপের শান্তিকে বিনষ্ট করতে না পারে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বৃহৎ চারটি রাষ্ট্র উদগ্রীব ছিল। তাদের একতার মধ্য দিয়েই Concert of Europe-এর উদ্ভব ঘটে। আর আলেকজাণ্ডারের 'পবিত্র চুক্তি' এবং মেটারনিক-ক্যাসালরির 'চতুঃশক্তি চুক্তি' এই পরিকল্পনার দুটি অংশ। পবিত্র চুক্তি অবাস্তব ছিল এবং কেবলমাত্র ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ রইল। সে কারণে চতুঃশক্তি চুক্তিই Concert of Europe-এর মূল ভিত্তি। চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীই কনসার্টের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী হল।

ইউরোপীয় সংঘ

ভিয়েনা ব্যবস্থার রচয়িতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভিয়েনা ব্যবস্থাকে চালু রাখতে হলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য। একারণে যে দিন

ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া প্যারিসের দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত করে

কিভাবে দেখা দিল

(নভেম্বর ২০শে, ১৮১৫) ঠিক সেই দিনই তারা নিজেদের মধ্যে আর একটি চুক্তি সম্পাদিত করল। এই চুক্তির দ্বারা চতুঃশক্তি মিতালিকে টিকিয়ে রাখা হল। এই চারটি শক্তি দৃঢভাবে ঘোষণা করল যে তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চাউমণ্ট, ভিয়েনা ও প্যারিসের ব্যবস্থাগুলি অন্ততঃ বিশ বছর টিকিয়ে রাখবে। ইউরোপের শান্তি রক্ষায় চারটি শক্তি এই যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করল তার ফলেই দেখা দিল Concert of Europe বা ইউরোপীয় শক্তি সমবায়। তাছাড়া, চারটি রাষ্ট্র মেনে নিল যে তারা পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ইউরোপে শান্তি অব্যাহত রাখবে এবং এই উদ্দেশ্যে তারা কিছুদিন অন্তর বৈঠকে বসে সাধারণ স্বার্থ, জাতির স্বার্থ এবং ইউরোপের সামগ্রিক শান্তি রক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবে।

এর রূপান্তর: চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। সমস্যা-পীড়িত ইউরোপে এটি নতুন আশার সঞ্চার করল। কারণ জনসাধারণের তখন একমাত্র কাম্যবস্তু ছিল শান্তি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চতুঃশক্তি চুক্তি প্রতিক্রিয়াশীল যন্ত্রে পরিণত হল। ইউরোপের সাধারণ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দের স্বার্থ রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য হল। ইউরোপীয় শান্তি রক্ষা অপেক্ষা স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষা করাই বৃহৎ শক্তিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হল। এই ক্রমাবনতি কনসার্ট অব ইউরোপের মৃত্যুঘণ্টা বাজাল। কনসার্ট অব ইউরোপের আবির্ভাব যেমন ইউরোপীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা, এর ক্রমাবনতি ও পতনও তেমনি স্মরণীয় দুঃখজনক ঘটনা।

এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েনা সম্মেলনে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইউরোপের শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা। এর জন্য

নীতি

চতুঃশক্তির প্রতিনিধিরা সময় সময় সম্মেলনে মিলিত হয়ে ইউরোপের শান্তি-ব্যবস্থা বজায় রাখবার জন্য বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করবেন বলে স্থির হয়।

চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাক্রমে আইলা-স্যাপেল, ট্রপো, লাইব্যাক ও ভেরোনাতে চতুঃশক্তির বৈঠক বসে।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে **আইলা-স্যাপেলে** প্রথম সভা ডাকা হয়। ফ্রান্স হতে মিত্র পক্ষের সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং ফ্রান্সকে চতুঃশক্তি চুক্তিতে যোগদান করতে অনুমতি দেওয়া হয়। কারণ ফ্রান্স প্যারিস সন্ধির শর্তসমূহ অতি দ্রুত পালন করে বলে।

এই ভাবে চতুঃশক্তি-চুক্তি প্রকৃতপক্ষে পঞ্চ-শক্তি চুক্তিতে পরিণত হল। কিন্তু ফরাসী ভীতি তখনো ইংল্যাণ্ড প্রমুখ রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণের মন হতে মুছে যায়নি। একারণে আদি চারটি শক্তি নিজেদের চতুঃশক্তি চুক্তিটি বজায় রাখল। এই বৈঠকে শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেগুলির সু-মীমাংসা হল। সুইডেনের বিরুদ্ধে ডেনমার্কের অভিযোগ, মোনাকোর রাজাকে ভালভাবে দেশ শাসন করতে নির্দেশ দান, হেসের ইলেক্টরকে রাজা উপাধি ধারণ করতে বাধা দান প্রভৃতি ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গ এক জোটে কাজ করতে পেরেছিলেন। সুইডেনরাজ নরওয়ে ও ডেনমার্কের সাথে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আচরণ করলেন না বলে তার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। জার্মানীর রাইন অঞ্চলের ব্যাডেনের উত্তরাধিকার সমস্যার মীমাংসা করা হল। ব্যাভেরিয়া এই রাষ্ট্রটিকে কুক্ষিগত করতে চেষ্টা করছিল বলে তাকে সাবধান করে দেওয়া হল। কিন্তু এই বৈঠকেই আবার তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও স্বার্থ-সংঘাতও দেখা দেয়। স্পেনের উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমনে এবং ভূমধ্য সাগরে জলদস্যুদের অত্যাচার নিবারণের ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড এই প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করল। ইংল্যাণ্ড ভূমধ্যসাগরে কোন রাষ্ট্রের আধিপত্য স্থাপন একেবারেই পছন্দ করল না। দ্বিতীয়ত, স্পেনের উপনিবেশসমূহে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তি গড়ে উঠছিল বলে সে এবিষয়ে কনসার্টের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতার ফলে এগুলি কার্যকরী হল না। ইংল্যাণ্ডের এই অনমনীয় মনোভাবের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ ইংল্যাণ্ড যখন অবৈধ ব্যবসায় বন্ধ করার জন্য সমুদ্রবাহী জাহাজসমূহ তল্লাস করার অনুমতি চাইল, তখন অন্যান্য সভ্যবৃন্দ তাতে আপত্তি জানাল। সুতরাং প্রথম বৈঠকেই কনসার্টের সভ্যবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহের লক্ষণ দেখা গেল এবং চতুঃশক্তি চুক্তিতে ভাঙন শুরু হল। তবে প্রথম বৈঠকেই মেটারনিক তাঁর প্রভাব এমন খাটাতে পারলেন যার ফলে তিনি পরবর্তী বৈঠকগুলিতে অবিসংবাদী নেতারূপে পরিগণিত হন।

আইলা-স্যাপেল ১৮১৮

ট্রপো বৈঠক (১৮২০): কনসার্টের সভ্যদের মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল তা এই বৈঠকে বিশেষভাবে দেখা যায়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের শুরুতে স্পেন, পর্তুগাল, পিডমণ্ট ও নেপল্‌সে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয় যার ফলে এই সব দেশের অত্যাচারী রাজারা উদারপন্থী শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। রাশিয়ার জার স্পেনের বিদ্রোহের সংবাদে খুবই বিচলিত হন

এবং এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য অস্ট্রিয়া ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে ১৫০০০ রুশ সৈন্য পাঠাতে চান। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স রুশ প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এই আশঙ্কায় রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। মেটারনিক আতঙ্কে স্পেনের বিদ্রোহে বিচলিত হতে নিষেধ করেন। কিন্তু স্পেনের বিদ্রোহের ঠিক পরই যখন নেপলসের বিদ্রোহের খবর তাঁর নিকট পৌছাল তখন তিনি আর বিলম্ব করতে পারলেন না। যদি বিদ্রোহীরা নেপলসে জয়ী হয় তা হলে ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব চলে যেতে পারে এই আশঙ্কা তিনি করলেন এবং নেপলসের বিদ্রোহ ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কনসার্টের একটি বৈঠক সত্বর আহ্বান করার জন্য অনুরোধ জানালেন। কনসার্টের সকল সদস্যই বিপ্লব-বিরোধী ছিল বলে এই সব বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য ট্রপো নামক স্থানে সম্মেলন ডাকা হল।

মেটারনিক তখন কনসার্টে অবিসংবাদী নেতা। একারণে নেপলসের বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি যা দাবি করলেন তা মেনে নেওয়া হল। স্পেনের বিদ্রোহ সম্বন্ধে ফ্রান্সের দাবি মুলতুবী রাখা হল। তাছাড়া বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া গ্রহণ করল। কংগ্রেসের নামে একটি ঘোষণাপত্র জারী করা হল যেটিকে ট্রপো ঘোষণাপত্র (Troppau Protocol) বলা হয়। এই ঘোষণাপত্রটির উদ্ভাবক ছিলেন স্বয়ং মেটারনিক। এতে বলা হল যে রাজার স্বেচ্ছাকৃত দান ভিন্ন কোন সাংবিধানিক সংস্কার স্বীকার করা হবে না। যদি কোন রাষ্ট্রে অন্য রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ও বিপ্লবের দ্বারা কোন শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহলে এই রাষ্ট্রটিকে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সম্মেলনের সদস্য পদ হতে বের করে দেওয়া হবে এবং সম্মেলনের সদস্যরা ইচ্ছা করলে একজোটে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ দ্বারা সেই রাষ্ট্রে পূর্বেকার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারবে।

ট্রপো ঘোষণাপত্র

ইংল্যাণ্ড এই ঘোষণাটিকে বিপ্লব বন্ধ করার অজুহাতে এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি-পত্র বলে মনে করল এবং ইংল্যাণ্ড বরাবরই এরূপ নীতির বিরোধী ছিল। একারণে সে ট্রপো ঘোষণারও বিরোধিতা করল এবং এটিকে স্বীকার করল না।

ইংল্যাণ্ডের নীতি

ইংলাণ্ডের প্রতিনিধি ক্যাসলরি এটিকে 'কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত' বলে মনে করলেন। অবশ্য ইংল্যাণ্ডের স্বাক্ষর ভিন্নই এই ঘোষণাটি প্রকাশিত হল।

ট্রপো বৈঠকে সদস্যবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ বিশেষভাবে দেখা দেয় বলে কোনরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। কংগ্রেসের অধিবেশন কয়েকমাসের জন্য মুলতুবী রাখা হল।

এই মুলতুবী অধিবেশন বসল ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে **লাইবেক** নামক স্থানে। এই বৈঠকে ইটালীর ব্যাপারে অষ্ট্রিয়ার বিশেষ স্বার্থ আছে বলে স্বীকার করা হল এবং একারণে তাকে নেপল্‌স ও পিডমণ্টে বিদ্রোহ দমন করবার অধিকার দেওয়া হল। অষ্ট্রিয়া খুব সহজেই নেপল্‌স ও পিডমণ্টের বিদ্রোহ দমন করল। নেপল্‌সের সিংহাসনে অত্যাচারী ফার্ডিন্যাণ্ড পুনরায় বসলেন।

ভেরোনার বৈঠক ১৮২২ঃ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভেরোনাতে তৃতীয় সম্মেলন ডাকা হয় এবং স্পেনের বিপ্লব ও গ্রীক বিদ্রোহ ছিল এর আলোচ্য বিষয়। এই সম্মেলন ফ্রান্সকে স্পেনে বিদ্রোহ দমনের ভার দিল, এবং ফরাসী সৈন্যরা স্পেনের গণ বিপ্লব দমন করল। ইংল্যাণ্ড স্পেনের ব্যাপারে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানাল। এর কিছুদিনের মধ্যেই স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলি মাতৃভূমি স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অষ্ট্রিয়া প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এই সব বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে বলে হুমকি দেখালে ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যানিং পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করলেন যে ইংল্যাণ্ড একরূপ কাজে সক্রিয়ভাবে বাধা দেবে। এরপর ইংল্যাণ্ড খুব তাড়াতাড়ি স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল। তাছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সুবিখ্যাত 'মনরোনীতি' ঘোষণা করায় ইংল্যাণ্ডের সুবিধা হল। এই নীতিতে বলা হয় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা মহাদেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে কোন বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ কোনক্রমেই বরদাস্ত করবে না। গ্রীক বিদ্রোহ সম্বন্ধে এই বৈঠক বিশেষ কিছু করল না। রাশিয়া গ্রীসে তুরস্কের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু এতে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে ভেবে ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া এর বিরোধিতা করল। একারণে ভেরোনা সম্মেলনে গ্রীক সমস্যাকে চাপা দেওয়া হল।

ভেরোনা বৈঠকেই চতুঃশক্তি চুক্তির কার্যতঃ অবসান হল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জার সেণ্ট পিটার্সবার্গে প্রাচ্য সমস্যা আলোচনা করবার জন্য দুটি সভা ডাকেন। কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হয়।

বিফলতার কারণঃ বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই চতুঃশক্তি-সংঘই প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থা। কিন্তু এটি কার্যকরী হয়নি। এর ব্যর্থতার কারণ সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। কনসার্টের চরিত্র, সংগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই এর পতনের বীজ উপ্ত ছিল।

ব্যর্থতা

প্রথমতঃ, এই সংঘটি কয়েকটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত হয়েছিল। এরা

প্রত্যেকেই ফরাসী-বিপ্লব-প্রসূত ভাবধারার বিরোধী ছিল। বিপ্লবের প্রতি তীব্র ঘৃণার ফলে তারা এক ঐতিহাসিক শক্তিকে অস্বীকার করল। ফলে এর পতন অবশ্যম্ভাবী হল। দ্বিতীয়তঃ, সদস্য-রাষ্ট্রগুলি আপন আপন স্বার্থ সম্বন্ধেই সজাগ ছিল বেশী। এর ফলে 'খোলা মন' নিয়ে কোন রাষ্ট্রই অধিবেশনে যোগ দেয় নি। এরূপ মনোভাব বর্তমান থাকলে অন্য কিছু হতে পাবে কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয়তঃ, ইংল্যাণ্ড প্রথম থেকে সহযোগিতা করছিল না। অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতি ইংল্যাণ্ড পছন্দ করল না। ট্রপো ঘোষণা ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও গৃহীত হয়। ভেরোনাতে ইংল্যাণ্ডের মতামত অগ্রাহ্য করা হল। ক্যানিং তখন কনসার্টের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করলেন। ইংল্যাণ্ডের এই মনোভাবে ও সংস্রব ত্যাগ কনসার্টকে শক্তিহীন করল। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাত, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাব কনসার্টের পতন ঘটায়। বৃহৎ শক্তিগুলি যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের ভিত্তিতে মিলিত হয়েছিল তা বেশি দিন টিকে থাকল না। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ শত্রুর হাত হতে রক্ষা পাবার পর নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করাই তাদের একমাত্র চেষ্টা হল। এর ফলে পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের কাল মেঘ তাদের মধ্যে নেমে এল। ফলে কনসার্টের পতন অনিবার্য হল। সবশেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধ মনোভাব এই সংঘটির মৃত্যু ঘটাল।

ঐতিহাসিক মূল্য

তবে এটি স্বীকার করতেই হবে যে চতুঃশক্তি চুক্তি যৌথ নিরাপত্তা নীতি ও আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত দেয়, এবং এটি নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের ফলস্বরূপ ছিল। এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ও মানসিক অভিজ্ঞতা হতে এটি সৃষ্টি হয়। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত জাতিগুলির সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হতেই চতুঃশক্তি চুক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল।

More Questions

1. What principles were followed at the Congress of Vienna ? Were they compatible with the political ideals of the day ?

Ans. [২নং প্রশ্নের উত্তর দেখ এবং তারপরে যোগ দাও]—ভিয়েনা সম্মেলনের সময় ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রবল ছিল। রাজতন্ত্রই আইনানুগ সরকার বলে সকলে মনে করত। চার্চের ক্ষমতাও বাড়তির পথেই ছিল। জমিদার শ্রেণী

তাদের পূর্বেকার ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য চেষ্টা করছিল। জনসাধারণও দীর্ঘকাল যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে কালাতিপাত করে শান্তির জন্য কাঙাল হয়ে পড়েছিল। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, উদারনৈতিকবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ তখন নিজ নিজ শৈশব অবস্থা কাটিযে উঠতে পারেনি। একারণে ভিয়েনা সম্মেলনে ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য যে তিনটি নীতি গ্রহণ করা হয় সেগুলির তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে খুব কিছুটা অসামঞ্জস্য ছিল না।

2. Did the Vienna settlement constitute a betrayal ? Why did the settlement ultimately fail ?

Ans কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ভিয়েনা ব্যবস্থা বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ। এর অর্থ হল ইউরোপের আপামর জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা এতে মেটান হয়নি এবং নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইউরোপের জনসাধারণ একজোটে সংগ্রাম করেছিল বলেই নেপোলিয়নের পতন ঘটেছিল। কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনে জনসাধারণের এই অবদান ইচ্ছে করে ভুলে যাওয়া হল এবং জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী এক ব্যবস্থা চালু করা হল। অতএব ভিয়েনা ব্যবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতাই চরম ভাবে দেখা যায়।

উপরিউক্ত মতটি গ্রহণ করা যায় না। একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ইতিহাসের ঘটনাগুলি বিচার করলে বোঝা যায় যে ভিয়েনা ব্যবস্থা কারও প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেনি। আমরা জানি নেপোলিয়নের পতন ঘটেছিল সামরিক শক্তির দ্বারা। আর এই সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছিল প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি। অতএব ভিয়েনা ব্যবস্থায় যদি এই রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ না দেখা হত তা হলে ভিয়েনা ব্যবস্থাকে বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ বললে অন্যায় হত না। কিন্তু ভিয়েনা ব্যবস্থায় এই রাষ্ট্রের স্বার্থ বিশেষভাবে দেখা হয়। অতএব ভিয়েনা ব্যবস্থাকে বিশ্বাসঘাতকতার ফল স্বরূপ বলা যায় না।

[প্রশ্নটির শেষ অংশের জন্য ২নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।]

3. What do you know about the Holy Alliance ? What circumstances led to its collapse ?

Ans. ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

4. What were the aims of the concert of Europe ? How were the aims unfolded in course of its work ?

Ans. ৪নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

5. What was the Troppau Protocol ? Discuss the role of England vis-a-vis the Protocol.

Ans. ৪নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

6. What were the causes of the failure of the concert of Europe ?

Ans. ৪নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

দ্বাদশ অধ্যায়

শিল্প-বিপ্লব

Q. 1 What do you understand by Industrial Revolution? What were its causes? When did it begin and why? *Or*, What were the causes and effects of the Industrial Revolution in England?

সূচনা : অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কল্যাণে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে তাকেই শিল্প-বিপ্লব বলে। মানুষের শ্রমের পরিবর্তে নানারূপ যন্ত্রশক্তির প্রয়োগে এই পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমে বাষ্পীয় শক্তি কাজে লাগান হয়, পরে বৈদ্যুতিক শক্তি, আধুনিক কালে পারমাণবিক শক্তির কথা শোনা যাচ্ছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তিই ছিল মানুষের সম্বল। শিল্পগুলি ছিল মূলতঃ কুটির শিল্প। এই কুটির শিল্পজাত পণ্যের বাজার ছিল সীমাবদ্ধ।

উপরিউক্ত অবস্থার বদলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে কয়েকটি বিরাট এবং মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মানুষের দৈহিক শক্তির বদলে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রশক্তি ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রকৃতিকে মানুষ তার কাজে লাগাবার জন্য নতুন নতুন উপায় বের করতে থাকে।

স্বরূপ

যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব ঘটে এবং বিরাট মূলধন প্রচুর কাঁচামাল এবং অসংখ্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বেচা-কেনার বাজারও সম্প্রসারিত হয়। উৎপাদন পদ্ধতিতে বিরাট পরিবর্তন আসার ফলে উৎপাদনী সম্পর্কেও মৌলিক পরিবর্তন এল। সমাজে নতুন শ্রেণী দেখা দিল। শিল্পোৎপাদন পদ্ধতিতে ও ক্ষেত্রে শ্রেণী সম্পর্কে এবং ব্যাপকভাবে অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনকে পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছে বলে এই পরিবর্তনকে **শিল্প-বিপ্লব** বলা হয়।

শিল্প-বিপ্লব কথাটির তাৎপর্য

শিল্প-বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় আকস্মিক ও চমকপ্রদভাবে দেখা দেয়নি। এটি ধীরে ধীরে শান্ত গতিতে প্রকাশিত হয়। এই কারণে অনেকে এটিকে শিল্প-বিপ্লব না বলে **শিল্প-ক্রমবিকাশ** (Industrial Evolution) বলেছেন। শিল্প ক্রমবিকাশের বা বিপ্লবের প্রধান কারণ **নতুন বণিক শ্রেণীর উদ্ভব**। ষোড়শ শতাব্দী হতে বণিক সম্প্রদায় সমুদ্র পার হয়ে বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর সম্পদ

কারণ

আহরণ করেছিল। পূর্বে কারিগরেরা নিজ নিজ গৃহে জিনিসপত্র তৈরী করত এবং নিজেরাই উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করত। কিন্তু বণিকশ্রেণীর উদ্ভবের ফলে কারিগর ও ক্রেতার মধ্যে এই মধ্যম শ্রেণীর (বণিক শ্রেণীর) আবির্ভাব হল। এদের প্রচুর অর্থ ছিল, সেজন্য এরা নিজেদের কাজে কারিগরদের নিযুক্ত করতে লাগল। এইভাবে ধীরে ধীরে একটি একটি করে কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। যারা কারখানায় গেল, পূর্বে তারা ছিল স্বাধীন কারিগর। কিন্তু এখন মালিকের কারখানায় মজুরি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তারা স্বাধীনতা হারাল। একই কারখানায় বহু কারিগর একত্রিত হওয়ার **শ্রম বিভাগ** ব্যবস্থার প্রবর্তন হল। শ্রম বিভাগ শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম কারণ। এর পর বিভিন্ন যন্ত্রের আবিষ্কার এবং ক্রমে কারখানায় সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে তা প্রয়োগ হল তখন শিল্প-বিপ্লব পুরোপুরিভাবে দেখা দিল। অতএব একথা অবশ্যই বলা চলে যে শিল্প-বিপ্লবের মূলে ছিল বিজ্ঞানের অবদান। কারণ, যন্ত্রগুলির আবিষ্কার বিজ্ঞানের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। আবার মূলধনও শিল্প-বিপ্লবের আর একটি কারণ। প্রচুর মূলধন না থাকলে কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হত না।

শিল্প-বিপ্লবের আরম্ভে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল—কাঁচা মাল, প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন বিস্তৃত বাজার এবং মূলধন। ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব প্রথম দেখা দেয়, কারণ—ইংল্যাণ্ডের এই তিনটির মধ্যে কোনটিরই অভাব হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের অধীনে উপনিবেশ ছিল। সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষই তার কুক্ষিগত ছিল। অতএব এই সকল দেশ হতে ইংলণ্ড প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল পেল। আবার এই সকল দেশে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তার উৎপাদিত জিনিসগুলি এই সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হতে লাগল। এ ছাড়া ইংল্যাণ্ডের মূলধনেরও অভাব হয় নি। ভারতে যুগ যুগ ধরে যে অর্থ ও সম্পদ সঞ্চিত ছিল তা ইংল্যাণ্ডের শোষণের ফলে ভারতবর্ষ হতে ইংল্যাণ্ডে চলে গেল। এই অর্থ মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে ইংল্যাণ্ড শিল্প বিপ্লবের পথে সর্বাগ্রে অগ্রসর হল।

প্রথমে কোথায় দেখা দিল

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করত। পল্লীসমাজ ও পল্লীজীবন ছিল আদর্শ। কৃষিকার্য ও পশুপালনই ছিল জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায় কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধীরে ধীরে এই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হল। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্তন হল। সংক্ষেপে, **কৃষিপ্রধান ইংল্যাণ্ড শিল্প প্রধান হয়ে উঠল।**

অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্প-বিপ্লব ইংলণ্ডে প্রথম দেখা দেয়। **বয়নশিল্পের** উপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাব সর্বপ্রথম দেখা দেয়। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে **জন কে** নামক এক ব্যক্তি 'উড়ন্ত মাকু' (Flying Shuttle) তৈরী করলেন। এর ফলে বয়ন শিল্পের রূপান্তর ঘটল। ১৭৬৪ খ্রীঃ-এ হারগ্রিভ্স নামক একজন তাঁতী একটি উন্নত ধরনের সূতা কাটবার যন্ত্র (Spinning Jenny) আবিষ্কার করেন। এর পরে **আর্করাইট, কম্পটন** ও **কার্টরাইট** এর চেয়ে ভাল ভাল যন্ত্র প্রস্তুত করলেন। এদের যন্ত্রগুলি জলশক্তির সাহায্যে চালিত হত। ফলে নদীর ধারে ধারে বহু বয়নশিল্পের কারখানা গড়ে ওঠে। এর ভেতর **জেমস ওয়াট** বাষ্পীয় এঞ্জিন আবিষ্কার করেন।

কিভাবে দেখা দিল

কার্টরাইট বয়নশিল্পে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার প্রচলিত করলে ইংল্যাণ্ডে আধুনিক যন্ত্রচালিত কারখানার উদ্ভব হয় এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব সম্পূর্ণ হল। এই সকল যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে ইংল্যাণ্ড সারা পৃথিবীর বস্ত্র-বাজার একচেটিয়াভাবে কিছুকালের মত ভোগ করতে লাগল।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

এদিকে নতুন যন্ত্রগুলি প্রস্তুতের জন্য প্রচুর লৌহের ও কয়লার প্রয়োজন হল সুতরাং একদিকে লৌহশিল্পের উন্নতি হল ও অপরদিকে কয়লাখনির কাজ বৃদ্ধি পেল। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে **কর্ট** আরও উন্নতভাবে লৌহ প্রস্তুতের পদ্ধতি বের করেন। ইংল্যাণ্ড লৌহ ও ইস্পাতশিল্পেও পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী হল।

পূর্বে ইংল্যাণ্ডে যাতায়াতের ভাল রাস্তা ছিল না। এখন শিল্পের উন্নতির জন্য উন্নততর রাস্তাঘাটের প্রয়োজন হল। এই সময় **টেলফোর্ড ও ম্যাক্অ্যাডম** পাকা রাস্তা ও **জেমস ব্রিণ্ডলি** চমৎকার খাল তৈরী করবার উপায় বের করেন। ফলে দেশের সবত্র প্রশস্ত রাজপথ তৈরী হল ও অসংখ্য খাল কাটা আরম্ভ হল।

এর পর বাষ্প-চালিত জাহাজ আবিষ্কৃত হল। তারপর ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে **ষ্টিফেনসন** প্রথম বাষ্পচালিত রেলওয়ে এঞ্জিন নির্মাণ করেন, ফলে রেলগাড়ির যুগ শুরু হল এবং যাতায়াত ও বাণিজ্য দ্রব্য বহনের আরও সু-ব্যবস্থা হল।

শিল্পের ন্যায় কৃষিক্ষেত্রেও বিপ্লবের সূচনা হয়। এই সময় কৃষিকার্যে নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হল। পশুপালনের ব্যবস্থারও খুব উন্নতি দেখা দিল। **বেকওয়েল** বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরু ও ভেড়া প্রতিপালন আরম্ভ করেন।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের সম্পদ খুবই বৃদ্ধি পেল। ইংল্যাণ্ড "পৃথিবীর কারখানায়" পরিণত হল।

ইংল্যাণ্ডের সম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেল সত্য কিন্তু এটি দেশের সর্বশ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল না। অল্প কয়েকজন ব্যবসায়ী কারখানার মূলধন যোগান দিয়ে লাভের অধিক অংশ আত্মসাৎ করল। শ্রমিকগণের ভাগ্যে শুধু অমানুষিক পরিশ্রম, অসীম দারিদ্র্য, অবজ্ঞা ও পৈশাচিক অত্যাচার জুটল। এর ফলে শিল্পপতি ও মালিক শ্রেণীর সহিত শ্রমিকগণের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল

শিল্প-বিপ্লবের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প ব্যয়ে ইংরাজ বণিকগণ অধিক দ্রব্য উৎপন্ন করবার সুযোগ পায় এবং তারা প্রাচ্যের বাজারে সস্তার প্রতিযোগিতায় জয়ী হল।

ইংল্যাণ্ডে কুটির শিল্পের অবনতি হল এবং পরবর্তীকালে একেবারে লোপ পেল। ইংল্যাণ্ডের অনেক জনবিহীন প্রান্তর বড় বড় শহরে পরিণত হল। জনসাধারণ শহরমুখী হল এবং গ্রামগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব দেখা যায়। শিল্পবিপ্লবের ফলে অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা কমতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও কলকারখানার দৌলতে বিত্তশালী হয়ে উঠল এবং তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপন করল। শিল্প-কেন্দ্রগুলি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচনের অধিকার পেলে অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা কমে যায়। পরবর্তীকালে শ্রমিকশ্রেণী যখন ভোটাধিকার পেল তখন তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল।

Q. 2. What were the good and evil effects of the Industrial Revolution? *Or*, discuss some of the far-reaching effects of the Industrial Revolution.

Ans. আগেই বলা হয়েছে যে শিল্প-বিপ্লব শুধু ইংল্যাণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং আমেরিকা মহাদেশে শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ গিয়ে পৌঁছাল।

বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং জার্মানিতে শিল্পবিপ্লব অল্পকালের মধ্যেই প্রসারলাভ করে। এসব দেশের শিল্পোন্নতিতে প্রথম দিকে অবশ্য ইংরেজ পরিচালক এবং ইংরেজ মূলধন কাজ করেছিল। বেলজিয়ামের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

ফ্রান্সে প্রথম রেলপথ তৈরী হয় ইংরেজদের সাহায্যে। তবে ফ্রান্সের পুঁজি খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। ফলে ফ্রান্সে শিল্প-প্রসার খুব দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। জার্মানিতে শিল্প-বিপ্লব বয়ন শিল্পকে কেন্দ্র করে শুরু হয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই লৌহ-শিল্পে জার্মানি খুব এগিয়ে যায়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প-বিপ্লব

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প-বিপ্লবের প্রেরণা আসে ইংল্যাণ্ড হতে। এখানে শিল্প-বিপ্লব একটু দেরিতে শুরু হলেও এর গতি এখানে তীব্রতর হয়। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে নতুন নতুন কারখানা ও রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার পশ্চিমাঞ্চলের অনধিকৃত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের দিকে নিজের আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে থাকে। কালক্রমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার শিল্পের বাজারকে রক্ষা করার জন্য এক নীতি ঘোষণা করে (মনরো নীতি)। পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপ্রধান উত্তরাঞ্চলের সাথে কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চলের যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তার মূলে ছিল শিল্প-বিপ্লব প্রসূত অর্থনৈতিক প্রশ্ন।

আমেরিকায়

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হওয়ায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি পৃথিবীর অন্যান্য অংশে পড়ল। শিল্পে-অগ্রসর রাষ্ট্রগুলি তাদের শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ও বৃহত্তর বাজারের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র সুযোগ সুবিধা খুঁজতে লাগল এবং তাদের কারখানাগুলি চালাবার এবং শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করবার জন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন তাও সংগ্রহ করবার জন্য পৃথিবীর শিল্পে-অনুন্নত দেশগুলির প্রতি দৃষ্টি দিল। এর ফলে পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর দেশ দেখা দিল—**শিল্পে অগ্রসর ও শিল্পে অনগ্রসর দেশ**। শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলি সাধারণত কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশগুলি আবার প্রায়ই ঘনবসতিপূর্ণ। অতএব এই সকল ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে শিল্পে-উন্নত দেশগুলির দু দিক দিয়ে সুবিধা হওয়ার কথা—তাদের কলকারখানাগুলি চালু রাখবার জন্য কাঁচামালের অভাব থাকবে না এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর লাভে বিক্রয়ের সম্ভাবনা (ঘন বসতিপূর্ণ বলে)। এই কারণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দিল।

শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল

সাম্রাজ্যবাদ

প্রথমে ইউরোপীয়গণ এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। ভারতবর্ষ ইংরাজদের অধিকারে চলে গেল। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজরা আধিপত্য স্থাপন

করল। ইন্দোচীনে ফরাসী এল। বিশাল চীনদেশও রেহাই পেল না। সাম্রাজ্য-লোলুপ দেশগুলির প্রভুত্ব চীনের অনেক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল। আফ্রিকার সমস্ত দেশ ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির অধীনে চলে গেল। এই সকল দেশগুলি যদিও শোষিত ও লুণ্ঠিত হতে থাকল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিন্তু সম্প্রীতি রইল না। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল এবং তাদের অধীনে যে সব উপনিবেশ ছিল সেগুলিতে নিজ দেশের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য ছাড়া অন্য দেশের শিল্পদ্রব্য আমদানী হতে দিল না। এর ফলে আন্তর্জাতিক রেষারেষি বৃদ্ধি পেল এবং বিশ্বযুদ্ধের পথ সুগম করে দিল।

সংক্ষেপে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ শিল্প বিপ্লবেরই-পরোক্ষ ফল। সাম্রাজ্য নিয়ে শিল্পপ্রধান দেশগুলি যে পশুর ন্যায় হানাহানি করছিল এবং এখনও করছে তা শুধু শিল্পপ্রধান দেশগুলির ক্ষতি করেনি, মানবজাতির উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হয়েছে। শক্তিশালী দেশগুলির বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়েছে এই তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিতে আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য।

মানব-সভ্যতার উপর শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব বলে বা লিখে শেষ করবার নহে। জগতের প্রত্যেক দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে শিল্প-বিপ্লব সভ্যতায় বিপ্লব এনেছে। এখানে শিল্পে অনুন্নত বা উন্নত এ প্রশ্ন ওঠে না। অধুনা প্রত্যেক দেশই অল্পবিস্তর শিল্পে উন্নত হয়েছে। সকল রাষ্ট্রেরই একমাত্র চেষ্টা নিজ নিজ রাষ্ট্রকে শিল্পে আরও উন্নত করা। এই 'আরও-র' বুঝি শেষ নেই।

শিল্প-বিপ্লব প্রথমেই শহরমুখী সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক দেশেই এখন বড় বড় শহরের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের জনবিহীন প্রান্তর এখন জনমুখর হয়েছে। এটা শিল্প বিপ্লবেরই ফলে। কারণ বড় বড় কারখানা স্থাপনের ফলেই শহরের সৃষ্টি। এর ফলেই প্রাচীন সভ্যতার মৃত্যু ঘটেছে এবং প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। মানুষকে আরও আরামপ্রিয় করেছে। শিল্পদ্রব্য না হলে এখন মানব-সভ্যতা পঙ্গু হয়ে পড়বে।

আধুনিক সভ্যতা ও শিল্প বিপ্লব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফলে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অবশ্য শিল্প-বিপ্লবের ফলেই বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য করে খাদ্যশস্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রত্যেক দেশেই শ্রমিকশ্রেণী বলে একটি শক্তিশালী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। যে

দেশ শিল্পে যত উন্নত সে দেশে শ্রমিকশ্রেণী তত শক্তিশালী। দেশের রাজনীতিতে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে শ্রমিক দল একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। রাশিয়া প্রভৃতি দেশে সকলেই শ্রমিক বলে গণ্য হয়।

শিল্প-বিপ্লব মানুষের চিন্তাধারায় এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। মানুষের মনে ধর্মের প্রভাব শিথিল হয়েছে। মানুষ অর্থকেই পরমার্থ বলে গ্রহণ করেছে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে শিশুকে গৃহে শিক্ষা দেওয়া হত, এখন গৃহের স্থান নিয়েছে বিদ্যালয়।

শিল্প-বিপ্লবের সাথে সাথে বিভিন্ন বিজ্ঞান-সাধনা এগিয়ে চলল। চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নতি ঘটল। ভূগোল, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব সমাজ-তত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতির উন্নতি ঘটল।

যানবাহনের উন্নতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দিল। কলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নতুন মূল্যবোধ দেখা দিল। এ দুটি ক্ষেত্রে বাস্তবতাবাদের সূচনা হল।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে রেষারেষি চলেছে তাও শিল্প-বিপ্লবের ফল। আমেরিকা যে সমস্ত জগৎ জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করতে পেয়েছে এবং পারছে তাও সম্ভব হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প শীর্ষস্থানে বলে। রাশিয়া যে আমেরিকাকে পরাজিত করতে চেষ্টা করছে তাও তার শিল্পে অভাবনীয় উন্নতির জন্য। ইংল্যাণ্ড যে দুটি সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধের পরও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে টিকে আছে তাও শিল্পোন্নতির জন্যই। খণ্ডিত জার্মানি ও পরাজিত জাপান সে পুনরায় নিজ নিজ পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে তাও শিল্পোন্নয়নের জন্য। ভারতবর্ষ তার অসংখ্য দরিদ্র জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে চাইছে শিল্পোন্নতির মাধ্যমেই। ভারতের প্রথম চারটি পাঁচসালা পরিকল্পনার মূল নীতির দিকে লক্ষ্য রাখলেই এটা বুঝতে পারা যায়।

আধুনিক মানব-সভ্যতা শিল্পাশ্রয়ী বললে ভুল হবে না। উপরি-উক্ত আলোচনা হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে আধুনিককালে মানবসভ্যতা সম্পূর্ণভাবে শিল্প-ভিত্তিক হয়ে পড়েছে। দেশের উন্নতি বলতে এখন অর্থনৈতিক উন্নতিই বুঝায় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে শিল্পোন্নতির উপর। অধুনা প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার জাতীয় সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নতির কার্যে প্রয়োগ করছে। পরিশেষে, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে শিল্পোন্নতির সাথে সাথে

যেন আমাদের মানবিক গুণাবলীরও উৎকর্ষ ঘটে। মানুষের মন যেন কারখানা-ধর্মী শিল্পগন্ধী না হয়ে পড়ে।

More Questions

1. Give an account of the way or inventions which brought about the Industrial Revolution

Ans. ১নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

2. What is meant by Industrial Revolution ? Is it proper to call it an evolution rather than a revolution ?

Ans. ১নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

3. How did the Industrial Revolution affect the world ? What is its influence upon the world civilisation ? Is it true to say that the modern civilisation is nothing but an industrial civilisation ?

Ans. ২নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইউরোপে বিপ্লবের যুগ (১৮১৫-১৮৫০)

ইউরোপ ১৮১৫-৫০ : ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে নি। এই যুগটিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই প্রবল থাকার ফলে গণতন্ত্রের জয় সম্ভব হয় নি। এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য রাজায়-প্রজায় দ্বন্দ্ব, অনধিকার শাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজাপুঞ্জের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এরই ফলে গ্রীস ও বেলজিয়ামবাসীগণ তাদের মনোমত সরকার গঠন করতে পারে। অন্যান্য দেশে অবশ্য জাতীয়তাবাদ পাশবশক্তির নিকট পরাজিত হয়। অনেকের মতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগটি কৃতকার্যতা অপেক্ষা আশা-আকাঙ্ক্ষার যুগ বলে বর্ণনা করা উচিত। এই যুগটিতে মানুষের জীবন প্রভাবিত হয়েছিল শিল্প বিপ্লব, সাহিত্যের বিকাশ, ধর্মনৈতিক আন্দোলন, মানব-কল্যাণের প্রচেষ্টার দ্বারা। রাজনীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। জনসাধারণ যদিও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখছিল, তবু তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপূর্ণ থেকে যায়। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে জনসাধারণের প্রচেষ্টার ফলেই রাজনৈতিক সমস্যাগুলির স্বরূপ ধরা পড়ে এবং ফলে তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ প্রশস্ত হয়।

যুগটির স্বরূপ

এযুগটিকে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের সাথে রক্ষণশীলতার সংগ্রাম হিসেবেও গণ্য করা যায়। যে সব দেশে রাজনৈতিক ঐক্য ও স্বাধীনতা আগে হতেই ছিল সেখানকার জনসাধারণ এই যুগটিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের জন্য আন্দোলন করে। আর যে সবদেশে রাজনৈতিক ঐক্য ও স্বাধীনতা ছিল না, সে সব দেশে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও ঐক্যের জন্য গণ-আন্দোলন চলতে থাকে। কিন্তু এই যুগটিতে আন্দোলনগুলি ব্যর্থ হয়। এর প্রথম কারণ হচ্ছে শত্রুপক্ষ প্রবল ছিল এবং তাদের হাতেই আইন, শাসন-ক্ষমতা এবং সেনাবাহিনী ছিল। জনসাধারণের ছিল কেবলমাত্র উৎসাহ এবং আত্মপ্রত্যয়। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর কথা বলা যেতে পারে।

গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

ব্যর্থতার কারণ

খ্রীঃ ১৮৪৮-৪৯-এ কিন্তু স্পষ্ট হল যে প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীল শক্তিগুলি গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের নিকট হেরে যাচ্ছে। নতুন সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নতুন

ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শিল্প বিপ্লবজনিত নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারা প্রথমে গণমানসে স্থানলাভ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবসাধনের জন্য সচেষ্ট হচ্ছে। এই যুগটিতে অসংখ্য বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল কারণ রক্ষণশীল শক্তিগুলি কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাই কুক্ষিগত করেছিল, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব স্থাপন করতে পারেনি। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রুত শিল্পায়নের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল তার সাথে রক্ষণশীল শক্তি খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিকবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটল নানারূপ আন্দোলনের মাধ্যমে। রক্ষণশীল রাজতন্ত্র ও সুবিধাভোগী অভিজাততন্ত্র গতিশীল সমাজের সাথে খাপ খাওয়াতে পারলো না, আর এই যুগে ইউরোপে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে যে সমাজের উদ্ভব ঘটল সেটিকে পুরোপুরিভাবে গতিশীল সমাজ বলা যায়। এই সমাজ প্রথমে দেখা দিল পশ্চিম ইউরোপে, পরে মধ্যপূর্ব ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল। স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা এই গতিশীল সমাজব্যবস্থাকে তার নিজস্ব আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারল না —পুরানো বোতলে নতুন মদ্য রাখা সম্ভব হল না।

ফ্রান্স (১৮১৫-১৮৪৮)

সূচনা: ১৮১৫ হতে ১৮৪৮ পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস নানাদিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগ ফ্রান্সের ইতিহাসকে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির দ্বন্দ্বের বিচিত্র উত্থানপতনের কাহিনীতে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্স এই যুগেই শিল্প বিপ্লবের খারাপ দিক ও ভালো দিক উভয় দিক সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা লাভ করে। সামাজিক ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই যুগের ফ্রান্স একান্তভাবে সমৃদ্ধশালী। বিভিন্ন সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ্ ফ্রান্সের তথা ইউরোপের সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করেন।

১৮১৫ হতে ১৮৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজা ছিলেন পুরানো বুরবোঁ বংশের অষ্টাদশ লুই (১৮১৫-'২৪) ও দশম চার্লস (১৮২৪-'৩০)। এই সময় ফ্রান্স বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাগুলির সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা বুরবোঁ নরপতিদ্বয়ের পক্ষে সম্ভব হল না বলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে পুনরায় বিপ্লব দেখা দিল। বিপ্লবের ফলে বুরবোঁ বংশ চিরতরে ফ্রান্সের সিংহাসন হারাল; অবশ্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দেই ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল না। Orleans বংশীয় লুই ফিলিপ ফ্রান্সের সিংহাসনের

জন্য নির্বাচিত হলেন। ফরাসী জনসাধারণ ভাবল এবার বুঝি তাদের দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রবর্তিত হবে। কিন্তু লুই ফিলিপ তাদের হতাশ করলেন। তিনি তাঁর শাসনের দ্বারা ফ্রান্সের উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণী ভিন্ন কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। তাঁর ১৮ বছরের শাসনে ফরাসী জনসাধারণ যেন হাঁপিয়ে উঠল। এই সার্বিক হতাশার ফলস্বরূপ এই বিপ্লব দেখা দিল। ১৮৪৮-এর বিপ্লব ফ্রান্সে লুই ফিলিপের শাসনে পরিসমাপ্তি আনল। তিনি ফ্রান্স হতে পালিয়ে গেলেন। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল।

Q. 1. Write what you know about the Restored monarchy in France. *Or*, Discuss the principles and policies of the Restoration of Monarchy in France. *Or*, Briefly describe the reigns of Louis XVIII and Charles X in France.

Ans ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ বংশের শাসন শুরু হয় ১৮১৪তে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে চতুঃশক্তি নিজেদের মধ্যে চাউমণ্ট-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত করে। এই চুক্তিতে বলা হয় যে নেপোলিয়নের পতনের পর বুরবোঁ বংশই পুনরায় ফ্রান্সের সিংহাসনে বসবে। এরপর ভিয়েনা সম্মেলনে সুচতুর ফরাসী কুটনীতিক ট্যালির‍াঁ Legitimacy নামে এক নীতি প্রয়োগের কথা তোলেন। তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এই নীতি কার্যকরী হলে বুরবোঁ রাজবংশ ফ্রান্সের সিংহাসন ফিরে পাবে। ভিয়েনা সম্মেলনে এই নীতি গৃহীত হয়।

ভূমিকা

অষ্টাদশ লুইঃ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল নেপোলিয়ন সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত জীবনযাপন করবার জন্য চলে গেলেন। এই বছরের মে মাসে অষ্টাদশ লুই ফরাসী জনসাধারণের অবগতির জন্য একটি শাসনতন্ত্র জারী করেন। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি ফ্রান্স শাসন করতে চান বলেও উল্লেখ করেন। ৪ঠা জুন ১৮১৪ হতে অষ্টাদশ লুই নিজের দেওয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজত্ব করতে শুরু করেন। নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপ হতে হঠাৎ ফিরে আসার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার জন্য অষ্টাদশ লুইকে পুনরায় ফ্রান্স হতে পলায়ন করতে হয়। সুতরাং 'শতদিবস কাল' (নেপোলিয়নের এলবা দ্বীপ হতে আগমন ও ওয়াটারলুর পরাজয় পর্যন্ত) লুই-এর শাসনে বিরতি কাল বলে ধরা যায়। নেপোলিয়নের চরম পরাজয়ের সাথে সাথে অষ্টাদশ লুই পুনরায় ফ্রান্সে ফিরে এলেন এবং তাঁর প্রদত্ত শাসনতন্ত্রটি পুনর্ঘোষণা করলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের রাজা ছিলেন।

অষ্টাদশ লুই-এর কার্যাবলী: ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজ বংশের যে পতন ঘটবে তা কিন্তু লুই-এর শাসনের শুরুতে অনুমান করা সম্ভব হয়নি। কারণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের সাথে পুরানো রাজতন্ত্রের বিশেষ মিল ছিল না। অষ্টাদশ লুই তাঁর শাসন শুরু করেন এক চার্টারের ওপর ভিত্তি করে। আর এখানেই তাঁর রাজত্বের সাথে ষোড়শ লুই-এর রাজত্বের পার্থক্য। এই চার্টারে ফরাসী বিপ্লব প্রসূত যে সব স্থায়ী আদর্শ জনসাধারণ মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল সেগুলিকে অগ্রাহ্য করার সাহস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের পক্ষে সম্ভব হল না। বরঞ্চ লুই-এর চার্টারে এগুলিকে মেনে নেওয়া হল।

চার্টারের স্বরূপ

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতান্ত্রিক সনদে আইনের চোখে সকলে সমান এবং গুণানুসারে চাকুরী পাবার যোগ্যতা মেনে নেওয়া হল। বে-আইনী গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ হল। ক্যাথলিকধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃত হলেও ধর্মোপাসনার স্বাধীনতা দেওয়া হল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হল। 'কোড নেপোলিয়ন' তুলে দেওয়া হল না। পোপের সাথে নেপোলিয়নের যে রফা হয়েছিল তা বাতিল করা হল না। জাতীয় রক্ষীবাহিনী ভেঙে দেওয়া হল না। সুতরাং এই সনদে বিপ্লবী যুগের সাম্যের আদর্শ প্রসূত বহু বিধিব্যবস্থা মেনে নেওয়া হল।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন: এই সনদে ফ্রান্সে দ্বি-কক্ষযুক্ত পরিষদের ব্যবস্থা হল —উচ্চতর পরিষদের নাম Chamber of Peers এবং নিম্নকক্ষের নাম Chamber of Deputies রাখা হল। প্রথমটির সদস্যরা রাজা কর্তৃক যাবজ্জীবনের জন্য মনোনীত হতেন, দ্বিতীয়টির সদস্যরা ৫ বছরের জন্য সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার দ্বারা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। যারা বৎসরে কমকরে ৩০০ ফ্রাঁ প্রত্যক্ষ কর হিসেবে দিত এবং তিরিশ বছরের ওপর বয়স ছিল তারাই ভোট দেবার অধিকারী বলে গণ্য হয়। আর যারা কম করে ১০০০ ফ্রাঁ প্রত্যক্ষ কর দিত এবং ৪০ বছরের ওপর বয়স ছিল তারা ডেপুটি নির্বাচিত হবার যোগ্য বলে গণ্য হল। এরফলে ফ্রান্সের তৎকালীন ৩ কোটি অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৮০ হাজার ভোটাধিকার লাভ করে এবং ১২ হাজার ব্যক্তি নির্বাচনে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করে। সুতরাং ফ্রান্সে এক নতুন ধরনের অভিজাততন্ত্র স্থাপিত হল। অবশ্য পূর্বেকার জন্মভিত্তিক আভিজাত্যের বদলে সম্পত্তিভিত্তিক আভিজাত্য স্বীকার করা হল।

রাজার ক্ষমতা: সনদে রাজার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা রাখা হয়। পরিষদকক্ষ দুটিকে ক্ষমতা দেওয়া হল না। রাজা নিজেই মন্ত্রী নির্বাচিত করতেন। তাঁদের

নিম্নকক্ষের সদস্য না হলেও চলত। রাজার হাতে সামরিক বেসামরিক উভয় ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত হল। তিনি আইন প্রণয়ন করবার অধিকারী হলেন। যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের হর্তা কর্তা রাজাই থাকলেন। তবে পরিষদদ্বয়ের অনুমতি ভিন্ন নতুন কর ধার্য করা যাবে না বলে সনদে বলা হল। সংক্ষেপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের কাঠামোটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ন্যায় মনে হল।

কিন্তু স্বৈরতন্ত্রী এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে পরিত্যাগ করা হল না। লুই ঘোষণা করলেন যে তিনি তাঁর অগ্রজ ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের পর হতেই ফ্রান্সের প্রকৃত রাজা এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দকে তিনি তাঁর রাজত্বকালের উনিশ বছর বলে ঘোষণা করলেন। সনদের মুখবন্ধে তিনি লিপিবদ্ধ করলেন যে তিনি স্বেচ্ছায় এই সনদ জনসাধারণকে দিচ্ছেন। এর ফলে রাজতন্ত্রীরা দাবি করল যে রাজা যখন স্বেচ্ছায় সনদটি দিয়েছেন তখন ইচ্ছা করলে তিনি এটি তুলেও নিতে পারেন। অর্থাৎ অষ্টাদশ লুই গণসার্বভৌমত্ব স্বীকার করেননি, দৈবস্বত্বে পূর্ণ আস্থা রেখে দেশ শাসন করছেন। অন্যদিকে সংবিধানপন্থীরা দাবি করল যে রাজা সিংহাসনে আরোহণ করবার সময় শপথ নিয়েছেন যে তিনি সনদে প্রদত্ত শর্তগুলি অটুট রাখবেন।

দৈবস্বত্ব ও নিয়মতন্ত্রের মধ্যে রফা

দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী রাজতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের কখনো নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন হতে পারে না। তবে অষ্টাদশ লুই খুবই চালাক লোক ছিলেন। দীর্ঘকাল অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যে বিদেশে অতিবাহিত করার ফলে তিনি বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ফ্রান্সের সিংহাসনে বসে তিনি এমন কোন কাজ করতে চাইলেন না যার ফলে তাঁকে পুনরায় দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। একারণে রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন।

লুই-এর অসুবিধা: এই সময় ফ্রান্সে চারটি রাজনৈতিক দল দেখা দিল। গোড়া বামপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল। এটিকে ultra-royalist দল বলা হত। এই দলটিকে ভারী করল একদা দেশত্যাগী অভিজাত সম্প্রদায়, এবং ধর্মযাজকরা। এই দলের নেতা ছিলেন অষ্টাদশ লুই-এর ভাই কাউণ্ট অব আর্টয়েস্ (Artois)। বিপ্লবের ফলে এদের দেশ হতে চলে যেতে হয় এবং এদের অবর্তমানে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। তাছাড়া এদের বহু আত্মীয় স্বজন বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। স্বভাবতঃই এরা যখন লুই-এর সাথে সাথে ফ্রান্সে ফেরে তখন এদের মধ্যে একটা প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং এই দলের লক্ষ্য হল ফরাসী বিপ্লবের

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

ফলে যে সব পরিবর্তন ঘটেছিল সেগুলিকে অগ্রাহ্য করা এবং প্রাক-বিপ্লব যুগের শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা। অষ্টাদশ লুই যে সনদ জনসাধারণকে দিলেন তার বিরুদ্ধে এই দল প্রবল আপত্তি জানায়। অষ্টাদশ লুই এই দলের নীতি অনুযায়ী চলতে রাজী হলেন না। নিম্নকক্ষে এগুলি নানা উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অষ্টাদশ লুই যখন এই দলের কথা অনুযায়ী চলছিলেন না তখন রাজাকে এই দলের নীতি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করবার জন্য চেষ্টা করা হল। দক্ষিণ ফ্রান্সে এরা দাঙ্গা বাধাল এবং এক নয়া সন্ত্রাসের সৃষ্টি করল। এই দাঙ্গাকে শ্বেত বিভীষিকা বলা হয়। বহু নেপোলিয়ানপন্থী ও প্রোটেষ্টাণ্টরা এদের হাতে প্রাণ হারাল। নেপোলিয়নের বহু বিশ্বস্ত সেনাপতিও রেহাই পেল না। উগ্র রাজপন্থীদের এরূপ কাজে লুই-এর সমর্থন ছিল না। অবশেষে তিনি পরিষদ ভেঙে দিলেন এবং নতুন নির্বাচনের আদেশ দিলেন। ১৮২৩ হতে এই দল পুনরায় সক্রিয় হয় এবং পরিশেষে যখন এই দলের নেতা ফ্রান্সের রাজা হলেন তখন ফরাসী জনসাধারণের জীবনে তমসা নেমে এল। ১৮৩০-এর জুলাই মাসে ফ্রান্সে যে বিদ্রোহ দেখা দিল তার অন্যতম কারণ হল উগ্ররাজপন্থীদের কার্যকলাপ। দ্বিতীয় দল হল গোঁড়া বামপন্থী দল। এরা রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল না। তবে এদের ক্ষমতা তখন সীমাবদ্ধ ছিল। নেপোলিয়নপন্থী বা বোনাপার্টিস্ট দলকেও বামপন্থী দল বলে গণ্য করা যায়। এই দলের ওপর উগ্র রাজতন্ত্রীদল খুবই অত্যাচার চালায়। মধ্যমপন্থী দল আবার দুভাগে বিভক্ত ছিল। একটা ভাগ ছিল রাজতন্ত্রীঘেষা মধ্য-পন্থী, অন্যটি ছিল বামপন্থীঘেষা মধ্য-পন্থী। প্রথমটি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের সনদকেই সর্বোত্তম বলে মনে করত এবং এটি যাতে পুরোপুরি চালু থাকে তারজন্য দাবি জানাত আর দ্বিতীয় দলটি চালু শাসনতন্ত্রটি যথেষ্ট নয় বলে মনে করত এবং আরও গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য দাবি জানাত। অষ্টাদশ লুই দক্ষিণ ঘেষা মধ্য-পন্থী দলের কথাই প্রকারান্তরে শুনতেন এবং সেইমত কাজও করতেন।

শ্বেত বিভীষিকা

অষ্টাদশ লুই-এর মন্ত্রিগণ: অষ্টাদশ লুই যেসব মন্ত্রিকে নিযুক্ত করেছিলেন তারা প্রায় সকলেই বেশ কৃতী কর্মী ছিলেন। কেউ ছিলেন পুরান অভিজাত-সম্প্রদায়-ভুক্ত, আবার কেউ ছিলেন নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ডিউক অব রিশ্যলু ছিলেন পুরানো অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত। ভিলিলি ও ডেকাজেজ ছিলেন প্রায় অজ্ঞাতকুল-শীল। কিন্তু এরা সকলেই লুইকে তাঁদের কার্যের দ্বারা ভালভাবেই সেবা করেছিলেন। এবং এঁদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই ফ্রান্স নানাদিকে উন্নতি করতে সক্ষম হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে লুই উগ্র রাজতন্ত্রী প্রভাবিত পরিষদ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেঙে দেন এবং নতুন নির্বাচনের আদেশ দেন। এই নির্বাচনে চেম্বারে উগ্র রাজপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারলেন না। মধ্য-পন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। ডেকাজেজ, রয়ার কোলাড ও গিজো এই দলের নেতা ছিলেন। এই দলের লক্ষ্য ছিল ফরাসী জনসাধারণকে রাজতন্ত্রী করা এবং রাজাকে জাতীয়তাবাদী করে তোলা। এই দল সহজেই ধনী শিল্পপতি ও ব্যাঙ্কারদের হাতে করতে সক্ষম হল। উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণী রাজাকে সমর্থন জানাল। ডিউক অব রিশালু এই সময় প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি দেশে শাসন ব্যাপারে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলেন। তাঁর মন্ত্রীত্বকালে ফ্রান্স অর্থ-নৈতিক ক্ষেতে দ্রুত উন্নতির পথে যেতে শুরু করে। ফলে রাজকোষেও অর্থ সঞ্চিত হতে লাগল। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই উন্নতি প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই। এই সময় ফ্রান্স মিত্রশক্তির প্রাপ্য যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দেয়। ফলে ফ্রান্স হতে বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর ফ্রান্সের সামরিক বিভাগের সংস্কার করা হয় এবং দেশে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ ও সংবাদ পত্রের অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ডিউক অফ রিশলুর পর ডেকাজেজ প্রধান মন্ত্রী হন। তিনিও শাসন ব্যবস্থায় মধ্যমপন্থা অনুসরণ করেন।

মধ্যমপন্থীদের শাসন

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে একটি অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে লুই-এর পক্ষে উগ্ররাজতন্ত্রীদের বশে রাখা অসম্ভব হল। রিশলু ও ডেকাজেজের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ফরাসী জনসাধারণের মনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের প্রতি যেটুকু শ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল তা এই ঘটনার পর উগ্ররাজতন্ত্রীরা যেরূপ কার্যকলাপ শুরু করল তার ফলে জনসাধারণ পুনরায় বিপ্লব-মনা হতে বাধ্য হল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রাজবংশীয় ডিউক অব বেরী আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। ইনি ছিলেন উগ্র রাজতন্ত্রীদলের নেতা অষ্টাদশ লুই এর ভ্রাতা ডিউক অব আরটয়েস-এর পুত্র। অষ্টাদশ লুই-এর কোন পুত্র ছিল না। একারণে আরটয়েসের পর ডিউক অব বেরীর ফরাসী সিংহাসনে বসার সম্ভাবনা খুবই বেশি ছিল। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে উগ্র রাজপন্থীদল প্রচার করল যে উদারপন্থীরাই ডিউককে হত্যা করেছে এবং উদারপন্থীদের এত সাহসের কারণ হল লুই এর দুর্বল শাসন। তারা এরূপ আন্দোলন শুরু করল যে লুই বাধ্য হয়ে তাদের হাতে নিজেকে সমর্পণ করলেন। এরপর ফ্রান্সে যে শাসন চলল তা অত্যাচারের নামান্তর মাত্র। তবে উগ্র রাজপন্থীরা ডিউকের হত্যার ঠিক পরপরই অত্যাচারী শাসন

প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা হস্তগত

শুরু করতে পারেনি। এটি শুরু হয় অষ্টাদশ লুই-এর মৃত্যুর পর। আরটয়েস যখন দশম চার্লস নাম নিয়ে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ভিলিলি (Villele) প্রধান মন্ত্রী হন। খুবই সতর্কতার সাথে ভিলিলি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। প্রথমেই তিনি উগ্র রাজপন্থীদের নীতি পুরোপুরিভাবে কার্যকরী করলেন না। তাঁর নীতি ছিল জনসাধারণকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ভুলিয়ে রেখে উগ্র রাজপন্থীদের নীতি ধীরে ধীরে কার্যকরী করা। বৈদেশিক নীতিতেও তিনি ভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। ভিলিলির মন্ত্রীত্বের কালে অষ্টাদশ লুই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ভিলিলির মন্ত্রিত্ব

লুই-এর কৃতিত্ব: অষ্টাদশ লুই বুরবোঁ রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। জনসাধারণের মঙ্গলসাধন করবার জন্য তিনি যেরূপ চেষ্টা করেছিলেন তাতে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্স বহু সমস্যায় জর্জরিত ছিল। তিনি দেশের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি সত্য কিন্তু যে কয়েকটি সমস্যার সমাধান করেছিলেন তারজন্যই তিনি ফ্রান্সের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সময় ফ্রান্স অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি করে। দেশে শিল্পায়ন দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। মিত্রশক্তির প্রাপ্য ক্ষতিপুরণের অর্থ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই মিটিয়ে দিয়ে এবং বিদেশী সৈন্যদের দেশ হতে চলে যাওয়ার ফলে ফ্রান্স হীনাবস্থা হতে উদ্ধার পেল। আর এরজন্য লুই-এর অবদান কম ছিল না। তাছাড়া প্রজাগণের অধিকারও তিনি কিছুটা স্বীকার করেছিলেন বলেই ফ্রান্সে ইউরোপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তিনি ফ্রান্সের পুরানো গৌরবের কিছুটা ফিরিয়ে আনেন। ফ্রান্স কনসার্ট অব ইউরোপের একজন সক্রিয় সদস্য হয় এবং ইংল্যাণ্ডের সাথে একজোটে গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরোধিতা করে। অবশ্য স্পেনের বিদ্রোহ দমন ফ্রান্সের দ্বারাই হয়েছিল। তবে এসময় অষ্টাদশ লুই সমস্ত কিছু তাঁর ভ্রাতার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

দশম চার্লস (১৮২৪-১৮৩০)**:** দশম চার্লস রাজা হবার আগে উগ্র রাজতন্ত্রী দলের নেতা ছিলেন। সুতরাং তিনি ছিলেন একটি রাজনৈতিক দলের রাজা। অন্যান্য দলগুলি প্রথম হতেই তাঁকে ও তাঁর কার্যাবলীকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। অষ্টাদশ লুই নতুন ও পুরাতন যুগের মধ্যে একটা রফা করার যে প্রচেষ্টা করেছিলেন দশম চার্লস তা করলেন না। তিনি রাজা, অভিজাত শ্রেণী ও চার্চের সমস্ত অধিকার সহ ফ্রান্সকে প্রাক-বিপ্লব যুগে

উগ্র রাজতন্ত্রপন্থী

ফিরিয়ে নিয়ে যেতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। তাঁর ছ'বছরের রাজত্বকালের ইতিহাসে এইটি ছিল একমাত্র লক্ষ্য।

প্রতিক্রিয়াশীল কার্যাবলী : সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই দশম চার্লস জনসাধারণকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন। অবশ্য এটি সম্ভব হয়েছিল তাঁর প্রধানমন্ত্রী ভিলিলির জন্য। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি দেশে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং উদারনৈতিকবাদকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হলেন। প্রথমেই তিনি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব যাজক সম্প্রদায়ের হাতে দিলেন। একজন বিশপকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। দ্বিতীয়ত তিনি যে সকল অভিজাত বিপ্লবের সময় দেশ ত্যাগ করেছিল সে সব দেশত্যাগী অভিজাতদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করলেন। তাদের জন্য প্রথম কিস্তি হিসেবে ৬৫০০০০ ফ্রা মঞ্জুর করা হল। তাঁর এই দুটি কাজে মধ্যবিত্তশ্রেণী রুষ্ট হল। কারণ প্রথমটির দ্বারা তাদের চার্চ বিরোধী মনোভাবকে অগ্রাহ্য করা হয় এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা তাদের পকেটে হাত দেওয়া হয়—মঞ্জুরিকৃত অর্থ-সংগ্রহ করা হয় সরকারী ঋণের সুদের হার কমিয়ে দিয়ে।

অভিজাত ও যাজক তোষণ নীতি

তৃতীয়ত, প্রাক-বিপ্লব যুগে বুরবোঁ রাজাদের যেখানে এবং যেমনভাবে রাজ্যাভিষেক হত চার্লসও নিজের রাজ্যাভিষেক তদনুরূপভাবে সম্পন্ন করলেন। ফলে জনসাধারণ তাঁর ইচ্ছা সম্বন্ধে সবিশেষ জানতে পারল। অর্থাৎ তিনি যে প্রাক-বিপ্লব অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চান জনসাধারণের নিকট আর অস্পষ্ট রইল না। চতুর্থত, তিনি যাজক সম্প্রদায়ের যে কোন ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করলেন এবং যে জেসুইট সম্প্রদায় পঞ্চদশ লুই-এর রাজত্বকালে ফ্রান্স হতে বিতাড়িত হয়েছিল তাদের আবার ফিরে আসতে বলা হল। জেসুইটরা ফিরে আসার সাথে সাথে আইন জারী করা হল যে ক্যাথলিক ধর্ম বিরুদ্ধ কোন কর্মের শাস্তি হল প্রাণদণ্ড। ফলে দেশময় উগ্র যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক সন্ত্রাস শাসন স্থাপনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনসাধারণ বিচলিত হল। পঞ্চমত, বিপ্লবের মধ্যে সম্পত্তির ওপর সকল পুত্রের যে অধিকার স্থাপিত হয়েছিল তার পরিবর্তন করে পুনরায় সম্পত্তির ওপর জ্যেষ্ঠপুত্রের অধিকারকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হল। ষষ্ঠত, সরকার বিরোধী মুদ্রাকর; সাংবাদিক, প্রকাশক সকলকেই বিনা বিচারে আটক রাখা হল। এর ফলে জনসাধারণ আরও সরকার বিরোধী হল। পরিষদে সরকার বিরোধীদের সংখ্যা বেশি না থাকলেও দেশময় সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হল। এই অবস্থায় ভিলিলি মন্ত্রিসভার পতন হল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে

মার্টিগনাক প্রধান মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। পুঞ্জীভূত বিদ্রোহের সম্মুখীন ও সমস্যা জর্জরিত ফ্রান্সে মার্টিগনাক কিছুটা উদারনীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করতে চাইলেন। দশমচার্লস বিরক্ত হয়ে তাঁকে সরিয়ে দিলেন এবং কুখ্যাত পলিগন্যাককে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। প্রথম হতেই জনসাধারণ পলিগন্যাকের নিয়োগে তীব্র প্রতিবাদ জানাল; কারণ তিনি ছিলেন প্রায় সকলের ঘৃণ্য। তাছাড়া পলিগন্যাক দেশত্যাগী অভিজাতদের নেতা ছিলেন এবং তাঁর মত বেপরোয়া উগ্র রাজতন্ত্রী তৎকালীন ফ্রান্সে আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। সুতরাং দেশের বিভিন্ন দল পলিগন্যাকের নিয়োগকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে মনে করল। নিম্ন পরিষদের সদস্যদের মধ্যেও এই ক্ষোভ ফেটে পড়ল। ১৮৩০-এ নিম্ন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য দশম চার্লসকে স্মরণ করিয়ে দিল যে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যশাসন করতে হলে জনসাধারণের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করতে হবে এবং সরকারের নীতির সাথে জনসাধারণের ইচ্ছার সামঞ্জস্য না থাকলে রাজতন্ত্রের সমূহ বিপদ ঘটতে পারে। দশম চার্লস তাঁদের প্রতি বিরক্ত হয়ে পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন। নতুন নির্বাচনের ফলে দেখা গেল পরিষদে সরকার বিরোধী সদস্যদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্রোহের সূচনা

অর্ডিন্যান্স জারি

দশম চার্লস তাঁর নীতি কার্যকরী করবার জন্য শেষ চেষ্টা করলেন। তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে চাইলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সেণ্টক্লাউড হতে চারটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। একটি ঘোষণা দ্বারা সংবাদপত্রের তথা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেওয়া হল। দ্বিতীয়টির দ্বারা নব নির্বাচিত পরিষদ ভেঙে দেওয়া হল। তৃতীয়টির দ্বারা নির্বাচন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হল এবং নির্বাচিত সদস্য ও ভোটদাতাদের সংখ্যা কমানো হল। ভোটদানের ক্ষেত্রে ভোটাধিকারকে এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হল যার ফলে একমাত্র অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া অধিকাংশ লোকই ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত হল। চতুর্থটির দ্বারা নতুন ভিত্তিতে আইন সভার নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হল।

জুলাই বিদ্রোহ: এই সব অর্ডিনান্স ঘোষণার ফলে চার্লসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্বেষ ফেটে পড়ল। থিয়ার্সের নেতৃত্বে প্যারিসের সংবাদপত্রের সম্পাদকবৃন্দ এই অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সংবিধানপন্থীরা এবং পরিষদের উদারপন্থী সদস্যরাও তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। প্যারিসের জনতা মন্ত্রিসভার পতন এবং সনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হক ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে গোটা শহর পরিভ্রমণ করে রাজার স্বৈরাচারী চার্টার বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিস্থিতির সৃষ্টি করল।

চার্লস প্যারিসের জনতাকে শিক্ষা দেবার জন্য সৈন্য পাঠালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহ শুরু হল। তিন দিনের মধ্যে সমগ্র প্যারিস বিপ্লবীদের অধীনে চলে এল। চার্লস দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচালেন।

পররাষ্ট্রনীতি : বৈদেশিক নীতিতে চার্লস জোরদার নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি গ্রীকদের সাহায্য পাঠান। আফ্রিকার আলজেরিয়া নামক স্থানেও তিনি সৈন্য প্রেরণ করেন এবং আলজেরিয়ার সেরা অঞ্চলটি ফ্রান্সের অধিকারে নিয়ে আসেন।

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের কৃতিত্ব : এটা বলা হয়ে থাকে যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁরাও কিছু শিখতে যেমন চাননি, ভুলতেও তাঁরা চাননি। কিন্তু এটা বলা ন্যায়-সঙ্গত হবে না। যখন অষ্টাদশ লুই ভালভাবেই জানতেন যে পূর্বেকার মত স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র অচল। জনসাধারণের সদিচ্ছার ওপর রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তিনি ফ্রান্সে বিপ্লবজাত বহু পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেন এবং জাগ্রত উদার-নৈতিক মতবাদও স্বীকার করেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন। তিনি দক্ষ লোকেদের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন যাঁদের চেষ্টার ফলে ফ্রান্সের প্রভাব দেশের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রইল না। ফ্রান্সের বৈষয়িক উন্নতি বিশেষভাবে দেখা যায়। শিল্পায়নের পথেও ফ্রান্সের এই সময়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু হয়। সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টাও এই সময়েই শুরু হয়। কিন্তু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ বিশেষ করে দশম চার্লস বুঝতে পারলেন যে উনিশ শতকে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবিগুলি অর্থনৈতিক উন্নতি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বারা দাবিয়ে রাখা যায় না। ফ্রান্সে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্রের পতন ঘটল কারণ এটি জাতীয়তাবাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেও উদারনৈতিকবাদের সাথে কোনরূপ মীমাংসায় উপনীত হতে পারল না।

Q. 2. What were the causes of the July Revolution (1830) in France ? Briefly trace its repercussions in other countries of Europe. *Or*, Account for the Revolution of 1830 in France. What were its results in France and in other countries ? *Or*, Describe the Revolutionary movements in Europe in 1830 ? why did they fail ?

Ans. ১৮৩০-এর জুলাই মাসে চরম স্বৈরাচারী ফরাসী সম্রাট দশম চার্লসের প্রতিক্রিয়াশীল জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ফ্রান্সে যে সার্থক বিদ্রোহ ঘটেছিল তা সমসাময়িক যুগের এক যুগান্তকারী ঘটনা। উদারনীতি ও রক্ষণশীলতার আপসহীন সংগ্রামের ইতিহাসে সংগ্রামী ফরাসী জনসাধারণের অবদান অবিস্মরণীয়।

মেটারনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসেবে জুলাই বিপ্লব ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ভিয়েনা সম্মেলন (১৮১৫) ন্যায্য অধিকার নীতি গ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলন ফরাসী বিপ্লবের অন্ধকার দিকটা দেখেছিল। এর ফলে ভিয়েনায় উপস্থিত রাষ্ট্রনায়কগণ বিপ্লব-পূর্ব অবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করতে চাইলেন। ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ রাজবংশ পুনরায় অধিষ্ঠিত হল।

উদারনীতিবাদ

বিদ্রোহের কারণ : অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করে উদার নৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। তিনি একটি শাসনতান্ত্রিক সনদ জারি করেন এবং ঐ সনদ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে চাইলেন। এর ফলে একটি প্রতিনিধি সভা গঠিত হল এবং জনসাধারণকে ধর্ম ও বাকস্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হল। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশীদিন টিকল না। রক্ষণশীল দল এর বিরোধিতা করতে থাকল। রক্ষণশীল দলের অধিকাংশই ছিল বিপ্লবপূর্ব যুগের অভিজাত সম্প্রদায়। তারাই বিপ্লবের ফলে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারা জনসাধারণের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করল। এই দলের নেতা ছিলেন অষ্টাদশ লুই-এর ভ্রাতা চার্লস। এই সময় ফরাসী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ডিউক ডি বেরিকে হত্যা করা হয়। রক্ষণশীল দল উদারপন্থী দলকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করল। এর ফলে ফ্রান্সে প্রতিক্রিয়াশীল দল শক্তিলাভ করে। ১৮২৪ খ্রীঃ-এ অষ্টাদশ লুই-এর মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর ভ্রাতা যিনি রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন দশম চার্লস-রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। প্রাকবিপ্লব যুগের ফ্রান্সকে তিনি ভুলতে পারলেন না। অভিজাতদের ও চার্চের যে সকল অস্বাভাবিক অধিকারগুলি ছিল তা পুনরায় বলবৎ করতে চাইলেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ তাঁর শাসনে বিরক্ত হল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে দশম চার্লস বহুনিন্দিত জনসাধারণের চক্ষুশূল পলিগন্যাক-কে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযোগ করলেন। জাতীয় সভা প্রধান মন্ত্রীর কার্যকলাপের সমালোচনা করল এবং তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করল। রাজা চার্লস জাতীয় সভা ভেঙে দিলেন।

স্বৈরতন্ত্র

উগ্রতর প্রতিক্রিয়া দশম চার্লস

নবনির্বাচিত সভাও যখন রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর সমালোচনা করল তখন এই সভাও ভেঙে দেওয়া হল। তাঁর পরামর্শে প্রধান মন্ত্রী পলিগন্যাককে স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে চারটি বিশেষ ঘোষণা বা অর্ডিনান্স জারী করলেন। (১) জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়া হল, (২) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হল, (৩) ভোটদাতাদের সংখ্যা হ্রাস করা হল এবং সম্পত্তির

ভিত্তিতে নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করা হল, (৪) নতুন ভোটার তালিকা অনুযায়ী নতুন জাতীয়সভা নির্বাচনে আদেশ দেওয়া হল এবং এতে রাজার মনোনীত সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য ১নং প্রশ্ন দেখ।)

এসব অর্ডিনান্স ঘোষণার ফলে চার্লসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ ফেটে পড়ল। থিয়ার্স-এর নেতৃত্বে সংবাদপত্রের সম্পাদকরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত থাকল না চার্লস-এর এই সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিদ্রোহ করবার জন্য আহ্বান জানাল। সংবিধান পন্থী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও চার্লসের এই স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির সমালোচনা করল। প্যারিসের জনসাধারণ মন্ত্রিসভা নিপাত যাক, সনদ দীর্ঘজীবী হক' ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে প্যারিসের রাস্তাঘাট মুখরিত করল। সংক্ষেপে বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হল। ২৮ শে জুলাই প্যারিসে বিদ্রোহ দেখা দিল।

চার্লস কর্তৃক ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অকার্যকরী করা এবং তাঁর চার্টার বিরোধী কার্যই জুলাই বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ। প্যারিসের জনসাধারণের দাবিতেও চার্টারের কথা উল্লেখ ছিল, সাংবাদিকদের প্রতিবাদেও এটির উল্লেখ করা হয়েছিল। এবং যেহেতু চার্লস চার্টারের শর্তগুলি ভেঙেছেন সেহেতু জনসাধারণকে চার্লসকে রাজা বলে মানতে নিষেধ করা হয়।

জুলাই বিপ্লব তিনদিন স্থায়ী ছিল। এই বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করল প্রাক্তন সৈনিকরা, গুপ্ত সমিতির সদস্যরা, প্রজাতন্ত্রীগণ এবং ছাত্রদল ও শ্রমিকশ্রেণী। বিপ্লব প্রধানত প্যারিসেই সীমিত ছিল। চার্লসের সৈন্যবাহিনী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়তে রাজী না হওয়ায় চার্লসের পক্ষে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া অন্যপথ ছিল না। পলায়ন করবার পূর্বে চার্লস অর্ডিন্যান্স গুলি প্রত্যাহার করে চার্টার অনুযায়ী রাজ্য শাসন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গৌরবময় তিন দিনের বিপ্লব ঘটে গিয়েছে।

জুলাই বিপ্লবের ফলাফল—ফ্রান্সে—রাজতন্ত্রবিরোধী জনতা জুলাই বিপ্লবকে সফল করলেও পরিষদের সভ্যবৃন্দ ও প্যারিসের ক্ষমতাশালী সংখ্যালঘিষ্ঠরা প্রজাতন্ত্রের বিরোধী ছিল। তাছাড়া ইউরোপীয় রাজতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা সহজ হত না। একারণে বুরবোঁ বংশের অন্যতম শাখা অলিয়েন্স বংশের লুই ফিলিপকে সিংহাসনে স্থাপন করা হল। লুই ফিলিপ রাজবংশীয় হলেও

The reign of law has been interrupted ; that of force has been begun. The government has violated the law : we are absolved from obedience,

বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। লুই ফিলিপ অবশ্য জনসাধারণের অধিকার সমূহ স্বীকার করলেন এবং অষ্টাদশ লুই প্রদত্ত চার্টার অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসেবে দেশ শাসন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল ফ্রান্সে বিশেষ দেখা যায় না। এক রাজবংশের পরিবর্তে আর এক রাজবংশ স্থাপিত হল। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে এই বিপ্লব যে ফ্রান্সে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল তা বুঝতে পারা যায়।

প্রথমত, লুই ফিলিপ রাজা হলেন সত্য কিন্তু তিনি বিপ্লবের ফলে রাজা হলেন। একারণে তিনি যে রাজতন্ত্র স্থাপন করলেন তা পূর্বেকার বুরবোঁ রাজতন্ত্রের সমচরিত্রের ছিল না। তিনি হলেন নাগরিক রাজা (citizen king) তাছাড়া, লুই ফিলিপ জনসাধারণের অধিকার মেনে নিলেন এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী রাজ্য শাসন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দ্বিতীয়ত, ভিয়েনা কংগ্রেস ও কনসার্ট অব ইউরোপে এতদিন যে জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী নীতি মেনে চলেছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গকে মানতে বাধ্য করেছিল জুলাই বিপ্লব সেই নীতির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের পতনে অর্লিয়েন্স বংশের প্রতিষ্ঠায় ভিয়েনা বৈঠকে গৃহীত বৈধাধিকারস্বত্বের (Legitimacy) নীতিকে চরম আঘাত হানল। লুই ফিলিপ জনসাধারণের ইচ্ছায় রাজা নির্বাচিত হন এবং স্বভাবতঃই জনসাধারণের সদিচ্ছার ওপর তাঁর ক্ষমতা নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং যে ভগবৎদত্ত রাজক্ষমতা বা Divine Right kingship, বুরবোঁ রাজবংশের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত সেই ভগবৎ দত্ত রাজক্ষমতার অবসান হল। তৃতীয়ত, যে অভিজাত ও যাজকদের ক্ষমতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা দশম চার্লস ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন, জুলাই বিপ্লবের ফলে এক দিকে যেমন চার্লসের সে ব্রত ব্যর্থ হল অন্যদিকে অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হল। কারণ জুলাই বিপ্লবের ফলে সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলি দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হল। ফ্রান্স সামাজিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে গেল। এদিক হতে দেখলে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব ১৭৮৯-এর বিপ্লবের পরিপূরক বলা যেতে পারে।*

*'The Revolution of 1830 was the complement of the Revolution of 1789 . for the future the achievements of the revolutionary spirit—the principles of equality, secularism and constitutional liberty rested on secure foundation'. Lipson.

(৩) পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হল এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এর ওপর ন্যস্ত হল। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হল এবং গণ সার্বভৌমত্বের নীতি শক্তিশালী হল। ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। তাছাড়া জুলাই বিপ্লবের সূত্রপাত করে ফ্রান্স ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র হতে বের হয়ে এল।

(৪) সর্বশেষে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা সম্মেলনের নীতিগুলির বিরুদ্ধে জুলাই বিপ্লবই প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। বুরবোঁ বংশের বদলে অরলিঁয় বংশের রাজা নির্বাচন করে ফরাসীগণ ভিয়েনা সম্মেলনের 'ন্যায্য অধিকার নীতি' বানচাল করে দিল এবং ফ্রান্সে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা ও অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার আশঙ্কা নির্মূল হল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। তারা প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত শ্রেণীকে এবং অপরদিকে শ্রমিক শ্রেণীর উগ্র সাম্যবাদী দাবিদাওয়া দাবিয়ে রেখে দেশের রাষ্ট্রীক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করল।

ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া: ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে যথাসময়ে পৌছালো। এই বিপ্লবের ফলাফলে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দেশপ্রেমিকরা আবার জাতীয়তাবাদ ও স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আন্দোলন শুরু করল। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল যে সব রাজশক্তি পনের বছর ধরে বিপ্লবের স্রোত নিরুদ্ধ করে রেখে ছিল, এখন আবার হঠাৎ তার প্রবাহে তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

বেলজিয়মের স্বাধীনতা: ফ্রান্সে 'জুলাই বিপ্লবের' পরেই অক্টোবর মাসে বেলজিয়মে বিপ্লবের সূচনা হল। ভিয়েনা সম্মেলন এই দেশটাকে হল্যাণ্ডের সহিত মিলিত করে দিয়েছিল; কিন্তু এই দুটি দেশের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। এজন্যই হল্যাণ্ডবাসী ডাচ্ বা ওলন্দাজদের শাসনপদ্ধতি বেলজিয়মবাসীদের অসহ্য হয়ে উঠেছিল। হল্যাণ্ড বেলজিয়মের উপর ডাচ্ আইন জারি করে ডাচ্ ভাষাকেই সরকারী ভাষা রূপে প্রবর্তিত করে, এবং সেনাদলে, রাজকার্যে ও শিক্ষাকেন্দ্রে ডাচ্‌দের অধিকার স্থাপন করে, দেশভক্ত বেলজিয়মবাসীদিগকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। এজন্যই তারা হল্যাণ্ডের অধিকার হতে মুক্তিলাভ করবার জন্য বিদ্রোহী হল। ফ্রান্স এটা সমর্থন করল; ইংল্যাণ্ডও এই ক্ষুদ্র দেশের দুর্ভোগ দূর করতে চাইল; রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া বা প্রাশিয়াও এতে বাধা দিতে আসল না। অবশেষে লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক সভার সিদ্ধান্তে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল।

বেলিজিয়ম

রাশিয়ার শাসনাধীন পোল্যাণ্ডের অধিবাসী পোলগণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিদ্রোহের সূচনা করল, কিন্তু তারা বেলজিয়মবাসীদের মতো কৃতকার্য হতে পারল না। দূরবর্তী ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাদের কোন সাহায্য করল না, প্রাশিয়া বা অষ্ট্রিয়াও তাদের দিকে দৃষ্টি দিল না। রাশিয়ার যার প্রথম নিকোলাস (পূর্বতন জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের ভ্রাতা) কঠোর হস্তে তাদের দমন করে তাদের স্বাধীনতার আশা দূর করে দিলেন।

পোল্যাণ্ড

ইটালী

ইটালীতেও জাতীয়তামূলক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু তা তেমন কার্যকরী হয়নি। ইটালীর অন্তর্গত পোপের অধিকৃত স্থানগুলির অধিবাসীরা পোপের বিরুদ্ধে এবং পার্মা ও মোডেনার জনগণ হ্যাপস্‌বার্গ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু মেটারনিক সম্পূর্ণরূপে তাদের দমন করে দিয়েছিলেন। জার্মানীর স্যাক্সোনি, হ্যানোভার প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নানা দাবিদাওয়ার জন্য ভীষণ আন্দোলন করে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখালে রাজন্যবর্গের অনুমোদনে তারা অনেক সুযোগ-সুবিধা পেল। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ায় অবশ্য বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে গণ অভ্যুত্থানে মেটারনিক ভীত হলেন। তিনি জার্মান কনফেডারেশনের অধিবেশন ডাকলেন এবং ফেডারেল ডায়েটকে বিপ্লব বিরোধী আইন পাস করতে বাধ্য করলেন। যে সব রাজ্যের রাজারা জনসাধারণের চাপে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল তারা এই সুযোগে নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল করে পুনরায় স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রবর্তন করল।

জার্মানী

স্পেন ও পর্তুগালে—জুলাই বিপ্লবের সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্পেন ও পর্তুগালের জনসাধারণ আংশিকভাবে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা আদায় করল। অবশ্য এর পিছনে কেবলমাত্র জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ছিল না, স্পেনে সুদীর্ঘকাল ধরে উত্তরাধিকারমূলক গোলযোগ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল অবস্থাও এই পরিবর্তনের জন্য কিছুটা দায়ী ছিল। সুইজারল্যাণ্ডেও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়। সুইস যৌথরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ক্যাণ্টনের শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্রের নাম-গন্ধ ছিল না। জুলাই বিপ্লবে উৎসাহিত হয়ে এই সব ক্যাণ্টনের জনসাধারণ আন্দোলন শুরু করে। ফলে ক্যাণ্টিনগুলির শাসনকর্তৃপক্ষগণ জনসাধারণের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

জুলাই বিপ্লবের প্রতিধ্বনি ইংল্যাণ্ডেও শোনা গেল। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল শাসন কর্তৃপক্ষ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিকে আর অগ্রাহ্য করতে পারল না।

ফলে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভাই প্রথম সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ করতে বাধ্য হল।

জুলাই বিপ্লবের তাৎপর্য ঃ কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে জুলাই বিপ্লব কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছিল। এই বিপ্লব কেবলমাত্র বিপ্লবী চেতনাকে উদ্দীপিত করেছিল, আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত হয়নি।* একমাত্র বেলজিয়াম ছাড়া অন্ত কোন দেশে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান সাফল্যলাভ করেনি এবং সেকারণেই গণসার্বভৌমত্ব অধিকাংশ দেশেই স্বীকৃত হল না। একারণে ভিক্টর হুগো এই বিপ্লবকে মাঝপথে থমকে যাওয়া বিপ্লব বলছেন।** এমন কি ফ্রান্সেও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিলাভ করেনি।

তবে এটা ঠিকই জুলাই বিপ্লব একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বেলজিয়ামের স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার ফলে ভিয়েনা সম্মেলনের ইউরোপের পুনর্গঠিত কাঠামোতে ফাটল ধরল। যদিও পোল্যাণ্ড, ইটালী ও জার্মানীতে বিদ্রোহ ফলপ্রসূ হয়নি তবুও একথা সর্বৈব সত্য যে জুলাই বিপ্লব ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের জনসাধারণের মনে এক নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করল এবং ভবিষ্যতের জন্য বিপ্লবী ভাবধারার নীতিসমূহ— সাম্য, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও শাসনতান্ত্রিক অধিকারের নীতিগুলি নিরাপদ ভিত্তিতে স্থাপিত হল। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ যে একেবারে ধ্বংস করা যায় না জুলাই বিপ্লব তাই প্রমাণ করে। এ দুটি শক্তি সাময়িকভাবে ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি দ্বারা কোণঠাসা হয়েছিল মাত্র এবং যখনই সুযোগ এল পুনরায় আত্মপ্রকাশ করল। সুতরাং জুলাই বিপ্লবের মধ্যেই পরবর্তীকালে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বৃহত্তর বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল।

Q 3. Describe the reign of Louis Philippe in France. What was its nature? What problems did this monarchy face?

Ans ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের ফলে অরলিয়ঁ বংশীয় লুই ফিলিপ ফ্রান্সের সিংহাসনে বসবার সুযোগ লাভ করেন। জুলাই মাসে এ ঘটনা ঘটেছিল বলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র বা তার শাসনকালকে জুলাই রাজতন্ত্র বা July Monarchy বলা হয়। লুই ফিলিপ ভগবানের অনুগ্রহ ও জাতির ইচ্ছানুসারে ফরাসী জনসাধারণের রাজা হলেন।***

ভূমিকা

* The July Revolution awakened the revolutionary tradition without satisfying national aspirations.

** A revolution stopped half way.—*V. Hugo* in Philosophies Meleos (1841)

*** King of the French by the grace of God and the will of the nation.

অরলিয় বংশের শাসনের তাৎপর্য : লুই ফিলিপের সিংহাসন আরোহণ ফ্রান্সের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করল। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের সাথে নিবিড়ভাবে ও নিশ্চিতভাবে দৈবস্বত্ব ক্ষমতার ভিত্তি শিথিল হল। তাঁর সিংহাসনে আরোহণ বংশগত কোন নীতির ভিত্তিতে হয়নি। জনসাধারণের ইচ্ছার ওপর অনেকটা তা নির্ভর করেছিল। সুচতুর লুই ফিলিপ নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টির জন্য সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্ক রেখে নিজেকে নাগরিক রাজা বা Citizen King-এ পরিণত করেছিলেন। রাজা হয়েও তিনি তাঁর বাইরের সরলতা ত্যাগ করেননি। সিংহাসনে বসবার পূর্বে তিনি পায়ে হেঁটে অধিকাংশ জায়গায় যেতেন, সাধারণ রেস্তোরাঁয় আহার করতেন, নিজের ছেলেদের সাধারণ স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। এর ফলে জুলাই বিপ্লবের পূর্বে তাঁর কথা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকল এবং জনসাধারণ মুগ্ধ হল তাঁর গণতান্ত্রিক মনোভাব ও আচারব্যবহার দেখে। সুতরাং বিপ্লবের ফলে সিংহাসন যখন খালি, তখন সিংহাসনে বসবার জন্য তাঁর মত যোগ্য লোক প্যারিসের জনসাধারণ আর খুঁজে পেল না। তারা ভাবল, লুই ফিলিপের হাতে তাদের স্বার্থ ও অধিকার নিরাপদ থাকবে। কিন্তু তৎকালীন ফরাসীরা বুঝতে পারেনি যে লুই ফিলিপের বাহ্যিক উদারতার পিছনে এক ক্ষমতালিপ্সু স্বৈরাচারী মন ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদাই উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। ব্যক্তিগত স্বৈরাচারী ক্ষমতা স্থাপন কিভাবে করতে হয়, নিজ স্বার্থের জন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার, কায়দাকানুন সম্বন্ধে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

লুই ফিলিপের মানস প্রকৃতি

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন : জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রে কিছুটা পরিবর্তন আনা হল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হল। ধর্মীয় উদার-নীতি গ্রহণ করা হল। ১৮১৪-এর চার্টারে রাজাকে যে সব অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সেগুলি বাদ দেওয়া হল এবং জন্মকৌলীন্য প্রথা পরিত্যক্ত হল। পরিষদের সদস্য হবার, নির্বাচনে দাঁড়াবার বয়সগত এবং ট্যাক্সগত যোগ্যতা কমানো হল। ভোটার সংখ্যাও বেশ বাড়ানো হল ভোট দেবার বয়সগত ও ট্যাক্সগত যোগ্যতা কমিয়ে। ফলে ভোটের সংখ্যা আগের চেয়ে দ্বিগুণ হল। লুই ফিলিপের সিংহাসনে বসবার সময় সাংবিধানিক পরিবর্তন কিছুটা আনা হল এবং উদারনৈতিকদের সমর্থনলাভের জন্য ও তাদের সন্তুষ্টিবিধানের চেষ্টা হিসেবে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হল। কিন্তু আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনুগত্যের ওপরই তিনি নির্ভর করলেন। ফলে গণতান্ত্রিক কাঠামো থাকলেও তাঁর শাসনে মধ্যবিত্তেরই

আধিপত্য স্থাপিত হল। সুতরাং লুই ফিলিপের শাসনকালে জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

রাজত্বকালের দুটি পর্যায়: লুই ফিলিপ ১৮ বছর ধরে ফ্রান্স শাসন করেন। তাঁর শাসনকাল দুভাগে ভাগ করা যায়: (ক) ১৮৩০ হতে ১৮৪০ এবং (খ) ১৮৪০ হতে ১৮৪৮। প্রথম পর্যায়ে লুই ফিলিপের রাজবংশ টিকিয়ে রাখবার জন্য বিরোধী পক্ষগুলির সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করতে হয়। এই সময় ফ্রান্সের বৈষয়িক উন্নতিও অবশ্য দেখা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে লুই ফিলিপের বিরুদ্ধ শক্তি বিশেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি এবং আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থানের সংখ্যাও এই সময় কম ছিল। এর কারণ হল লুই ফিলিপের সরকার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করেছিল এবং ছলে-বলে-কৌশলে নিজের ক্ষমতা অটুট রাখবার জন্য সদাসর্বদা চেষ্টিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এক সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে বিদ্রোহ দেখা দিল তার ফলে লুই ফিলিপকে দেশ হতে পালিয়ে যেতে হল।

জুলাই রাজতন্ত্রের দুর্বলতা: জুলাই রাজতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল না। বিপ্লবজনিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই রাজতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল অর্থাৎ এক অস্বাভাবিক অবস্থা লুই ফিলিপকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসায়। কিন্তু বিপ্লবের উন্মাদনা যখন কেটে গেল, জনসাধারণ সুস্থ মনে বিচারবিবেচনা করতে শুরু করল তখন জুলাই রাজতন্ত্রের দুর্বলতা তাদের নিকট গোপন রইল না। তারা দেখল যে এই রাজতন্ত্রের পিছনে বিশেষ কোন শক্তি নেই। একমাত্র উচ্চমধ্যবিত্তরাই এই রাজ-তন্ত্রকে একদিকে যেমন টিকিয়ে রেখেছে তেমনি তারাই এই রাজতন্ত্রের পক্ষপুটে-দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করেছে। এই রাজতন্ত্রের পিছনে বিপ্লবকালীন কনভেনশন সরকারের ন্যায্য গণসমর্থন ছিল না, কিংবা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ বংশের ন্যায্য বৈধাধিকার স্বত্বের ওপরও এটি প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কিংবা নেপোলিয়নের ন্যায্য সামরিক শক্তি বা সাম্রাজ্য গৌরবও এই রাজতন্ত্র দাবি করতে পারত না। ফলে সুদীর্ঘ আঠার বছরের শাসনকালে লুই ফিলিপ কোন শক্তিশালী দলের আনুগত্যলাভ করতে পারেননি। তাঁর রাজত্বের প্রথম দশ বছরে তাঁকে প্রত্যেক বছরেই একটি করে নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি করতে হয়েছিল। এতেই বোঝা যায় যে জুলাই রাজতন্ত্রের ভিত্তি কিরূপ দুর্বল ছিল। তাছাড়া তাঁর শাসন শুরু হবার কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি অগণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করে জনসাধারণের কণ্ঠরোধ করতে চাইলেন, শ্রমিক অভ্যুত্থান কঠোর হস্তে দমন

জুলাই রাজতন্ত্রের স্বরূপ

করলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিলেন। জুলাই বিপ্লবের ফলে জনসাধারণ যেটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়েছিল তা কয়েক বছরের মধ্যেই লোপ পেল। পররাষ্ট্র নীতিতেও জুলাই রাজতন্ত্র কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। ফরাসী জনসাধারণ যেরূপ আশা করছিল তা পূরণ করা এই রাজতন্ত্রের পক্ষে সম্ভব হল না। ফলে জনসাধারণ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হল।

বিরোধী দলগুলি: জুলাই রাজতন্ত্রের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। ন্যায্য অধিকারবাদীগণ লুই ফিলিপের রাজতন্ত্রকে অবৈধ বলে বিশ্বাস করত; দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী এই সব ব্যক্তিদের নিকট দশম চার্লসের পৌত্র ছিলেন ফ্রান্সের সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। উগ্র ক্যাথলিকপন্থীরা লুই ফিলিপকে সমর্থন করত না, কারণ তিনি রাষ্ট্র হতে ধর্মকে পৃথক করে দিয়ে তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা নষ্ট করে দেন। শিক্ষাক্ষেত্র হতেও যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়ার ফলে এরা লুই ফিলিপের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়। প্রজাতান্ত্রিকরা প্রথমে লুই ফিলিপের সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে সাহায্য করেছিল কিন্তু যতই দিন যেতে থাকল ততই তারা জুলাই রাজতন্ত্রের রূপ সম্বন্ধে মোহমুক্ত হল এবং লুই ফিলিপের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য তৎপর হল। সমাজতন্ত্রীরা লুই ফিলিপের মধ্যবিত্ত সমর্থিত, মধ্যবিত্তের স্বার্থে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার চরম বিরোধী ছিল। উগ্র সমাজতন্ত্রী ব্লাঙ্কী ও মধ্যমপন্থী লুই ব্লাঙ্কের শ্রমিক শ্রেণীর ওপর বিশেষ প্রভাব ছিল। তাঁরা দেশের সম্পদের সমবণ্টন ও পুঁজিপতিদের বিলোপ সাধনের উপায় খুঁজছিলেন। এ দুটি কার্য পরিণত করতে হলে প্রথমেই লুই ফিলিপের শাসনের বিলোপ সাধন প্রয়োজন ছিল। জাতীয় ঐতিহ্যবাদী বোনাপার্টিস্টদল লুই ফিলিপের পররাষ্ট্র নীতিকে পঙ্গু, দুর্বল ও দেশের অমর্যাদাকর বলে মনে করল। স্বভাবতই ফিলিপও তাঁর মন্ত্রীদের পক্ষে এতগুলি রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করা সাধ্যাতীত ছিল। তাঁর রাজ্যকালে যে ক্রমাগত বিদ্রোহী অভ্যুত্থান ঘটাবে তা এ হতেই বোঝা যায়।

উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী-নির্ভর জুলাই রাজতন্ত্র

আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী: সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবার জন্য ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের সময় বিশেষভাবে আন্দোলন চলেছিল। এর কারণ হ'ল জুলাই রাজতন্ত্রের কার্যাবলীতে মুষ্টিমেয় উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছাড়া অন্য কারও সুবিধা হল না। দেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পেলেও জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি হল না। লুই ফিলিপের সরকার কোনরূপ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন পছন্দ করলেন না। ফ্রান্সে বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে সম্পত্তির

নির্বাচনে শঠতা

মালিকরাই ভোট দেবার অধিকারী ছিল এবং সম্পত্তির মালিকানার সীমা এরূপ ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে উচ্চ মধ্যবিত্তরাই এই অধিকার পেল। তাছাড়া ক্ষমতাসীন দল এভাবে নির্বাচন পরিচালনা করবার ব্যবস্থা করল যার ফলে কেবলমাত্র সরকারের তাঁবেদাররাই নির্বাচনে জিততে পারে। বিপক্ষ দলকে পরাজিত করবার জন্য নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা হল। ফ্রান্সে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিপার্টমেণ্ট প্রধান প্রিফেক্টদের মারফৎ ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনে জয়ের পথ নিশ্চিত করে দেবার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করত। এসম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী কাসিমির পেরিয়ার তাঁদের নির্দেশ দেন যে সরকার দৃঢভাবে বিশ্বাস করে যে দেশের স্বার্থের জন্যই সরকারের ক্ষমতায় আসীন থাকা অপরিহার্য।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কাসিমির পেরিয়ার (Casimir Perier) জুলাই রাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ নীতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করলেন—জুলাই রাজতন্ত্র সামাজিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, স্বাধীন অথচ সুশৃঙ্খল ও আইনানুগ শাসন পদ্ধতি চালু রাখাই এর প্রধান লক্ষ্য। অতএব বেআইনী কার্যকলাপ, হিংসাত্মক কার্যাবলী কঠোর হস্তে দমন করা হবে। অভ্যন্তরে বা বিদেশে গণ-অভ্যুত্থান সমর্থন করা হবে না, সরকারের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং রাজতন্ত্রের সাথে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংগতি বিধানই হবে জুলাই রাজতন্ত্রের অবশ্য কর্তব্য।

শিল্পায়ন জনিত সমস্যা: কাসিমির পেরিয়ারের উপরিউক্ত নীতিই জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন মন্ত্রিসভা কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করে কিন্তু পরিশেষে ব্যর্থ হয়। কারণ উদারনীতিতে বিশ্বাসী সকলেই জুলাই রাজতন্ত্রে কায়েমী স্বার্থবাদী নীতি, স্বজনপোষণ, নির্বাচনে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবসান চাইল। তখনকার দিনে মনে করা হত যে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হলে এগুলি দূর হবে। তাছাড়া ফ্রান্সে এই সময় শিল্পায়নের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একদিকে যেমন উন্নতি ঘটেছিল, অন্যদিকে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে জনসাধারণ ও বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীকে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হল। সরকার এদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ আইনকানুন প্রবর্তন করলেন না। একারণে ফ্রান্সে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য যে আন্দোলন চলে তার পরিপূরক হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবার জন্য আন্দোলন চলতে থাকল। উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সময় জোর করে বলত যে রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সব বৈষম্য রয়েছে সেগুলি দূর করতে পারে না।

জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী

অতএব রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন অর্থ হয় না। কিন্তু সাধারণ লোক বাস্তবে দেখতে পেল যে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক উন্নতির মূলে রয়েছে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বা অধিকারগুলি। একারণে তারা মনে করল, যে রাজনৈতিক ক্ষমতা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতির কারণ সেটি তাদের ক্ষেত্রেও উন্নতির কারণ কেন হবে না ?*

শিল্পায়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি : আভ্যন্তরীণ সংস্কার : জুলাই রাজতন্ত্রের আমলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেছিল। শিল্প ও ব্যবসায়বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য লুই ফিলিপের সরকার বিশেষভাবে চেষ্টিত হয় এবং শিল্পমালিক ও ব্যবসায়ীদের নানারূপ সাহায্য ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় কিন্তু ১৮০৮-এর মধ্যেই ফ্রান্সে দু হাজার মাইলের বেশি রেলপথ স্থাপিত হয়ে যায়। এর ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। দেশের পুরানো রাস্তার সংস্কার সাধন করা হল এবং কয়েকটি নতুন রাজপথ তৈরি করা হল। আলসেস ও নর্মাণ্ডি অঞ্চলে কার্পাস শিল্প, লরেনে ও লয়ের অঞ্চলে ধাতু শিল্প এবং লায়নস্ অঞ্চলে রেশম শিল্প বিশেষ ভাবে গড়ে উঠল। এর ফলে কয়েকটি শহরের লোকসংখ্যা ও পরিধি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেল। কলকারখানায় শ্রমিক নিয়োগ, মজুরি ও কাজের সময় সম্বন্ধে কোন আইনকানুন ছিল না। কারখানার মালিকরা নির্বিচারে অল্পবয়স্ক বালক ও নারীদের নিয়োগ করতে লাগল। কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে থেকে শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক দুর্গতির সীমা থাকল না। দেশে কলেরা এবং যক্ষ্মা রোগ মহামারীরূপে দেখা দিল। ১৮৪০-এ দেখা গিয়েছিল যে দশটি শিল্পপ্রধান অঞ্চল হতে যে দশ হাজার যুবক সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল তাদের মধ্যে ৯ হাজারকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর অনুপোযোগী বলে বাদ দেওয়া হয়। দেশের শিল্পায়নের জন্য জনসাধারণকে এই ক্ষতিস্বীকার করতে হয়েছিল। আবার এই সময় সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যে সব অভ্যুত্থান ঘটেছিল সেগুলির মূলেও ছিল এই শিল্প বিপ্লবজনিত দুঃখদুর্দশা।

লুই ফিলিপের সরকার অবশ্য শ্রমিক বিষয়ক কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেছিল। যেমন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের কারখানা আইন দ্বারা বস্ত্রশিল্পে বালকদের নিয়োগ বন্ধ করা

*The shrewdness of the common man taught him that what was sauce for the bourgeois goose was likely to be sauce for proletarian gander.—David Thomson, Europe Since Napoleon

হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে জেলা পরিষদের নাম করা যেতে পারে। এই জেলাপরিষদগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও দীন দরিদ্রের প্রতি নজর রাখত।

শিক্ষা ক্ষেত্রে জুলাই রাজতন্ত্রের অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাসম্বন্ধীয় আইনের দ্বারা ফ্রান্সের প্রত্যেক কমিউন-এ সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করা হল।

ক্রমাগত বিদ্রোহী অভ্যুত্থান: লুই ফিলিপের শাসনকাল বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, হরতাল ও গণ-অভ্যুত্থানে ভরপুর। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রভেন্স ও লা-ভেণ্ডি প্রদেশের ডাচেস অব বেরীর নেতৃত্বে ন্যায্য অধিকারবাদীরা অভ্যুত্থান ঘটায়। এই সব অভ্যুত্থান অবশ্য সহজেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়। বোনাপার্টিস্টরা লুই নেপোলিয়নের নেতৃত্বে স্ট্রাসবুর্গ ও বুলোনে বিদ্রোহ করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। লুই ফিলিপের রাজত্বকালের প্রথম পাঁচ বছরে অসংখ্য বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং এই বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, হরতাল ও প্রতিবাদ দিবসের উদ্যোক্তা ছিল প্রজাতন্ত্রীরা যারা মনে করেছিল যে ১৮৩০-এ তাদের ঠকানো হয়েছে। ১৮৩১-এ লায়ন্সের রেশম শিল্পের শ্রমিকরা বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ যখন ভীষণ আকার ধারণ করল তখন লুই ফিলিপের সরকার সামরিক শক্তির সাহায্যে শ্রমিকদের এই আন্দোলন ভেঙে দিল। এই ঘটনার পর শ্রমিক শ্রেণীর জুলাই রাজতন্ত্র সম্বন্ধে মোহভঙ্গ হল। তারা প্রজাতন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত গুপ্ত সমিতিগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকল। আর ঠিক এই সময় ফ্রান্সে অসংখ্য রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। এগুলির মধ্যে 'ফ্যামিলিজ', সিজনস, রাইটস্ অব ম্যান প্রভৃতি গুপ্ত সমিতিগুলির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অগষ্ট ব্লাঙ্কি এই গুপ্ত-সমিতিগুলির নেতা ছিলেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্রোহ

গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতিগুলির কার্যকলাপ

গুপ্ত সমিতিগুলির তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে এবং লুই ফিলিপকে হত্যা করবার কয়েকবার চেষ্টা হলে সরকার অগণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করল। ১৮৩৪-এর এক আইন দ্বারা বিনা অনুমতিতে দলবদ্ধ হওয়া বা সভা করা বন্ধ করা হল। এই আইনের বিরুদ্ধে প্যারিস ও বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের সাথে সরকারী ফৌজের লড়াই বাঁধল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক শ্রেণী, প্রজাতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রীরা এক বিরাট অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে। ১২ মে এই অভ্যুত্থান ঘটল। পূর্বেকার বিপ্লবের মত বন্দুকের দোকান

শ্রমিক শ্রেণীর ব্যর্থ অভ্যুত্থান

লুট করা হল। কিন্তু বিদ্রোহীরা সফলতা অর্জন করতে পারল না। তারা জাতীয় রক্ষী বাহিনী বা সৈন্যবাহিনীর কোন সাহায্য পেল না। ফলে এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবার ফলে ফ্রান্সের জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা যখন আরও বাড়ল তখন আর সরাসরি বিদ্রোহ করা সম্ভব হল না। ১৮৪০-এর পর লুই ফিলিপের সরকার বিভিন্ন আন্দোলনের হাত হতে কিছুটা রেহাই পায়। ফ্রান্সের জেলখানাগুলি এই সময় অবশ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বারা ভর্তি ছিল। এবং এই জেলখানাগুলিই রাজনৈতিক প্রচারের উৎসস্থল হল।

সংবাদপত্র দলন: ফ্রান্সের প্রগতিপন্থী সংবাদপত্রগুলি প্রথম হতেই জুলাই শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন নীতিগুলির সমালোচনা শুরু করে। এই সংবাদপত্রগুলির মধ্যে ন্যাশনাল ও ট্রিবিউন-এর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ট্রিবিউন পত্রিকাটির ওপর সরকারের রোষবহ্নি পড়ে। বহুবার এটিকে অভিযুক্ত করা হয় এবং প্রচুর অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কয়েকটি দমনমূলক আইন প্রবর্তন করল। এগুলির দ্বারা সংবাদপত্রের ওপর কড়া সেন্সর প্রথা স্থাপন করা হল এবং বিনা বিচারে নাটক, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে বিচারে শাস্তির ব্যবস্থা করা হল।

নেপোলিয়নের স্মৃতির পুনরাবির্ভাব: জনসাধারণের ঐতিহ্যধর্মী মনকে কিছুটা সন্তুষ্ট করবার জন্য লুই ফিলিপের সরকার চেষ্টা করল। সম্রাট নেপোলিয়নের স্মৃতিকে সর্বপ্রকারে সম্মানিত করবার ব্যবস্থা করল। বড় বড় রাজপথের নামকরণ তাঁর নামে করা হল, সবশেষে সেন্ট হেলেনা হতে তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে এসে প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে রাজকীয় সম্মানের সাথে সমাধিস্থ করা হল। কিন্তু যা ভেবে লুই ফিলিপ এসব করলেন ফল কিন্তু ঠিক তার বিপরীত হল। জনসাধারণের চোখে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হলেন যখন তারা নেপোলিয়নের সাথে তাকে তুলনা করল। অন্যদিকে লুই নেপোলিয়নের পক্ষে পরবর্তীকালে রাষ্ট্রযন্ত্র হস্তগত করার সুবিধা হল।

শাসকদলে ভাঙন: কাসিমির পেরিয়ার ছিলেন লুই ফিলিপের প্রথম প্রধান মন্ত্রী। তিনিই ক্ষমতাসীন দলের নীতি নির্ধারণ করে দেন এবং এই দলের অন্যান্য নেতাদের তিনি রাজনৈতিক গুরু ছিলেন। ১৮৩২-এ হঠাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটলে ক্ষমতাসীন দলে ভাঙন দেখা দিল। এই দলটি দুভাগে ভাগ হল। একটি দলের নেতা হলেন গিজো, অপরটির থিয়ার্স। লুই ফিলিপ একের পর এক মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করেন এবং ভেঙে দেন। থিয়ার্সও কিছুদিনের জন্য প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন কিন্তু রাজার সাথে তাঁর মতের গরমিল

গিজো ও থিয়ার্স

হওয়ায় তাঁকে পদত্যাগ করতে হল। এর পর থিয়ার্স সরকার-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। ১৮৩৮-এর নির্বাচনের পর নতুন পরিষদে চারটি রাজনৈতিক দলের দেখা পাওয়া যায়—দক্ষিণপন্থী, দক্ষিণ অথচ মধ্যপন্থী, বামপন্থী, বাম অথচ মধ্যপন্থী। ১৮৪০-এ গিজো প্রধান মন্ত্রী হলেন এবং লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত তিনিই প্রধানমন্ত্রীরূপে টিকে থাকেন। গিজো সুপণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও সুবক্তা বলে পরিচিত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সাধুপ্রকৃতির লোক। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন চরম অসাধু এবং দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, সুবিধাদান ও অনাচারের প্রবর্তক। আভ্যন্তরীণ নীতিতে তিনি কোনরকম সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর নীতি ছিল সর্বত্র এবং সর্বসময়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা। রাজনীতিতে থিয়ার্স তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আর এই মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি মৌলিক সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে—থিয়ার্সের মতে রাজা রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না। অর্থাৎ মন্ত্রিসভাই পরিষদের সাহায্যে দেশ শাসন করবেন এবং পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন। অন্যদিকে গিজোর অভিমত হল রাজার শাসন ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে। রাজা শুধু রাজত্ব করেন না, শাসনও করেন। ক্ষমতাহীন চেয়ার রাজসিংহাসন নয়। বলাই বাহুল্য যে, লুই ফিলিপ গিজোর মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন এবং গিজোর মন্ত্রিসভার মাধ্যমে নিজের বহুদিনের আশা চরিতার্থ করবার প্রয়াসী হলেন। অন্যদিকে থিয়ার্সপন্থীরা জুলাই রাজতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক নীতির বিরোধিতা করতে শুরু করল। থিয়ার্সপন্থীরা লুই ফিলিপের বৈদেশিক নীতিরও তীব্র সমালোচনা করতে থাকল। কিন্তু এতে ফল কিছু হল না। লুই ফিলিপের সরকার থিয়ার্সপন্থীদের সকল দাবী অগ্রাহ্য করল। অবশেষে প্রগতিপন্থী মধ্যবিত্তশ্রেণী বুঝতে পারল যে চালু শাসনতন্ত্র না বদলাতে পারলে বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না। একারণে তাঁরা ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। কিন্তু তাদের আন্দোলন দাবিয়ে রাখবার জন্য গিজো সরকার সবরকম ব্যবস্থা নিলেন। কিন্তু আন্দোলনকারীরা এক নতুন পন্থা অবলম্বন করলেন। তাঁরা শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ করবার জন্য সংস্কার-ভোট-সভা (reform banquets) ডাকতে থাকলেন। এই সব সভায় সংস্কার কেন দরকার সে সম্বন্ধে আলোচনা চলত। গিজো সরকার ভীত হয়ে দমননীতির আশ্রয় নিলেন এবং এই প্রকার সভা বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। আন্দোলনকারীরা এতে পিছু হটল না। তারা ২২শে ফেব্রুয়ারী প্যারিসে এক বিরাট সংস্কার ভোট

ভোটাধিকার দাবিতে আন্দোলন

সভার আয়োজন করলেন। বলাবাহুল্য, গিজো সরকার আগে হতেই এই সভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। কিন্তু সরকারের এই নিষেধে কেউ কর্ণপাত করল না। প্রগতিপন্থী জনসাধারণ দলে দলে এই সভায় যোগ দেবার জন্য আসতে থাকল। শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলের রাস্তায় অবরোধ-প্রাকার তৈরী করা হল। সরকার এদের বিরুদ্ধে 'জাতীয় বাহিনী' প্রেরণ করলেন কিন্তু তারা আন্দোলনকারীদের পক্ষ অবলম্বন করল। লুই ফিলিপ এতে ভীত হয়ে গিজোকে পদচ্যুত করলেন। কিন্তু অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে। প্রজাতান্ত্রিকরা এই অরাজক অবস্থার সুযোগ নিল। তারা প্যারিসের জনতাকে জুলাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করল। এর ফলে গিজোর বাড়ির সামনে এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা উপস্থিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকল। এই জনতাকে দমন করবার জন্য গিজোর গৃহরক্ষীদল গুলি বর্ষণ করে। ফলে কয়েকজন হতাহত হয়। এর ফলে প্যারিস শহরে বিপ্লব দাবানলের মত বিস্তৃত হল। ক্রুদ্ধ জনতা জুলাই রাজতন্ত্রের অবসান দাবি করল। লুই ফিলিপ বাধ্য হয়ে নিজের ছেলের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে গেলেন। এর সাথে সাথে জুলাই রাজতন্ত্রের অবসান ঘটল। ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাধারণ-তন্ত্রের সাময়িক সরকার স্থাপিত হল।

জনতার বিক্ষোভ

রাজতন্ত্রের অবসান

লুই ফিলিপের পররাষ্ট্র নীতি: জুলাই রাজতন্ত্রের পররাষ্ট্রনীতি ফ্রান্সে জনপ্রিয় হতে পারেনি। এই সময় ফরাসী জনসাধারণ জোরদার বৈদেশিক নীতির পক্ষপাতী ছিল কিন্তু লুই ফিলিপের সরকার শান্তিকামী উত্তেজনাহীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। ফলে জনসাধারণ তাঁর পররাষ্ট্রনীতিকে জাতীয় মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করল এবং সাথে সাথে নেপোলিয়নের আমলের গৌরবোজ্জ্বল বৈদেশিক নীতির কথা তারা ভাবতে থাকল।

জুলাই বিপ্লব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল ও উৎসাহ দিয়েছিল। বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড ও ইটালীতে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ-আন্দোলন দেখা দেয়। ফরাসী জনসাধারণ স্বভাবতই মনে করেছিল যে লুই ফিলিপ এই সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেবেন। কিন্তু লুই ফিলিপ এপথে গেলেন না। তিনি পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ নীতি পছন্দ করলেন। বেলজিয়ামের ব্যাপারে তিনি ইংল্যাণ্ডের সাথে এক জোটে কাজ করলেন। এ ব্যাপারে তিনি যদি নিজস্ব নীতি গ্রহণ করতেন তা হলে তাঁর পুত্র বেলজিয়ামের সিংহাসনে অনায়াসে বসতে পারত। অবশ্য ওই সময় আন্তর্জাতিক

পরিস্থিতি একরূপ জটিল ছিল যে ফিলিপের পক্ষে জোরদার পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ফ্রান্সের সাধারণ লোক এটি বুঝতে চাইল না। তারা মনে করল যে লুই ফিলিপ ফ্রান্সের জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সাথে একজোটে বেলজিয়াম প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। পোল্যাণ্ড ও ইটালীর গণ-আন্দোলনগুলিকে কোনরূপ সাহায্য না করে তিনি বিপ্লবী আদর্শের বিরোধিতা করলেন। নিকট-প্রাচ্য সমস্যায় ফ্রান্স তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে মিশরের গভর্নর মহম্মদ আলীকে সাহায্য করতে মনস্থ করে। কিন্তু ইংল্যাণ্ড সুলতানের পক্ষ নিল এবং অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ইংল্যাণ্ডের কথামত তুরস্কের সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে এ সম্বন্ধে যে বৈঠক বসল তাতে ফ্রান্সকে নিমন্ত্রণ জানান হল না। ফলে লণ্ডন চুক্তিতে ফ্রান্সের স্বাক্ষর রইল না। অর্থাৎ ফ্রান্সকে বৃহৎ শক্তিরূপে ধরা হল না এবং তাকে বাদ দিয়েই নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধান হল। ফরাসী জনসাধারণ এটিকে জাতীয় অবমাননা বলে মনে করল। মন্ত্রী থিয়ার্সও এই সময় লুই ফিলিপের একরূপ ক্লীবনীতির সমালোচনা করলেন। ফলে তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হল। লুই ফিলিপ তার মতে মত দেবার মত লোক গিজোর মধ্যে পেলেন। গিজো ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী হয়ে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আরও শান্তিকামী নীতি গ্রহণ করলেন। তিনি ইংরেজ প্রেমিক ছিলেন বলে ইংল্যাণ্ডের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলবার চেষ্টায় থাকলেন। ইংল্যাণ্ডের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এতে ফরাসী জনসাধারণ আরও ক্ষিপ্ত হল। ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্পেনের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিণীর সাথে লুই ফিলিপ তাঁর পুত্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু পূর্বে তিনি ইংল্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে একরূপ বিবাহে তিনি কখনো মত দেবেন না। কিন্তু কার্যকালে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখলেন না। ফলে ইংল্যাণ্ড তাঁর প্রতি বিরক্ত হল। আবার ফরাসী জনসাধারণ কিন্তু এতে খুব সন্তুষ্টও হল না। স্পেনের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের সাথে বন্ধুত্বে ভাঙন ধরার ফলে লুই ফিলিপের সরকার অস্ট্রিয়ার সাথে মৈত্রী স্থাপনে তৎপর হল এবং মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন জানাল। সুইজারল্যাণ্ডে এই সময় প্রতিক্রিয়া-পন্থী ক্যাথলিক লীগ (Sonderbund)-এর সাথে প্রগতিপন্থী প্রোটেস্টাণ্টদের বিরোধ চলছিল। লুই ফিলিপের সরকার ক্যাথলিক লীগের পক্ষ সমর্থন করল। কিন্তু ক্যাথলিক লীগ ফ্রান্সের সাহায্য পাবার পূর্বেই পরাজিত হল। লুই ফিলিপের এই বিপ্লব-বিরোধী নীতিতে ফরাসী জনসাধারণ রুষ্ট হল। উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রেও লুই ফিলিপ ও তাঁর মন্ত্রিসভা কোন কৃতিত্বই দেখাতে পারল না। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্স

মরক্কোতে আধিপত্য স্থাপনে ইতস্ততঃ করল, পাছে ইংল্যাণ্ড কিছু মনে করে বলে। সুতরাং জুলাই রাজতন্ত্র অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি ফরাসী জনসাধারণের নিকট আদৃত হল না।

অস্ট্রিয়া (১৮১৫-১৮৪৮)

Q. 4. What is meant by Metternich system ? Why did it fail ? *Or*, Make an assessment of the part played by Metternich in Euorpean politics after 1815.

Ans. গোঁড়া রক্ষণশীল সরকারের আদর্শ ও শাসন ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়েছিল অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে। হাপসবার্গ বংশীয় রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ছিল জাতিভিত্তিক এক রাষ্ট্র। এর পশ্চিমাঞ্চলে জার্মান ভাষাভাষীদের প্রাধান্য ছিল। রাজবংশ ও শাসকশ্রেণীর জন্মভূমি এই অঞ্চলেই ছিল। সাম্রাজ্যের উত্তর দিকে ছিল বোহেমিয়া প্রদেশ, পূর্বদিকে ম্যাগায়ার অধ্যুষিত হাঙ্গেরী এবং দক্ষিণে ছিল ইটালীয় প্রদেশদ্বয় লম্বার্ডি ও ভেনিসিয়া। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে শক্তিশালী প্রগতিপন্থী **মধ্যবিত্তশ্রেণী** বলে কিছু ছিল না। ব্যবসায়ী বণিকসম্প্রদায় এবং শিল্পপতিদের আবির্ভাব ঘটেনি। জমিদারগণই শক্তিশালী ছিল এবং অধিকাংশ লোকই কৃষির ওপর জীবিকা অর্জনের জন্য নির্ভর করত। অস্ট্রিয়ার অর্থনীতিও ছিল সম্পূর্ণভাবে কৃষিভিত্তিক। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশগুলি নানারূপ সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। প্রত্যেক প্রদেশে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রাদেশিক ডায়েট ছিল। এগুলির সদস্য অবশ্য জমিদারগণই হতে পারত। অঙ্গ রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ প্রভাব ছিল না। স্থানীয় অভিজাতরাই শাসন পরিচালনা করত। তবে গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই সচেষ্ট থাকত। কারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফলতালাভ করলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তা কেন্দ্রীয় সরকার ভালভাবেই জানত।

অস্ট্রিয়ার অবস্থা

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যেও জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঘটে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে, সৈন্যবাহিনীর কিছু সংখ্যক অফিসারদের মধ্যে এবং অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের প্রান্তবর্তী অঙ্গ রাজ্যগুলিতে এই চেতনা বিশেষভাবে দেখা যায়। লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া এবং জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিতে

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন জোরদার হয়। অষ্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং তৎকালীন ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অষ্ট্রিয়া সরকারের পক্ষে জাতীয়তাবিরোধী অগণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সমগ্র ইউরোপে জাতীয়তাবাদ, উদারনৈতিক মতবাদ যাতে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হতে পারে তার জন্য মেটারনিকের নেতৃত্বে অষ্ট্রিয়া সরকার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। জার্মানী, ইটালী ও পোল্যাণ্ডে স্থিতাবস্থা টিকিয়ে রাখবার জন্য অষ্ট্রিয়া বদ্ধপরিকর হল। আর এই তিনটি স্থানেই জাতীয়তাবাদ বিশেষভাবে দেখা দিল। তাছাড়া অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে বারোটি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বসবাস করত—যথা জার্মান, ম্যাগায়ার, চেক, শ্লোভাক, পোল, রুথেন্স, ক্রোটস, সার্ব, শ্লোভেন, ইটালিয়ান, ইহুদি এবং রুমানিয়ান। এর ফলে আর যা হক্, অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলে কিছু ছিল না।

অগণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করবার কারণ

মেটারনিক ব্যবস্থা কাকে বলে ও তার স্বরূপ: সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ণধার রূপে মেটারনিক অষ্ট্রিয়ার এই দুর্বলতা ভালভাবেই জানতেন। একারণে তাঁর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষা করা। তিনি পতনোন্মুখ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এবং এর জন্যই তিনি তাঁর বহু নিন্দিত **মেটারনিক ব্যবস্থা** গড়ে তুললেন। তথাকথিত মেটারনিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল যেমন করেই হোক অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করা, এবং স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রাখা। তিনি অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করবার চেষ্টা করেন নি, কারণ তিনি জানতেন এটি করা অসম্ভব, অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ও ধর্মীয় অনৈক্য ও দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। বহু পুরাতন Divide and Rule নীতিই এই ব্যবস্থার চালিকা শক্তি ছিল। এই নীতির বাস্তব পরিণতি দেখা গেল যখন মেটারনিক বোহেমিয়ায় জার্মান সৈন্য ও কর্মচারী রাখলেন এবং লম্বার্ডিতে হাঙ্গেরীয় সৈন্যদের নিয়োগ করলেন। জার্মানীতে এই ব্যবস্থার কার্যকরী রূপ দেখা গেল যখন মেটারনিক জার্মান কনফেডারেশনটিকে টিকিয়ে রাখবার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করলেন। কারণ কনফেডারেশনের সভাপতি ছিল অষ্ট্রিয়া। জার্মানীতে যাতে কোন একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে না পারে তার জন্য মেটারনিক সর্বদাই চেষ্টা করতেন। তা ছাড়া জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিক আন্দোলন জার্মানীতে যাতে দানা বাঁধতে না পারে তার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকারের দমনমূলক

লক্ষ্য ও নীতি

জার্মানীতে মেটারনিক ব্যবস্থা

ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। জার্মান কনফেডারেশনের মাধ্যমে তিনি তার উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে সিদ্ধ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রক্ষণশীল সাহিত্যিক কোটজেবুয়েকে হত্যা করা হলে মেটারনিক কার্লসবাড নামক স্থানে জার্মান রক্ষীদের এক বৈঠক আহ্বান করেন এবং তাদের বিপ্লবভীতিকে জাগিয়ে তোলেন। এই বৈঠক শেষে কয়েকটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এগুলিকে কার্লসবাড আদেশসমূহ (Carlsbad Decrees) বলা হয়। এই আদেশগুলির ফলে জার্মানীতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছু রইল না। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গুপ্তচর রাখা হল। জার্মানীর কোন রাষ্ট্রে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিলে কনফেডারেশনের পক্ষ হতে অষ্ট্রিয়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বলে জার্মান রাজন্যবর্গ মেনে নিল। এই সময় প্রাশিয়া তার আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে জার্মানীতে মেটারনিকের ব্যবস্থা জয়যুক্ত হল।

জার্মানীতে কনফেডারেশনের ডায়েট মারফৎ মেটারনিক তাঁর ব্যবস্থা কার্যকরী করতে সক্ষম হন। কিন্তু ইটালীতে জার্মান কনফেডারেশনের মত কোনরূপ রাজ-নৈতিক কাঠামো গড়ে উঠতে পারেনি। একারণে ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার প্রভাব স্থাপন করতে মেটারনিককে বেশ বেগ পেতে হয়। ইটালীতে হ্যাপসবার্গ বংশীয় যে সব রাজা রাজত্ব করতেন তাঁদের মারফৎ মেটারনিক তাঁর ব্যবস্থা চালু করতে চেষ্টা করেন। তাছাড়া গুপ্ত পুলিশ সংস্থার মাধ্যমেও তিনি এই ব্যবস্থাকে বাস্তবে পরিণত করতে উদ্যোগী হন। নেপোলিয়নের শাসনাধীনে ইটালীর জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা জন্মায়। একারণে তারা অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য মেনে নিতে রাজী হল না। এই সময় ইটালীতে আবার শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটেছিল। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ভিয়েনায় মিলিত হয়ে ইটালীতে বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগ ফিরিয়ে আনতে চায়। অষ্ট্রিয়া লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়া হস্তগত করে। তাছাড়া, টাসকানী, পার্মা, মডেনা প্রভৃতি রাজ্য হ্যাপসবার্গ বংশীয় রাজাদের হাতে গেল। এই সব রাজ্যে জার্মান ও স্লাভদেরই শাসনকার্যে নিয়োগ করা হত। ইটালীবাসীরা এটি সহ্য করতে পারল না। তারা নেপোলিয়নের শাসনে থেকে গুণানু-সারে সকলেই সরকারী কার্যের উপযুক্ত এটা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখেছিল। কিন্তু মেটারনিক তাঁর ব্যবস্থা' চালু করে এ নীতি একেবারে বরবাদ করে দিলেন। ইটালীর অন্যান্য রাজ্যগুলিতে স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। এই স্বৈরতন্ত্রী রাজাদের মধ্যে যাতে ঐক্যভাব না গড়ে উঠতে পারে তার জন্য মেটারনিক চেষ্টা করেন। ইটালীতে

ইটালীতে

তাঁর ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক দুরবস্থা, নিরক্ষরতা, গুপ্ত পুলিশ সংস্থা, রাজন্যবর্গদের মধ্যে অনৈক্য এবং স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র। স্বৈরতন্ত্রী রাজারা বাধ্য হয়ে মেটারনিকের মুখাপেক্ষী হল এবং এই সুযোগে তিনি তাঁর ব্যবস্থা' চালু করলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ করা হল, সমস্ত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হল। কিন্তু এত চেষ্টা করেও মেটারনিক ইটালীতে তাঁর ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে পারলেন না। তিনি ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি যৌথ রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন কিন্তু পোপ ও সার্ডিনিয়ার রাজার বিরোধিতার জন্য এটি সম্ভব হল না। একারণে ইটালীতে তাঁর ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা দুর্বল ছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মেটারনিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে সমস্ত গণ-আন্দোলন দমন করা। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে অষ্ট্রিয়ায় তাঁর প্রবর্তিত স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা টিকে থাকবে না যদি না ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে না রাখা হয়।* একারণে তিনি কনসার্টের মাধ্যমে ইউরোপে তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কংগ্রেসের যুগে যে সব বৈঠক বসেছিল প্রতিটিতে মেটারনিক ছিলেন প্রধান এবং মূল শক্তি। তিনি 'কনসার্ট অফ ইউরোপকে আভ্যন্তরীণ গণআন্দোলন দমনে ও পূর্বতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যবহার করলেন। এদিক হতে ট্রপোর প্রটোকল ইউরোপীয় ক্ষেত্রে মেটারনিক ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মেটারনিক ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর খুঁটিনাটি নিত্য বিবরণ জানবার জন্য গুপ্তচর বাহিনী, দালাল প্রভৃতি নিয়োগ করতেন। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট তিনি আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ প্রস্তাব পাঠাতেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে অষ্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের ডাক চলাচল করবে। এই প্রস্তাব প্রায় সব রাষ্ট্রগুলিই গ্রহণ করে। ফলে বিভিন্ন দেশের সরকারী চিঠিপত্রাদি অষ্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাবার সময় তিনি সেগুলি গোপনে পড়বার ব্যবস্থা করলেন এবং বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসকদের মনোভাব জানতে সক্ষম হন।

বিদেশী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে

মেটারনিক ব্যবস্থার পতন: মেটারনিক ব্যবস্থা কিন্তু চিরস্থায়ী হল না। যে বিপ্লবকে তিনি চিরদিনের জন্য বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন তা ১৮৪৮-এ পুনবায়

*'The contention of Metternich was that internal and international affairs were inseparable : and what happens inside one state is of some concern to other states.' David Thomson.

দেখা দিল। এবং এই বিদ্রোহ তাঁর ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিল। তিনি নিজে অষ্ট্রিয়া হতে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচলেন। মেটারনিকের ব্যবস্থা যে চিরস্থায়ী হতে পারে না তা প্রথম হতেই বোঝা যায়। তিনি বিপ্লবকে ঘৃণা করতেন কিন্তু বিপ্লবের পিছনে বিপ্লবীদের যে সব দাবি ছিল সেগুলির প্রতি তিনি নজর দিতে চাননি। উদারনীতি ও জাতীয়তাবাদ যে বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি তা তিনি বুঝতে চাননি। একারণে তিনি দমননীতির সাহায্যে গণ-অভ্যুত্থান প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন; জনসাধারণের দাবিগুলির যথার্থতা সম্বন্ধে তিনি কোনদিনই জানতে চেষ্টা করেন নি। যুগের সাথে তাল রেখে চলবার চেষ্টা তিনি করেন নি। তিনি চেষ্টা করেছিলেন পুরানো ঘুনে-ধরা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার, যা সাময়িকভাবে সম্ভব হলেও স্থায়ী হতে কখনই পারে না। সংক্ষেপে তিনি তাঁর ব্যবস্থার দ্বারা মানবসমাজের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে চাইলেন, যেটি কথা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। একারণেই তাঁর ব্যবস্থা তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙ্গে পড়ল। যে অষ্ট্রিয়াতে তিনি বিপ্লবী মতবাদের অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করে ছিলেন সেই অষ্ট্রিয়াতেই গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের স্রোত তাঁকে ও তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থাকে ভাসিয়ে দিল।

Q 5. Describe the character and policy of Metternich.

Ans. ১৮১৫ হতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের প্রধান রাজনৈতিক পুরুষ ছিলেন মেটারনিক, এজন্য এই যুগটিকে মেটারনিকের যুগ বলা হয়।

প্রথম জীবন ও চরিত্র : মেটারনিক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর পিতা অবশ্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। বাল্যকাল হতেই মেটারনিকের প্রতিভার স্ফুরণ হয়। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজ প্রতিভাবলে অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার হন এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তৎকালীন কূটনীতিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না, বহু জটিল প্রশ্নে যখন ইউরোপীয় রাজনীতিবিদরা বিভ্রান্ত ও মীমাংসায় আসতে অক্ষম, এরূপ সময়ে মেটারনিক নিজ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এসব দিক হতে দেখলে তিনি যে সমসাময়িক ইউরোপের পরিচালক ছিলেন তা বোঝা যায়। তাঁর মনোবল ও কূটনীতি নেপোলিয়নের পরাজয়ের অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন। তিনি সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর রুচি মার্জিত ছিল। লোকচরিত্রকে অনুধাবন করবার বিশেষ শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে দাম্ভিকতা পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়। রাজনীতিতে সাধুতা, নৈতিক আদর্শ, বিশ্বস্ততা প্রভৃতির কোন স্থান নেই; চক্রান্ত ও সুযোগ

সুবিধাই রাজনীতির মূল জিনিস বলে মনে করতেন। একারণে জার আলেকজাণ্ডার তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতেন। নেপোলিয়ন তাঁকে ষড়যন্ত্রপরায়ণ বলেছিলেন। কি সমসাময়িক ব্যক্তি, কি পরবর্তী কালের উদারনীতিবিদ সকলেই তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব অনস্বীকার্য তাঁর সাথে যাঁরা একমত নন এমন ব্যক্তিরাও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পড়ে তাঁর মনোমত কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটি তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক Sorel তাঁকে তাঁর যুগের অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ বলেছেন যিনি কূটনীতির সাহায্যে শাসন চালাবার ক্ষমতা রাখতেন। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলতেন—'আমার এইটুকু বৈশিষ্ট্য যে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী, আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই আমাকেই কেন্দ্র করে ঘুরছে—কেন জানি না। কোটি কোটি লোকের মধ্যে আমি কেবল চিন্তা করি, একমাত্র আমিই কাজ করি এবং আমিই লিখি। নিজের সম্বন্ধে যে ব্যক্তি বলতে পারে 'যে ন্যায়নীতি হতে কখনো বিচ্যুত হয়নি, সে নিশ্চয়ই সুখী, আমার বিবেক কখনো আমার সম্বন্ধে এই উক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না—আমার মন কখনো ভুল করেনি।"

উদ্দেশ্য ও নীতি: বিপ্লব বিরোধী মনোভাব মেটার্নিকের চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফরাসী বিপ্লবকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন এবং ফরাসী বিপ্লব প্রসূত ভাবধারাকে ইউরোপ হতে নিশ্চিহ্ন করা তাঁর পবিত্র দায়িত্ব ছিল। তাঁর মতে ফরাসী বিপ্লব হল একটা চিকিৎসাসাপেক্ষ মহাব্যাধি, নির্বাপনযোগ্য এক আগ্নেয়গিরি উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দগ্ধ করবার যোগ্য এক পচনশীল ক্ষত। এক হাজারমুখো দানব যেন তার উন্মুক্ত মুখ-বিবর দ্বারা মানব সমাজকে গ্রাস করবার জন্য সর্বদা উদ্যত হয়ে রয়েছে। বিপ্লবের প্রতি তাঁর এই ঘৃণা স্বভাবতই তাঁর আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করেছিল।

উদারনীতি ও জাতীয়তাবোধ তাঁর চরম শত্রু ছিল এবং যে কোন গণতান্ত্রিক ভাবধারাকেই তিনি সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁর মতে 'গণতন্ত্র-নীতি দেশের সূর্যালোক দূর করে দেশকে গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রাখবে'। এটি যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য তিনি সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন এবং তাঁর কুখ্যাত 'ব্যবস্থা' যাতে কার্যকরী হতে পারে তার জন্য তৎপর হন। জনসাধারণের মুক্তির আগ্রহ দূর করবার জন্য অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং অস্ট্রিয়া প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলিতে নানারূপ দমনমূলক নীতির আশ্রয় নেন। তিনি গোয়েন্দা ও গুপ্ত পুলিশের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করেন, জনমতের মুখ বন্ধ রাখবার জন্য আইন জারি করে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অবাধ স্বাধীনতা লোপ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের বিপজ্জনক শিক্ষা

বন্ধ করবার ব্যবস্থা করলেন; জাতীয়তা-বোধের আন্দোলনকারীরা নির্বাসিত, কারারুদ্ধ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে লাগল। অসাধারণ কুচক্রী মেটারনিক নানা হীন চক্রান্তের দ্বারা ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে নিজের মতবাদকে স্থাপন করবার চেষ্টা করেন।

মেটারনিক ছিলেন অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার। একারণে তাঁর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি পতনোন্মুখ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সবশক্তি নিয়োগ করেন। অষ্ট্রিয়ার ভেতরে ও বাইরে এমন কোন ঘটনা ঘটতে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না যাতে অনৈক্যপূর্ণ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি হতে পারে। বহু জাতির দেশ অষ্ট্রিয়ায় জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রচারিত হলে এর রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হবে এই সত্য উপলব্ধি করে তিনি সকল প্রকার জাতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করতে সচেষ্ট হলেন। এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থ তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। আর একারণেই তিনি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে অষ্ট্রিয়া তথা ইউরোপের প্রধান শত্রু বলে মনে করতেন। তিনি আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতিতে যথাপূর্বং নীতি গ্রহণ করেন। এরই ফলে তিনি কনসার্ট অব ইউরোপকে গণশক্তি ধ্বংস করার যন্ত্রে পরিণত করেন। ইউরোপের যে সব রাষ্ট্রে গণচেতনা দেখা দিয়েছিল তিনি সেগুলি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেষ্টা করেন এবং অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপও করেন। তিনি নিজেকে সমগ্র ইউরোপের কমিশনার অব পুলিস-এ পরিণত করেন। তিনি কখনো প্রগতিপন্থী ভাবধারাকে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তিনি ছিলেন রক্ষণশীলতার মূর্ত প্রতীক।

আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী: অষ্ট্রিয়া ছিল একটি বহু জাতিভিত্তিক সমস্যাসঙ্কুল রাষ্ট্র। জাতীয় ঐক্য বলে অষ্ট্রিয়ায় কিছু ছিল না। ক্রোট, শ্লাভ, জার্মান, চেক, ইটালিয়ান, ম্যাগাযাব, পোল, রুথেন ও সার্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এখানকার অধিবাসী ছিল। ফরাসী বিপ্লব প্রসূত জাতীয়তাবাদী মনোভাব অষ্ট্রিয়ায় প্রসারিত হলে অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে বলে মেটারনিক মনে করলেন। তিনি জরাজীর্ণ অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করলেন। প্রথমতঃ তিনি আভ্যন্তরীণ সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। বিদেশ হতে যাতে প্রগতিবাদী ভাবধারা অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য তিনি অষ্ট্রিয়ার চারদিকে শুল্ক ও নানারূপ বাধার প্রাচীর স্থাপন করলেন এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেন। গোয়েন্দা পুলিশ ও গুপ্ত পুলিশের সংখ্যা বাড়ালেন;

জনমতের মুখ বন্ধ রাখবার জন্য আইন জারি করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক-স্বাধীনতা লোপ করলেন; বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পুলিশী ব্যবস্থার অধীনে আনলেন; জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকারীদের নির্বাসন, কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন এবং এক জাতিকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে উস্কানি দিলেন। জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন চালিয়ে যেতে থাকলেন। জার্মান কর্মচারী ও সেনাদলকে রাখলেন হাঙ্গেরী প্রদেশে আর হাঙ্গেরীয়ানদের ইটালীর লম্বার্ডি ও ভিনিসিয়ার শাসনকার্য ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবার কাজে নিয়োগ করলেন। তিনি অষ্ট্রিয়ায় এক জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলবার চেষ্টা করেননি কারণ এটি যে অসম্ভব তা তিনি ভাল ভাবেই জানতেন। অষ্ট্রিয়ার প্রাচীন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা ও পুনর্জীবন দান করাই তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন জাতি যাতে একই রাজ শক্তির আধিপত্য মেনে চলে তার জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন। ভগবদ্দত্ত অধিকারের বলে রাজশক্তি যাতে স্বকীয় নিয়ন্ত্রণে স্বৈরনীতি দৃঢ় ও সবল করে তুলতে পারে, তাই-ই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য।

বৈদেশিক নীতি: মেটারনিকের পররাষ্ট্রনীতি তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতিরই প্রতিফলন ছিল। আভ্যন্তরীণ নীতির সাথে পররাষ্ট্র নীতির যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা তিনি ভালভাবেই জানতেন। একারণে ইউরোপের কোন দেশে প্রগতিশীল ভাবধারা যাতে জোরদার না হতে পারে তার জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন। ভিয়েনা সম্মেলনে নেতৃত্ব দান করে তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে কার্যকরী করতে কিছুটা সক্ষম হলেন। এরপর তিনি ইউরোপীয় সংঘকে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং এর সাহায্যে ইউরোপে তাঁর ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্যোগে যে চারটি স্থানে কনসার্ট অব ইউরোপের বৈঠক বসে তার প্রত্যেকটিতে তিনি তাঁর নীতিকে ইউরোপের রাজন্যবর্গের নিকট স্বীকৃত করিয়েছিলেন। তাঁর বিপ্লব-বিরোধী মনোভাব ১৮১৫ হতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের মনোভাব হয়েছিল। ১৮২০তে তিনি ট্রপো কংগ্রেসকে সমস্ত বিদ্রোহ বেআইনী বলে তা দমন করতে বলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, যদি কোন রাজ্যে শাসননীতি পরিবর্তনের জন্য বিদ্রোহের আভাস পাওয়া যায়, তবে সেই রাজ্যটিকে যেমন করেই হক ইউরোপীয় গণ্ডীর মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে হবে। এইরূপ বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টা প্রথম দেখা দিল নেপল্‌স ও সিসিলি রাজ্যে। দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে এই রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ অত্যাচারী বুরবোঁ রাজাকে এক

কনসার্ট অফ ইউরোপের ওপর প্রভাব বিস্তার

নতুন শাসনতন্ত্র অনুমোদন ও কার্যকরী করতে বাধ্য করে। অমনি ইউরোপীয় সংঘ এতে বাধা দেয় এবং মেটারনিক অষ্ট্রিয়ার একদল সৈন্য দ্বারা ওই রাজ্যে বিদ্রোহ দমন করে অত্যাচারী রাজার স্বেচ্ছাতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সার্ডিনিয়াতে এরূপ বিপ্লব দেখা দিলে সেখানেও মেটারনিক হস্তক্ষেপ করেন। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে যখন ইটালীর পার্মা, মডেনা ও পোপের রাজ্যে গণ অভ্যুত্থান দেখা দেয় তখন মেটারনিক এই সব আন্দোলনগুলি ধ্বংস করে দেন। এবং ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনেন।

জার্মান নীতি ঃ জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য যাতে বজায় থাকে তার জন্য মেটারনিক সবিশেষ চেষ্টা করেন। জার্মানীর ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিল প্রথমতঃ, জার্মানীর ঐক্যসাধন যাতে সম্ভব না হয় তার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; দ্বিতীয়তঃ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংস করা; তৃতীয়তঃ, জার্মানীর ওপর অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য বজায় রাখা। জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের ছাত্রদের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধারা ধ্বংস করবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রক্ষণশীল সাহিত্যিক কোটেজবুয়েকে হত্যা করা হলে তিনি জার্মানীর কার্লসবাড নামক স্থানে জার্মান রাজাদের এক বৈঠক আহ্বান করেন এবং তাদের বিপ্লবভীতিকে জাগিয়ে তোলেন। এই বৈঠক শেষে কয়েকটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এগুলিকে কার্লসবাড আদেশসমূহ (Carlsbad Decrees) বলা হয়। এর ফলে জার্মানীতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু রইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর পুলিশের কর্তৃত্ব স্থাপন করার ফলে জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। ফলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পক্ষে জার্মানীতে বাস করা অসম্ভব হল। জার্মানীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিনষ্ট করার জন্য মেটারনিক রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে এক ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত করবার জন্য উদ্যোগী হন। অবশ্য এটি কাজে পরিণত হতে পারেনি।

গ্রীস নীতি ঃ তুরস্কের শয়তানী শাসনের বিরুদ্ধে গ্রীস যখন বিদ্রোহ করে তখন মেটারনিক স্বাধীনতাকামী গ্রীকদের প্রতি সহানুভূতি ত দেখালেনই না, বরঞ্চ গ্রীকরা যাতে পরাজিত হয় তার জন্য চেষ্টা করেন। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার যখন গ্রীকদের সাহায্য করবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন তখন মেটারনিক তাঁকে নানা উপায়ে প্রতিনিবৃত্ত করেন। এর কারণ হল মেটারনিক স্বাধীনতাকামী গ্রীকদের এই আন্দোলনকে আইনানুগ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভিন্ন কিছুই মনে করলেন না। তাছাড়া, তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীকরা জয়লাভ করলে জাতীয়তাবাদই

জয়যুক্ত হবে এবং পরোক্ষভাবে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিগুলি গ্রীকদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করবে। সুতরাং অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই তিনি গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাল চোখে দেখেন নি।

এছাড়া, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও স্পেনের গণ আন্দোলন তাঁকে চিন্তিত করে তোলে এবং এগুলিকে ধ্বংস করবার জন্য চেষ্টা করেন। এমনকি আমেরিকায় অবস্থিত স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামও ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।

কৃতিত্ব: উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ হলেন মেটারনিক। কূটনীতি ও রাজনৈতিক দ্যূতক্রীড়ায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমস্ত উদারনৈতিক মতবাদের উচ্ছেদ সাধন করে প্রাক বিপ্লব যুগের প্রাচীন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা এবং একে টিকিয়ে রাখা। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রাখবার জন্য তিনি যে কোন পন্থা গ্রহণে কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি যে ষড়যন্ত্রপরায়ণ ছিলেন তা সকলেই স্বীকার করেন। নানারূপ হীন চক্রান্তের সাহায্যে তিনি সমগ্র ইউরোপে নিজের মতবাদকে স্থাপন করবার চেষ্টা করেন। তাঁর হীন চক্রান্তগুলি সর্বকালে নিন্দনীয় হলেও তৎকালীন ইউরোপের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। বিপ্লব ও যুদ্ধে বিপর্যস্ত ইউরোপের জনসাধারণ শান্তির জন্য কাঙাল হয়ে পড়েছিল। সব কিছুর বিনিময়ে তারা শান্তি কামনা করছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মেটারনিক এটি ধরতে পারেন। একারণে তিনি ইউরোপে শান্তি স্থাপনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সমস্যা কণ্টকিত ইউরোপে তাঁর ন্যায় কুচক্রী ছাড়া অপর কারও পক্ষে শান্তি স্থাপন ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হত না। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন শাসন ব্যবস্থা, অপর দিকে অপুষ্ট নতুন ব্যবস্থা—এই যুগসন্ধিক্ষণে মেটারনিকের চক্রান্ত-নীতিই ইউরোপকে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি দিয়েছিল।

মেটারনিক ছিলেন অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার। একারণে তাঁর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিকনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি পতনোন্মুখ অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখবার জন্য সর্ববিধ প্রয়াস চালান। অষ্ট্রিয়ার ভেতরে ও বাইরে এমন কোন ঘটনা ঘটতে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না যাতে অনৈক্যপূর্ণ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি হতে পারে। একারণে তিনি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে অষ্ট্রিয়া তথা ইউরোপের প্রধান শত্রু বলে মনে করেন। সুতরাং তাঁর

প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব ও কার্যাবলীর পিছনে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা বিশেষভাবে কাজ করত। আর তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল নীতির ফলেই অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে জুলাই বিপ্লবের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি।

মন্তব্য: মেটারনিকের স্থিতাবস্থা নীতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারেনি। এই নীতির দ্বারা রাজ্যশাসন করা যে দুরূহ কাজ তিনি নিজেই বুঝেছিলেন। তাঁর নীতি সাময়িকভাবে সাফল্যলাভ করলেও পরিণামে এটি যে ব্যর্থ হতে বাধ্য তা তিনি নিজেই অনুভব করেছিলেন—'এই পৃথিবীতে আমার কিছু আগে বা পরে আসলে ভাল হত। কিছু আগে এলে যুগকে উপভোগ করতে পারতাম, কিছু পরে এলে নতুন যুগ গঠনে ব্রতী হতাম। আজ কেবলমাত্র ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠান সমূহকে টিকিয়ে রাখবার জন্য আমাকে জীবনপাত করতে হচ্ছে।'

উপসংহারে বলা যায় যে মেটারনিকের নীতিতে বিচক্ষণতার পরিচয় মেলে না। তিনি যুগধর্মকে অস্বীকার করে প্রাণহীন, শক্তিহীন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেন। যে বিপ্লবকে তিনি সমূলে বিনষ্ট করবার জন্য সর্বস্ব পণ করেছিলেন সেই বিপ্লবের সম্মুখীন হয়ে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন।

Q. 6. Give a critical account of the Belgian Struggle for independence

Ans. ফ্রান্স ভবিষ্যতে যাতে শান্তির বিঘ্নস্বরূপ না হতে পারে তার জন্য ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী দেশগুলিকে শক্তিশালী করা হয়। উত্তর সীমান্ত হল্যাণ্ডকে শক্তিশালী করার জন্য অষ্ট্রিয়ার নিকট হতে **বেলজিয়ামকে** নিয়ে হল্যাণ্ডের সাথে জুড়ে দেওয়া হল। বেলজিয়ামবাসীরা এই সংযুক্তিকরণ প্রথম হতে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে এবং এই কৃত্রিম ভুক্তিকরণ ভেঙে দেবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইল। আর এই সুযোগ এল ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের ফলে।

ভিয়েনা ব্যবস্থার ফল

নতুন শাসনব্যবস্থায় বেলজিয়ানদের অসুবিধা: হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামকে নিয়ে যে নতুন রাষ্ট্রটি ১৮১৫-তে আত্মপ্রকাশ করল তার রাজা হলেন হল্যাণ্ডের অরেঞ্জবংশীয় রাজা প্রথম উইলিয়াম। তিনি এই নতুন রাজ্যে শাসন করার শুরুতেই একটি সংবিধান জারী করলেন। নতুন সংবিধানে রাষ্ট্রের জন্য দুকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। আইন সভার উচ্চতর পরিষদের সকল সদস্যই রাজা কর্তৃক মনোনীত হবেন বলে বলা

হয়। আর নিম্ন পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হবে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। কিন্তু যেহেতু নতুন রাষ্ট্রে ডাচ (হল্যাণ্ডের অধিবাসী) সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল সেকারণে ঠিক হল যে নিম্ন পরিষদে ডাচদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ বেলজিয়ানদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার সমানই হবে। এছাড়া ধর্মীয় স্বাধীনতা, জুরির বিচার প্রভৃতির উল্লেখ সংবিধানে করা হয়। বেলজিয়ানরা কিন্তু এই সংবিধান মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারল না। তারা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখল যে এই সংযুক্তিকরণের ফলে ডাচদের সব দিক হতে সুবিধা হয়েছে। এই নতুন রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা রূপে ডাচ ভাষাকেই গ্রহণ করা হয়। সরকারী চাকুরী ডাচরাই পেতে থাকে। বেলজিয়ামবাসীরা রোমান ক্যাথলিক আর হল্যাণ্ডবাসীরা প্রোটেস্টাণ্ট ছিল বলে ধর্মের ক্ষেত্রেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। তাছাড়া বেলজিয়াম ছিল শিল্পোন্নত দেশ আর হল্যাণ্ড ছিল বাণিজ্য প্রধান দেশ। এর ফলে রাষ্ট্রীয় করের বোঝা বেলজিয়ামবাসীদের ওপরই চাপান হল। সংক্ষেপে, ডাচদের স্বার্থের অনুকূলে এই নতুন রাজ্য শাসিত হতে থাকল। বেলজিয়ামবাসীরা নিজ দেশে পরবাসী হল।

ডাচদের কর্তৃত্ব

এই অসহনীয় অবস্থা বেশি দিন টিকতে পারেনা। বেলজিয়ামবাসীরা বিদ্রোহ করবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকল। ১৮৩০-এর ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের খবর যখন বেলজিয়ামে পৌছাল তখন তারা একজোটে ডাচ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তারা মনে করল প্যারিসের জনসাধারণ যদি বিদ্রোহের দ্বারা ভিয়েনা ব্যবস্থার আইনগত উত্তরাধিকারের নীতি বানচাল করে দিতে পারে তাহলে বেলজিয়ানরা এই ব্যবস্থার ভাবসাম্য নীতিই বা ছিন্নভিন্ন করে দিতে কেন পারবে না।

বেলজিয়ামে বিদ্রোহ

বিদ্রোহের ঘটনাবলী: এর ফলে ২৫শে আগষ্ট (১৮৩০) বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে প্রথম অভ্যুত্থান ঘটল। ব্রাসেলসের দেখাদেখি বেলজিয়ামের প্রাদেশিক শহরগুলিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। শহরের বিত্তশালীরা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য নিরাপত্তা কমিটি ও বেসামরিক রক্ষীদল গঠন করে। রাজা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়োগে ভয় পেলেন। এর বদলে তিনি তাঁর দুই পুত্রকে বিদ্রোহীদের সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রাসেলসে পাঠালেন। যুবরাজ ব্রাসেলসে প্রবেশ করে বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনা চালালেন এবং আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে বেলজিয়াম আর হল্যাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকবে না, কেবল হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ বংশকে বেলজিয়ামের

কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করল?

রাজবংশ বলে মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ অরেঞ্জ বংশীয় রাজা বেলজিয়ামের নিয়মতান্ত্রিক রাজা হবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজা উইলিয়ম ষ্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করলেন এবং এই অধিবেশনে বেলজিয়ামের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। বিদ্রোহীরা ব্রাসেলস শহর অধিকার করে ডাচ সৈন্যদের শহর হতে বিতাড়িত করে দেয় এবং এক অস্থায়ী সরকার গঠন করে। এই অস্থায়ী সরকার বেলজিয়ামের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করল। নতুন বেলজিয়ামে ১৮৩০-এর নভেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের বলে জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরা নির্বাচিত হলেন। জাতীয় কংগ্রেস-এর প্রথম অধিবেশনে বেলজিয়ামের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হল এবং হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ বংশীয় কোন ব্যক্তি বেলজিয়ামের রাজা হতে পারবে না বলে সিদ্ধান্ত নিল। ১৮৩১ এর প্রথমেই জাতীয় কংগ্রেস বেলজিয়ামের জন্য এক নতুন সংবিধান প্রণয়ন করল। এই সংবিধানটি তৎকালীন ইউরোপের সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক সংবিধান বলা যেতে পারে। সংবিধানে বলা হল যে রাষ্ট্রীয় শক্তির আধার হল জনসাধারণ এবং জনসাধারণই রাজা নির্বাচন করবে। এছাড়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের যুগ্ম সুপারিশে জার্মানীর Saxe-coburg-Gotha বংশের যুবরাজ লিওপোল্ডকে জাতীয় কংগ্রেস বেলজিয়ামের রাজা নির্বাচিত করল। নব নির্বাচিত রাজা প্রথম লিওপোল্ড হিসেবে বেলজিয়াম শাসন করতে শুরু করলেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মনোভাব: কিন্তু বেলজিয়ামের নতুন শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ভর করল ইউরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের মনোভাব ও কার্যাবলীর ওপর। অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া বেলজিয়ামে বিদ্রোহীদের সাফল্যে চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং তারা একজোটে বেলজিয়ামের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একজোটে বেলজিয়ামের নতুন শাসন ব্যবস্থাকে রক্ষা করবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ধ্বংস করতে সাহসী হল না। এরপর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের উদ্যোগে বেলজিয়াম সমস্যা সমাধানের জন্য লণ্ডনে এক পঞ্চশক্তির বৈঠক আহ্বান করা হল। এই বৈঠকে বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং বেলজিয়ামের চিরস্থায়ী নিরপেক্ষতাও যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি মেনে নেয়। সুতরাং ঘটনাচক্রে বেলজিয়াম অতি সহজেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল।

হল্যাণ্ডের অনমনীয় মনোভাব ও তার প্রতিক্রিয়া: হল্যাণ্ড কিন্তু বেলজিয়ামের স্বাধীনতা মানতে রাজি হল না। ১৮৩১-এ এক বিরাট ডাচ বাহিনী

বেলজিয়াম আক্রমণ করল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বেলজিয়ামের সৈন্যদলকে পরাজিত করে রাজধানীর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বেলজিয়ামের এই সঙ্গীন অবস্থা দেখে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে এল। একদিকে ফরাসী বাহিনী এবং অপরদিকে ইংরেজ নৌবহর বেলজিয়ামের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব নিল। এতে হল্যাণ্ড ভীত হয়ে বেলজিয়াম হতে তার সৈন্যবাহিনী তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল। লণ্ডন-সম্মেলনে বেলজিয়ামের যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল হল্যাণ্ড তা মেনে নিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ও চিরাচরিত নিরপেক্ষতা স্বীকার করে নেয়।

হল্যাণ্ড কর্তৃক বেলজিয়ামের স্বাধীনতা স্বীকার

মন্তব্য : বেলজিয়ামের স্বাধীনতা বিপ্লবোত্তর যুগে এক বিরাট ঘটনা। ভিয়েনা সম্মেলন বেলজিয়ামবাসীর ইচ্ছাকে অবহেলা করে তার জাতীয় স্বার্থের প্রতি যে ঔদাসীন্য দেখিয়েছিল তার বিরুদ্ধে বেলজিয়ামবাসীরা এই স্বাধীনতা ঘোষণার দ্বারা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাল। তাছাড়া বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ভিয়েনা ব্যবস্থায় সুকঠিন আঘাত হানল। 'মেটারনিক ব্যবস্থার' বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ হিসেবে এই ঘটনাটিকে উনিশ শতকের উদারনৈতিক আন্দোলনের একটি বিশেষ স্তম্ভ-স্বরূপ বলে মনে করা যেতে পারে।

Q. 7. Give an account of the Polish repurcussions of the July Revolution :

Ans. নেপোলিয়ন সৃষ্ট গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারস ভিয়েনা বৈঠকের শর্তানুযায়ী রাশিয়াকে দেওয়া হয়। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার এই অঞ্চলটিকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত না করে পৃথক একটি রাজ্যে পরিণত করেন। ফলে এটির নাম হল পোল্যাণ্ড রাজ্য। একমাত্র ব্যক্তিগতভাবে জারের আনুগত্য ছাড়া রাশিয়ার সাথে পোল্যাণ্ডের কোন যোগ থাকল না। জার আলেকজাণ্ডার পোল্যাণ্ডে একটি সংবিধান চালু করেন। এই সংবিধানে ডায়েট নামে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা থাকে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ধর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয় এবং পোল ভাষাকে পোল্যাণ্ডে সরকারী ভাষা বলে গণ্য করা হয়। এর ফলে তৎকালীন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নাগরিকদের যতটা ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল, পোলবাসীদের তার চেয়ে বেশি ব্যক্তি স্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু পোল্যাণ্ডকে যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হল না, সেকারণে পোলরা অভিজাত-শ্রেণী রাশিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন

জার আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক নীতি

চালিয়ে যেতে থাকল। জার আলেকজাণ্ডার স্বভাবতই পোলবাসীদের প্রতি বিরক্ত হলেন এবং তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েন। ফলে পোল্যাণ্ডে নানারূপ দমনমূলক আইন প্রয়োগ করা হতে থাকে।

জার আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা নিকোলাস রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন। তিনি গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতির চরম শত্রু ছিলেন। ফলে পোল্যাণ্ডে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তিনি কঠোর হস্তে দমন করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বেলজিয়ামে বিদ্রোহ দেখা দিল। জার নিকোলাস বেলজিয়ামের বিদ্রোহ দমন করবার জন্য পোল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বললেন। এই সুযোগে পোল্যাণ্ডের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাশিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল।

পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ

জার নিকোলাস এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য দু-প্রকারের নীতি গ্রহণ করলেন। প্রথমত তিনি পোলবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলেন। পোল্যাণ্ডের শোষিত কৃষকদের পোল জমিদারদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেন। অবশ্য তিনি পোল কৃষকদের কিছু সুযোগ সুবিধা দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি এক বিরাট রুশ বাহিনী পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। এই শক্তিশালী বাহিনীর সামনে পোল বিদ্রোহীরা দাঁড়াতে পারল না। তারা বিদেশী সাহায্যের আশায় ছিল কিন্তু কোন বিদেশী রাষ্ট্র মৌখিক সহানুভূতি ভিন্ন অন্য কিছুই করল না। ফলে নিকোলাস অতি সহজেই পোল বিদ্রোহ দমন করলেন। তিনি পোল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত শাসন কেড়ে নিলেন এবং পোল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করলেন। রুশভাষাকে পোল্যাণ্ডের সরকারী ভাষা রূপে গণ্য করা হল। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগঠনগুলি ভেঙে দেওয়া হল। প্রতি বছর অসংখ্য পোলবাসীদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান হতে থাকল। ফলে পোলদের জীবনে ঘন অন্ধকার নেমে এল।

জার নিকোলাসের দমন নীতি

বিদ্রোহ দমন

১৮৪৮ এর বিপ্লব—বিপ্লবের বছর ঃ

পট ভূমিকা ঃ ১৮৪৮-এর ১২ই জানুয়ারী সিসিলির রাজধানী পালের্মোর জনতা রাজপথে জমায়েত হয়ে অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিন্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এর পর একমাসের মধ্যেই ইটালীর বিভিন্ন শহরে এরূপ বিদ্রোহ ও দাঙ্গা

হাঙ্গামা দেখা দেয়। ১৮৪৮-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী ফ্রান্সের আইন সভার নিম্নকক্ষে রক্ষণশীল মন্ত্রী গিজো মন্ত্রিসভার সমর্থনকারীদের সংখ্যা খুবই কমে গেল এবং বিরোধী দলগুলি ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সংস্কার ভোজসভা আন্দোলন শুরু করবে বলে ঘোষণা করল। লুই ফিলিপের সরকার ভীত হয়ে যখন এই সংস্কার ভোজসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল তখন প্যারিসের জনসাধারণ বিদ্রোহের পতকা উত্তোলন করল। এই দুটি ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা দুটি দুধরনের গণ অভ্যুত্থানের বা বিপ্লবের ইঙ্গিত দেয়, যার ফলে কয়েক মাসের মধ্যে কম করেও ইউরোপের প্রায় পনেরটি রাষ্ট্রের জনসাধারণ বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১৮৪৮-৪৯ ইটালী, জার্মানী ও হাঙ্গেরীতে যে সব বিদ্রোহ ঘটেছিল সেগুলি **পার্লামো অভ্যুত্থানের** পথকে অনুসরণ করেছিল—বিদেশী শাসনের বা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী জনপ্রিয় অভ্যুত্থান। সাধারণতঃ এগুলি কুখ্যাত মেটারনিক ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের দমননীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। আর সুইজারল্যাণ্ড, গ্রেটবৃটেন ও বেলজিয়ামের গণআন্দোলনগুলি ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিসের জনসাধারণ লুই ফিলিপের শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে তার অনুকরণে ঘটেছিল। এই অভ্যুত্থানগুলিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বলা যেতে পারে। এই গণ আন্দোলনগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করল। সুতরাং ১৮৪৮-৪৯ এর বিপ্লবগুলির মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অবশ্য পার্থক্য থাকলেও এদুটির মধ্যে মিলও প্রচুর ছিল এবং এদুটি এক জোটে ইউরোপে এক মহাপ্লাবন সৃষ্টি করল, যে প্লাবনের মুখে মেটারনিক ব্যবস্থা ভেসে চলে গেল এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশ হতেই সামন্ত প্রথা লোপ পেল।

বিপ্লবের পর্যায়ক্রম

Q. 8. Give an account of the revolution of 1848 in France. What were the social and political elements involved in this revolution ? *Or*, What were the causes of the revolution of 1848 in France. What were its results in France. *Or*, Bring out the significance of the February Revolution of 1848 in France.

Ans. লুই ফিলিপের চরিত্র : ফিলিপ শাসক হিসাবে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি রাজজনোচিত বিলাসিতা ও আদবকায়দা ভালবাসতেন না। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নেপোলিয়নকে তিনি শ্রদ্ধা

করতেন। জনসাধারণ প্রথমে তার এই সকল গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এটিও সত্য যে তিনি যা বাইরে প্রকাশ করতেন সেগুলি তাঁর অন্তরের কথা নয়। মনেপ্রাণে তিনি স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। জনসাধারণ শেষে তাঁর আসল রূপ বুঝতে পেরেছিল।

বিপ্লবের কারণ : (ক) ফ্রান্সে এই সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়েছিল। ন্যায্য অধিকারবাদীগণ, ক্যাথলিকগণ, প্রজাতান্ত্রিকগণ, সমাজতান্ত্রিকগণ, বোনাপার্টির সমর্থকগণ, কেউ ফিলিপের শাসনে সন্তুষ্ট ছিল না। এক একটি দল বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে লুই-এর রাজত্বের প্রতি ঘৃণার মনোভাব ব্যক্ত করল। যেমন ন্যায্য অধিকারবাদীগণ ফিলিপের রাজতন্ত্রকে অবৈধ বলে বিশ্বাস করত তেমনই বোনাপার্টি দল তাঁর বৈদেশিক নীতিকে পঙ্গু, দুর্বল ও দেশের পক্ষে অমর্যাদাকর বলে মনে করত। সেরূপ সমাজতান্ত্রিকগণ ফিলিপের আভ্যন্তরীণ নীতিকে বুর্জোয়া-ঘেঁষা বলে এর বিনাশ চাইল। ফিলিপ ও তাঁর মন্ত্রিদের পক্ষে এতগুলি দল ও উপদলকে সন্তুষ্ট করা সাধ্যাতীত ছিল।

লুই ফিলিপের বিরোধীদল

লুই ফিলিপ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থনে দেশ শাসন করছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রথা তখন ছিল না। ভোটদানের অধিকার ছিল কেবলমাত্র সম্পদশালীদের। লুই ফিলিপের সরকার উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত। সমগ্র ফ্রান্সে মাত্র ৩লক্ষ ভোটার ছিল। এই মুষ্টিমেয় ভোটারদের সরকারের পক্ষে হাত করা বিশেষ কষ্টকর ছিল না। ফলে সরকারের মনঃপুত লোকরাই আইন সভায় নির্বাচিত হত। এদের আবার নানারূপ দুর্নীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে সরকারের বশে রাখা হত। সদস্যরাও জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখত। ফলে আইন সভার সরকার পক্ষ সর্বদাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করত। একারণে আইনতঃ জুলাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করবার উপায় ছিলনা। কিন্তু পরিশেষে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনগণ লুই ফিলিপের শাসনকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করল এবং পুনরায় বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিল।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাধান্য

লুই ফিলিপ জোরদার পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেননি। পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি শান্তিবাদী ছিলেন। এই নীতির ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হতে পারে, কিন্তু গণ-মানসে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে না। ফ্রান্সের জনসাধারণ যখন বলিষ্ঠ ও গৌরবময় পররাষ্ট্র নীতি আশা করছিল তার বদলে পেল দুর্বল, পঙ্গু ও অমর্যাদাকর পররাষ্ট্রনীতি।

বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা

ফ্রান্স এই সময় কূটনীতিতে ইংলণ্ডের নিকট বারবার পরাজিত হয়। ফিলিপের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করল। ফ্রান্সে শিল্পায়নের ফলে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। এর ফলে দেশে গুরুতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক পরিবর্তন যে একান্ত দরকার তা লুই ফিলিপের সরকার মনে করলেন না। শিল্পায়নের ফলে দেশের পুঁজিপতিরা লাভবান হল, শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখ কষ্ট আরও বৃদ্ধি পেল। পুঁজিপতিরা মুনাফা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে বেশি করে শোষণ শুরু করে। লুই ফিলিপের সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের দিকে কোন নজর দিল না, বরঞ্চ নানারূপ দমনমূলক আইনের দ্বারা তাদের দাবি দাওয়া সম্বন্ধে আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হল। এর ফলে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সরকারবিরোধী মনোভাব তীব্র হল। তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে থাকল। এই সময় কয়েকজন জার্মান সাংবাদিক ফ্রান্সে পরিভ্রমণে আসেন। তারা যে কয়টি কলকারখানা দেখতে যান সবগুলিতেই তাঁরা লুই ফিলিপ সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের মনোভাব বুঝতে পারেন। এমন কি শ্রমিকরা বিপ্লবের সংগীতের প্রতি যে খুবই আকৃষ্ট তা তাঁরা লক্ষ্য করেন। একারণে তাঁরা উল্লেখ করেন যে ফ্রান্সে অদূর ভবিষ্যতে যে বিপ্লব দেখা দেবে তা হবে সামাজিক বিপ্লব। এই সময় ফরাসী শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রীরা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রী লুই ব্লাঁ সোচ্চারে প্রকাশ করতে লাগলেন যে লুই ফিলিপের বুর্জোয়াপন্থী সরকারের পতন ঘটাতে না পারলে শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটবে না। লুই ব্লা-র প্রধান দাবি ছিল সমস্ত কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা এবং শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরি এবং বেকারদের জন্য চাকুরীর সংস্থান করা সরকারের অবশ্য কর্তব্য। লুই ফিলিপ এর সরকার এই বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে চাইল না। ফলে অসন্তুষ্ট শ্রমিক সম্প্রদায় জুলাই রাজতন্ত্রের ওপর চরম আঘাত হানবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইল। আর এই সুযোগ দেখা দিল ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে।

শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ

লুই ফিলিপের সরকার কোনরূপ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল না। এ ব্যাপারে সরকারের স্থানুনীতি জনসাধারণের নিকট অসহ্য হয়ে উঠল। সরকার-বিরোধী দলগুলি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য বারবার আবেদন জানিয়ে ভগ্নমনোরথ হয়। বিরোধীদলগুলি অবশ্য শাসন ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন চায়নি। তারা আইন সভার গঠন ব্যবস্থার পরিবর্তন, ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধি, ভোট দেবার আর্থিক যোগ্যতার সীমা কমানো প্রভৃতি চেয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গিজো এগুলি সরাসরি

অগ্রাহ্য করে দেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে চালু ব্যবস্থাই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। আইন সভায় সরকারী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলে বিরোধীদল কিছুই করতে পারল না। পরিশেষে তারা বিপ্লবের পথ বেছে নিতে বাধ্য হল।

জনসাধারণ ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবী করলে লুই ফিলিপ তাঁর মন্ত্রী গিজোর পরামর্শে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দিলেন। প্যারিসে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হলে লুই ফিলিপের সরকার দমননীতি প্রয়োগ করলেন।

বিভিন্ন দল জনসাধারণকে বিদ্রোহে যোগদান করতে আহ্বান জানাল। ফ্রান্স যেন এই সময় আগ্নেয়গিরির ওপর নিদ্রা যাচ্ছিল। অগ্ন্যুৎপাত দেখা দিল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন এক বিরাট জনসভা বে-আইনী বলে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হল। রাস্তায় রাস্তায় অবরোধ প্রথা সৃষ্টি করা হল। প্যারিস নগরী আবার বিপ্লবের বাণীতে মুখরিত হল। লুই ফিলিপ উপায়ান্তর না দেখে পলায়ন করলেন। ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এটিকে **দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র** বলে।

ভোটের অধিকার নিয়ে বিবাদ ও বিপ্লব

ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব যে সকল সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, লুই ফিলিপের নিকট জনসাধারণ সেই সকল সমস্যার সমাধান আশা করেছিল। লুই ফিলিপ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ফ্রান্সে ঐ সময় যেরূপ রাজনৈতিক অবস্থা ছিল ফিলিপের পক্ষে সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয়নি। তিনি উচ্চ মধ্যবিত্তদের নিয়েই রাজ্যশাসন পরিচালনা করেন। এর ফলে দেশে বিপ্লব আরও প্রবল আকার ধারণ করে এবং তাঁকে সিংহাসন পরিত্যাগ করতে হয়।

ফলাফল: বিপ্লবের আশু সাফল্য ফ্রান্সে বিশেষভাবে দেখা গেল। ফ্রান্সে লা-মার্টিনের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিকদের যুক্ত অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হল। সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের নীতি নেওয়া হল। জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেবার সকলের অধিকার আছে বলে ঘোষণা করা হল। কাজ পাবার অধিকার মেনে নেওয়া হল। সরকারী তত্ত্বাবধানে জাতীয় কলকারখানা স্থাপিত হল। এই ভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন যুগ এল।

রাজতন্ত্রের অবসানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। প্রজাতন্ত্রের একজন সভাপতি প্রতি চারিবৎসর অন্তর নির্বাচিত হবেন ঠিক হল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য লোপ পেল। জনসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হল। শ্রমিক শ্রেণীর সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হল। সুতরাং ১৮৪৮-এর বিপ্লবকে রফা হিসেবে গণ্য করা যায় না। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন

আনবার চেষ্টা করা হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈসম্য দূর করিবার চেষ্টা চলে। এবং ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিক্রিয়াশীল কাঠামো ভেঙে পড়ল।

Q. 9. The French revolution of 1848 was the signal for the most widespread disturbances of the century.

Ans. ফ্রান্সের ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লব কেবল মাত্র ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র ইউরোপ এক প্রবল আলোড়নে আলোড়িত হল। ইউরোপে পনেরটি রাজ্যে বিপ্লব তরঙ্গ গিয়ে পৌঁছাল এবং ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিপ্লবী বছরের সৃষ্টি করল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। এই বিপ্লব যেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইঙ্গিত জানাল। জার্মানী, প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইতালী প্রমুখ ইউরোপের ১৫টি রাষ্ট্রে এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সর্বত্র স্বৈরাচারী সরকারের সাময়িকভাবে পরাজয় ঘটল।

অস্ট্রিয়া ঃ অষ্ট্রিয়ায় এই ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। ভিয়েনা, বোহেমিয়া, মিলান ও হাঙ্গেরীতে বিপ্লব প্রবল আকার ধারণ করে। মেটারনিক তাঁর রাজ্য (অষ্ট্রিয়া) হতে পালিয়ে যান। তাঁর পতনের সাথে সাথে তাঁর সৃষ্ট প্রাচীন অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থারও পতন হল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট প্রগতিবাদীদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন এবং জনসাধারণকে একটি নতুন সংবিধান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা এতে সন্তুষ্ট হল না। তারা একটি সংবিধান গঠনের দাবি জানাল। সম্রাট এটি মেনে নিলেন। সংবিধান পরিষদ নতুন সংবিধান রচনায় ব্যস্ত রইল। কিন্তু ইতিমধ্যে রক্ষণশীলরা পুনরায় ক্ষমতা হস্তগত করল। বৃদ্ধ সম্রাট ফার্ডিনাণ্ড পদত্যাগ করলেন। নতুন সম্রাট ফ্রান্সিস উদারনৈতিক সংস্কারগুলি প্রত্যাহার করে নিলেন। হাঙ্গেরীতে এই বিপ্লব লুই কসুথের নেতৃত্বে শুরু হল। হাঙ্গেরী স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং মার্চ মাসের আইনের দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যেও জাতিগত চেতনা দেখা দিল। ফলে জাতিতে জাতিতে বিভেদ শুরু হল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া সম্রাট বিপ্লবের প্রথম আঘাত সহ্য করে প্রত্যাঘাত করবার মত ক্ষমতাবান হলেন। ইটালীতে বিদ্রোহ দমন করা হল। হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে ধ্বংস করা হল। হাঙ্গেরীর স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ লোপ করা হল।

অস্ট্রিয়াতে বিপ্লব

হাঙ্গেরীতে

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা পেল

জার্মানীতে : ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ জার্মানীতে তরঙ্গ তুলল। প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনে জনতার বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন এবং সংবিধান তৈরী করার জন্য প্রতিনিধিসভা আহ্বান করেন। ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উরটেমবার্গ, সাকসনি প্রভৃতি রাজ্যেও প্রগতিবাদীদের চাপে রাজারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সম্মত হলেন।

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্ট

ঐক্যবদ্ধ জার্মানী প্রতিষ্ঠার কাজও এগিয়ে চলল, সমগ্র জার্মানীর ছয়শো প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানে মিলিত হলেন। এই সাধারণ সভা ইতিহাসে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্ট নামে পরিচিত। ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্ট অবশ্য সফলতা অর্জন করতে পারেনি। সদস্যদের মধ্যে বহু বাদানুবাদের পর এই পার্লামেন্ট এক শাসনতন্ত্র তৈরী করল। বংশগত রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়বার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই রাষ্ট্রের সম্রাট হবার জন্য প্রাশিয়ার রাজাকে আহ্বান জানান হল। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা অষ্ট্রিয়ার ভয়ে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। ফলে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টের কার্য বিফল হল। জার্মানীতে আবার পুরানো ব্যবস্থা ফিরে এল।

অন্যান্য রাজ্যে : ইংল্যাণ্ড, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও বলকান অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

ইটালীতে : ইটালীর পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া, নেপলস্, রোম প্রভৃতি অঞ্চলে বিপ্লব দেখা দিল। শাসকরা গণতান্ত্রিক সংবিধান মঞ্জুর করতে বাধ্য হলেন। তিন মাসের মধ্যেই অস্ট্রিয়াধীন ভেনিস ও লম্বার্ডি ভিন্ন ইটালীর প্রায় সমগ্র অঞ্চলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এরপর ইটালীতে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হল।

বিপ্লবের সাময়িক সাফল্য ও ব্যর্থতা

মেটারনিকের পতনের সংবাদ ইটালীতে পৌছানো মাত্র মিলান এবং ভেনিসে বিদ্রোহ শুরু হল। মডেনা ও পার্মার শাসকরা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। অস্ট্রিয়ার সৈন্য দল মিলান ত্যাগ করল। ভেনিসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পিডমণ্টের রাজা চার্লস্ আলবার্ট অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এই জাতীয় সংগ্রামের নেতা হলেন এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই যুদ্ধ বিফলতায় পর্যবসিত হয়। কাস্টোজার যুদ্ধে চাল্‌স্ আলবার্ট অষ্ট্রিয়া বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। কাস্টোজার যুদ্ধ কিন্তু ইটালীতে বিপ্লব-এর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করল না। ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি পোপকে বিতাড়িত করে রোমে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। কিন্তু ফ্রান্সের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট লুই নেপোলিয়ন এক ফরাসী-বাহিনী প্রেরণ করলেন পোপকে স্বীয় অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের এই সৈন্যবাহিনী রোমের প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করল। একে একে ইটালীর সর্বত্রই বিপ্লব দমিত হল। অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল তবে এটা ঠিক যে ১৮৪৮-৪৯-এর জাতীয় সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও ইটালীকে ভবিষ্যৎ চলার পথের কিছুটা সন্ধান দিয়েছিল।

ব্যর্থতার কারণ

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র বিদ্রোহের বহ্নি ব্যাপ্ত হয়েছিল। উৎপীড়িত জনসাধারণ স্বেচ্ছাচারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করল। কিন্তু পরিশেষে প্রায় সকল স্থানেই বিদ্রোহীদের পরাজয় হল। তবুও এটি স্বীকার্য যে ১৮৪৮-এর বিপ্লব ইউরোপের গণতান্ত্রিক ও জাতীয় আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দকে বিপ্লবের বৎসর বলা হয়। ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিপ্লব দেখা যায়। কিন্তু সর্বত্রই বিপ্লব পরিচালনায় ত্রুটি ছিল বলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পিছনে অনেক কারণ ছিল। প্রধান কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সৈন্যদল বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয় নি। যে বিপ্লব সৈন্যদলের সাহায্য পেয়েছিল সে বিপ্লব কখনই ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু ১৮৪৮-এর বিপ্লব এটি পায় নি। এছাড়া বিপ্লবীদের মধ্যে উদ্দেশ্যের অসমতা, তাদের প্রচেষ্টায় সমন্বয়ের অভাব ছিল। উপযুক্ত নেতা বিপ্লবীদের মধ্যে ছিল না।

ভবিষ্যতের ক্ষেত্র প্রস্তুত

তবে একথা বলা যায় যে এই বিপ্লব একেবারে ব্যর্থ হয়নি। এটিকে ভবিষ্যত সংগ্রামের মহড়া বলা যেতে পারে। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ায় পুরোনো শাসন ব্যবস্থায় ভাঙন ধরল এবং স্বৈরতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ল।

Q. 10. Discuss the nature and character of the Hungarian Revolution of 1848. Why did it fail?

হাঙ্গেরীর অবস্থা

Ans. অষ্ট্রিয়া ছিল একটি বহু জাতিভিত্তিক সমস্যাসঙ্কুল রাষ্ট্র। রাজনৈতিক একতা বলে কিছুই ছিল না। ক্রোট, শ্লাভ, জার্মান, চেক, ইটালিয়ান, ম্যাগায়ার পোল, রুমেন ও সার্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এখানকার অধিবাসী ছিল। হাঙ্গেরীতে ম্যাগায়ার জাতি একক জাতি হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এছাড়া শ্লাভ, জার্মান ও রুমানিয়ান জাতি ও হাঙ্গেরীতে বসবাস করত। অষ্ট্রিয়ার সম্রাটই হাঙ্গেরীর রাজা ছিলেন। এখানে মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। হাঙ্গেরীর নিজস্ব ব্যবস্থা পরিষদ বা 'ডায়েট' ছিল। অভিজাতরাই ডায়েটের সদস্য হতে পারত। সমাজ ব্যবস্থাও মধ্যযুগীয় আবহাওয়া কাটিয়ে উঠতে

পারেনি। জনসাধারণ সামন্ত প্রথার কুফল ভোগ করে আসছিল। মেটারনিকের শাসনকালে হাঙ্গেরীতে কোনরূপ সংস্কারসাধন করা সম্ভব হয়নি। তিনি সংস্কার আন্দোলনের তীব্র বিরোধী ছিলেন। মেটারনিক এক জাতিকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে উস্কানি দিলেন এবং জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন চালিয়ে যেতে থাকলেন। জার্মান কর্মচারী ও সেনাপতিকে হাঙ্গেরী প্রদেশে নিয়োগ করেন। ফলে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের তরঙ্গ হাঙ্গেরীতে পৌছাতে পারেনি।

জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হাঙ্গেরীতে না দেখা দিলেও হাঙ্গেরীতে জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিক মতবাদের প্রসার ঘটে।

হাঙ্গেরীর নবজাগরণ

উনিশশতকের প্রথমার্ধে হাঙ্গেরীতে রাজনৈতিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি একই সাথে চলতে থাকে। এই সময় হাঙ্গেরীতে কয়েকজন জাতীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে। এঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে হাঙ্গেরীতে জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিক মতবাদের প্রসার ঘটে। জনসাধারণ তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং দেশকে উন্নত করবার জন্য যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে।

হাঙ্গেরীর মধ্যযুগীয় সমাজ ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন আনবার জন্য ষ্টিফেন্ স্সেচেনই (Szecheny) প্রথম প্রচেষ্টা চালান। তিনি অভিজাত বংশীয় ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা প্রধানতঃ সামাজিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। হাঙ্গেরীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন ও ম্যাগায়ার ভাষা ও সাহিত্যে নবজাগৃতি যাতে দেখা দেয় তাঁর জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে হাঙ্গেরীর ডায়েট কিছুটা সচেতন হয় এবং অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে ম্যাগায়ার জাতির বিশেষ স্থান করে নেবার চেষ্টা করে। হাঙ্গেরীতে ম্যাগায়ার ভাষাই সরকারী ভাষারূপে গৃহীত হয়। এর ফলে কিন্তু হাঙ্গেরীতে বসবাসকারী অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলি ম্যাগায়ারদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হ'ল। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের সময় এর ক্ষতিকারক দিকটা দেখা দেয়।

হাঙ্গেরীর ডায়েটের অধিকাংশ সদস্যই জমিদারশ্রেণীর অন্তর্গত ছিল বলে তারা হাঙ্গেরী হতে সামন্তপ্রথা তুলে দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে নি। একারণে হাঙ্গেরীতে ভূমিসংস্কার সম্বন্ধে ডায়েট কোন প্রকার চেষ্টা করেনি। ফলে জনসাধারণ ডায়েটের কার্যাবলীতে খুবই অসন্তুষ্ট হল এবং প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক লুই কসুথ ও ফ্রান্সিস ডিকের নেতৃত্বে তারা আন্দোলনের পথ বেছে নিল।

লুই কসুথ: আধুনিক হাঙ্গেরীর স্রষ্টা লুই কসুথের নাম উনিশ শতকের

ইউরোপের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে। তিনি প্রথমে আইনজীবী ও পরে সাংবাদিকতার কাজ করতেন এবং নিজেই একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি তাঁর সংবাদপত্রের মাধ্যমে অষ্ট্রিয়া সরকার ও হাঙ্গেরীর ডায়েটের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির তীব্র সমালোচনা করতেন। ফলে তিনি সরকারের রোষ নজরে পড়েন। তার সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৮৪০-এ তিনি জেলখানা হতে ছাড়া পান। এরপর তিনি অন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকেন।

কসুথ উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। হাঙ্গেরীকে তিনি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত না হলে হাঙ্গেরীর উন্নতি হবে না বা হতে পারে না বলে তিনি মনে করতেন। হাঙ্গেরীর জনসাধারণ কসুথকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করল।

রাজনৈতিক মতবাদ

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কসুথ তাঁর দলের মতবাদ প্রকাশ করতে থাকলেন। ডিক এবিষয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ১৮৪৮-এ হাঙ্গেরীতে যখন বিপ্লব শুরু হয় তখন কসুথ ছিলেন ম্যাগায়ারদের অবিসংবাদী জাতীয় নেতা।

হাঙ্গেরীতে বিপ্লব: ১৮৪৮-এর মার্চ মাসে ফ্রান্সে ফিলিপের পতনের সংবাদ হাঙ্গেরীতে পৌঁছালে লুই কসুথের নেতৃত্বে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন দেখা দেয়। কসুথ প্রথমেই অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। প্রথমে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংস্কারের দাবি জানান। কিন্তু অষ্ট্রিয়া সরকার যখন পুনরায় প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করল তখন কসুথ বিপ্লবের পথ, সংগ্রামের পথ বেছে নিলেন এবং হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন।

কিভাবে শুরু হল

১৮৪৮ এর মার্চ মাসে কসুথ হাঙ্গেরীর ডায়েটে এক আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি জমিদারশ্রেণীকে তাদের পুরানো অধিকারগুলি ত্যাগ করতে বলেন এবং হাঙ্গেরী হতে সামন্ত প্রথার অবসান ঘোষণা করার দাবি জানান। হাঙ্গেরীতে জাতীয় ঐক্য অটুট রাখবার জন্য তিনি এটি দাবি করেন। এরপর প্রেসবার্গে হাঙ্গেরীর ডায়েটের অধিবেশনকালে তিনি আর একটি উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দেন। ঠিক এই সময় বুদাপেস্তে (হাঙ্গেরীর রাজধানী) মার্চের উৎসব মেলায় বহু কৃষকদের আগমন ঘটেছিল। এই কৃষকদের উত্তেজিত করল ছাত্রদল ও বিপ্লবী কবি পেটফ। ফলে বুদাপেস্তে অষ্ট্রিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হ'ল। অষ্ট্রিয়া সরকার ভীত হয়ে কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করল। কিন্তু লুই কসুথ যে

বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্য

সামাজিক সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তা মেটান হল না এবং তাঁর কথা মত হাঙ্গেরীকে স্বায়ত্তশাসনাধিকারও দেওয়া হল না। লুই কসুথ তখন ডায়েটে কয়েকটি আইন পাস করে নেন। এই আইনগুলির দ্বারা প্রকারান্তরে হাঙ্গেরীতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হল। অস্ট্রিয়া সরকার চুপচাপ রইল। তারা মনে করল যে বিপ্লবের উত্তেজনা প্রশমিত হলেই পুনরায় অস্ট্রিয়ার শাসন প্রবর্তিত করা যাবে। অতএব সাময়িক ভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করল।

এদিকে কসুথের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ ম্যাগায়ারগণ হাঙ্গেরীকে একটি ম্যাগায়ার জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করতে উদ্যোগী হল। ফলে হাঙ্গেরীতে ক্রোট, শ্লোভাক ও জার্মান জাতিরা এর বিরোধিতা শুরু করল। তারাও নিজ নিজ অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন দাবি করল। লুই কসুথ তাদের দাবি অগ্রাহ্য করলেন। ফলে হাঙ্গেরী গৃহযুদ্ধের কিনারায় পৌঁছাল। এতে সুবিধা হল অস্ট্রিয়ার। অস্ট্রিয়া যেন এরজন্য অপেক্ষা করছিল। হাঙ্গেরীতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কলহ শুরু হবার ফলে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীতে তার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পেল। অস্ট্রিয়া প্রথমেই 'মার্চের আইনগুলি' (March Laws) নাকচ করে দেবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইল। ১৮৪৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে অস্ট্রিয়ার রাজকীয় সৈন্যবাহিনী ক্রোশিয়া হতে হাঙ্গেরী আক্রমণ করল। কসুথ ভিয়েনার অধিবেশনে রত সংবিধান সভাকে এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। সংবিধান সভায় জার্মান ও স্লাভ সদস্যরা ম্যাগায়ার সদস্যদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি থাকায় কসুথের অনুরোধ উপেক্ষিত হল। এরপর ভিয়েনাতে জনসাধারণ আর একটি অভ্যুত্থান ঘটায় কিন্তু রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এই অভ্যুত্থান ধ্বংস করে দেওয়া হয়। বৃদ্ধ সম্রাট এই সময় সিংহাসন ত্যাগ করলেন। প্রতিক্রিয়াশীল যুবরাজ ফ্রান্সিস অস্ট্রিয়ার সম্রাট হলেন। তিনি কঠোর হস্তে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করে অস্ট্রিয়ার সম্রাটের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। এই সময় জেলাচিক (Jellachich) নামে একজন উগ্র ম্যাগায়ার বিরোধীকে হাঙ্গেরীর গভর্ণরপদে নিযুক্ত করা হয়। কসুথ এই নিয়োগ মানতে রাজি হলেন না। তিনি অস্ট্রিয়া সরকারকে জেলাচিকের বদলে অন্য কোন ব্যক্তিকে গভর্নর নিয়োগ করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। বলাই বাহুল্য অস্ট্রীয় সরকার কসুথের অনুরোধ উপেক্ষা করল। ফলে হাঙ্গেরীর উগ্রপন্থীরা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হল এবং কসুথের নেতৃত্বে

অন্যান্য জাতিদের ক্ষোভের কারণ

অস্ট্রিয়ার উদ্দেশ্যমূলক নীতি

তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হাঙ্গেরীর রাজা নন বলে ঘোষণা করল। সংক্ষেপে অষ্ট্রিয়ার সাথে সমস্ত সম্পর্ক তারা বিচ্ছিন্ন করে দিল। অষ্ট্রিয়া এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য জেলাচিককেই অষ্ট্রিয়া বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করল। জেলাচিক নিজে ক্রোট ছিলেন। তিনি অতি সহজেই হাঙ্গেরীর অম্যাগায়ার জাতিগুলির সাহায্য পেলেন। এর পর অষ্ট্রিয়ার নতুন সরকার মার্চ আইন নাকচ করে দিল।

বিদ্রোহ দমন

হাঙ্গেরী এর জবাব দিল লুই কসুথকে রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করে। লুই কসুথ প্রেসিডেন্ট হয়েই অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হল। রাশিয়ার জার নিকোলাস ছিলেন পুরোপুরি স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি মনে করতেন যে গণতন্ত্র ও বিপ্লবকে ইউরোপের কোন রাষ্ট্রে জয়যুক্ত হতে দিলে রাশিয়ার পক্ষে তা বিপজ্জনক হবে। হাঙ্গেরীতে বিপ্লব যদি জয়যুক্ত হয় তাহলে রাশিয়ার খুবই নিকটে অবস্থিত হাঙ্গেরীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হবে নিকোলাস এটি বুঝতে পারলেন। একারণে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমন করবার জন্য যখন তাঁর নিকট সাহায্য চান তিনি কাল বিলম্ব না করে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে দুলক্ষ রুশ সৈন্য প্রেরণ করলেন। কসুথ এইবার সমূহ বিপদে পড়লেন। তুরস্ক ও শ্লাভ জাতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। এদিকে ভিলাগসে হাঙ্গেরীয় সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর নিকট বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। হাঙ্গেরীতে অষ্ট্রিয়া ম্যাগায়ার জাতির ওপর সন্ত্রাসের শাসন শুরু করল। হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হল এবং হাঙ্গেরী এতদিন যে সুযোগ সুবিধা পেয়ে আসছিল সেগুলি প্রত্যাহার করা হল। সংক্ষেপে হাঙ্গেরীর ভাগ্যে ঘোর তমসা নেমে এল।

রাশিয়ার হস্তক্ষেপ

হাঙ্গেরীর বিদ্রোহের স্বরূপ : ১৮৪৮-এ-হাঙ্গেরীতে যে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ দেখা যায় অষ্ট্রিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ নয়, সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঘৃণার জন্য। দ্বিতীয়ত হাঙ্গেরীয় বিদ্রোহ প্রধানত ম্যাগায়ার জাতির বিদ্রোহ। হাঙ্গেরীতে বসবাসকারী অন্যান্য জাতিগুলি এতে যোগ দেয়নি, বরঞ্চ তারা এর বিরোধিতা করে এবং এই বিদ্রোহ দমনে অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করে। তৃতীয়ত, এই বিদ্রোহ প্রথম শুরু হয় রাজধানী বুদাপেস্তে এবং পরে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলে এই বিদ্রোহের প্রসার বিশেষ ঘটেনি। চতুর্থত হাঙ্গেরীয়

বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু পরে ম্যাগায়ার জনসাধারণ এটিতে যোগ দেয়। ফলে হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ বেশ কিছুদিন টিকে থাকে। পরিশেষে বলা যায় যে হাঙ্গেরীয় বিদ্রোহে আত্মবিভেদ দেখা যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ম্যাগায়ার জাতি নিজেরা যে সব সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য বিদ্রোহ করল সেই সুযোগ সুবিধা হাঙ্গেরীর অন্যান্য জাতিগুলিকে দিতে অসম্মত হল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি একদিকে যেমন হাঙ্গেরীয় বিদ্রোহকে এক বিশেষ রূপ দিয়েছে তেমনি এটির ব্যর্থতার জন্যও এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে দায়ী ছিল। তাছাড়া বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে মতভেদ, রাশিয়ার হস্তক্ষেপ, বিদেশী সাহায্যের অভাব, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শক্তিসঞ্চয় প্রভৃতি ঘটনাগুলি হাঙ্গেরীয় বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে।

Q. 11. Analyse the causes of the failure of the Revolutions of 1848 in Europe. Did the revolutions completely fail ?

Ans. ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দকে বিপ্লবের বছর বলা হয়। ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিপ্লব দেখা দেয়। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই বিপ্লব পরিচালনায় ত্রুটি দেখা দেয় এবং বিপ্লব ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পিছনে অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ, বিপ্লবীদের মধ্যে উদ্দেশ্যের অসমতা এবং তাদের প্রচেষ্টায় সমন্বয়ের অভাব ছিল। উপযুক্ত নেতাও বিপ্লবীদের মধ্যে বিশেষ ছিল না। প্রথমে বিপ্লবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়, কিন্তু পুরানো ব্যবস্থার পরিবর্তে কিরূপ ব্যবস্থার পত্তন হবে তা নিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যে মতভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এদের এই দুর্বলতা ও একতার অভাবের সুযোগ গ্রহণ করল স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়াশীলরা এবং তারাই অবশেষে জয়ী হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই ফ্রান্সের বিপ্লবোত্তর ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। বিপ্লবের পর ফ্রান্সে কিরূপ শাসন ব্যবস্থা স্থাপিত হবে তা নিয়ে প্রজাতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। ফ্রান্সে অবশ্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এই প্রজাতন্ত্রী সরকারের স্বরূপ নিয়ে প্রজাতন্ত্রী প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা লুই ব্লা-কে অপদস্থ করার জন্য জাতীয় কর্মশালা খোলা হল। প্রজাতন্ত্রী দল শীঘ্রই সমাজতান্ত্রিক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করল। জাতীয় মহাসভায় সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্যসংখ্যা মুষ্টিমেয় হলে সমাজতান্ত্রিকরা বিদ্রোহ করে। কিন্তু এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। এর ফলে সমাজতন্ত্রীরা প্রজাতন্ত্রীদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে রইল এবং এই সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ পেল। ইটালী ও জার্মানীতে বিপ্লবীদের মধ্যেও অনুরূপ মতপার্থক্য দেখা যায়। ভাবী জার্মান

রাষ্ট্রের কাঠামো কিরূপ হবে এ নিয়ে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টের সদস্যরা একটি বছর কাটালেন এবং যখন একটি সিদ্ধান্তে এলেন তখন দেখা গেল সেটিও অবাস্তব। ভাবী ইটালী রাজ্যে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র না পোপের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র হবে এই নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতির অভাবের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হল।

দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবের প্রাথমিক সাফল্যের সাথে সাথে প্রাদেশিকতা, ভাষা গোষ্ঠীগত স্বার্থ-চিন্তা ও জাতিবিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যেমন হাঙ্গেরীর ম্যাগায়ার জাতি ক্ষমতা হস্তগত করে নিজের সুযোগ সুবিধা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসী হলে হাঙ্গেরী বসবাসকারী অন্যান্য জাতিগুলি এটি সহ্য করতে পারল না। তারা ম্যাগায়ার জাতির শাসনের চেয়ে স্বৈরাচারী হাপস্‌বার্গ রাজতন্ত্রের শাসন পছন্দ করল। এটি ঘটতনা যদি ম্যাগায়ার জাতির নেতারা শাসন ব্যাপারে একটু উদার মনোভাবাপন্ন হতেন।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় সৈন্যদল বিপ্লবীদের সাথে যোগ দেয়নি। যে বিপ্লব সৈন্যদলের সাহায্য পেয়েছিল সে বিপ্লব কখনো ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু ১৮৪৮-এর বিপ্লব এটি পায়নি। বরঞ্চ বিপ্লব ধ্বংস করবার হাতিয়ার হিসেবে স্বৈরতন্ত্রী শক্তি সৈন্যদলকে ইচ্ছামত ব্যবহার করবাব সুযোগ পায এবং সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই অধিকাংশ রাষ্ট্রে পুবানো শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থতঃ, ১৮৪৮ এর বিপ্লবগুলি শহরভিত্তিক ছিল। শহরের অসন্তুষ্ট জনসাধারণ এই বিপ্লব শুরু ও জয়যুক্ত করে। এবং এই বিপ্লবগুলির নেতৃত্ব করেছিল শহরের বুদ্ধিজীবীরা—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছাত্রদল সাংবাদিক এবং সাহিত্যিকবৃন্দ। জার্মানীতে ১৮৪৮-এর বিপ্লবকে বুদ্ধিজীবীগণের বিপ্লব ফলে গণা করা হত। এর ফল-কিন্তু ভাল হয়নি। কারণ বুদ্ধিজীবীরা সাধারণতঃ ভাববাদী হয়ে থাকেন; তাঁরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থসংঘাত সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত থাকেন না। ফলে বিপ্লব জোরদার হতে পারেনি এবং পরিশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাছাড়া, বিপ্লবগুলি শহরভিত্তিক ছিল বলে কৃষককুল এগুলিতে বিশেষ যোগদান করতে পাবেনি বা বিপ্লবের প্রতি তাদের আগ্রহও দেখা গেল না। বরঞ্চ অনেকক্ষেত্রে কৃষকরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিদ্রোহ যাতে সাফল্যলাভ করতে না পারে তার জন্য চেষ্টা করে। ফ্রান্সে এবং অষ্ট্রিয়ায় এটি দেখা যায়। অষ্ট্রিয়া থেকে সামন্ত-প্রথা তুলে দেবার সাথে সাথে কৃষককুল বিপ্লবের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব দেখাতে শুরু করে।

উপসংহারে বলা যায় যে ১৮৪৮-এর বিপ্লবগুলির ব্যর্থতার জন্য নিয়তি অনেকটা

দায়ী ছিল—কলেরা রূপে এই নিয়তি কাজ করল। ১৮৪৮ ইউরোপের ইতিহাসে কেবলমাত্র বিপ্লবের বছররূপেই খ্যাত নয়, এই বছরটি মহামারীর রুদ্রমূর্তির জন্যও বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। যে কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয় তার উৎসস্থল ছিল চীন দেশ। চীন দেশ হতে রাশিয়ায় এটি সঞ্চারিত হয় ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। এবং ১৮৪৮-এর শুরুতেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এর করালমূর্তি দেখা যায়। বৃটেন হতে এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পৌছায়। এই ভাবে তুর্কীস্থানের কলেরা মিসিসিপি নদীর কিনারায় গিয়ে নিবৃত্ত হল। প্রত্যহ শত শত লোকের প্রাণহানি ঘটল। এর প্রকোপ শহরাঞ্চলেই বিশেষভাবে দেখা যায়। যেহেতু বিপ্লবগুলিও শহরভিত্তিক ছিল সেকারণে বিপ্লবের জয়যাত্রা বিশেষভাবে ব্যাহত হল। যারা এই রোগ হতে কোনরকমে পরিত্রাণ পেল তাদের মধ্যে বিপ্লবকে সার্থক করবার মত কর্মোদ্যমের পুরোমাত্রায় অভাব দেখা গেল। ক্ষুধার তাডনায়, দুঃখ দুর্দশার ফলে যে বিপ্লবের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তা নির্বাপিত হল মহামারীরূপ কলেরার দ্বারা।

তবে একথা বলা যায় যে এই বিপ্লব একেবারে ব্যর্থ হয়নি। এটিকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের মহড়া বলা যেতে পারে। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংবিধান ও সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ায় পুরানো শাসন ব্যবস্থায় ভাঙন ধরল এবং স্বৈরতন্ত্রের সেই জৌলুস আর ফিরে এল না। এটি ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকল। মেটারনিক ব্যবস্থার পতন ঘটল। ভূমিদাসত্ব প্রথার অবসান ঘটল। প্রজাতন্ত্রী আদর্শ জোরদার হল এবং সমাজতন্ত্রীরা নিজ মতবাদ প্রকাশ করবার সুযোগ পেল। তাছাডা, ১৮৪৮-এর বিপ্লব মেহনতী জনতার জয়যাত্রার শুভসূচনা করল। জনতাই বিপ্লবকে জয়যুক্ত করেছিল। এর ফলে ভবিষ্যতে প্রত্যেক দেশের সরকার বিশ্বাস করল যে জনতাই রাজনীতির বাহক ও ধারক। অতএব জনতাকে হাত করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের জন্য আওয়াজ তোলা হল।

Q. 12. Make a comparative study of the revolutionary movements of 1830 and 1848.

Ans. ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের তুলনামূলক আলোচনাকালে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিপ্লবটি প্রথমটি অপেক্ষা ব্যাপক ও গভীর ছিল। দুটির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য বেশি করে চোখে পড়ে।

সাদৃশ্য : প্রথমত, ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ১৮৩০ এবং ১৮৪৮-এর বিপ্লবগুলি সাধারণতঃ প্যারিসের বিপ্লবের অনুকরণে সংঘটিত হয় এবং সর্বত্রই প্রতিক্রিয়াশীল

শাসকদের বিরুদ্ধে বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, দুটি বিপ্লবই শহরভিত্তিক ছিল এবং বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তৃতীয়ত, উভয় বিদ্রোহই পরিশেষে ব্যর্থ হয়।

পার্থক্য: ১৮৩০-এর বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী শাসন ও অভিজাতদের সুযোগ সুবিধার অবসান ঘটিয়ে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৩০-এর বিপ্লবীরা রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ চায়নি। সংক্ষেপে এই বিপ্লব ছিল উদারনৈতিক। চার্চের বিশেষ ক্ষমতা এবং সামন্ততান্ত্রিক অধিকারগুলির অবসান ঘটাবার জন্য সুযোগ সুবিধা অন্বেষণী মধ্যবিত্ত জনতাকে উত্তেজিত করে এই বিপ্লব ঘটায়। ১৮৩০-এর বিপ্লবীরা আইনসভার সার্বভৌমত্বের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল, জনসাধারণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিল না। সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি তোলা হয়নি। অবশ্য ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য আওয়াজ তোলা হয়। সম্পত্তির মালিকরা যাতে ভোট দিতে পারে এবং বিত্তহীনরা যাতে ভোট দিতে না পারে তারজন্য বিশেষ চেষ্টা চলেছিল। সংক্ষেপে, ১৮৩০-এর বিপ্লব **সাম্যের** চেয়ে **স্বাধীনতার** ওপর বেশি জোর দেয়। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল উল্লেখ করা যেতে পারে। দশম চার্লস অষ্টাদশ লুই প্রবর্তিত চার্টার মানতে চাইলেন না বলেই বিদ্রোহ দেখা দিল এবং তাঁকে বিতাড়িত করে উদারনৈতিক শাসন প্রবর্তনে পক্ষপাতী মধ্যবিত্তশ্রেণী-ঘেষা লুই ফিলিপকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসান হল। এই বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন রাজতন্ত্র টিকে রইল অন্যদিকে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের চার্টার পুনরায় চালু হল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেল। দ্বিতীয়ত, ১৮৩০-এর বিপ্লব ভূমিদাস প্রথা, মেটারনিক ব্যবস্থা এবং রাজতন্ত্রের সমূলে বিনাশ চায়নি। এমন কি বেলজিয়ামের বিপ্লবের পর সেখানে রাজতন্ত্রই স্থাপন করা হল। প্রজাতান্ত্রিক চিন্তাধারা ১৮৩০-এর বিপ্লবীদের মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। আর সমাজতন্ত্রবাদের ত প্রশ্নই ওঠেনি। সংক্ষেপে ১৮৩০ এর বিপ্লবীদের মধ্যে চালু শাসন ব্যবস্থার সাথে একটি রফা করবার মনোবৃত্তি প্রথম হতেই দেখতে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে ১৮৪৮-এর বিপ্লব ব্যাপক ও ভবিষ্যতের দ্যোতনামূলক ছিল। এই বিপ্লব ফ্রান্সে, ইটালীতে ও হাঙ্গেরীতে বিশেষভাবে রূপ পরিগ্রহ করে। ফ্রান্সে এই বিপ্লব কেবলমাত্র লুই ফিলিপের শাসনের অবসানই ঘটাল না, রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করল এবং সমাজতন্ত্রবাদের চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়নে প্রথম পদক্ষেপ সূচিত হল জাতীয় কর্মশালার ধারণার মাধ্যমে। এই বিপ্লবের

ফলে ভোটাধিকার কেবলমাত্র সম্প্রসারিতই হল না, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার নীতির কার্যকরী রূপ দেখা গেল। যে সব দেশে বিপ্লব ঘটল সেগুলির প্রত্যেকটিতে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রয়াস দেখা যায়। ১৮৪৮-এর বিপ্লব প্রতিক্রিয়াশীল মেটারনিক ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে এবং সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ অধিকার ও ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটায়। সংক্ষেপে এই বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার সাথে কোনরূপ রফা করতে রাজী হয়নি।

Q. 13. In the realm of politics the period 1815 to 1850 was one of aspirations than of achievement Illustrate.

Ans. ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে রাজনৈতিক পরিবর্তন বিশেষ ঘটেনি। ভিয়েনা ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে বজায় ছিল। এই যুগটিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রবল থাকার ফলে পরিবর্তনকামী শক্তিগুলির পরাজয় ঘটে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এই যুগটিকে Forces of continuity-র সাথে (প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি) Forces of change-(পরিবর্তনকামী শক্তিগুলি) এর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম কাল হিসেবে গণ্য করেছেন। প্রথমটির মধ্যে তিনি স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র, চার্চ, জমিদারশ্রেণী এবং শান্তির জন্য জনসাধারণের ইচ্ছাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর দ্বিতীয়টির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু সমস্যা, শিল্পায়ন ও শহরভিত্তিক সভ্যতা, জাতীয়তাবাদ উদারনৈতিক মতবাদ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১৮১৫ হতে ১৮৫০ পর্যন্ত পরিবর্তনকামী শক্তিগুলি স্থিতাবস্থাকামী শক্তিগুলিকে পরাজিত করতে পারেনি। একারণেই রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। তবে ৮৪৮-৫০-এর মধ্যে বেশ বোঝা গেল যে স্থিতাবস্থাকামী শক্তিগুলি পরাজিতের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই শক্তি সাময়িকভাবে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের হাত হতে মুক্তি পেলেও এর ধ্বংসের দিন যে আগত প্রায় তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল।

অনেকের মতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগটি সফলতার যুগ বলে অভিহিত না করে আশা আকাঙ্ক্ষার যুগ বলে বর্ণনা করা উচিত। এই যুগটিতে মানুষের জীবন প্রভাবিত হয়েছিল শিল্প-বিপ্লব, সাহিত্যের বিকাশ, ধর্মনৈতিক আন্দোলন এবং মানব কল্যাণের প্রচেষ্টার দ্বারা। ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই সংস্কৃতিতে এক নতুন উদ্দীপনা দেখা যায়। সাহিত্য, শিল্প কলা-বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক নতুন চেতনার আবির্ভাব ঘটে। এই চেতনা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং কালক্রমে জাতীয় চেতনারূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে।

জনসাধারণ যদিও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে ছিল কিন্তু তাদের সংগ্রামগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। রাজায়-প্রজায় দ্বন্দ্ব, অনধিকার শাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজাপুঞ্জের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এযুগে প্রায়শ:ই ঘটেছিল কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা বিশেষ পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। এর কারণ হল ভিয়েনা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য মেটারনিক প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীলদের সার্বিক চেষ্টা। কার্লসবাড ডিক্রি, ট্রপো প্রটোকল, সামরিক শক্তি, গোয়েন্দা বিভাগের সাহায্যে জনসাধারণের উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা রুদ্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে আইন, শাসনক্ষমতা এবং সেনাবাহিনী ছিল। জনসাধারণের ছিল কেবলমাত্র আবেগজনিত উৎসাহ এবং আত্মপ্রত্যয়। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, জার্মানী অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

উপসংহারে বলা যায় যে এই যুগটিকে সাধারণভাবে আশা আকাঙ্ক্ষার যুগ বললেও এটি একেবারে অসাফল্যের যুগ ছিল না। এই যুগেই গ্রীক ও বেলজিয়ামবাসীরা তাদের মনোমত সরকার গঠন করে। এই যুগেই ফ্রান্স হতে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে। এই যুগেই জার্মানী ও ইটালীর কয়েকটি রাষ্ট্রে উদারনৈতিক শাসনবিধি প্রবর্তিত হয়। আর এই যুগেই কুখ্যাত মেটারনিক ব্যবস্থার পতন ঘটে।

More Questions with Hints

1. Discuss the principle and policies of the Restoration of monarchy in France.

Ans. অষ্টাদশ লুই ও দশম চার্লসের রাজত্বকাল সম্বন্ধে লিখতে হবে। 1 নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

2. Discuss the role of reactionary parties on bringing about the July Revolution.

Ans. ফ্রান্সে ১৮১৫ হতে উগ্র রাজতন্ত্রীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে লিখতে হবে। 1 নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

3. Discuss the significance of the Revolution of 1830.

Ans. ফ্রান্সের ইতিহাসে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আপাত-দৃষ্টিতে এই বিপ্লবের ফলাফল নগণ্য বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

ফ্রান্সে রাজতন্ত্র টিকে রইল সত্য কিন্তু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটল। ১৮১৪

খৃষ্টাব্দের চার্টারে রাজাকে যে সব বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সেগুলির অবসান ঘটল। এখন হতে ঠিক হল আইন সভাই দেশের আইন প্রণয়ন করবে। ফ্রান্সে ক্যাথলিক ধর্ম আর রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে স্বীকৃতি পেল না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হল। সংক্ষেপে, জুলাই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্স গণতন্ত্রের পথে অনেকটা এগিয়ে গেল। রাজনৈতিক ক্ষমতার চাবিকাঠি যে জনসাধারণের হাতে তা পরোক্ষ ভাবে মেনে নেওয়া হল এবং রাজার ভগবৎদত্ত ক্ষমতার বদলে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হল। তাছাড়া জুলাই বিপ্লব ভিয়েনার বৈধাধিকার স্বত্ব নীতির মূলে কুঠারাঘাত করল এবং ভিয়েনা ব্যবস্থা যে চিরন্তন নয় তা প্রমাণ করে দিল। এর সাথে সাথে ১৮১৫ হতে ফ্রান্সে উগ্র রাজতন্ত্রীরা তাদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে যে চেষ্টা করে আসছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

Q. 4 What was the importance of the Revolution of 1830 beyond France.

Ans. ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনুভূত হল। এই বিপ্লবের ফলাফলে অনুপ্রাণিত হয়ে বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, জার্মানী, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের নিষ্পেষিত জনসাধারণ প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবি জানাল। এর ফলে ভিয়েনা কংগ্রেসের আমল হতে ইউরোপে যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চালু হয় তার পরিসমাপ্তি ঘটল। এইসব গণঅভ্যুত্থানে শাসনকর্তারা চিন্তিত হলেন এবং এর সমাধান কিভাবে করা সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা চালাতে থাকলেন। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের চেতনাকে সমূলে উৎপাটিত করবার জন্য তাঁরা ১৮১৫তে জোট বেঁধেছিলেন কনসার্টের মাধ্যমে। ইউরোপের শান্তি রক্ষার জন্য যে কোন দেশের বিপ্লবাত্মক আন্দোলন দমনে আভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের নীতি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জুলাই বিপ্লবের সময় এই নীতির কার্যকরী রূপ দেখা গেল না। ফ্রান্সের বিপ্লব ধ্বংস করবার জন্য কোন রাষ্ট্রই এগিয়ে এল না। মেটারনিক এসম্বন্ধে কিছুটা চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই লুই ফিলিপকে ফ্রান্সের আইন সম্মত রাজা বলে বিভিন্ন রাষ্ট্র মেনে নিল। ভিয়েনা ব্যবস্থায় ফাটল ধরল এবং ভিয়েনা ব্যবস্থার স্রষ্টারা এটি মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

Q. 5. Estimate the personal responsibility of Louis Philippe for the French Revolution of 1848.

Ans. 3 নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

চতুর্দশ অধ্যায়

ইটালী ও জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা

Q. 1. Sketch the story of the unification of Italy. *Or*, How did Italy which was a Geographical expression in 1815, become a fully united country in 1870 ?

ইটালীর শোচনীয় অবস্থা

Ans বহু শতাব্দী ধরে ইটালী একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা ছাড়া কিছুই ছিল না। ইউরোপের রাজনীতিতে ইটালী ছিল একটি আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের পীঠস্থান। পনের ও ষোল শতকে এটি ছিল স্পেন ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র। আঠারো শতকে ইটালী অষ্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

এই যুগে ইটালীর জনসাধারণের ভাষা এবং তাদের আচারব্যবহার, ধর্ম এবং ইতিহাসও এক ছিল। কিন্তু ইটালীতে রাজনৈতিক ঐক্য বলে কিছুই ছিল না। ইটালীর উত্তর-পূব অংশ অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীনে ছিল। ফ্রান্সের বুরবোঁ বংশের এক শাখা নেপল্‌স ও সিসিলি দ্বীপ শাসন করতেন। মধ্য-ইটালীতে পোপ এবং কয়েকটি দুর্বল রাজা রাজত্ব করতেন। কেবলমাত্র দক্ষিণ-পূব ইটালীতে পিডমণ্ট-প্রদেশটি এবং সার্ডিনিয়া দ্বীপ ইটালীর একমাত্র দেশীয় রাজবংশের অধীনে ছিল।

নেপোলিয়ন ইটালী জয় করে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ইটালীতে এক অখণ্ড রাজ্য স্থাপন করার চেষ্টা করেন। নেপোলিয়নের শাসনাধীনে ইটালীর জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা জন্মায়। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ভিয়েনায় মিলিত হয়ে ইউরোপে বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগ ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর হল। ইটালী পুনরায় বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অষ্ট্রিয়া লম্বার্ডি ও ভেনিসিয়া হস্তগত করে। টাসকানী পার্মা, মডেনা প্রভৃতি রাজ্য হ্যাপস্‌বুর্গ বংশীয় রাজাদের হাতে গেল। পোপ তাঁর রাজ্য আবার ফিরে পেল। বিতাড়িত বুরবোঁ বংশীয় রাজা নেপল্‌সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইটালীর উত্তর-পশ্চিম দিকে সার্ডিনিয়া পিডমণ্ট রাজ্য থেকে গেল। জনসাধারণের স্বার্থ বা আকাঙ্ক্ষার কোন মূল্যই দেওয়া হল না।

ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলন : ইটালীতে ঐক্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন প্রথমে গোপন ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদের রূপ নেয়। সন্ত্রাসবাদীগণ **'কার্বনারি'** নামে

পরিচিত। তাদের প্রতিষ্ঠিত বহু সমিতি ছিল। সমিতিগুলি হতে নতুন ভাব ও নতুন আদর্শ—ইটালীর ঐক্য প্রচারিত হতে থাকে। এর ফলে ১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর কয়েকটি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কার্বোনারিরা নেপল্‌স ও পিডমণ্টে বিদ্রোহ শুরু করে। কিন্তু অষ্ট্রিয়া তার সামরিক শক্তি দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে।

বিপ্লবী আন্দোলন-গুলির ব্যর্থতা

১৮৩০-এর ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইটালীতে প্রবেশ করলে মডেনা, পার্মা ও পোপের রাজ্যে গণ-বিদ্রোহ দেখা দিল, অষ্ট্রিয়া এতে শঙ্কিত হল। বিপ্লবীরা বৈদেশিক সাহায্যের আশা করেছিল কিন্তু ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ড কেউই সাহায্য করল না। মেটারনিক ইটালীতে অষ্ট্রীয় সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। ফলে শাসকরা আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। ইটালীর সবত্র বিপ্লব ব্যর্থ হল।

এই দমননীতি কিন্তু ইটালীতে ঐক্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন ধ্বংস করতে পারেনি। এই সময় স্বাধীনতাকামী ইটালীয়দের মধ্যে তিনটি দলের সৃষ্টি হয়—প্রজাতন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজতন্ত্রী। প্রজাতন্ত্রী দলের নেতা ছিলেন ম্যাটসিনি।

বিভিন্ন দল ও মত

ম্যাটসিনি ঃ ম্যাটসিনি ছিলেন ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়ার এক ডাক্তারের পুত্র। তিনি যৌবনেই ইটালীর ভাষা, সাহিত্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেন। ইটালী যখন একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র তখন তিনিই সবপ্রথম স্বাধীন ও অখণ্ড ইটালীর স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্ন সার্থক করার জন্য তিনি 'যুব ইটালী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। তার ইচ্ছা ছিল ইটালীকে ঐক্যবদ্ধ করে এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার। রোমনগরী এই প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হবে। পোপের প্রাধান্য থাকবে না। তাঁর এই ঐক্য ও স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলমন্ত্র ছিল 'ভগবান ও জনসাধারণ'। দেশের যুবশক্তির ওপর তাঁর আস্থা ছিল গভীর। তাঁর রচনা ও বক্তৃতা তাঁর স্বদেশবাসীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর নানাস্থানে যে গণ-বিপ্লব হয় সেগুলি ম্যাটসিনি-পরিচালিত যুবশক্তির প্রচেষ্টায় সংঘটিত হয়েছিল। এই বিপ্লবগুলি সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও একথা অনস্বীকার্য যে ম্যাটসিনি ইটালীবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেন। অখণ্ড ইটালী গঠনের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল তিনি তাঁর বাণী ও কার্য দ্বারা তা সম্পূর্ণ করেন। এই কারণে তাঁকে ইটালীর স্বাধীনতা-আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয়।

প্রজাতন্ত্রী দল

ম্যাটসিনির মত আরও বহু দেশপ্রেমিক নাট্যকার, কবি ও কথাশিল্পী তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে ইটালীর সাহিত্যে একটি নবজাগরণ সৃষ্টি করলেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় দলের নেতা ছিলেন জিওবার্টি। তাঁর মতে ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্র পোপের নেতৃত্বাধীনে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হলে ইটালীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক হবে। এই সময় আবার পোপ নবম পায়াস তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি খুব প্রগতিবাদী এবং অষ্ট্রিয়া বিরোধী। স্বভাবতই জিওবার্টি ও তাঁর অনুচরবৃন্দ ভেবেছিলেন যে এই পোপ ইটালীর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান হোতা হবেন। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পোপের স্বরূপ ধরা পড়ল। তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলেন না। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় দলের সব আশা নস্যাৎ হল।

যুক্তরাষ্ট্রীয় দল

ম্যাটসিনির স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বহু ইটালীবাসী মনে করেন যে ইটালীর রাজনৈতিক একতা ও স্বাধীনতা সম্ভব হবে যদি পিডমণ্ট সার্ডিনিয়ার রাজবংশ মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। অবশ্য জনসাধারণের এই চিন্তার পিছনে পিডমণ্ট সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস্ আলবার্টের অবদান ছিল। তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক বিরাট সংগ্রামে নেমে পড়েন। কিন্তু শেষে তিনি অষ্ট্রিয়ার হাতে পরাজিত হন এবং পুত্র দ্বিতীয় ভিক্টর এমান্যুয়েলের হাতে রাজ্যভার তুলে দেন।

রাজতন্ত্রী দল

১৮৪৮-৪৯-এর ইটালীর অভ্যুত্থান ব্যর্থতার একটি মর্মান্তিক উদাহরণ সন্দেহ নেই তবু পিডমণ্টের রাজবংশ এই অভ্যুত্থানে ভূমিকা নেন, তাতে ভবিষ্যতে এই রাজবংশের নেতৃত্বেই যে ইটালীর ঐক্যসাধন সম্ভব হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।

১৮৫০ হতে ১৮৭০—এই বিশ বছরে ইটালীর জাতীয় ঐক্য ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত গতিতে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যায়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীবাসীদের স্বপ্ন সফল হয়। ইটালীর এই সাফল্যের মূলে যার দান সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন পিডমণ্টের প্রধান মন্ত্রী **কাউণ্ট কাভুর**।

কাভুরের নেতৃত্ব

ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির সাধু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সমগ্র ইটালীতে হতাশা দেখা দেয়। ইটালীর এই দুর্দিনে কাভুরের আবির্ভাব ঐক্যসাধনায় অন্ধকার যুগে একমাত্র আশার আলো নিয়ে আসে। কাভুর প্রথমেই উপলব্ধি করলেন যে ইটালী হতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করতে না পারলে দেশে ঐক্য আসতে পারে না। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সার্ডিনিয়া রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। এই সার্ডিনিয়া

পিডমণ্টের রাজা ছিলেন ভিক্টর দ্বিতীয় ইমানুয়েল। তিনিও ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতা মনেপ্রাণে চাইতেন। কাভুরের চেষ্টায় ছোট সার্ডিনিয়া রাজ্য ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরাভাগে এল।

কাভুর ঃ কাভুর ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তিনি প্রথমে কৃষিকার্যে মন দেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁব ঐকান্তিক চেষ্টায় সার্ডিনিয়ার রাজা একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এর আগে তিনি ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বহু স্থান ভ্রমণ করে ওই সব দেশের নানাবিধ উন্নতি লক্ষ্য করেন এবং নিজ রাজ্যে ওই দেশগুলিব শাসন-ব্যবস্থা ও শিল্প-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সংকল্প করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে পিডমণ্ট সার্ডিনিয়াব নেতৃত্বেই সমগ্র ইটালীর রাজনৈতিক একতালাভ সম্ভবপর। প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি সার্ডিনিয়ার আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে মন দিলেন। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে সব রকমে সাহায্য করলেন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে উৎসাহিত করলেন। সমগ্র দেশে দ্রুত রেলপথ নির্মাণের পবিকল্পনা ছিলেন। রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার কববার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বাষ্ট্রের সাথে কয়েকটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেলেন। সামরিক বাহিনীকে তিনি নতুনভাবে গড়ে তুললেন।

কাভুরের প্রাথমিক জীবন

আভ্যন্তরীণ নীতি

পররাষ্ট্র নীতি ঃ ইটালীব ঐক্য আন্দোলনের ফলে যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তার দিকে লক্ষ্য বেখে কাভুর তাঁর পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ কবলেন। তিনি একজন সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং এর ফলে তিনিই প্রথম বুঝতে পারলেন যে বিদেশী শক্তির সাহায্য ছাড়া ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য আসবে না। তিনি ইটালীর সমস্যাকে নিজের রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে ইউরোপীয সমস্যায় পরিণত করলেন এবং অষ্ট্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করবার জন্য অষ্ট্রিয়া-বিরোধী শক্তি-সমন্বয় গড়তে চেষ্টা করলেন। এর জন্য প্রথমেই তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পত্র-পত্রিকায় ইটালীর সমস্যা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখলেন।

ইতিমধ্যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হল। কাভুবের চেষ্টায় পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যোগ দিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সার্ডিনিয়া বাহিনী বিশেষ কৃতিত্ব দেখাল এবং ইউরোপে সুখ্যাতি অর্জন করল। যুদ্ধশেষে কাভুর প্যারিসের শান্তি

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

বৈঠকে (১৮৫৬) যোগ দেন এবং ইটালীর দুঃখ-দুর্দশায় কথা বৈঠকে উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের নিকট নিবেদন করেন। ফলে ইটালীর সমস্যা সম্বন্ধে সমবেত রাষ্ট্রনায়করা অবহিত হন।

প্যারিস সম্মেলন

ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ইংল্যাণ্ডও ইটালীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। প্যাবিস বৈঠক হতে কাভুর মহানন্দে দেশে ফিরলেন। এর পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কাভুর প্লমবিয়ার্স নামক স্থানে তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন এবং বৈঠক শেষে নেপোলিয়নের সাথে **প্লমবিয়াসে´র গোপন চুক্তি** সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে স্থির হল যে ফ্রান্স ও পিডমণ্ট যুগ্মভাবে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া অষ্ট্রিয়ার নিকট হতে কেড়ে নিয়ে পিডমণ্টের সাথে যুক্ত করা হবে। পার্মা, মডেনা, টাসকেনি নিযে একটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করা হবে। রোম এবং পোপের বাজ্যের-কোন পবিবর্তন করা হবে না। নেপলস যেমন ছিল তেমনি থাকবে। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে, পিডমণ্টের পক্ষে যুদ্ধে নামার জন্য ফ্রান্স স্যাভয় ও নীস পাবে।

তৃতীয় নেপোলিযনেব সাথে চুক্তি

দেশে ফিবে কাভুব কেবল সুযোগ খুঁজতে লাগলেন এবং যে কোন ছুতোয় অষ্ট্রিযার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেন।

ইটালীর ঐক্যসংগ্রামের প্রথম পর্যায়ঃ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই সুযোগ দেখা দিল। অষ্ট্রিযা সার্ডিনিয়াব সৈন্যবাহিনীকে তিন দিনেব মধ্যে ভেঙে দেবার দাবি জানালে এবং সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালে যুদ্ধের জন্য উদ্‌গ্রীব কাভুব সানন্দে বলেছিলেন, "অক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি।" এবং এর সাথে সাথেই অষ্ট্রো-সার্ডিনিয়া যুদ্ধ শুরু হল এবং প্লমবিয়ার্সের চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স পিডমণ্টে সার্ডিনিয়ার পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করল। মিত্রপক্ষের সৈন্যদল মাজেণ্টা ও সলফেরিনোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করল। লম্বার্ডি ও মিলান মিত্রশক্তির হাতে এল। কেবল ভেনেসিয়া হতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করতে পারলেই ইটালী হতে অষ্ট্রিয়ার অধিকার একেবারে চলে যাবে। আবার এর ভেতব পার্মা, মডেনা, টাসকানি এবং রোম অঞ্চলে জনসাধারণ বিদ্রোহ করল এবং সার্ডিনিয়ার সাথে তাদের রাষ্ট্রগুলির সংযুক্তিকরণ দাবি করল। কিন্তু হঠাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভুরের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং অষ্ট্রিয়ায় সাথে ভিলাফ্রাঙ্কা নামক স্থানে যুদ্ধ-বিরতিতে স্বাক্ষর করলেন। পরে

অস্ট্রিযাব সাথে যুদ্ধ

যুদ্ধের অবসান

এই বিরতি জুরিখের সন্ধিতে পরিণত হয়। সন্ধি অনুসারে স্থির হয় যে, সার্ডিনিয়া লম্বার্ডি পাবে কিন্তু ইটালীর অন্যান্য রাজ্যে পূর্বাবস্থা ফিরে আসবে।

তৃতীয় নেপোলিয়নের আচরণে কাভুর হতবাক হলেন। পিডমণ্ট একাই যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ধীর-স্থির পিডমণ্ট রাজ এতে রাজী না হওয়ায় কাভুর পদত্যাগ করলেন। কাভুরের পক্ষে নৈরাশ্যের কারণ হলেও জুরিখের সন্ধিতে ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের অগ্রগতিই সূচিত হয়।

যুদ্ধের ফলাফল

মধ্য ও দক্ষিণ ইটালীর অন্তর্ভুক্তি ঃ কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার ইটালীতে দেখা দিল তাতে ভাটা পড়ল না। ভিল্লাফ্রাঙ্কা ইটালীয়দের স্বাধীনতার স্পৃহা, তাদের একতার আকাঙ্ক্ষা আরও বাড়িয়ে দিল। এই সময় ইটালীর জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এতই প্রবল হল যে, মধ্য ইটালীর পার্মা, টাসকেনি, মডেনা ও রোমগ্না প্রভৃতি রাজ্যের জনসাধারণ প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করে সার্ডিনিয়ার সাথে একতাবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে কাভুর পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং নেপোলিয়নের সাথে নতুন এক চুক্তি করলেন। স্থির হল পার্মা, মডেনা ও টাসকেনি পিডমণ্টের সাথে যুক্ত হবে। ফ্রান্স অবশ্য স্যাভয় ও নীস পাবে। গণভোটের মাধ্যমে অবিলম্বে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হল।

মধ্য ইটালীতে বিপ্লব ও গণভোট

ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্যের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ের নায়ক হলেন গ্যারিবল্ডি।

গ্যারিবল্ডি ঃ গ্যারিবল্ডি এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পনের বছর বয়সে তিনি বাড়ি হতে পালিয়ে যান এবং নৌবিদ্যায় শিক্ষালাভ করে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন হন। এই সময় তিনি ম্যাটসিনির সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর আদর্শে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সহকর্মীরূপে কাজ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইটালীর পিডমণ্টে যে বিদ্রোহ হয় তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাঁকে নির্বাসনে থাকতে হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তিনি ইটালীতে ফিরে আসেন এবং সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর রাজনৈতিক গুরু ম্যাটসিনি রোমনগরীতে এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। গ্যারিবল্ডি এই প্রজাতন্ত্রে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পরে তিনি রোম রক্ষার জন্য ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন। শেষে অবশ্য তাঁকে রোম ছেড়ে

বিপ্লবী জীবন

চলে যেতে হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেপলস্ ও সিসিলিতে জনসাধারণ বিদ্রোহ করলে তিনি বিপ্লবীদের সাহায্য করতে মাত্র এক হাজার 'লালকোর্তা' নিয়ে সিসিলি জয় করতে যান। গ্যারিবল্ডি সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিসিলিতে অবতরণ করলে সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে বরণ করে নিল। অভূতপূর্ব জনসমর্থন পেয়ে গ্যারিবল্ডি তিন মাসের মধ্যে সমগ্র সিসিলি অধিকার করলেন এবং নিজেকে সিসিলির সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করলেন। এরপর তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নেপলসে এলেন। তাঁর পৌঁছা সংবাদ পেয়ে নেপলসের জনসাধারণ অত্যাচারী বুরবোঁ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস প্রাণভয়ে গেটা নামক দুর্গে আশ্রয় নিলেন। গ্যারিবল্ডি যুদ্ধ বুঝতেন, কিন্তু রাজনীতির ধার ধারতেন না। নেপলস জয় করে তিনি রোম ও ভেনিস জয় করবার কথা ঘোষণা করলেন। কাভুর মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কারণ গ্যারিবল্ডি রোম আক্রমণ করলে তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং অস্ট্রিয়া একজোটে পিডমন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করত। কাভুর প্রথমে গ্যারিবাল্ডিকে রোম আক্রমণ না করবার জন্য অনুরোধ জানালেন কিন্তু গ্যারিবাল্ডি এটি ভীরুতার নামান্তর বলে মনে করলেন। এরূপ সঙ্কটময় অবস্থায় কাভুর এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্যারিবল্ডির হাত হতে রোম ও পোপকে রক্ষা করবার জন্য উত্তর দিক হতে পোপের রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং সহজেই পোপের রাজ্য জয় করে তিনি রাজা ভিক্টর এমানুয়েলকে নেপলসে পাঠালেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভিক্টর দ্বিতীয় এমানুয়েল যখন নেপলস্-এ প্রবেশ করেন গ্যারিবল্ডি তাঁকে 'ইটালীর রাজা' বলে অভিহিত করেন। রাজা ইমানুয়েল তাঁকে প্রচুরভাবে পুরস্কৃত করতে চান, কিন্তু এই নির্লোভ পুরুষসিংহ কপর্দক না নিয়ে নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রে মহানন্দে চলে গেলেন। এরূপ আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম মানুষকে দেবতা করে এবং জীবনকে মহাকাব্যে পরিণত করে।

সিসিলির অভ্যুত্থান

গ্যারিবল্ডির বিজয়াভিযান

কাভুরের মনোভাব

পোপের রাজ্য, নেপলস্ ও সিসিলির অন্তর্ভুক্ত

গ্যারিবল্ডি ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনাপতি বলে গণ্য হয়েছেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তুরিনে সংযুক্ত ইটালীর পার্লামেন্টের অধিবেশন বসল। ভিক্টর এমানুয়েলকে রাজমুকুট দিয়ে 'ইটালী রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হল। ভেনিস এবং রোম ভিন্ন সমগ্র ইটালী ঐক্যবদ্ধ হল। এর কিছুদিন পরই কর্মক্লান্ত কাভুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ইটালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা

ইটালীর ঐক্যের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ভেনিস ও রোম ঐক্যবদ্ধ ইটালীর সাথে যুক্ত হতে বেশি দেরি হল না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সাথে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ হলে ইটালী প্রাশিয়ার পক্ষে এই যুদ্ধে যোগ দেয়। প্রাশিয়ার নিকট অষ্ট্রিয়া পরাজিত হয়। যুদ্ধ-শেষে প্রাগের সন্ধি অনুসারে অষ্ট্রিয়া ইটালীকে ভেনিস দিতে বাধ্য হয়।

অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ইটালীর ভেনিস লাভ

ইটালীর ঐক্যের তৃতীয় পর্যায়ঃ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ফ্রান্স সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধ চলবার সময় ফ্রান্স তার সৈন্যদল রোম হতে সরিয়ে নেয়। ফলে ইটালীয় বাহিনী রোম দখল করে নেয়। ইটালীর রাজধানী রোমে স্থাপন করা হল। এর সাথে সাথে ইটালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হল।

ফ্রাঙ্কো প্রাশিয়ান যুদ্ধে রোম লাভ

কিন্তু ইটালীতে কিছু সংখ্যক লোক থেকে যায় যারা মনে করল যে ১৮৭০-তে ইটালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হয়নি। তারা অষ্ট্রিয়ার অধীনে টাইরল প্রভৃতি অঞ্চল ইটালীর প্রাপ্য বলে মনে করত। এই অঞ্চল ইটালীর অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য পরবর্তীকালে আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের Irrendists বলা হত। বহু চেষ্টার পর ইটালী যখন এইসব অঞ্চল পেল না তখন ফ্রান্সও গ্রেট বৃটেনের পথ অবলম্বন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়।

Q. 2. Make an estimate of the contributions of Victor Emanuel, Cavour, Mazzini and Garibaldi to the making of the united Italian State.

ইটালীর ঐক্য-আন্দোলনে বিভিন্ন নেতার অবদানঃ ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য-আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে কাভুরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁকেই নব্য ইটালীর স্রষ্টা বলা হয়। তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি ভিন্ন ইটালীর ঐক্য সম্ভব হত না। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে বিদেশী সাহায্য ছাড়া অষ্ট্রিয়ানদের ইটালী হতে তাড়ান যাবে না। এবং তাদের না তাড়াতে পারলে ইটালীর স্বাধীনতা আসবে না। তিনি ইটালীর সমস্যাকে তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে ইউরোপীয় সমস্যায় পরিণত করলেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিলেন। ফ্রান্স তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করল। ইংল্যাণ্ডও তাঁকে সাহায্য করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন শুরু হল তখন তিনি ধৈর্য, সাহস ও দক্ষতার সাথে এটিকে পরিচালিত করেন।

কাভুর

মধ্য ইটালীর বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে রাজতন্ত্রী পথে পরিচালিত করেন। গ্যারিবল্ডির হাত হতে ক্ষমতা গ্রহণ করবার জন্য রাজা এমানুয়েলকে নেপলস্-এ পাঠিয়ে তিনি অসামান্য রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দেন। পরিশেষে বলা যায় যে ইটালীর জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্যে তিনি ইটালীকে এক-জাতিতে পরিণত করেন—এটাই তাঁর জীবনের সাধনা ছিল। ম্যাটসিনির প্রেরণা, গ্যারিবল্ডির রণনৈপুণ্য এবং এমানুয়েলের নির্ভীক দেশপ্রেম বৃথাই বায়িত হত যদি না কাভুর এগুলির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করতেন।

কাভুরের কৃতিত্ব

রাজা ভিক্টর এমানুয়েল-এর ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি দৃঢ়চেতা ও স্থিরবুদ্ধি নৃপতি ছিলেন। তিনি এক সংকটময় অবস্থায় পিডমণ্টের সিংহাসনে বসেন। অস্ট্রিয়া তাঁকে পিডমণ্টের শাসনতন্ত্র নাকচ করে দিতে বলে কিন্তু তিনি অস্ট্রিয়ার এই আদেশ অগ্রাহ্য করেন। ফলে পিডমণ্ট ইটালীর মুক্তি আন্দোলনের নেতারূপে গণ্য হয় এবং ইটালীতে রাজতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কাভুরকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত তিনিই করেছিলেন। আবার কাভুরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ভিলাফ্রাঙ্কার চুক্তিকে মেনে নিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। রোম ও নেপলস্-এ গিয়েও তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম যাতে সফলতা লাভ করে তার জন্য তিনি সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। এবং এসব কারণে ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি এক গৌরবময় স্থান নিয়ে রয়েছেন।

রাজা এমানুয়েলের ভূমিকা

গ্যারিবল্ডি ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনাপতি বলে গণ্য হয়েছেন। তরুণ বয়সে তিনি ইটালীর প্রায় সমস্ত বিপ্লবগুলিতেই যোগ দেন। ম্যাটসিনির তিনি ছিলেন সুযোগ্য শিষ্য। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সিসিলির জনসাধারণ তাঁকে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়। গ্যারিবল্ডি তাঁর মাত্র এক হাজার 'লালকোর্তা' নিয়ে সিসিলি দ্বীপ হতে অত্যাচারী বুরবোঁ রাজাকে বিতাড়িত করেন। সিসিলি জয় করে তিনি নেপলস্ জয় করেন এবং রাজা এমানুয়েল নেপলস্-এ প্রবেশ করলে তিনি তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখান এবং নিজে সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করে জনসাধারণকে রাজানুগত্য স্বীকার করে নেবার জন্য মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানান। তিনি দেশের স্বার্থে নিজেকে বিলুপ্ত করে দেন। এখানেই তাঁর প্রকৃত মহত্ব। তাঁর আত্মত্যাগের আদর্শ ইটালীর যুবকবৃন্দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

গ্যারিবল্ডির অবদান

ম্যাটসিনির অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্বোনারীর সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত

আন্দোলনের পথ তিনি ছেড়ে দিয়ে গণ-বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করেন। ইটালী যখন একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র তখন তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন ও অখণ্ড ইটালীর স্বপ্ন দেখেন। তিনি ইটালীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগান। অখণ্ড ইটালী গঠনের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল তিনি তাঁর লেখনী ও কার্যাবলীর দ্বারা তা সম্পূর্ণ করেন। এ কারণে তাঁকে ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয়।

ম্যাটসিনির ভূমিকা

Q. 3. Tell the story of the unification of Germany. Give an account of the political condition which prevailed in Germany consequent on the Vienna Settlement. What were the basic factors that prepared the field for the unification of Germany ? What was the Bismarkian plan for the unification of Germany ? How did Bismark execute that plan up to the Battle of Sadowa ? What was the bearing of the Schleswig-Holstein Question on the unification of Germany ? What is the origin of the Franco-Prussian War ?

Ans. **জার্মানীর ঐক্য-আন্দোলন :** উনিশ শতকে জার্মানীর অবস্থাও ইটালীর ন্যায়ই ছিল। নেপোলিয়ন কতকগুলি জার্মান রাজ্য নিয়ে দক্ষিণ জার্মানীতে একটি যুক্ত জার্মান রাজ্য গঠন করেন। জার্মানরা নেপোলিয়নের অধীন থাকাকালীন নিজেদের এক জাতি হিসাবে ভাবতে শিখল এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বুঝল। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানীকে পুনরায় খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত করা হল। কিন্তু জার্মান জাতি আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাইল না। তারা ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করল। পরবর্তীকালে প্রাশিয়া এই সংগ্রামের নেতৃত্ব করে এবং জার্মানীর ঐক্য সাধন সম্ভব হয়।

নেপোলিয়নের নিকট বারংবার পরাজিত হয়ে জার্মানগণের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ বিশেষভাবে দেখা দেয়। প্রাশিয়া জার্মানীর পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। প্রাশিয়ার জাতীয়তাবাদ আরও উগ্ররূপে ফুটে ওঠে। এই রাষ্ট্রের চিন্তানায়করা শিক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্পে রাষ্ট্রের জনসাধারণকে শক্তিশালী করে তোলেন। ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সংঘবদ্ধ করে ৩৯টিতে পরিণত করা হয় এবং একটি শিথিল যৌথ রাজ্য গঠন করা

জার্মান যৌথরাজ্য

হয়। এই যৌথ রাজ্যটি ছিল অসংবদ্ধ। অষ্ট্রিয়া পুনরায় জার্মানীতে কর্তৃত্ব করতে আরম্ভ করে। যৌথরাজ্যের একটি পরিষদ ছিল। অষ্ট্রিয়া এই পরিষদের সভাপতি হয় এবং প্রাশিয়াকে সহ-সভাপতি করা হয়। ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে পরিষদের অধিবেশন বসত। অষ্ট্রিয়া এই পরিষদের মাধ্যমে জার্মানীতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে। জার্মানীর কোন রাষ্ট্রেই যাতে কোন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত না হয় তার জন্য মেটারনিক সবিশেষ চেষ্টা করেন। দক্ষিণ জার্মানীর কয়েকটি রাজ্য ভিন্ন জার্মানীর সর্বত্রই অনুদার স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থা চালু হয়। প্রাশিয়ার রাজা অষ্ট্রিয়ার ভয়ে কোন প্রগতিবাদী সংস্কার স্থাপন করতে পারেননি।

মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

জার্মান রাজ্যগুলিতে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত প্রগতিবাদ ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধারা প্রাধান্যলাভ করেছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্টবার্গ নামক স্থানে একটি যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হলে মেটারনিক এটিকে বিদ্রোহ বলে মনে করেন। এর দুবছর পর রক্ষণশীল নাট্যকার কোট্জেবুয়েকে একটি ছাত্র হত্যা করলে মেটারনিক অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গোটা জার্মানীতে প্রগতি আন্দোলন চিরদিনের জন্য নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে কার্লসবাডে জার্মান রাষ্ট্রনায়কদের এক সভা ডাকলেন। এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের ওপর লক্ষ্য রাখবার জন্য, সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য, প্রগতিপন্থী সংবিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন বন্ধ করবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রবর্তন করা হয়। ইতিহাসে এগুলি কার্লসবাড ডিক্রীস্ বলে পরিচিত। সর্বক্ষেত্রে প্রগতি আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করাই ছিল এই আদেশগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। কার্লসবাড আদেশসমূহ প্রায় দশবৎসর ধরে জার্মানীতে দমননীতি অব্যাহত রাখে।

দমননীতি

১৮৩০-এর বিপ্লব : ১৮৩০-এর ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া জার্মানীতে রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি করে। স্যাক্সনি, হ্যানোভার ও হেসের শাসকদের নিকট হতে জনসাধারণ প্রগতিবাদী সংবিধান আদায় করে নেয়। কিন্তু মেটারনিকের বিরোধিতার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এই শাসনতন্ত্রগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়।

১৮৩০-এর বিপ্লব ব্যর্থ হলেও এ থেকে ভবিষ্যতের দুটি আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলো—প্রথমটি জোলভারিন আন্দোলন এবং দ্বিতীয়টি জার্মান জাতীয়তাবাদ।

জোলভারিন ও জার্মানি : ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়া নেহাৎ অর্থনৈতিক কারণেই তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে একটি

শুল্ক সংঘের বা জোলভারিনের সৃষ্টি হয়। ক্রমে জার্মানীর অন্যান্য রাষ্ট্র এই শুল্ক সংঘে যোগ দেয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে অষ্ট্রিয়া ব্যতীত জার্মানীর সকল রাষ্ট্রই এতে যোগ দিয়েছে। এই শুল্ক সংঘ জার্মানীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাত্মবোধ সৃষ্টি করে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ সুগম করে দেয়। অষ্ট্রিয়া ছাড়া যে জার্মানী নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই আত্মপ্রত্যয় জোলভারিন এনে দেয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করবার বাস্তব ও মানসিক ভিত্তি তৈরী হয়।

সাংস্কৃতিক নব-জাগরণ ও ঐক্য-আন্দোলন ঃ অপরদিকে জার্মান মনীষীরা লেখনীর মাধ্যমে ঐক্যের জন্য জার্মানীর ভাবমানস তৈরী করেন। ফিক্‌টে, স্টেন, হেগেল, হেসার, বোজার ডলম্যান, ক্যাণ্ট, শিলার প্রভৃতি সকলের অবদানের ফলে জার্মানদের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত হয়।

১৮৪৮-এর বিপ্লব ঃ ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের প্রতিধ্বনিস্বরূপ জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে বিপ্লব দেখা দিল। এই সময় প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান জাতিকে এক করার প্রস্তাব ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজার অষ্ট্রিয়া-ভীতি প্রবল থাকায় এটি সম্ভব হয়নি। ফলে গণতান্ত্রিক উপায়ে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করবার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল। এর পর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় সত্য—কিন্তু সে ঐক্যের ভিত্তি ছিল প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি এবং বিসমার্কের কূটনৈতিক দক্ষতা।

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট

প্রাশিয়ার নেতৃত্ব ঃ ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের ব্যর্থতার সাথে সাথে গোটা জার্মানিতে আবার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থা ফিরে এল। প্রাশিয়ার রাজা নিজ রাজ্যে সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলন ধ্বংস করলেন এবং অন্যান্য রাজ্যের গণ-অভ্যুত্থানও প্রাশিয়ার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে কঠোরভাবে দমন করলেন। প্রাশিয়ার রাজা নিজের মনোমত এমন এক নতুন সংবিধান প্রবর্তন করলেন যাতে পার্লামেণ্টে কেবলমাত্র জমিদার ও ধনিক শ্রেণী সদস্যপদ লাভ করতে পারে। অবশ্য এই সময় প্রাশিয়ার রাজা ৪র্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম গোটা জার্মানীর ওপর প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট ভেঙে যাবার পর তিনি অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্র তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়। ফলে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই নতুন জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ১৭টি জার্মান রাষ্ট্র তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়। ফলে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই নতুন জার্মান ইউনিয়নের পার্লামেণ্ট আরফুট

প্রাশিয়ার প্রচেষ্টা ও অষ্ট্রীয়ার বিরোধিতা

নামক স্থানে মিলিত হল। প্রাশিয়ার এই কাজেও অস্ট্রিয়া বিরক্ত হল এবং প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করল যে জার্মানীতে ১৮১৫-এর যৌথরাজ্য-ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রাশিয়া অস্ট্রিয়ার ধমকে ভীত হয়ে নবগঠিত ইউনিয়ন ভেঙে দিল। ফলে অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বে জার্মান যৌথ রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হল। অস্ট্রিয়ার নিকট প্রাশিয়ার এই নতি স্বীকারকে 'ওলমুজের অপমান' বলা হয়।

ওলমুজের অপমান

১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দের ইটালীর নবজাগরণ গোটা জার্মানিতে, বিশেষ করে প্রাশিয়ায় এক বিরাট উৎসাহ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করল। প্রগতিবাদীরা পুনরায় জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শাসন ও রাজনৈতিক ঐক্য আনবার জন্য আন্দোলন শুরু করল। ইটালীতে অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে জার্মানরা মনে করতে লাগল যে তাদের দেশের ঐক্য একমাত্র প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই সম্ভব। এই সিদ্ধান্তে পৌছাবার আগে তারা ভেবে দেখল যে, ক্ষুদ্র পিডমণ্ট যদি ইটালীর নেতৃত্ব নিতে পারে তবে প্রাশিয়া জার্মানীতে কেন তা পারবে না। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করবার আকাঙ্ক্ষা সব চেয়ে তীব্র ভাবে দেখা দিল প্রাশিয়ার রক্ষণশীল অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যে।

ঐক্য আন্দোলনের নতুন পর্যায়

এদিকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১ম উইলিয়ম প্রাশিয়ার রাজা হন। তাঁর সিংহাসনারোহণের ফলে প্রাশিয়ার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হল। তিনি একদিকে যোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়াকে জার্মানীর অবিসংবাদী নেতাতে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রথমেই তিনি প্রাশিয়ার সৈন্য বাহিনী পুনর্গঠিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করতে চাইলেন। কিন্তু প্রাশিয়ান পার্লামেণ্ট ব্যয়াধিক্যের অজুহাতে তাঁর এই কাজে বাধা দিল। ফলে প্রাশিয়ায় এক শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। উইলিয়ম বিরক্ত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে চাইলেন। শেষে সামরিক মন্ত্রী রুন ও প্রধান সেনাপতি মলট্‌কির পরামর্শে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে অটোভন্ **বিসমার্ককে** প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করলেন।

বিসমার্ক-এর ক্ষমতা লাভ

বিসমার্ক: বিসমার্ক এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র-জীবনে প্রতিভার কোনরূপ পরিচয় তিনি দেখাতে পারেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন কিন্তু চাকরির একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে নিজের ক্ষেতখামারের কাজে মন দেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানির রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং নিজেকে রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থকরূপে

প্রথম জীবন

প্রকাশ করেন। ১৮৪৮-এর বিপ্লবকে তিনি ঘৃণা করতেন। (তিনি প্রথম হতেই প্রজা-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন এবং সামরিক শক্তিতে তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারাই সম্ভব, বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা নয়—তাঁর প্রাণের কথা ছিল।) ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম উইলিয়ম প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ক প্রাশিয়ার মন্ত্রিসভার সভাপতি-রূপে নিযুক্ত হন। এর আগে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে (ফ্রান্স, রাশিয়া) প্রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানলাভ হয়।

মন্ত্রিসভার সভাপতি হিসেবে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল কাটিয়ে দেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী তিনিই জার্মানির ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন।

বিসমার্কের জীবনের স্থির লক্ষ্য ছিল প্রাশিয়াকে সম্মিলিত জার্মানির নেতৃত্বাসনে প্রতিষ্ঠা করা এবং ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত করা। তিনি সহজেই উপলব্ধি করলেন যে জার্মানির ঐক্যবন্ধনের প্রধান অন্তরায় অষ্ট্রিয়া এবং ইউরোপীয় প্রধান শক্তিতে জার্মানিকে পরিণত করার অন্তরায় ফ্রান্স। তিনি সামরিক শক্তিকেই তাঁর লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার উপায় বলে মনে করতেন। [এ কারণে প্রথমেই তিনি প্রাশিয়ার সামরিক শক্তিকে অজেয় করে তুললেন। বিরোধীদলের মুখ বন্ধ করবার জন্য তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ রাখলেন এবং সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করলেন।] তিনি এক সময় বলেছিলেন যে, সামরিক শক্তির সাহায্যেই কোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান সম্ভব। [সামরিক শক্তির সাহায্যেই জার্মানীর ঐক্য বন্ধনের ন্যায় বৃহৎ ও জটিল সমস্যার সমাধান হয়েছিল। এর জন্য বিসমার্ককে তিনটি যুদ্ধ করতে হয়েছিল—ডেনমার্কের সাথে, অষ্ট্রিয়ার সাথে এবং ফ্রান্সের সাথে।]

ডেনমার্কের সাথে যুদ্ধঃ শ্লেজউইগ ও হলস্টেন স্থান দুটিকে কেন্দ্র করে বিসমার্ক ডেনমার্কের সাথে যুদ্ধে নামলেন। এ দুটি স্থান ডেনমার্কের অধিকারে থাকলেও হলস্টেন ছিল জার্মান যৌথরাষ্ট্রের অন্যতম সদস্য। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন সন্ধির দ্বারা ঠিক হয় যে, এই দুটি স্থান ডেনমার্ক-এর শাসনাধীনে থাকলেও তাদের ডেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কিন্তু (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এ দু'টি অঞ্চলকে ডেনমার্কের সাথে যুক্ত করবার কথা ঘোষণা করা হলে এর বিরুদ্ধে গোটা জার্মানীতে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো, কারণ এই অঞ্চল দুটিতে বহু সংখ্যক জার্মান বাস করত। প্রাশিয়া

শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্ন

ও অষ্ট্রিয়া যুগ্মভাবে ডেনমার্ককে এ দুটি অঞ্চল সংযুক্ত করা থেকে বিরত থাকবার জন্য নির্দেশ দিল। ডেনমার্ক যখন এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করল তখন অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুক্ত বাহিনী ডেনবাহিনীকে পরাজিত করে এ দুটি অঞ্চল অধিকার করে নিল। যুদ্ধ শেষে এই অঞ্চল দুটির শাসন ব্যবস্থা কি হবে তা নিয়ে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। অবশেষে গেষ্টিনের চুক্তি দ্বারা ঠিক হল যে শ্লেজউইগ ও হলস্টেনে অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার যুগ্ম-শাসন প্রবর্তিত হলেও হলস্টেন থাকবে অষ্ট্রিয়ার শাসনে এবং শ্লেজউইগ প্রাশিয়ার অধীনে থাকবে। লক্ষণীয় যে প্রাশিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত হলস্টেনের শাসনভার দেওয়া হল অষ্ট্রিয়াকে। বিসমার্ক ভবিষ্যতে যাতে অষ্ট্রিয়ার সাথে এই নিয়ে যুদ্ধ করা যায় সেদিকে নজর রেখেই এরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, নিতান্ত সাময়িক ভাবেই কাগজ দিয়ে অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার সম্পর্কের ফাটল বন্ধ করা হয়েছে। শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে প্রাশিয়ার এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বিসমার্ক ভবিষ্যতে অষ্ট্রিয়ার সাথে সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখলেন।

ডেনমার্কের বিরুদ্ধে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

অস্থায়ী ব্যবস্থা

অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ (১৮৬৬) ঃ বিসমার্ক বিশ্বাস করতেন যে জার্মানীতে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার একত্রে অবস্থান করা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং তিনি জার্মানী হতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর হন। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার আগে তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ কূটনীতি দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যাতে অষ্ট্রিয়া যুদ্ধের সময় একক রইল, অন্য কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করল না। বিসমার্ক প্রথমেই ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে বিয়ারিজ নামক স্থানে মিলিত হলেন এবং সম্রাটের নিকট হতে অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে নেপোলিয়নের দুর্বলতা ছিল। তিনি ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে সামরিক সাহায্য দিয়েছিলেন। জার্মানীর ক্ষেত্রে তিনি একেবারে না-করতে পারলেন না, অস্ট্রো-প্রাশিয়ান কলহে নিরপেক্ষ থাকবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। এছাড়া ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ জার্মানীর কিছু স্থান বা বেলজিয়াম ফ্রান্স পেতে পারবে বলে বিসমার্ক ইংগিত দেন। অবশ্য পুরস্কার কিংবা অন্য কোন বিষয়ে দু'জনের মধ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি। নেপোলিয়নের সাথে সাক্ষাতের আগেই বিসমার্ক রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পোল-বিদ্রোহ দমন

যুদ্ধের প্রস্তুতি

বিসমার্কের কূটনীতি

করতে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে তিনি সাহায্য করেন। ফলে রাশিয়ার সাথে প্রাশিয়ার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এর পর বিসমার্ক নবগঠিত ইটালী রাজ্যের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত করলেন। ঠিক হল যে ইটালী অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে সাহায্য করবে; বিনিময়ে ইটালী ভেনেসিয়া পাবে। ইংল্যাণ্ডও যে অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন বিসমার্ক। এইভাবে অষ্ট্রিয়াকে নির্বান্ধব করে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়া আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কিন্তু তিনি বহির্জগতের নিকট দেখাতে চাইলেন যে অষ্ট্রিয়াই আক্রমণকারী।)

কূটনৈতিক প্রস্তুতি শেষ করে বিসমার্ক হঠাৎ জার্মান কনফেডারেশনের গঠনবিধি সংস্কার করবার কথা জোর গলায় বলতে থাকলেন এবং প্রাশিয়ার প্রতিনিধিকে সরিয়ে এনে কনফেডারেশনের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন যে, অষ্ট্রিয়া হলস্টেনে প্রাশিয়া-বিরোধী প্রচার কার্য চালাচ্ছে। (ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্নটি জার্মান যৌথ রাজ্যের ডায়েটে পেশ করল। কিন্তু গেষ্টিন সম্মেলনে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ডায়েটের বাইরে এই প্রশ্নটির মীমাংসা হবে। সুতরাং চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে বিসমার্ক হলস্টেনে সৈন্য পাঠালেন এবং স্থানটি দখল করে নিলেন। এতে অষ্ট্রিয়া ডায়েটে প্রস্তাব করল যে, জার্মান সংযুক্ত রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীগুলি প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাঠানো হোক। প্রাশিয়া এর উত্তরে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। এই যুদ্ধ মাত্র সাত সপ্তাহ চলেছিল। **স্যাডোয়ার যুদ্ধে** অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হ'ল, এবং **প্রাগের সন্ধি** দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হল।) অষ্ট্রিয়াকে কোন স্থান হারাতে হল না এবং তার নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণও দাবি করা হল না। কিন্তু অষ্ট্রিয়াকে জার্মান কনফেডারেশন চিরতরে ত্যাগ করতে হল এবং জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব তাকে স্বীকার করে নিতে হল। অষ্ট্রিয়া অবশ্য ইটালীকে ভেনেসিয়া ছেড়ে দিতে হল। (প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 'উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্রই এই সমগ্র অঞ্চলের শাসনতন্ত্র হল। স্যাডোয়ার জয়ের ফলে প্রাশিয়ার জনসংখ্যা ৪৫ লক্ষ বেড়ে গেল এবং জার্মানির আংশিক ঐক্য সম্পাদিত হল।)

যুদ্ধের অজুহাত

অস্ট্রিয়ার পরাজয়

জার্মানী ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান.'

স্যাডোয়া যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ স্যাডোয়ার যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ে মধ্য ইউরোপের শক্তিসাম্যে পরিবর্তন এল। প্রাশিয়া ইউরোপের ইতিহাসে নতুন মর্যাদা পেল। মধ্য ইউরোপের

রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু ভিয়েনা হতে বার্লিনে সরে গেল। এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ে ফরাসীস্বার্থের হানি হল। ফ্রান্সের সীমান্তে শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সের পক্ষে মারাত্মক হল। একারণে স্যাডোয়ায় অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসীরা নিজেদের পরাজয় বলে মনে করল। এই যুদ্ধের ফলে ইটালীয় ঐক্যের একটি পর্যায় শেষ হল। প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে রক্ষণশীল ও সমরবাদী বিসমার্কের নীতিরই জয় হল এবং তাঁর সাফল্য তাঁর প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে এল। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও স্যাডোয়ার পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অষ্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং ফলে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে দ্বৈতরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল।

অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ফলাফল

এই যুদ্ধের ফলে ইটালীও লাভবান হল। ইটালী প্রাগের সন্ধি অনুযায়ী অষ্ট্রিয়ার অধীনস্থ ভেনেসিয়া পেল এবং পূর্ণ ঐক্যসাধনের লক্ষ্য সীমায় প্রায় পৌছাল।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের কারণঃ বিসমার্ক তাঁর সুচতুর কূটবুদ্ধির দ্বারা ফ্রান্সকে ১৮৭০-এর জুলাইয়ে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করান—এই গালগল্প বহু দিন ধরে চালু ছিল এবং ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বলে মনে করা হত। অবশ্য এর জন্য বিশেষ করে দায়ী ছিলেন বিসমার্ক নিজে। নিজেকে তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ এবং প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি এটি করেছিলেন। আর কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক ও এমন কতকগুলি ঘটনার ওপর নির্ভর করেছিলেন যার ফলে বিসমার্ক এই যুদ্ধের হোতা বলে অনেকে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের কারণ এত সরল ছিল না। বিভিন্ন কারণে এই যুদ্ধ দেখা দেয় এবং বিসমার্কও এই যুদ্ধের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিলেন; সম্পূর্ণভাবে নন। বিসমার্ক ফ্রান্সের সাথে কখন হতে যুদ্ধ চেয়েছিলেন তাও সঠিক ভাবে বলা যায় না, এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে তার কি ধারণা ছিল তাও জানা যায় না।

বিসমার্কের কৃতিত্ব

অবশ্য বিসমার্ক প্রথম হতেই বার্লিনকে ইউরোপের কূটনীতির প্রাণকেন্দ্র করতে চেয়েছিলেন এবং প্রাশিয়া প্রভাবিত জার্মানী ইউরোপের রাজনীতি পরিচালিত করবে এটাও তিনি আশা করেছিলেন। তাঁর কর্মময় জীবনের প্রথম কটা বছর তিনি তাঁর পছন্দমত জার্মানীকে গড়ে তোলবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। তাঁর এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্র চতুষ্টয় বুঝতে পারল এবং

তাঁরা একজোট হতে পারলে প্রাশিয়াকে ধ্বংসও করতে পারতেন। কিন্তু এটি সম্ভব হয়নি। গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়া জার্মানীর ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। তাছাড়া রাশিয়া অষ্ট্রিয়াকে বলকান অঞ্চলে শত্রু বলে মনে করত বলে প্রাশিয়ার প্রতি তার সহানুভূতি ছিল। অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়ার বিরোধিতা করে নিজেই ১৮৬৬ খৃঃ-এ পরাজিত হয়। ফ্রান্স প্রাশিয়ার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল সত্য, কিন্তু অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে তারপক্ষে যুদ্ধে নামার মত সুযোগ ঘটল না। একারণে স্যাডোয়ার যুদ্ধে জয়ী প্রাশিয়াকে ফ্রান্স আর দুর্বল শত্রু হিসেবে মেনে নিতে পারল না।

বিসমার্ক ও তৃতীয় নেপোলিয়ন ঃ (অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পরবর্তী চার বছর জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা বিসমার্ক ও তৃতীয় নেপোলিয়ন— এই দুজনের দ্বন্দ্বে রূপ পরিগ্রহ করে।) এই দুজনের মানসপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা জানা দরকার। নেপোলিয়ন নিজেকে জানতেন না, তিনি যে কি চান তাও জানতেন না কিন্তু বিসমার্ক জানতেন। নেপোলিয়ন সবদাই দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকতেন এবং খুবই অব্যবস্থচিত্ততা তাঁর চরিত্রের অন্যতম খারাপ গুণ ছিল। বংশগৌরব, ধর্মসম্বন্ধীয় ও সামরিক গৌরব, অন্যদিকে কিন্তু সাম্রাজ্য স্থাপন এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সুবিধা—কোনটা যে বেছে নেবেন তা ঠিক করতে পারতেন না। কখনো প্রথম দিকটির দিকে ঝুঁকতেন; কখনো দ্বিতীয় দিকটির ওপর নিজের বিশ্বাস রাখতেন। এর ফলে তাঁর জীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে এল। বিসমার্কের চরিত্রে স্ববিরোধী কোন গুণ দেখা যায় না। বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় তিনি তাঁর নীতি নির্দিষ্ট করে নিতেন—প্রথম হতেই তিনি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে এক ঐক্যবদ্ধ জার্মানী চেয়েছিলেন—বিশাল জার্মানী নয়। (অর্থাৎ ইউরোপের সমস্ত জার্মান ভাষাভাষীদের তিনি তাঁর স্বপ্নে দেখা জার্মানীতে আনতে চাননি)।

(ফ্রান্স এবং প্রাশিয়া উভয় দেশেই যুদ্ধবাজ শ্রেণী ছিল; আর উভয় দেশেই এই শ্রেণী রাজার প্রিয়পাত্র ছিল। উভয় দেশেই বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু থাকায় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত ছিল। ফ্রান্স কিংবা প্রাশিয়ায় শান্তিবাদীদের কোন স্থান ছিল না। ~~১৮৫৯ এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের~~ পর উভয় রাষ্ট্রেই নিজ নিজ সামরিক শক্তি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে থাকে এবং একে অন্যের শত্রু বলে ভাবতে শুরু করে।)

উভয় দেশের সামরিক প্রস্তুতি

স্যাডোয়া যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ নেপোলিয়নকে টেলিগ্রামের দ্বারা জানান যে অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সকে ভেনেসিয়া ছেড়ে দিতে চায় কিন্তু প্রতিদানে তৃতীয় নেপোলিয়নকে নিজের প্রভাব খাটিয়ে অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের বিরতি ঘটাতে হবে। তৃতীয় নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার এত তাড়াতাড়ি পরাজয়ে বিস্মিত হলেন; কারণ অষ্ট্রিয়া যুদ্ধে জয়ী হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। এজন্য প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেননি; সৈন্য দলকে প্রস্তুত রাখেন নি। যখন তাঁর কয়েকজন মন্ত্রী তাঁকে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন তখনও তিনি যুদ্ধে নামলেন না। তাছাড়া তিনি ওই সময় অসুস্থ ছিলেন। যার ফলে ফ্রান্স এক স্বর্ণ সুযোগ হারাল।

নেপোলিয়নের ভুল নীতি

ফ্রান্সিস জোসেফের টেলিগ্রাম পাবার পর দশদিন ধরে তৃতীয় নেপোলিয়ন চিন্তাই করলেন এবং পরিশেষে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ রক্ষা করে এক প্রস্তাব পাঠালেন। বিসমার্ক দ্বিরুক্তি না করে তা মেনে নিলেন; তখন অষ্ট্রিয়ার কোন রাজ্যাংশ গ্রাস করার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তিনি চাইছিলেন জার্মানী হতে অষ্ট্রিয়া সরে যাক। যার ফলে প্রাশিয়া জার্মানীতে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারবে। ভেনেসিয়া পরাজিত ইটালি পাবে। অষ্ট্রিয়ার পক্ষে এটি সম্মানহানিকর হলেও তার শক্তিহানি হল না। তৎকালীন ঐতিহাসিকরা এটিকে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে শুভকারক বলে মনে করেছিলেন কারণ এর ফলে অষ্ট্রিয়া এক বিরোধী জনসমষ্টির হাত হতে রক্ষা পেল।

বিসমার্কের দূরদর্শিতা

প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার নিকট হতে কিছু নিল না। উত্তরাঞ্চলের প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজ্যগুলি নিয়ে উত্তর জার্মান যৌথরাজ্য প্রাশিয়ার নেতৃত্বে গড়ে উঠবে। তবে এই যৌথরাজ্যের সীমানা দক্ষিণে মেইন নদী পর্যন্ত কেবলমাত্র বিস্তৃত হবে। এরপর বিসমার্ক এই নতুন যৌথরাজ্যের সংবিধান তৈরি নিয়ে কয়েক মাস ব্যস্ত থাকলেন। এই সংবিধান প্রণয়নের সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমার্ককে পরোক্ষভাবে সাহায্য করলেন। এই সময় নেপোলিয়ন প্রস্তাব করলেন যে জার্মানীতে তিনটি স্বাধীন যৌথরাজ্য থাকবে—একটি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে, একটি অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে এবং তৃতীয়টিতে তাঁর প্রভাব থাকবে। বলা বাহুল্য যে, তাঁর এই প্রস্তাব দক্ষিণের জার্মান রাষ্ট্রগুলির নিকট ভীতিস্বরূপ হল এবং অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্রগুলি বিসমার্কের প্রস্তাবিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা মেনে নিল।

নেপোলিয়নের নয়া প্রস্তাব

প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে ফ্রান্স শঙ্কিত হল এবং ফরাসী জনসাধারণ ফ্রান্সের শক্তি ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য দাবী জানাল। এটি বাস্তবে পরিণত করবার জন্য নেপোলিয়ন বেনেডিটিকে বার্লিনে তাঁর দূত হিসেবে পাঠালেন। বেনেডিটিকে নির্দেশ দিলেন এই বলে যে বিসমার্ক যেন প্যালাটিনে ফরাসী প্রভাব মেনে নেন। বিসমার্ক বেনেডিটির চেয়ে অনেক সুচতুর কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি বেনেডিটির নিকট হতে ফ্রান্সের কোন্ কোন্ অঞ্চলের উপর দাবী আছে তা লিখিতভাবে জানতে চাইলেন। বেনেডিটি লিখিতভাবে জানালেন যে ফ্রান্স লাক্সেমবার্গ ও বেলজিয়াম পেলেই সন্তুষ্ট হবে এবং সমগ্র জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য (প্রাশিয়ার প্রভাবাধীনে) মেনে নেবে। এমন কি জার্মানী ও ফ্রান্সের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তিও স্থাপন হতে পারে। এই প্রস্তাবটি বিসমার্ক চারবছর পর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন। এছাড়া বিসমার্ক দক্ষিণ জার্মান রাষ্ট্রচালিত কূটনীতিবিদদের নিকট ফ্রান্সের আগ্রাসী নীতি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বিবরণ পেশ করলেন। ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে ভীত হয়ে ওয়াটেমবার্গ, ব্যাডেন, ব্যাভারিয়া প্রাশিয়ার সাথে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত করল এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে যুদ্ধ করতে হলে তাদের সৈন্যদল যাতে প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হল।

বিসমার্কের সুবিধা

নেপোলিয়নের ব্যর্থ পররাষ্ট্র নীতিঃ অন্যদিকে নেপোলিয়ন ইউরোপে তাঁর পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে কোন রাষ্ট্রের নিকট হতেই সক্রিয় সাহায্য পেলেন না। অষ্ট্রিয়ার কোন উপায় ছিল না, প্রাশিয়া এর বিরোধী ছিল, রাশিয়া নিষ্ক্রিয় এবং ইংল্যাণ্ড নিজের সমস্যায় ব্যস্ত এবং ইটালী ক্ষুব্ধ। ফলে নেপোলিয়নকে তাঁর পরিকল্পনাগুলি তুলে নিতে হল। এটাকে তিনি খুবই অপমানজনক বলে মনে করলেন এবং এটি তিনি শতচেষ্টা সত্ত্বেও ভুলতে পারলেন না। তাঁর রাজত্বের শেষ কটা বছর তিনি প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করতে থাকলেন এবং এর ফলে ইউরোপে শান্তি ব্যাহত হল।

তৃতীয় নেপোলিয়ন বিশ্বাস করলেন যে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ফ্রান্সের ভীতি-স্বরূপ হবে এবং এটি কোন ক্রমেই হতে দেওয়া যাবে না। তাছাড়া নেপোলিয়নের ক্ষমতা ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যদি তিনি বৈদেশিক নীতিতে ফ্রান্সের একটার পর একটা জয়ের সূচনা করতে পারেন। কিন্তু এই সময় তাঁর মেক্সিকো অভিযান

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। তিনি রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে গিয়ে বিফল হলেন। নেপোলিয়ন বৈদেশিক নীতিতে এমন একটা কিছু করতে চাইলেন যার ফলে তাঁর প্রজারা তাঁর শাসন সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলতে পারে। তিনি প্রথমে লাক্সেমবার্গ দখল করতে চাইলেন। কিন্তু রাশিয়ায় জারের কথামত লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে এবং ফ্রান্স এই বৈঠকে লাক্সেমবার্গ পাবার আশা পরিত্যাগ করে। এরপর নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু অষ্ট্রিয়ার নিকট হতে এসম্বন্ধে বিশেষ সাড়া পান না। রোমে ফরাসী সৈন্যবাহিনী থাকার ফলে তিনি ইটালিবাসীদের রোম অধিকার করার দাবী মেনে নিতে পারলেন না। ফলে ইটালি তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল না। ইতিমধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়ন তাঁর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলেন। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আগে ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে উঠল, কারণ ফ্রান্স যুদ্ধের জন্য তৈরি ছিল না, আর প্রাশিয়া মনে করছিল কয়েক বছর পর যুদ্ধ বাধলে তার পক্ষে সুবিধা হবে। কারণ প্রতি বছর প্রাশিয়া ১ লক্ষ লোককে সৈন্য হিসেবে শিক্ষা দিতে পারছিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ওলিভিয়ারের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হল। এই মন্ত্রিসভা প্রথমে শান্তিবাদী ছিল এবং ফ্রান্স ও প্রাশিয়া উভয় রাষ্ট্রই নিজ নিজ সামরিক শক্তি কমানো উচিত বলে মনে করে। এটি বাস্তবে পরিণত করবার জন্য বার্লিনে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকও বসে। কিন্তু ফ্রান্স মনে মনে প্রাশিয়ার ধ্বংস কামনা করছিল এবং প্রাশিয়ার সম্ভাব্য শত্রুদের প্রাশিয়া বিরোধী এক রাষ্ট্রজোট স্থাপনের কথা ভাবছিল।

স্পেনীয় উত্তরাধিকারের সমস্যা ঃ ইতিমধ্যে স্পেনের সিংহাসন খালি হয়। স্পেনের জনসাধারণ সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাকে দেশ হতে বিতাড়িত করে। ইসাবেলা ফ্রান্সে পালিয়ে যান। ফলে স্পেনের শাসকবর্গ একজন রাজার খোঁজ করতে থাকলেন, যিনি স্পেনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসন পরিচালনা করবেন। বিসমার্ক এই সুযোগটি গ্রহণ করলেন*। প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন বংশীয় কোন রাজকুমার যদি স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করতে পারে তাহলে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় প্রাশিয়ার পক্ষে

লিওপোল্ড-এর মনোনয়

*That Bismark was concerned to promote the Hohenzollern candidature there can be no doubt, though his motives for taking it up are still not all of them clear.
—*The New Cambridge Modern History Vol. X.*

সেটা খুবই সুবিধাজনক হবে। ফ্রান্স তিনদিক হতে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে, যা সে কখনো হয়নি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্পেনের মুকুটহীন শাসক গ্রিম হোহেন-জোলার্ন বংশীয় লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসাবার জন্য আহ্বান জানালেন। প্রাশিয়ার রাজা (হোহেনজোলার্ন বংশের মাথা স্বরূপ) এর পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু বিসমার্ক এসম্বন্ধে তাঁকে বিশেষভাবে বোঝালেন এই বলে যে স্পেনের সিংহাসনে লিওপোল্ড না বসলে প্রাশিয়া-বিরোধী বেভেরিয়াব উইটেলসব্যাক বংশীয় কোন একজন স্পেনের সিংহাসনে বসবে। ফলে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য আনা সম্ভব হবে না। কিন্তু লিওপোল্ড নিজে স্পেনের নিয়মতান্ত্রিক রাজা হতে চাইলেন না। ফলে এই পরিকল্পনাটির সাময়িকভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল। কয়েক মাস পরে হঠাৎ লিওপোল্ড তাঁর পূর্ব-সিদ্ধান্ত বাতিল করে স্পেনেব সিংহাসনে বসতে রাজী হলেন। এর পিছনে অবশ্য বিসমার্কের হাতে ছিল।

লিওপোল্ড প্রাশিয়ার রাজা উইলিয়ামের অনুমতি চেয়ে এক চিঠি পাঠান। উইলিয়াম অনুমতি দিলেন। স্পেনের কূটনীতিবিদ সালাজার স্পেনে ফিরে গেলেন এই শুভ সংবাদ নিয়ে। জুলাই মাসের তিন তারিখে প্যারিসের সমস্ত সংবাদ-পত্রে এই সংবাদ ছাপা হলে সমগ্র ফরাসী জনসাধারণের প্রাশিয়াবিরোধী মনোভাব ফেটে পড়ল। প্রাশিয়ায় কিন্তু এর সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। রাজা উইলিয়াম এমস্‌-এ ভ্রমণে গেলেন। বিসমার্ক তাঁর গ্রাম্য ভিলায় অবসর যাপন করছিলেন। ফ্রান্সের মন্ত্রিসভাও বিশেষ উদ্বিগ্ন হোল না। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে এই স্তব্ধতা ঠিক যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। শীঘ্র ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে প্রবল ঝঞ্ঝা দেখা দিল। পনের দিনের মধ্যেই ফ্রান্স ও প্রাশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হল। এই পনের দিনের ঘটনা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই। সংক্ষেপে এই ঘটনা বলা হল।

ফ্রান্সে প্রতিক্রিয়াঃ লিওপোল্ড-এর স্পেনের সিংহাসনে বসবার সম্মতি-জ্ঞাপক পত্রখানির সংবাদ ফ্রান্সে এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করল। ফরাসী সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে মত প্রকাশ করলে যে এর ফলে ফ্রান্স বিপদের সম্মুখীন হবে। এবং যেরূপ গোপনীয়ভাবে স্পেনের রাজা নির্বাচন বিষয়টি সম্পন্ন করা হয়েছে সে সম্বন্ধেও নানারূপ সমালোচনা করা হল। ফরাসী সরকার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবে বলে ঘোষণা করল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফ্রান্স যেভাবে প্রতিবাদ জানাল তাতে প্রাশিয়া ও স্পেন উভয় রাষ্ট্রই ফ্রান্সের ওপর ক্রুদ্ধ হল। প্রধানতঃ ফ্রান্স প্রাশিয়াকে এর জন্য দায়ী করল। এর বদলে ফরাসী সরকার যদি

প্রাশিয়া সরকারকে ভদ্রভাবে লিওপোল্ডকে সিংহাসনে না বসবার জন্য অনুরোধ করতেন তাহলে অনুরূপ ফল হত। কিন্তু তা না করার ফলে প্রাশিয়াও ফ্রান্স-বিরোধী নীতি নিতে বাধ্য হল।

ফ্রান্সের দ্বিতীয় ভুল তার পক্ষে মারাত্মক হল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী গ্রামোণ্ট চেম্বারে ঘোষণা করলেন যে লিওপোল্ড যদি স্পেনের সিংহাসনে বসতে এখনো আগ্রহী থাকে তাহলে ফ্রান্স তার সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেবে। কারণ স্পেনেব সিংহাসনে একজন হোহেনজোলার্নের অবস্থিতি ফ্রান্সের পক্ষে বিপদ স্বরূপ। এই ঘোষণায় প্রাশিয়াকে প্রচ্ছন্নভাবে ভয় দেখান হয। চেম্বারের অধিকাংশ সদস্য এই ঘোষণা উল্লাসের সাথে গ্রহণ করল সন্দেহ নেই। এবং সরকারকে জনপ্রিয় করল। কিন্তু পরিশেষে এটি ফ্রান্সেব সর্বনাশ সাধন করে।

বিসমার্ক এ সম্বন্ধে কয়েকদিন চুপ করে থাকলেন। অবশ্য সালাজার স্পেন থেকে তাঁকে ফ্রান্সেব মতিগতি সম্বন্ধে অবহিত করেন। এদিকে ফরাসী সরকার প্যারিসে অবস্থিত প্রাশিযার দূতকে ফরাসী সরকারেব মনোভাব জানাবার জন্য এমস্-এ সত্বর যেতে বলল। এমস্-এ তখন প্রাশিয়ার রাজা অবস্থান করছিলেন। তিনি যথাসময়ে এমস্-এ গিয়ে রাজাকে ফরাসী সরকারের মনোভাব জানালেন। উইলিয়ম ফরাসীদের মনোভাব সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে যেদিন (৬ই জুলাই) গ্রামোণ্ট ফরাসী পার্লামেণ্টে প্রাশিয়া-বিরোধী বক্তৃতা দিলেন ঠিক সেই দিনই লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে না বসবার জন্য উপদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে লিওপোল্ড নিরুদ্দেশ হলেন। কেউ তাঁর খবর জানতে পারল না। উইলিয়াম হোহেনজোলার্ন বংশেব প্রধান হিসেবে লিওপোল্ডের হয়ে স্পেনের সিংহাসনে বসবার ইচ্ছা ত্যাগ করতে চাইলেন। ইতিমধ্যে গ্রেমোণ্টের প্রাশিয়া-বিরোধী বক্তৃতা তাঁব গোচরে এল। ঠিক এই সময়ে ফরাসী রাজদূত বেনেডিটি তাঁর সাথে দেখা করতে এমস্-এ এলেন।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অভিমত: ইউরোপে যুদ্ধ বন্ধ রাখবার জন্য বিভিন্ন শক্তি সেসময়ে চেষ্টা চালালো। উইলিয়াম বিসমার্ককে যুদ্ধনীতি পরিহার করে কোন বন্ধুরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় স্পেনীয় সিংহাসনের প্রশ্নটি মেটাবার কথা বললেন। রাশিয়ার জারও লিওপোল্ডের সিংহাসনে বসবার ইচ্ছা সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। অবশ্য এর বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না। অস্ট্রিয়া এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ রইল। ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা এই সময় আইরিশ প্রশ্ন নিয়ে এত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল যে ইউরোপীয় কোন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা তার পক্ষে অসম্ভব হল।

যুদ্ধের পথে ফ্রান্স ঃ এদিকে ফ্রান্সে যুদ্ধবাজরা ঘটনাকে নিজেদের কাজে লাগালো। সংবাদপত্রগুলি এবিষয়ে তাদের পুরোপুরি সমর্থন করল। তারা নেপোলিয়নকে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্য পীড়াপীড়ি করল। তাঁরা ফ্রান্সের যুদ্ধাস্ত্র প্রাশিয়ার অপেক্ষা অনেকগুণে শক্তিশালী বলে মনে করত এবং যত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বাধবে ফ্রান্সের পক্ষে ততই যুদ্ধে জেতা সহজ হবে মনে করল। কিন্তু ১৮৭০তে প্রত্যেক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ফরাসী এবং জার্মান এ যুদ্ধকে ঘৃণা করত। কিন্তু প্রত্যেক ফরাসী যুদ্ধেব চেয়ে সাংঘাতিক বলে মনে করত প্রাশিয়ার দক্ষতার নিকট ফরাসী সংস্কৃতির মৃত্যু। যেটি দেখা দিল প্রাশিয়ার উত্থানের ফলে এবং স্পেনে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করাব অভীপ্সার মধ্যে। একারণে স্বদেশপ্রেমিক প্রত্যেক ফরাসী যুদ্ধের দ্বাবাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফরাসী প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং ফরাসী সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চাইল।

প্রাশিয়ার পক্ষে এই যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রস্তুতিব প্রয়োজন ছিল না। তার সামরিক বিভাগ পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল। বিসমার্ক তাঁর গ্রাম্য আবাস হতে বার্লিনে ফিরে এসে হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি এক টেলিগ্রাম পেলেন, তাতে লিওপোল্ড স্পেনের সিংহাসনে বসবার ইচ্ছা প্রত্যাহাব করেছেন জানতে পারলেন। তিনি রাজার সাথে এমস্-এ না গিয়ে বার্লিনে বসে রইলেন এবং কিভাকে ফ্রান্স এই কুটনৈতিক যুদ্ধে জয়ী হল সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণে মগ্ন থাকলেন। ইতিমধ্যে উইলিয়ম-এর নির্দেশে লিওপোল্ডের পিতা তার পুত্রের নামে স্পেনের সিংহাসনে বসবার ইচ্ছা প্রত্যাহার করলেন। এটি স্পেন সরকার ও ফরাসী সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হল।

প্রাশিয়া

প্যারিসে এই সংবাদেব প্রতিক্রিয়া কিন্তু শান্তি রক্ষা করার পক্ষে সহায়ক হল না। কারণ ফরাসীরা চাচ্ছিল প্রাশিয়ার অপমান, কোন ব্যক্তির অপমান নয়। তাছাড়া, ফ্রান্সে অলিভিয়ার মন্ত্রিত্বেব স্থায়িত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর ছিল না। চেম্বারের অধিকাংশ সদস্য যুদ্ধ চাইছিল। একারণে প্রধানমন্ত্রী অলিভিয়ার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রামোণ্ট পুরোপুরি শান্তির কথা বলতে পারলেন না। গ্রামোণ্ট প্রাশিয়ার দূতের নিকট দাবী করলেন এই বলে যে প্রাশিয়ার রাজা যেন তৃতীয় নেপোলিয়নের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এক চিঠি দেন। গ্রামোণ্টের এই অবিবেচনাপ্রসূত দাবী যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

প্রাশিয়ায় অবস্থিত ফরাসী রাজদূত বেনেডিটিকেও ফরাসী সরকার অনুরূপ নির্দেশ দিল। এই নির্দেশে বলা হল যে বেনেডিটি যেন অবিলম্বে প্রাশিয়ার রাজার

সাথে দেখা করবেন এবং তাঁর নিকট হতে এই মর্মে এক লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করবেন যে হোহেনজোলার্ন বংশের প্রধান হিসেবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এই বলে যে ভবিষ্যতে লিওপোল্ডকে তিনি স্পেনের সিংহাসনে বসবার অনুমতি দেবেন না। এই প্রতিশ্রুতি যাতে খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তার উল্লেখ করা হল ফরাসী সরকারের নির্দেশে। এই নির্দেশটি মূর্খতার পরিচায়ক। এর ফলশ্রুতি হল ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ।

বেনেডিটি তাঁর সরকারের নির্দেশমত প্রাশিয়ার রাজার সাথে (১২ই জুলাই) দেখা করতে গেলেন। রাজা তখন ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ফরাসী রাজদূত তাঁর সরকারের দাবি উত্থাপন করলেন। উইলিয়ম এতে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বললেন তাঁর পক্ষে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয় এবং রাজদূতকে আর কথা বলার সময় না দিয়ে চলতে শুরু করলেন। ওই দিন বিকালে বেনেডিটি পুনরায় রাজার সাথে দেখা করতে চাইলে রাজা দেখা করতে রাজী হলেন না।

এমস্ টেলিগ্রাম: ফরাসী রাজদূতের সাথে রাজার এই সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন টেলিগ্রামে বিসমার্ককে জানান হল এবং তাঁকে এটি সংবাদপত্রে ছাপাবার ক্ষমতা দেওয়া হল।

এদিকে বিমর্ষ বিসমার্ক বার্লিনে বিনিদ্র রজনী ও কষ্টদায়ক দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন যে ফ্রান্স তার বোকামি ও দম্ভের ফলে যুদ্ধ বাধাবেই এবং লিওপোল্ডের প্রত্যাখ্যান লিপি ফ্রান্সকে সন্তুষ্ট করতে পারবেনা। কিন্তু এটাও যদি না ঘটে তাহলে তিনি ঠিক করলেন যে চেম্বারে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রাশিয়া বিরোধী বক্তৃতার কৈফিয়ৎ দাবি করা হবে। বিসমার্ক যে ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। ফ্রান্সের সাথে এই যুদ্ধকে তিনি তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ও শ্রেষ্ঠ বিষয় বলে মনে করতেন। তবে তিনি প্রথম হতেই এই যুদ্ধ চেয়েছিলেন কিনা তা বলা শক্ত।

বিসমার্ক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রুন ও জেনারেল মলটকিকে সান্ধ্য ভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন। বিসমার্ক, রুন ও মলটকি তিনজনের মনে খুব স্ফূর্তি ছিল না। ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ বোধ হয় বাধবে না। ফলে বিসমার্কের স্বপ্নে দেখা ঐক্যবদ্ধ জার্মানী বাস্তবে পরিণত হতে দেরি হবে। ঠিক এই সময় এমস্ হতে রাজার নির্দেশমত টেলিগ্রাম এসে পৌঁছাল। বিসমার্ককে যেহেতু এটি সংবাদপত্রে পরিবেশন করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, বিসমার্ক সংবাদটি রূঢ় ভাষায় সংক্ষেপিত করে

সংবাদপত্রে ছাপাবার জন্য দিলেন। সাথে সাথে বিনে পয়সায় তা বার্লিনের রাস্তায় বিলি করা হল। প্যারিস ভিন্ন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিযুক্ত নর্থ জার্মান কনফেডারেশনের রাষ্ট্রদূতদের নিকটও তা পাঠান হল। প্যারিসেও এটি যথাসময়ে পৌছাল। বিসমার্কের পরিবেশিত সংবাদটি লোকে পড়ে বুঝল যে বেনেডিটি যেমন অভদ্রভাবে প্রাশিয়ার রাজার নিকট দাবি জানান, প্রাশিয়ার রাজা উইলিয়ামও অভদ্রভাবে সেটি প্রত্যাখ্যান করেন। বিসমার্কের তৈরি সংবাদটিকে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের প্রধান কারণ বলে মনে করা হত। ইদানিং এরূপ বলা যায় না। এই সংক্ষেপিত সংবাদটি অবশ্য তৎকালীন জার্মান ও ফরাসী জনসাধারণের মনোভাব ব্যক্ত করেছিল এবং যুদ্ধকে প্রায় জনযুদ্ধে পরিণত করেছিল। ফরাসী এবং প্রাশিয়ানরা উভয়েই সমানভাবে মনে করল যে তারা যেরূপ অপমানিত হয়েছে তা কেবলমাত্র যুদ্ধের দ্বারা দূর করা সম্ভব। কিন্তু ফ্রান্স বা প্রাশিয়ার কোথাও গণতন্ত্র চালু ছিল না। উভয় দেশের শাসকবৃন্দই যুদ্ধ বাধালেন এবং যুদ্ধের জন্য তারাই সমধিক দায়ী ছিলেন। তবে তৃতীয় নেপোলিয়ন যুদ্ধ চাইছিলেন না। তাঁর মন্ত্রিসভা এই যুদ্ধ চাইছিল এবং তাঁকে সেটা স্বীকার করে নিতে হয়। এই সময় তিনি তাঁর নিরুপায় অবস্থা তাঁর এক ইংরেজ বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করেন*। ১৯শে জুলাই ১৮৭০, ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ বেধে উঠল।

এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে উভয় দেশের জনসাধারণের ও কূটনীতি-বিদদের হঠকারিতাকে দায়ী করা যেতে পারে; বার্লিন এবং প্যারিসে যুদ্ধ চাই রব, ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রামোণ্টের অবাস্তব তূর্যনাদ, বিসমার্কের সুচিন্তিত কূটনীতি, তৃতীয় নেপোলিয়নের দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রাশিয়ার রাজা উইলিয়মের ব্যবহার উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধবার প্রত্যক্ষ কারণ বলে মনে হয়।

যুদ্ধঃ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর ফলে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র ফ্রান্সকে আক্রমণকারী বলে মনে করল। যুদ্ধ শুরু হলে দেখা গেল যে প্রাশিয়ার সামরিক ব্যবস্থা এরূপ নিখুঁত ও সুপরিকল্পিত ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মান সৈন্যদের কোনরূপ অসুবিধা হল না। এদিকে ফ্রান্সের সমর-প্রস্তুতি কিছুই ছিল না। ফ্রান্সের মিত্রশক্তি বলতে কাউকে দেখা গেল না। অপরদিকে দক্ষিণ-জার্মানীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে প্রাশিয়ার দিকে যোগ দিল।

* France has slipped out of my hand, I cannot rule unless I lead...I have no choice but to advance at the head of a public opinion which I can neither stem nor check."

ইতিমধ্যে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সৈন্যসহ **সেডানের** রণক্ষেত্রে জার্মানদের হাতে বন্দী হলেন। বিজয়ী জার্মান সৈন্য প্যারিসে প্রবেশ করল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করল। এবং সাথে সাথে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। গাম্বেটার নেতৃত্বে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার স্থাপিত হল। বিসমার্ক এই সরকারের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে রাজী হলেন না। তিনি নতুন নির্বাচনের পর যে সরকার গঠিত হবে তার সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত করবেন বলে কথা দিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ওই বছরের মে মাসে ফ্রাঙ্কফোর্টে এই সন্ধিপত্র পাকাপাকিভাবে উভয়পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হল।

ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়

ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধি অনুযায়ী ফ্রান্স প্রাশিয়াকে আলসেস ও লোরেন নামক প্রদেশ দুটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিন বছরের মধ্যে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা দিতে রাজী হয়। আরও ঠিক হয় যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত একটি জার্মান বাহিনী ফ্রান্সে থাকবে।

ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধি

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী ভার্সাইয়ের মিস্ মহলে প্রাশিয়ার রাজাকে জার্মান সম্রাট বলে ঘোষণা করবার সাথে সাথে জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ হল। জার্মানী ইউরোপের সামরিক শক্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করল।

জার্মানীর জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ফলাফলঃ ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ফলাফল ইউরোপের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। প্রথমত, এই যুদ্ধের ফলে জার্মানীর ঐক্যসাধন কেবলমাত্র সম্পূর্ণ হল না, কেবলমাত্র জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই হল না, নয়া জার্মান রাষ্ট্র ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হল। এর ফলে ইউরোপের পুরানো শক্তি সাম্যের অবসান ঘটল এবং এক নতুন শক্তি সাম্যের আবির্ভাব ঘটল। বার্লিন ইউরোপের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হল। বিসমার্ক শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতারূপে পরিগণিত হলেন। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে ইটালীর ঐক্যসাধনও সম্পূর্ণ হল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন রোম হতে ফরাসী সৈন্য সরিয়ে নেবার সাথে সাথে ইটালী রোম নগরী দখল করে নিল। তৃতীয়ত, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্যারিস সন্ধির শর্তগুলি ভেঙে দিতে সাহসী হলেন। তিনি কৃষ্ণসাগরে পুনরায় রাশিয়ার নৌশক্তি বৃদ্ধি করলেন এবং সিবাস্টোপোল প্রভৃতি স্থান সুরক্ষিত করলেন। ফলে

জার্মানীর ঐক্য
মূলরাজ্য ১৮৬৪ খ্রীঃ
পরবর্তী সংযুক্ত
১৮৬৬ খ্রীঃ
১৮৭১ খ্রীঃ
ফ্রান্স হ'তে ১৮৭১ খ্রীঃ
বালটিক সাগর
উত্তর সাগর
শ্লেজভিগ হলস্টেন
মেকলেনবার্গ
হ্যানোভার
প্রা শি য়া
রাশিয়া
অস্ট্রিয়া
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
হেসি
স্যাক্সনি
আলসেস লোরেন
বাডেন
উরটেমবার্গ
বেভেরিয়া
নিয়েমেন নং
ভিশ্চুলা নং
ওডার নং
দানিয়ুব নং
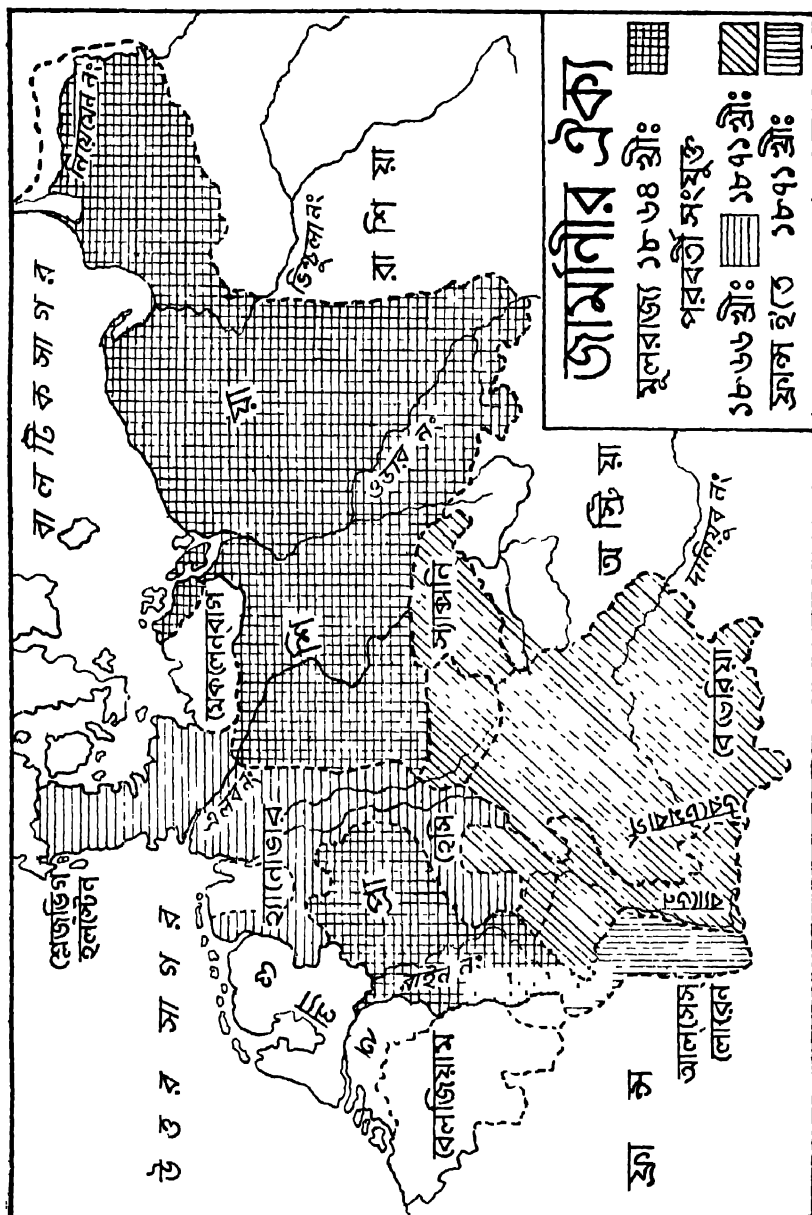
অবস্থা পুনরায় ঘোরাল হল। রাশিয়ার একতরফা এই কাজের বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রই বিশেষ প্রতিবাদ করল না। ফ্রান্স তখন পঙ্গু। তার পক্ষে প্রতিকার করা সম্ভব ছিল না। বৃটেনের গ্লাডস্টোন মন্ত্রিসভা প্রাশিয়ার সাথে একজোটে লণ্ডনে একটি বৈঠক ডাকলেন। এই বৈঠকে রাশিয়ার পক্ষে একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করা অন্যায় হয়েছে বলা হল। এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না। ফলে ভবিষ্যতে যে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক তিক্ত হবে তার সূচনা করল।

চতুর্থত, এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সে কেবলমাত্র দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরই পতন ঘটল না, ফ্রান্স হতে রাজতন্ত্র চিরদিনের জন্য বিদায় নিল। ফ্রান্সের নিকট হতে আলসেস্-লোরেন কেড়ে নিয়ে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ফরাসী জনসাধারণ জার্মান-বিদ্বেষী হল। ফ্রান্স তার পরাজয়ের কথা ভুলতে পারল না। তাছাড়া দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্যারিসের সাম্যবাদীরা এক স্বাধীন কমিউন স্থাপন করল। প্যারিসের বিভিন্ন শহরেও গণঅভ্যুত্থান ঘটল। প্রজাতন্ত্রী সরকার অবশ্য দৃঢহস্তে এই সব বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হলেন। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের নেতা থিয়ার্স ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে সক্ষম হলেন এবং জাতীয় নেতা হিসেবে কাভুর বিসমার্ক, এব্রাহাম লিঙ্কনের সমপর্যায়ভুক্ত হলেন।

উপসংহারে বলা যায় যে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ইউরোপের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত করল। এই যুদ্ধ এটাই প্রমাণ করল যে রাষ্ট্রের ভাঙাগড়ার ক্ষেত্রে যুদ্ধ অপরিহার্য। এর ফলে ইউরোপের রাজনীতি অনেকটা যুদ্ধভীতি দ্বারা পরিচালিত হতে থাকবে। ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধকে জাতীয় নীতির ভিত্তি বলে গ্রহণ করবে এবং কূটনীতিকে ইউরোপের শান্তিরক্ষার জন্য ব্যবহার করবে না, নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করবে।

Q. 4. Compare the two unification movements in Italy and Germany.

Ans. ইটালীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কতকটা সাদৃশ্য রয়েছে। পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির ফলে যেমন ইটালীর ঐক্য সম্ভব হয় তেমনি প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির ফলে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান ঐক্য দেখা দেয়। কাভুরের বিচক্ষণ পরিচালনায় ইটালীর ঐক্য-আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়; বিসমার্কের অনন্যসাধারণ দক্ষতা ও কূটনীতির দ্বারা প্রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তবে উভয় দেশের ঐক্য আন্দোলনের মধ্যে

ইটালী ও জার্মানীর ঐক্য আন্দোলনের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য

ইতালীর ঐক্য
সুইজারল্যাণ্ড
স্যাভয়
লোম্বার্ডি
মিলান
ভেনিশিয়া
পার্মা
মোডেনা
পোপের রাজ্য
নিস
টাস্কেনি
মার্চেস
এল্‌বা
রোম
আড্রিয়াটিক সাগর
ন্যাপল্‌স
ভূমধ্য সাগর
সিসিলি
পাইড্‌মন্ট সার্ডিনিয়া রাজ্য
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সংযুক্ত
১৮৬০ " "
১৮৬১ " "
১৮৬৬ " "
১৮৭০ " "

পার্থক্যও রয়েছে। (১) ইটালীর আন্দোলনে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা কাজ করেছিল। এখানে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী শক্তি এবং রাজতন্ত্রী সামরিক শক্তি একসাথে তাল রেখে চলতে পেরেছিল। কিন্তু জার্মানীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রাশিয়ার সামরিক শক্তিই এর জন্য প্রধানত দায়ী ছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক আদর্শ জার্মান ঐক্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে কখনো প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেনি। (২) পিডমণ্টের পক্ষে বৈদেশিক সাহায্য অপরিহার্য ছিল কারণ পিডমণ্টের পক্ষে এককভাবে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে প্রাশিয়ার পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না, তবে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নিরপেক্ষতা প্রয়োজন ছিল। (৩) তাছাড়া ইটালীর ঐক্যসাধনের পথে বাধা ছিল অসংখ্য—বিশেষ করে ইটালীতে বিদেশী শক্তির শাসন অব্যাহত ছিল এবং পোপ তার বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে রোমে বসে ছিলেন। জার্মানীতে এরূপ কোন সমস্যা ছিল না। (৪) ইটালীর ঐক্য ধীরে ধীরে ঘটেছিল, খুব সহজে এটি সংঘটিত হতে পারেনি, (মানচিত্র দেখ) জার্মানীর ঐক্য কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

Q. 5. Make a comparison between Cavour and Bismark.

Ans. কাভুর ও বিসমার্ক উভয়েই উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ছিলেন। উভয়ের কর্মকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখা যায়।

সাদৃশ্য ঃ কাভুর ও বিসমার্ক উভয়েই রাজনীতিতে চরম সুবিধাবাদী ছিলেন। উভয়েই বাস্তববাদী এবং সীমিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য চেষ্টা করেছেন, ভবিষ্যতের ঘটনা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাননি। উভয়েই কৃতী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, কেউই কৃতী অতিমানব ছিলেন না। কাভুর চেয়েছিলেন উত্তর ইটালীতে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে আর বিসমার্ক চেয়েছিলেন প্রাশিয়ার প্রভাবাধীনে উত্তর জার্মান যৌথ রাষ্ট্র গড়তে। দুজনেই মনে করতেন যে তাঁদের সীমিত লক্ষ্যে তাঁরা পৌছাতে পারবেন যদি ফ্রান্স, রাশিয়া ও গ্রেটবৃটেনকে নিরপেক্ষ রেখে অস্ট্রিয়াকে নিজ নিজ দেশ হতে বিতাড়িত করা যায়। উভয়েই নিজ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সামরিক বাহিনী ও কূট কৌশলের পূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন।

পার্থক্য ঃ কাভুর ও বিসমার্কের নীতি, কর্মপদ্ধতি ও জীবনাদর্শে পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, কাভুর ছিলেন উদারপন্থী এবং পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। একারণে তিনি ইটালীর বিভিন্ন অঞ্চলকে পিডমণ্টের প্রভাবাধীনে আনবার পূর্বে গণভোটের ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে বিসমার্ক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি

প্রজারঞ্জক রাজতন্ত্রে ও জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর নীতি ছিল—'দেশের বৃহত্তর কল্যাণ বক্তৃতা বা পরিষদে ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রস্তাব পাসের দ্বারা সম্পন্ন হয় না—কেবল মাত্র সামরিক শক্তিতেই এটি সম্ভব*। দ্বিতীয়তঃ, মানস প্রকৃতির দিক হতে কাভুর ছিলেন প্রথমে ইটালীয়ান পরে সার্ডিনিয়ান অন্যদিকে বিসমার্ক প্রথমে ছিলেন প্রাশিয়ান এবং পরে জার্মান। ফলে কাভুর অখণ্ড ইটালী রাষ্ট্রে সার্ডিনিয়ার স্বাতন্ত্র্য রাখার চেষ্টা করেননি। বিসমার্ক কিন্তু জার্মানীকে প্রাশিয়ার অধীনে আনেন। প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনই জার্মান সাম্রাজ্যের রাজধানী হল। তৃতীয়তঃ, বিসমার্ক তার লক্ষ্যে পৌছবার জন্য বিদেশী শক্তির সাহায্য নেবার প্রয়োজন মনে করেননি, অন্যদিকে কাভুরের পক্ষে বিদেশী সাহায্য অপরিহার্য ছিল।

More Questions with Hints

Q. 1. Italy as a nation is the legacy and life work of Cavour. Discuss.

Ans. জনসাধারণের ঐকান্তিক দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্যের কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত করতে হলে চাই সার্থক নেতৃত্ব। ইটালীর জাতীয় ঐক্যের ইতিহাসে কাভুর এই সার্থক নেতৃত্ব দেন।

কাভুরের রাজনৈতিক জীবন—পীডমণ্ট পার্লামেন্টের সদস্য—১৮৫২ তে প্রধান মন্ত্রী—রাজনৈতিক মতবাদ—আভ্যন্তরীণ নীতি ও সংস্কার—ইটালীর সমস্যা সম্বন্ধে কাভুরের ধারণা—বৈদেশিক নীতি—ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান—তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে প্লমবিয়ার্সের চুক্তি—অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ—তৃতীয় নেপোলিয়নের বিশ্বাসঘাতকতা—জুরিখের সন্ধি—কাভুরের পদত্যাগ—পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ—মধ্য ইটালীর ঐক্য—দক্ষিণ ইটালীর বিদ্রোহ ও গ্যারিবল্ডীকে পরোক্ষভাবে সাহায্য—গ্যারিবল্ডী সমস্যা—কাভুরের কৃতিত্ব ও অবদান।

Q. 2. What were the obstacles to the unification of Italy? How were they overcome?

Ans. নেপোলিয়নের শাসনাধীনে ইটালীর জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা জন্মায়। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি ভিয়েনায় মিলিত হয়ে ইউরোপে বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগ ফিরে

---

* "Not by speeches and majority resolutions but by the policy of blood and iron'.

আনতে বদ্ধপরিকর হয়। ইটালী পুনরায় বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অষ্ট্রিয়া লম্বার্ডি ও ভেনিসিয়া হস্তগত করে। টাসকানী, পার্মা, মডেনা প্রভৃতি হ্যাপসবুর্গ বংশীয় রাজাদের হাতে গেল। পোপ তাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন। বিতাড়িত বুরবোঁ বংশীয় রাজা নেপল্‌সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইটালীর উত্তর পশ্চিম দিকে একমাত্র ইটালীর রাজ্য পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া থেকে গেল।

এরফলে ইটালীর ঐক্যসাধনে বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি হয়। প্রথমত, ইটালীতে একমাত্র পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার ছাড়া ইটালীর আর কোন রাষ্ট্রে ইটালীর রাজা রাজত্ব করতেন না। ফলে এসব রাজত্বের মধ্যে জাতীয় চেতনা বলে কিছু ছিল না। তারা নিজ নিজ স্বার্থের দিকে নজর রাখত এবং জনসাধারণের অভ্যুত্থান যাতে সফলতা অর্জন করতে না পারে তার জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা করত। বলা বাহুল্য এই সব বিদেশী রাজারা জাতীয় ঐক্য যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। দ্বিতীয়ত, অষ্ট্রিয়া ইটালীতে প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। অষ্ট্রিয়া তখন ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। ইটালীতে চলতি ব্যবস্থায় কোনরূপ পরিবর্তন যাতে না ঘটে সেদিকে অষ্ট্রিয়া সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। অষ্ট্রিয়া ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করত না। অতএব ইটালী ঐক্যসাধনের পথে প্রধান বাধা ছিল অষ্ট্রিয়া। অষ্ট্রিয়াকে ইটালী হতে বিতাড়িত করতে না পারলে ইটালীর ঐক্যসাধন কোনদিনও সম্ভব হবে না এটি বুঝতে পারলেন কাভুর। এবং তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংগ্রাম শুরু করেন এবং বেশ কিছুটা সফলতা অর্জনে সমর্থ হন। তৃতীয়ত, ইটালীর ঐক্যসাধনের পথে পোপের অবস্থিতি বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। পোপ ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। এখানে পোপের বিরোধিতার অর্থ হল অধিকাংশ ধর্মভীরু ক্যাথলিকদের বিরোধিতা এবং বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পোপের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে এবং বহুদিন ধরে একটি ফরাসী বাহিনী পোপের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য রোমে অবস্থান করতে থাকে। অতএব ঐক্যবদ্ধ ইটালী রাষ্ট্রের পক্ষে রোম দখল করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময় সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রোম হতে ফরাসী বাহিনী যখন প্রত্যাহার করলেন সেই সুযোগে ইটালী রাষ্ট্র রোম দখল করে নিতে সক্ষম হল। অবশ্য পোপ দীর্ঘকাল ধরে ইটালী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে যান। চতুর্থত, ইটালী বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা এবং ঐক্যের পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। ফলে

ঐক্যসাধনের পথে এটি অন্যতম বাধাস্বরূপ ছিল। ম্যাটাসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের চেষ্টায় এই বাধা সাময়িকভাবে অতিক্রম করা সম্ভব হলেও ভবিষ্যতে ইটালী রাষ্ট্রের উন্নতি ব্যাহত হয়েছিল।

Q. 3. Tell the story of the unification of Italy clearly demarcating the different stages of the movement.

Ans. ১নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

Q. 4. Analyse the significance of the conferences of Plombiers and Villafranca in the Italian struggle for unification.

Ans. ইটালীর ঐক্যসাধনের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় শুরু হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। এই বছর কাভুর প্লমবিয়ার্স নামক স্থানে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এবং বৈঠক শেষে নেপোলিয়নের সাথে একটি গোপন চুক্তি সম্পাদনের খসড়া প্রণয়ন করেন। পরে যখন উভয় পক্ষ এটি গ্রহণ করে তখন এই চুক্তিটির নাম হয় প্লমবিয়ার্সের গোপন চুক্তি। এই চুক্তিটিতে তিনটি শর্ত ছিল—(১) পিডমণ্ট সার্ডিনিয়ার পঞ্চদশী রাজকন্যা তৃতীয় নেপোলিয়নের আত্মীয়া তেতাল্লিশ বছরের উচ্ছৃঙ্খল জেরোমকে বিবাহ করবে। এর ফলে পিডমণ্ট সার্ডিনিয়ার সাথে ফ্রান্সের সম্পর্ক নিবিড় হবে; (২) ফ্রান্স এবং পিডমণ্ট একজোটে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যুদ্ধের পর নতুন ব্যবস্থায় অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া নামক প্রদেশ কেড়ে নিয়ে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার সাথে যুক্ত করে Upper Italy বলে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা হবে। এই রাষ্ট্রের সাথে পার্মা, মডেনা এবং পোপের রাজ্য দুটিও যুক্ত হবে। রোম নগরীতে পোপের ক্ষমতা বজায় থাকবে। ইটালীর মধ্যভাগে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করা হবে এবং এই রাষ্ট্রের রাজা হবেন জেরোম। নেপলস-সিসিলি বুরবোঁ রাজার শাসনাধীনেই থাকবে। সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ তৃতীয় নেপোলিয়ন পিডমণ্টের নিকট হতে স্যাভয় ও নীস গ্রহণ করবেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কাভুর এবং নেপোলিয়ন কেন এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। কাভুরের দিক হতে বলতে গেলে এটা বলা অসঙ্গত হবে না যে কাভুরই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে বিদেশী শক্তির সাহায্য ভিন্ন ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য আসবে না। উত্তর ইটালীর ঐক্যসাধনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল

অষ্ট্রিয়া। আর অষ্ট্রিয়াকে লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া হতে বিতাড়িত করা পিডমণ্টের পক্ষে একক সম্ভব নয়। ১৮৪৮-৪৯ এর কাস্টোজা ও নোভারোর যুদ্ধে এটি প্রমাণিত হয়েছিল। এই যুদ্ধ তুটিতে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজা নিদারুণভাবে অষ্ট্রিয়ার হাতে পরাজিত হন। একারণে বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য অপরিহার্য বলে কাভুর মনে করলেন। তিনি অবশ্য প্রথমে ইংল্যাণ্ডের সাহায্য পাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। কারণ ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে কাভুরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে তিনি ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকলেন। কারণ এর আগেই প্যারিসের বৈঠকে তিনি তৃতীয় নেপোলিয়নের ইটালী সম্বন্ধে আগ্রহের পরিচয় পেয়েছিলেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের দিক হতে বলা যায় যে তিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর যেরূপ সুনাম অর্জন করেছিলেন সেটি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তৎপর হলেন এবং ইটালীর জনসাধারণের নিকট পরিত্রাতা হিসেবে গণ্য হবার ইচ্ছা তাঁর মনে জেগেছিল। তাছাড়া যৌবনে তিনি কার্বোনারির সদস্য ছিলেন এবং ইটালীবাসীদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর কিছুটা তুর্বলতা ছিল। স্যাভয় ও নীস হস্তগত করতে পারলে একদিকে যেমন তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে তেমনি অপরদিকে ভিয়েনা ব্যবস্থায় ফাটল ধরানো যাবে। প্রথম নেপোলিয়নের ভাগ্যোন্নতি ইটালী হতেই শুরু হয় এবং তিনি ইটালী জয় করে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ইটালীতে এক অখণ্ড রাজ্য স্থাপন করার চেষ্টা করেন। নেপোলিয়নের শাসনাধীনে ইটালীর জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা জন্মায়। তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রথম নেপোলিয়নের ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টায় ছিলেন। প্লম্বিয়ার্সের চুক্তির ফলে তিনি যে সুযোগ পেলেন তা ছাড়তে চাইলেন না।

ভিলাফ্রাঙ্কার বৈঠক : ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রো-সার্ডিনিয়ান যুদ্ধ শুরু হলে প্লম্বিয়ার্সের চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল। মিত্রপক্ষের সৈন্যদল মাজেণ্টা ও সলফেরিনোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদলকে পরাজিত করল। লম্বার্ডি ও মিলান মিত্রশক্তির হাতে এল। কেবল ভেনেসিয়া হতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করতে পারলেই ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার অধিকার একেবারে চলে যাবে। কিন্তু হঠাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভুরের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে ভিলাফ্রাঙ্কা নামক স্থানে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হলেন। এই সাক্ষাৎকারে উভয় সম্রাট ইটালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। পরে এটি চুক্তিতে পরিণত হয়। এই পরিকল্পনায় ঠিক হল যে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া লম্বার্ডি পাবে। টাসকানী ও মডেনার

ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। রাশিয়ার সাথে তিনি একটি চুক্তি করলেন যাতে বলা হল যে অষ্ট্রিয়ার সাথে ইটালীর ঐক্যসাধন নিয়ে যুদ্ধ দেখা দিলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকবে। গ্রেট বৃটেন ও প্রাশিয়া এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবে। এরপর অষ্ট্রো-সার্ডিনিয়ান যুদ্ধ শুরু হলে ফ্রান্স সার্ডিনিয়ার পক্ষে যোগ দিল। ফ্রান্সের সাহায্যের ফলে অষ্ট্রিয়া দুটি যুদ্ধে পরাজিত হল। এর পর অবশ্য তৃতীয় নেপোলিয়ন বিশ্বাস-ঘাতকতা করলেন। তিনি যুদ্ধ হতে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু সে সময় জনসাধারণের মনে স্বাধীনতাব আকাজ্ক্ষা এতই প্রবল ছিল যে মধ্য ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে তারা প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করে সার্ডিনিয়ার সাথে একতাবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু সহজে ব্যর্থ করা গেল না। এ ক্ষেত্রেও বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হল। তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে এক নতুন চুক্তির ফলে এটি সম্ভব হল। এই চুক্তিতে স্থির হল পার্মা, মডেনা ও টাসকানি সার্ডিনিয়ার সাথে যুক্ত হবে। ফ্রান্সকে অবশ্য স্যাভয় ও নীস দিতে হবে।

ইতিমধ্যে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেপলস ও সিসিলিতে জনসাধারণ বিদ্রোহ করল এবং তার নেতৃত্ব দেবার জন্য গ্যারিবল্ডিকে আহ্বান জানাল। ইংরেজ নৌবাহিনীর পরোক্ষ সহায়তার ফলে গ্যারিবল্ডি তাঁর হাজার লালকোর্তাদের নিয়ে সিসিলিতে অবতরণ করতে সক্ষম হলেন এবং সিসিলি হতে নেপলসে আসতে পারলেন।

এরপর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সাথে মৈত্রী স্থাপনের ফলেই ইটালী ভেনিসিয়া পায়। অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটলে ইটালীকে ভেনিসিয়া ছেড়ে দিতে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়াকে বাধ্য করেন। আর ইটালী রোম দখল করতে পারল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধেব সুযোগে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা হতে বোঝা যায় যে ইটালীর ঐক্যসাধনের ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যের অবদান কম নয়। তবে এটাও ঠিক যে বিদেশী সাহায্য নেবার ফলে ইটালীকে অনেক ক্ষতি স্বীকারও করতে হয়েছিল, কারণ বিদেশী সাহায্য কোন কালেই নিঃস্বার্থ হয় না।

Q. 7. What were the basic factors that prepared the field for the unification of Germany ?

Ans. নেপোলিয়নের নিকট বারবার পরাজিত হয়ে জার্মানদের মনে জাতীয়তাবোধ বিশেষভাবে দেখা যায়। প্রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদ আরও উগ্রভাবে ফুটে ওঠে। এই রাষ্ট্রের চিন্তানায়করা শিক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্পে রাষ্ট্রের জনসাধারণকে শক্তিশালী করে তোলেন। ভিয়েনা সম্মেলনের ফলে জার্মানীতে

একটি যৌথ রাষ্ট্রের প্রবর্তন ঘটে। এই যৌথ রাষ্ট্রটি ছিল অসংবদ্ধ। অষ্ট্রিয়া পুনরায় জার্মানীতে কর্তৃত্ব শুরু করে। যৌথরাজ্যের পরিষদের মাধ্যমে অষ্ট্রিয়া তার স্বার্থনীতি কার্যকরী করতে থাকে। কিন্তু জার্মান রাজ্যগুলিতে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত প্রগতিবাদ ফল্গু ধারার ন্যায় প্রবাহিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক-বৃন্দের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধারা প্রাধান্যলাভ করেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল মেটারনিকের নিকট এটি অসহ্য মনে হয়। তিনি জার্মানীতে উদারনৈতিক মতবাদ, গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যোগী হলেন। কার্লসবাড ডিক্রি দাবী করে তিনি এ পথে অনেকটা এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু জার্মানীতে ঐক্য আন্দোলনও এই সময় হতে নানাভাবে পুষ্ট হচ্ছিল। ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকরা তাঁদের রাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের জন্য যে চার্টার দিলেন তা ঐক্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করল। তাছাড়া দুটি ঘটনা এবিষয়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করল। প্রথমতঃ জলভারিন এবং দ্বিতীয়টি জাতীয়তাবাদ।

জলভারিন ঃ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়া নেহাৎ অর্থনৈতিক কারণেই তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে একটি জলভারিন বা শুল্ক সংঘের সৃষ্টি হয়। ক্রমে জার্মানীর অন্যান্য রাষ্ট্র এই শুল্ক সংঘে যোগ দেয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একমাত্র অষ্ট্রিয়া ছাড়া সকল জার্মান রাষ্ট্রই এই সংঘের সদস্য হল। এই শুল্ক সংঘ জার্মানীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাত্মবোধ সৃষ্টি করে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ সুগম করে দেয়। অষ্ট্রিয়া ছাড়া যে জার্মানী নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই আত্মপ্রত্যয় জলভারিন এনে দেয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করবার বাস্তব ও মানসিক ভিত্তি তৈরি হয়। জলভারিনের গুরুত্ব সম্বন্ধে কেটেলবির মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য ঃ "The political value of this grouping of German material and economic interests round Prussia was immense. It was a direct preparation for the Empire of 1870."

দ্বিতীয়ত, এই সময় জার্মান মনীষীরা লেখনীর মাধ্যমে সর্ব-জার্মান ঐক্যের বাণী প্রচার করতে থাকলেন এবং এর ফলে জনসাধারণের ভাবমানসে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল। ফিকটে, হেগেল, হেসার, স্টেইন, ডালম্যান, কান্ট, শিলার প্রভৃতি মনীষীদের অবদানের ফলে জার্মানদের মধ্যে একাত্মবোধ দেখা দিল। এই একাত্মবোধ ফ্রাঙ্কফোর্টের জাতীয় মহাসভায় ফুটে উঠল।

এছাড়া ইটালীতে ঐক্য আন্দোলনের সাফল্যেও জার্মানদের মনে ঐক্যবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হল।

Q. 8. What was the Bismarkian plan for the unification of Germany ? How did he execute the plan upto the battle of Sado Wa ?

Ans. ৩ নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

Q. 9. What was the bearing of the Schlegwig-Holstein question on the unification of Germany ?

Ans. প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য স্থাপনের প্রথম সুযোগ এল শ্লেজউইগ-হলষ্টিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এ দুটি স্থান ডেনমার্কের অধিকারে থাকলেও হলষ্টিন ছিল জার্মান যৌথ রাষ্ট্রের অন্যতম সদস্য এবং দুটি স্থানেই জার্মানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন সন্ধির দ্বারা ঠিক হয় যে, এ দুটি স্থান ডেনমার্কের শাসনাধীনে থাকলেও তাদের ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কিন্তু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এ দুটি অঞ্চলকে ডেনমার্কের সাথে যুক্ত করবার কথা ঘোষণা করা হলে এর বিরুদ্ধে গোটা জার্মানীতে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। বিসমার্ক ডেনমার্কের সাথে এ নিয়ে যুদ্ধ করতে চাইলেন। অবশ্য তিনি এভাবে Confederation-এর হয়ে যুদ্ধ করতে চাইলেন না। তিনি অষ্ট্রিয়ার সাথে একজোটে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে মনস্থ করলেন। তার পিছনে অবশ্য কয়েকটি কারণও ছিল। প্রথমত, তিনি ভাবলেন এই যুদ্ধে প্রাশিয়া যোগদান করলে প্রাশিয়ার পক্ষে জার্মানীতে নেতৃত্ব গ্রহণ করার সুবিধা হবে, যেমন পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদানের পর। এই যুদ্ধের ফলে প্রাশিয়ার মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি জার্মানীতে নেতা হবার মত যোগ্যতা প্রাশিয়াই অর্জন করবে। দ্বিতীয়ত, অষ্ট্রিয়ার সাথে একজোটে যুদ্ধে নামা একদিকে যেমন বাঞ্ছনীয়, অন্যদিকে তেমনি অনিবার্যও ছিল। বাঞ্ছনীয় এই কারণে যে ভবিষ্যতে এই জটিল বিষয়টি নিয়ে অতি সহজে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা সম্ভব হবে আর অনিবার্য এই কারণে যে অষ্ট্রিয়া কখনো প্রাশিয়াকে এককভাবে এই যুদ্ধ চালাতে দেবেনা। এটি হতে দিলে প্রকারান্তরে জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হবে। একারণে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সাথে এক-জোটে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ডেনমার্ক পরাজিত হল। যুদ্ধ শেষে এই অঞ্চল দুটির শাসন ব্যবস্থা কি হবে তা নিয়ে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। অবশেষে গেষ্টিনের চুক্তিদ্বারা ঠিক হল যে শ্লেজউইগ ও হলস্টেনকে

অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুগ্ম শাসন প্রবর্তিত হবে। কিন্তু হলস্টেন থাকবে অষ্ট্রিয়ার শাসনে এবং শ্লেজউইগ প্রাশিয়ার শাসনে। লক্ষ্য করবার মত যে প্রাশিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত হলস্টেনের শাসনভার দেওয়া হল অষ্ট্রিয়াকে। বিসমার্ক ভবিষ্যতে যাতে অষ্ট্রিয়ার সাথে এই নিয়ে যুদ্ধ করা যায় সেদিকে নজর রেখেই এরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন।

বিসমার্কের পক্ষে গ্যাস্টিন চুক্তিতে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মানীতে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটান। এর জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল জার্মানী হতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য বিনাশ করা। ডেনমার্কের সাথে যুদ্ধের পর বিসমার্কের নিকট অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতাব আর কোন প্রয়োজন রইল না। এখন তিনি তাঁর প্রধান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন। তাঁব নিকট গ্যাস্টিন চুক্তি কাগজ দিয়ে ফাটল ঢাকার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ বাধাতে সক্ষম হন এবং এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া নিদারুণভাবে পরাজিত হয়। ফলে জার্মানী হতে তাকে সরে যেতে হল এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান যৌথরাজ্য স্থাপিত হয়। অতএব জার্মানীর **ঐক্যসাধনের** ইতিহাসে শ্লেজউইগ-হলস্টেন সমস্যাটিব বিশেষ অবদান রয়েছে।

Q. 10. Discuss the origin of the Franco-Prussian War. What were its results ?

Ans. 3 নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

Q. 11. Why did movement to unify Germany on a liberal basis fail ?

Ans. উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের সার্থক রূপায়ণ ঘটে ঐক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায়। এই শতকের প্রথমে যখন ইউরোপে নানা অঞ্চলে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠছিল তখন জার্মানী ছিল বহুধা-বিভক্ত। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐক্য থাকলেও জার্মানীতে জাতীয় ঐক্য বা জাতীয় রাষ্ট্রের সূচনা হয়নি বা হতে পারেনি। জার্মান জনসাধারণের জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যের চেতনা হলেও উনিশ শতকের শেষার্ধে বিসমার্কের লৌহকঠিন নীতির ফলেই জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের শুভ সূচনা ঘটে। অবশ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানীকে খণ্ডখণ্ড রাজ্যে বিভক্ত

করা হয়। এই রাজ্যগুলিকে সংঘবদ্ধ করে একটি শিথিল যৌথ রাজ্য স্থাপন করা হল। এটি ছিল খুবই অসংবদ্ধ। অষ্ট্রিয়া পুনরায় জার্মানীতে কর্তৃত্ব করতে শুরু করে। যৌথরাজ্যের একটি পরিষদ বা Diet ছিল। অষ্ট্রিয়া এই ডায়েটের সভাপতি হয় এবং প্রাশিয়াকে সহ-সভাপতি করা হয়। ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে ডায়েটের অধিবেশন বসত। জার্মানীর কোন রাষ্ট্রেই যাতে কোন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত না হয় তার জন্য মেটারনিক সবিশেষ চেষ্টা করেন। এমন কি অষ্ট্রিয়ার ভয়ে প্রাশিয়ার রাজাও প্রগতিবাদী সংস্কার স্থাপন করতে পাবেন নি।

কিন্তু জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষকদের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধাবা প্রাধান্যলাভ করেছিল। এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যে যুব উৎসবের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলতে থাকে। সমগ্র জার্মানীতে উদারনৈতিক আন্দোলন চিরদিনেব জন্য ধ্বংস করে দেবার উদ্দেশ্যে মেটারনিক কার্লসবাড নামক স্থানে জার্মান রাষ্ট্রনায়কদের এক সভা ডাকেন। এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের ওপর লক্ষ্য রাখবার জন্য, সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণেব জন্য, প্রগতিপন্থী সংবিধান প্রণযন ও প্রবর্তন বন্ধ করবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রবর্তন করা হয়। ইতিহাসে এগুলি কার্লসবাড ডিক্রিস্ বলে পরিচিত। সবক্ষেত্রে উদারনীতিবাদ ধ্বংস করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। কার্লসবাড ডিক্রি প্রায় দশ বছর ধরে জার্মানীতে দমননীতি অব্যাহত রাখে।

১৮৩০-এর ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া জার্মানীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করে। স্যাক্সনি, হ্যানোভার ও হেসের শাসকদের নিকট হতে জনসাধারণ প্রগতিমূলক সংবিধান আদায় করে নেয়। কিন্তু মেটানিকের বিরোধিতার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এই শাসনতন্ত্রগুলি বাতিল করে দেওযা হয়।

১৮৩০-এর বিপ্লব ব্যর্থ হলেও জার্মানীর জনসাধারণের মনে এক নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করল।

এদিকে জলভারিন বা শুল্ক সংঘ জার্মানীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাত্মবোধ সৃষ্টি করে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ সুগম করল। জার্মান মনীষীরাও লেখনীর মাধ্যমে ঐক্যের জন্য জার্মানীর ভাবমানস তৈরি করলেন। জার্মানদের মধ্যে একাত্মবোধ দেখা দিল। আবার ঠিক এই সময় জার্মান জাতি অনুপ্রাণিত হল সিসিলির বিদ্রোহ ও ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সংবাদে। এর ফলে জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিপ্লব ও গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল। এগুলির লক্ষ্য ছিল দুটি—

(ক) বিভিন্ন রাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন এবং (খ) জার্মানীতে রাজনৈতিক ঐক্য সাধন।

প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনে জনতার বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ম গণতন্ত্র স্থাপন করা হবে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সংবিধান তৈরি করার জন্য প্রতিনিধি সভা আহ্বান করলেন। ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উইটেমবার্গ, স্যাকসনি প্রভৃতি রাজ্যেও উদারনৈতিক আন্দোলনের ফলে রাজারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সম্মত হলেন। এদিকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর প্রতিষ্ঠার কাযও এগিয়ে যেতে থাকে। সমগ্র জার্মানীর প্রায় ছয় শত প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে একটি সংবিধান সভায় মিলিত হলেন। ডায়েটের পরিবর্তে এই সভা কার্যকরী হবে বলে সকলে মেনে নিলেন। এই জাতীয় সভা ইতিহাসে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট নামে পরিচিত। এটিকে ভোর-পার্লামেণ্ট (Vor-Parliament)-ও বলা হয়ে থাকে। এই সভার অধিবেশন এক বছর ধরে চলল। এটির প্রধান কাজ ছিল সমগ্র জার্মানীর জন্য একটি সুসংবদ্ধ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। কিন্তু সদস্যরা অধিকাংশই ভাববাদী ছিলেন বলে কোন বিষয়েই তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। অধিকাংশ সদস্যই উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং রক্তাক্ত বিপ্লব এবং সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা জার্মানীতে একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক যৌথরাজ্য পরিণত করতে ইচ্ছুক ছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডালম্যান ভাবী জার্মান রাষ্ট্রের জন্য সংবিধানের খসড়া রচনা করলেন। কিভাবে এই লক্ষ্যে পৌছানো যাবে এই নিয়ে জাতীয়তাবাদী সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। এর ফলে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল।

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে 'জার্মানী' কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিল। অধিকাংশের দাবি ছিল জার্মানী ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলির জার্মান ভাষাভাষীদের নিয়ে অখিল জার্মান রাষ্ট্র গঠন করা। এঁদের নাম দেওয়া হল 'Great Germans', আর যাঁরা সমগ্র প্রাশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে বাদবাকী জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে নতুন জার্মান রাষ্ট্র গঠন করতে চাইল তাদের বলা হল 'Little Germans'। Great Germans রা অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনে ইচ্ছুক হল। 'Little Germans'দের মধ্যে আবার মতবিরোধ দেখা দিল। কিছু সংখ্যক প্রাশিয়ার নেতৃত্ব কামনা করল, আর কিছু সংখ্যক বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিকরা অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্ব স্থাপনে ইচ্ছুক হল। এর ফলে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকল। ইতিমধ্যে জার্মানী ও অন্যান্য স্থানে বিপ্লব বহ্নি প্রায় নির্বাপিত হয়ে এল।

অবশেষে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্ট এক শাসনতন্ত্র তৈরি করল। এই শাসনতন্ত্রে বংশগত রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গডবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এবং এই রাষ্ট্রের সম্রাট হবার জন্য প্রাশিয়ার রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিককে আহ্বান জানাল হল। কিন্তু ভীরুচরিত্রের ফ্রেডারিক এটি প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট হতে 'কর্দম ও কাষ্ঠ' নির্মিত রাজমুকুট গ্রহণ করতে ঘৃণাবোধ করলেন। জার্মানীর অন্যান্য রাজাদের দ্বারা যদি তিনি নিমন্ত্রিত হতেন তাহলে অবশ্য এ বিষয়ে চিন্তা করতেন। কিন্তু ব্যাভেরিয়া, ওয়াটেমবার্গ, স্যাক্সনী ও হ্যানোভারের রাজারা প্রাশিয়ার রাজাকে ভাবী জার্মান রাষ্ট্রের সম্রাট বলে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। অষ্ট্রিয়াও এর বিরোধিতা করল। প্রাশিয়ার রাজা ভীত হয়ে সম্রাট হবার প্রস্তাব তুলে নিলেন।

ভাবী জার্মান রাষ্ট্রের কর্ণধার নিবাচন নিয়ে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ তীব্র হল। পরিশেষে কিছু সংখ্যক সদস্য জার্মান রাষ্ট্রগুলির রাজন্যবর্গের সহযোগিতা ছাডাই নতুন সংবিধান চালু করবার জন্য প্রচেষ্টা চালালেন। ফলে জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল। জার্মান রাষ্ট্রের শাসকবর্গ শংকিত হল। তারা নিজ নিজ প্রতিনিধিদের ফ্রাঙ্কফোর্ট হতে চলে আসতে নির্দেশ দিলেন। যে সব রাজ্যে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল সে অঞ্চলের শাসকবর্গ প্রাশিয়ার সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করল। প্রাশিয়ান সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে কার্যত বিদ্রোহ দমিত হল। ফলে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টের অবলুপ্তি ঘটল। এবং এর সাথে সাথে গণতান্ত্রিক উপায়ে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। এরপর জার্মানীতে ঐক্য স্থাপিত হয় সত্য কিন্তু সে ঐক্যের ভিত্তি ছিল প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি এবং বিসমার্কের কূটনৈতিক দক্ষতা। বিসমার্ক ১৮৪৮-এর আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জার্মানীর ঐক্যসাধন সম্ভব নয়। সামরিক শক্তির সাহায্যেই ঐক্য নিয়ে আসতে হবে এবং প্রাশিয়ার দ্বারা এটি সম্ভব হতে পারে, অবশ্য অষ্ট্রিয়াকে জার্মানী হতে বিতাড়িত করতেই হবে।

ব্যর্থতার কারণঃ ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টে সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে মতবিরোধ ছিল। ভাবী ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর শাসনব্যবস্থা কিরূপ হবে এটাই একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকদের বিরোধিতা। তৃতীয়ত, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবিরা আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং শহরাঞ্চলের জনসাধারণ যোগ দেয়। কৃষকরা বিশেষ আগ্রহ দেখাল না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিকট প্রাচ্য সমস্যা (১৮১৫—১৮৯০)

Q. 1. What do you mean by the Eastern Question? What was its nature during the 18th and the 19th centuries?

Ans. ইউরোপের পূর্ব-দিগ্‌বর্তী বিশেষ করে তুর্কীদের অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে যে জটিল রাজনীতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল সেটিকে ইউরোপীয় ইতিহাসে **'নিকট প্রাচ্য সমস্যা'** বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব নিকট প্রাচ্য সমস্যা একান্ত ভাবে ইউরোপের সমস্যা। আমাদের নিকট এটি নিকট প্রাচ্য সমস্যা নয়; কারণ ইউরোপীয়দের নিকট যেটি নিকট প্রাচ্য আমাদের নিকট সেটি পশ্চিমী দেশ।

ক্ষীয়মান তুরস্ক সাম্রাজ্যের অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অধঃপতন আধুনিক যুগের নিকট প্রাচ্য সমস্যার মূল কারণ। আর তুরস্কের এই অধঃপতনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে স্বার্থসংঘাত দেখা দেয় এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার উদয় হল তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলেই নিকট প্রাচ্য সমস্যার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটল।

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত তুর্কীরা এককালে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। এটিকে অটোম্যান সাম্রাজ্য বলা হত। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে মিশর, ট্রিপলি প্রভৃতি অঞ্চল ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বিস্তীর্ণ আরব ভূভাগ এবং টিউনিস, আলজেরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এছাড়া ইউরোপের বল্কান অঞ্চল এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

বিরাট অটোম্যান সাম্রাজ্যের ঐক্য বলে কিছু ছিল না। বহু জাতি ভিত্তিক এই সাম্রাজ্যের পরতে পরতে যখন ঘুণ ধরল তখনই ইউরোপের নিকট প্রাচ্য সমস্যা দেখা দিল। এই সমস্যাটিকে অল্প কথায় বলা যায় 'তুরস্কের ভাগ্যে কি ঘটবে'?

সতের শতক হতেই তুরস্কের ক্ষমতা কমতে শুরু করে, কারণ তুরস্কের শক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল মিথ্যা ভিত্তির ওপর। জাতি-ধর্ম ও ভাষার দিক হতে তুর্কীদের সাথে ইউরোপীয়দের কোন মিলই ছিল না। এ কারণে ইউরোপীয় প্রজাদের সাথে তাদের সম্পর্ক বরাবরই তিক্ত ছিল। তুর্কীদের শাসন পরিচালনায় যেমন দক্ষতা ছিল না। তাদের নির্ভর করতে হত খৃষ্টান প্রজাদের ওপরই। আর শাসন পরিচালনা ছিল যেন একটা এলোমেলো ব্যবস্থা—রাজ প্রাসাদের পোষ্যরাই এটা চালাত। 'পাশা' নামে

অভিহিত প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার ফলে প্রায় স্বাধীন শাসক হয়ে উঠত।

তুর্কী সুলতানের ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি ছিল তাঁদের নিজস্ব 'জেনিসারী' বাহিনী। খৃষ্টান প্রজাদের শিশুকালে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে এই বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। কালক্রমে এই জেনিসারী বাহিনী সাম্রাজ্যের হর্তাকর্তা হয়ে ওঠে। এমন কি সুলতানদের সিংহাসনে বসান ও সরান এই বাহিনীর ওপর নির্ভর করত।

তুর্কী সাম্রাজ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন অধিকার ছিল না; তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কঠোর হস্তে দমন করা হত।

এই সাম্রাজ্যের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা ছিল মধ্য-যুগীয়। ইউরোপের নবজাগৃতির ফলে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায় তার সাথে তুর্কী সাম্রাজ্য তাল রাখতে পারল না। ব্যবসা-বাণিজ্যেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র হতে তুর্কীরা হটে গেল। তুর্কী সাম্রাজ্যে কৃষকদের অবস্থা বড়ই সঙ্গীন ছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তুর্কী সাম্রাজ্য দেউলিয়া হল। রক্ষণশীলতাব অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে কোন পরিবর্তনই তারা পছন্দ করল না।

তুর্কী সাম্রাজ্যের যখন এরূপ অবস্থা, ঠিক সেই সময়ই তুর্কী সাম্রাজ্যের চারদিকে কয়েকটি ক্ষমতাশালী বাষ্ট্রেব আবির্ভাব ঘটে। এই রাষ্ট্রগুলি সম্প্রসাবণ নীতি গ্রহণ করে এবং দুর্বল তুর্কী সাম্রাজ্যকেই তাদের সম্প্রসারণ নীতির প্রধান স্থল বলে গণ্য করে; অতএব এর ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ দেখা দিল এবং নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সৃষ্টি হল।

আঠারো শতকে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা: আঠারো শতকের নিকট-প্রাচ্য সমস্যা বিশেষ জটিল ছিল না। এই শতকেব নিকট-প্রাচ্য সমস্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যেব প্রতি রাশিয়াব আক্রমণাত্মক মনোভাব। স্বাভাবিক ভাবেই তুরস্ক ছিল রাশিয়ার শত্রু। কারণ রাশিয়া কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চাইল। ফলে তুরস্কের সাথে তার যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। রাশিয়া এই অঞ্চল হতে তুর্কী শক্তিকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর হল। তাছাড়া রাশিয়া গ্রীক চার্চের রক্ষক হিসেবে নিজেকে প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনে করল। তুর্কী সাম্রাজ্যের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ অনেকটা ধর্মযুদ্ধের রঙ নেয়।

রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি

রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথাবিন দি গ্রেট যখন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করে রাশিয়ার অধিকার বিস্তার নীতি গ্রহণ করলেন তখন ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে দাঁড় করাবার চেষ্টা করে।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শুরু হল। আভ্যন্তরীণ সংকটে জর্জরিত ফ্রান্স কিন্তু তুরস্ককে বিশেষ সাহায্য করতে পারল না। যুদ্ধ হওয়ার এক বছরের মধ্যেই রাশিয়া মোলডাভিয়া, ওয়ালাসিয়া, আজভ প্রভৃতি অঞ্চল হতে তুর্কীদের বিতাড়িত করল। প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া এতে ভীত হ'ল এবং রাশিয়াকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। অবশেষে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে **কুস্থক কৈনার্জীর** (Kutchuk Kainardji) সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই সন্ধির ফলে রাশিয়া কৃষ্ণসাগরে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেল। ক্রিমিয়া অঞ্চল রাশিয়ার ভবিষ্যৎ গ্রাসের জন্য তৈরী করা হল। প্রণালীগুলির মধ্য দিয়ে ভূমধ্য-সাগরে জাহাজ পাঠাবার অধিকার রাশিয়া পেল। তাছাড়া রাশিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের গ্রীকচার্চ অনুগামীদের অভিভাবকত্ব লাভ করল।

বিভিন্ন সময়ে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ

কুস্থক-কৈনার্জীর সন্ধি (১৭৭৪)

এই চুক্তি তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জয়যাত্রার একটি উল্লেখযোগ্য পদচিহ্ন। এরপর ক্যাথারিন অষ্ট্রিয়া সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ইউরোপীয় তুর্কী সাম্রাজ্য ভাগাভাগির পরিকল্পনা করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাথারিন ক্রিমিয়া দখল করে নেন। দুর্বল তুরস্ক এব বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না। ক্রিমিয়ার অন্তর্গত সেবাস্তোপোলে রাশিয়া এক শক্তিশালী নৌঘাটি স্থাপন করল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অষ্ট্রিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাশিয়াব পক্ষ নিল। রাশিয়া ওচাকফ আক্রমণ করে দখল করে নিল। যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়া অবশ্য বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড তুরস্কের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। এমন কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইংল্যাণ্ডের এই মনোভাব পরবর্তীকালে নিকট-প্রাচ্য সমস্যাকে আবও জটিল কবে তোলে। এই সমস্যা যে বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গুরুতর বিবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, সেটা এই যুদ্ধে স্পষ্টভাবে বোঝা গেল এবং এই সমস্যা নিয়ে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার দীর্ঘকালীন সংঘর্ষ শুরু হল। এখন হতে ইংল্যাণ্ড নিজেকে তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ড সত্তার প্রধান রক্ষক হিসেবে মনে করল।

দ্বিতীয় রুশ-তুর্কী যুদ্ধ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে **জ্যাসির** সন্ধি দ্বারা থামল এবং এই সন্ধিতে তুরস্ক ক্রিমিয়া ও ওচাকফের ওপর রাশিয়ার অধিকার মেনে নিল। এবং এর সাথে সাথে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার একটি পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

জ্যাসির সন্ধি (১৭৯২)

উনিশ শতকে নিকট প্রাচ্য সমস্যা : উনিশ শতকে নিকট প্রাচ্য সমস্যা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। এই সময়ে এই সমস্যার তিনটি নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। (ক) তুরস্ক সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা এবং শক্তিশালী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এই অঞ্চল সম্বন্ধে আগ্রহী হওয়া। নেপোলিয়নই প্রথম এই অঞ্চলের প্রতি আগ্রহী হন তাঁর পতনের পর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নজর এদিকে পড়ে এবং এই অঞ্চলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ যে বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে সে সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়। (খ) তুর্কী সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে স্বার্থসংঘাত দেখা দেয়। এই অঞ্চলে রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতিতে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়া নিজনিজ স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব স্থাপিত হলে ইংল্যাণ্ডের প্রাচ্য দেশীয় সাম্রাজ্যের ক্ষতি হতে পারে বলে ইংল্যাণ্ড তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করে রাশিয়ার অগ্রগতি রোধ করবাব জন্য দৃঢ প্রতিজ্ঞ হল। ফলে ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র নীতিতে রুশভীতি একটি বিশিষ্ট স্থান পেল। অস্ট্রিয়া তার বহু জাতি ভিত্তিক সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য রাশিয়ার সর্বনাশা (অস্ট্রিয়ার পক্ষে) স্লাভ নীতিতে সন্ত্রস্ত হল। তাছাড়া, এই অঞ্চলে রাশিয়া বা ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা অস্ট্রিয়ার স্বার্থ গভীর ও ব্যাপক ছিল। দানিয়ুব নদীর মোহনা পর্যন্ত বাশিয়াব সম্প্রসারণ ঘটলে জলপথে অস্ট্রিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হবার আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় ছিল। সুতরাং রাশিয়ার বলকান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের সাথে একদিকে অস্ট্রিয়াব যেমন বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত ছিল, অপরদিকে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্লাভরা রাশিয়ার প্যানস্লাভ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবার সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় রইল। আর এটা দেখা দিলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বলে অস্ট্রিয়ার শাসকবর্গ মনে করল। এ কারণে অস্ট্রিয়া বলকান অঞ্চলে স্থিতাবস্থার নীতি মেনে চলার পক্ষপাতী ছিল। ফ্রান্স এবং জার্মানী নিজ নিজ বাণিজ্যিক স্বার্থ যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখল। বাণিজ্যিক স্বার্থের খাতিরে ফ্রান্স কখনো তুরস্ক সুলতানের শাসনের বিরোধিতা করেছে, কখনো বা তার পক্ষ অবলম্বন করে বাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও করতে দ্বিধা করেনি। অবশ্য ফ্রান্সের বাণিজ্যিক স্বার্থের সাথে তার মর্যাদার প্রশ্নও জড়িয়ে ছিল। জার্মানী এ অঞ্চল সম্বন্ধে প্রথমে আগ্রহী ছিল না। উনিশ শতকের শেষ দশকে সে এই অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পডে এবং অস্ট্রিয়াব সাথে গাঁটছড়া বাঁধল। (গ) জাতীয়তা-বাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বলকান অঞ্চলের খৃষ্টান অধিবাসীদের তুর্কী শাসনের নাগপাশ হতে মুক্তি পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা এই সমস্যাকে জটিলতর করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুরস্কের অধীনে খৃষ্টানদের মৃতপ্রায় জাতি বলে মনে করা হত।

কারণ তারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ করেনি। তারা তুর্কীদের ঘৃণা করত সত্য কিন্তু মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে সাহসী হয়নি। কিন্তু হঠাৎ উনিশ শতকে এ মৃতপ্রায় জাতি জাতীয়তাবাদের সঞ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকল।

উনিশ শতকের নিকট প্রাচ্য সমস্যা এতই জটিল ছিল যে একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন যে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এই প্রশ্ন মানবজাতিকে ভাবিত রাখবে। উনিশ শতকে এই সমস্যা কোন একটি নির্দিষ্ট নীতি বা পন্থা অনুসরণ করে চলেনি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে, এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কখনো ধর্মকে কেন্দ্র করে, কখনো ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে, কখনো শক্তিসাম্য রক্ষা করার অজুহাতে বা কখনো বলকান জাতিগুলির পরস্পর স্বার্থ সংঘাতের ফলে নিকট প্রাচ্য সমস্যা যুদ্ধের পথে ইউরোপের দেশগুলিকে এগিয়ে দেয়। উনিশ শতকের নিকট প্রাচ্য সমস্যার প্রকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে লর্ড মর্লে লিখেছেন—*'The Eastern question may be described as a shifting, intractable and interwoven tangle of conflicting interests, rival peoples and antagonistic faiths'.*

Q. 2. Explain how Serbia achieved her self-Government.

Ans. উনিশ শতকের প্রথম দশকেই তুরস্ক সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে থাকে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মন্টেনিগ্রো দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামের পর স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সার্বিয়ায় তুর্কী বিরোধী বিদ্রোহ দেখা দেয়। সুলতান এই বিদ্রোহ দমন করবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৮১৩তে অবশ্য তুর্কী সুলতান পুনরায় সার্বিয়া অধিকার করতে সক্ষম হন। ১৮২০তে মিলোস অব্রেনোভিচের নায়কত্বে সার্বিয়া পুনরায় বিদ্রোহ করে। রাশিয়া বিদ্রোহীদের সাহায্য করে ফলে এই বিদ্রোহ দমন করা তুরস্কের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অবশেষে তুর্কী সুলতান সার্বিয়ার স্বায়ত্তশাসন মেনে নিতে বাধ্য হল। সার্বিয়ার অব্রেনোভিচ রাজা হলেন। তিনি এবং তাঁর উত্তরসূরীরা তুরস্ককে বার্ষিক কর দেবেন বলে ঠিক হয়। এই নতুন রাজ্যের রাজধানী হল বেলগ্রেড (আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী)। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এই ব্যবস্থা কে স্বীকার করে নেয়।

Q. 3. Write a note on Russo-Turkish War of 1812.

Ans. নেপোলিয়নের সাথে টিলসিটের সন্ধি স্থাপন করে রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে

বুখারেস্টের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে বেসারাবিয়া রাশিয়ার অধিকারে চলে যায় এবং রুশ সাম্রাজ্য প্রুথ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ভিয়েনা সম্মেলন পূর্বাঞ্চলে রাশিয়ার এই অগ্রগতি মেনে নেয়।

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ (১৮১২)

Q. 4. Explain how Greece achieved her independence. Analyse the significance of the independence of Greece.

Ans. উনিশ শতকের নিকট-প্রাচ্য সমস্যার দ্বিতীয় অধ্যায় গ্রীসের স্বাধীনতা-আন্দোলন দ্বারা শুরু হয়। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাও সংস্কৃতির জন্মদাত্রী গ্রীস নানাকারণে তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

গ্রীকদের বিদ্রোহের কারণ: কিন্তু তুর্কী সুলতানের অধীনে থাকলেও গ্রীকগণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। তারা ধর্মপালনের যেরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত সেরূপ ক্যাথলিকগণ ওই সময় ইংলণ্ডে পেত না। তুর্কী সাম্রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যে তাদের প্রায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। দেশের সরকারী দপ্তরে বড় বড চাকুরীতে গ্রীকরাই নিযুক্ত হত। এর ফলে গ্রীসে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। আর এই শ্রেণীর মধ্যে খুব সহজে ফরাসী বিপ্লবের চিরন্তন বাণী সঞ্চারিত হল। অতএব শাসনের অধীনে ছিল বলেই গ্রীকরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হল। তারা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করল। এ ছাড়া, এই সময় গ্রীকরা তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজাগ হল এবং তাদের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উদগ্রীব হল। প্রখ্যাত গ্রীক মনীষী **করাইস** (Korais) গ্রীকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবোধের প্রসার ঘটান। তিনি গ্রীক সংস্কৃতিতে নবজাগরণের সূচনা করলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ভাবধারাকে কাজে লাগালেন রিগাস। তিনি ফরাসী বিপ্লব প্রসূত ভাবধারার সম্বন্ধে গ্রীকদের অবহিত করেন এবং স্বাধীনতা যে মানুষের জন্মগত অধিকার সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন করলেন। সমগ্র গ্রীসে অসংখ্য গুপ্ত সমিতি স্থাপনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তুর্কী শাসনের অবসান ঘটানই এইসব সমিতিগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল।

ঘটনা: ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীক স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। আলেকজাণ্ডার ইপসিল্যান্টির নেতৃত্বে রুমানিয়ায় এই বিদ্রোহ প্রথমে দেখা দিল। কিন্তু এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হল। গ্রীসের বিভিন্ন প্রদেশে গ্রীকরা আন্দোলন

আরম্ভ করল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীকরা তুরস্কের বিরুদ্ধে এককভাবে যুদ্ধ করে। ইউরোপের কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র তাদের সাহায্য করতে অগ্রসর হয় নি। মেটারনিক গ্রীকদের এই বিদ্রোহ ভাল চোখে দেখলেন না এবং এটি ধ্বংস করতেও উদ্যত হলেন। এই সময় অবশ্য সমগ্র ইউরোপে গ্রীকপ্রীতি প্রবল হয়ে ওঠে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জনসাধারণ গ্রীকদের সাহায্য করতে অগ্রসর হল। ইংরেজ কবি বায়রন গ্রীকদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এর মধ্যে গ্রীকবা তুরস্কের শক্তির সাথে পেরে উঠছিল না। মোরিয়া নামক স্থানে গ্রীকরা মুসলমান নরনারীদের হত্যা করল। এব প্রতিশোধে মুসলমানেরা থেসালি ও ম্যাসিডনে গ্রীকদের নৃশংসভাবে হত্যা করল। এই সময় তুরস্কের সুলতান গ্রীকদেব সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবার জন্য মিশরের শাসনকর্তা মহম্মদ আলীর সাহায্য চাইলেন। মহম্মদ আলীর সাহায্যে তুরস্ক যখন এথেন্স দখল করল তখন গ্রীকদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে উঠল।

১৮২৪ হতে ১৮২৭-খৃঃ মধ্যে মহম্মদ আলীব সৈন্যদল গ্রীকদের পরাজিত করে অধিকৃত অঞ্চলে সন্ত্রাস শাসন শুরু করল। হাজার হাজার গ্রীক প্রত্যহ হত্যা হতে থাকল। এই অবস্থায় ইউরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হল। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিগুলি এতদিন গ্রীক স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্বন্ধে মনস্থির করে উঠতে পারেনি। মেটারনিকের নিকট এই স্বাধীনতা সংগ্রাম আইনানুগ সরকাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি অষ্ট্রিয়ার স্বার্থের জন্য গ্রীকদের এই অভ্যুত্থান ধ্বংস করবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু গ্রীকদের আর বেশিদিন তুর্কী-মিশরীয় অত্যাচার সহ্য করতে হল না। ইতিমধ্যে রাশিয়ার সিংহাসনে দুর্বলমনা প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর লৌহহৃদয় জার প্রথম নিকোলাস বসেছেন। তিনি গ্রীকদের সংগ্রামের প্রতি প্রথম হতেই সহানুভূতি দেখালেন এবং এবিষয়ে একতরফা কাজ করবেন বলে অপরাপর ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে ভয় দেখালেন। ইংরেজ সরকার এতে ভীত হল। কারণ রাশিয়া গ্রীকদের সাহায্য করলে এই অঞ্চলে রুশ প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, ইংরেজদের তাতে ক্ষতি হতে পারে। নতুন বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যানিং গ্রীক স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিও সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি সুপ্রাচীন গ্রীক সভ্যতাকে তুর্কী দস্যুদের হাত হতে কিভাবে বাঁচান যায় সে নিয়ে চিন্তা করলেন। অবশেষে ইংল্যাণ্ড, ও রাশিয়া ১৮২৬-এ প্রোটোকল অব পেট্রোগার্ড নামক ঘোষণায় গ্রীসে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের জন্য তুর্কী সুলতানকে অনুরোধ জানাল। তুর্কী সুলতান এটি গ্রাহ্য করল না।

ফলে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া একযোগে গ্রীসের সাথে অবিলম্বে শান্তিস্থাপনের কথাবার্তা বলতে তুরস্কের সুলতানকে নির্দেশ দিল এবং নিজেদের মধ্যে লণ্ডনের চুক্তি নামে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে ঠিক করল যে তুরস্কের সুলতান তাদের নির্দেশ না মানলে সামরিক শক্তির সাহায্যে তাকে বাধ্য করা হবে। তুর্কী সুলতান এই তিন শক্তির নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সম্মিলিত নৌ-বাহিনী **ন্যাভারিনোর** (১৮২৭) জলযুদ্ধে তুরস্ক ও মিশরের সম্মিলিত নৌ-বাহিনীকে ধ্বংস করল। এই পরাজয়ের পরও সুলতান গ্রীকদের স্বাধীনতা স্বীকার করতে রাজী হলেন না। বরঞ্চ গ্রীকদের ওপর আরও বেশি করে অত্যাচার চালাতে লাগলেন। এদিকে ইংল্যাণ্ডের টোরী মন্ত্রিসভা পূর্বেকার নীতিতে ফিরে গেল। প্রধান মন্ত্রী ওয়েলিংটন নাভারিনোর ঘটনাকে দুঃখজনক বলে বর্ণনা করলেন এবং গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম হতে ইংল্যাণ্ড হাত গুটিয়ে নিল। ইংল্যাণ্ডের দেখাদেখি ফ্রান্সও সরে গেল। তখন রাশিয়া এককভাবে গ্রীকদের সাহায্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তুরস্ক সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হ'ল এবং **এড্রিয়ানোপোল**-এর সন্ধির দ্বারা (১৮২৯) গ্রীসের মধ্যভাগ ও দক্ষিণাংশের স্বাধীনতা স্বীকার করল। তখনো কিন্তু থেস্যালী, এপিরাস ও ক্রীট সহ প্রাচীন গ্রীসের এক বিরাট অংশ তুর্কীদের অধিকারে থেকে গেল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি গ্রীস দেশের স্বাধীনতা যাতে বজায় থাকে তার জন্য সচেষ্ট হল।

লর্ড পামারস্টোন ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হবার ফলে গ্রীকদের কিছুটা সুবিধা হল। তিনি একদিকে গ্রীকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন অপরদিকে বল্কান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব যাতে বৃদ্ধি না পায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। গ্রীসের স্বাধীনতার সংগ্রামে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা দূর করবার জন্য তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গ্রীক-সমস্যা সমাধানের জন্য লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকলেন। এই বৈঠকে গ্রীসের সীমানা নির্ধারিত হল এবং তার পূর্ণ স্বাধীনতা ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র মেনে নিল এবং গ্রীসের স্বাধীনতা ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের সম্মিলিত রক্ষা শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। গ্রীসে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল ও তাৎপর্য ঃ গ্রীসের স্বাধীনতার সংগ্রাম ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর দ্বারা জাতীয়তাবাদের জয় সূচিত হল। ভিয়েনা কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদ অবহেলিত হয়েছিল। কনসার্ট অব ইউরোপ জাতীয়তাবাদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু এটিকে ধ্বংস করা যে যায় না গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাই প্রমাণ করল।

অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ১৬৯৯-১৯১৪
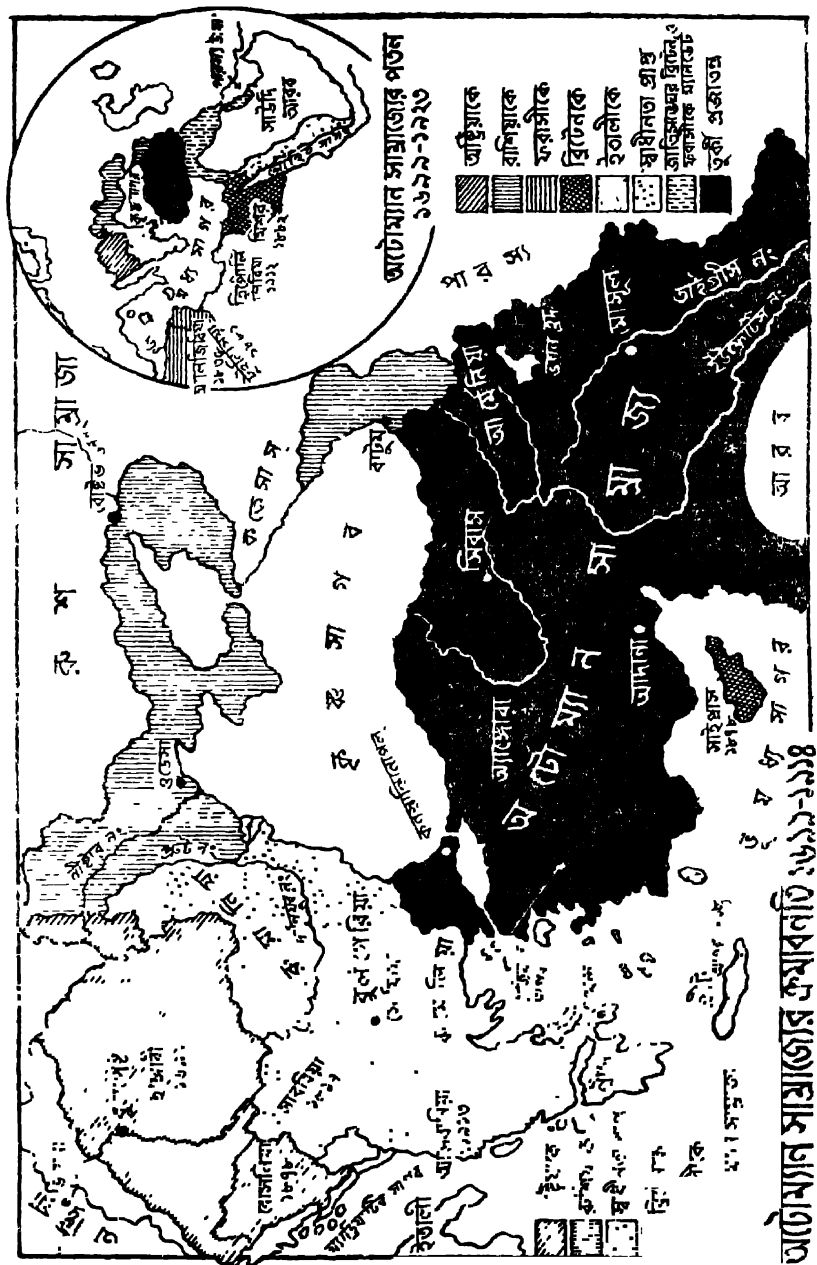
গ্রীস স্বাধীন হবার ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনার ইচ্ছা প্রবল হল। ফলে বল্কান অঞ্চলে তুর্কী বিরোধী আন্দোলন তীব্র হতে থাকল। এর ফলে ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হল।

রাশিয়া এককভাবে বিপদের সময় গ্রীকদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল বলেই গ্রীকরা স্বাধীন জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পেল। এই ঘটনা বল্কান অঞ্চলের জনসাধারণ ভুলতে পারল না। ফলে এই অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব শত বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাড়তির পথেই থাকল।

ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে বল্কান অঞ্চলের জনসাধারণ বীতশ্রদ্ধ হল। ইংল্যাণ্ড দু নৌকায় পা দিল। কখনো তুরস্কের সুলতানকে সাহায্য করল কখনো নির্যাতিত খৃষ্টানদের পক্ষে কথা বলল। এই দুমুখো নীতি ইংল্যাণ্ডের ক্ষতিই করেছিল।

গ্রীসের স্বাধীনতার সংগ্রাম নিকট-প্রাচ্য সমস্যা যে কত জটিল তার কিছুটা বোঝা গেল।

বল্কান অঞ্চলে ভবিষ্যতে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের স্বার্থ-সংঘাত কিভাবে দেখা দিতে পারে তার আভাস পাওয়া গেল। তুর্কী সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে মৌলিক মতভেদ দেখা দেবে তারও ইংগিত এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ফুটে ওঠে।

তুর্কী সাম্রাজ্য কতটা অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে তাও প্রমাণিত হল এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। তুরস্কের সুলতান মিশরের সাহায্য নিয়ে গ্রীকদের বিদ্রোহ দমন করতে যান এবং রাশিয়াব হাতে পরাজিত হন। এর ফলে আর যাই হক, তুরস্কের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও সামরিক শক্তিহীনতা সকলের নিকট ধরা পড়ল। ফলে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করল।

গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে গ্রীকপ্রীতি ও রোমান্টিক ভাবধারাকে উদ্দীপিত করল। রোমান্টিক কবি ও সাহিত্যিকরা বিপ্লবীদের সাথে সম-মনা হলেন। এই সংগ্রাম আবেগ-অনুভূতি ভিত্তিক রোমান্টিক আন্দোলনকে জোরদার করল। ফলে ইউরোপীয় ভাবমানসে মধ্যযুগীয় ধর্মযুদ্ধের (ক্রুসেডের) অন্তর্নিহিত আদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটল এবং খৃষ্টান জগতের ঐক্য চেতনার পুনরাবির্ভাব হ'ল। পোপ এবং অষ্টাদশ লুই অর্থ দিয়ে গ্রীক বিদ্রোহীদের সাহায্য করলেন। প্রত্যেক দেশেই গ্রীকদের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হল। রোমান্টিক লেখক গোষ্ঠী তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে গ্রীকদের সাহায্য করতে মনস্থ করলেন। ফ্রান্সের চাটুব্রিয়াঁ ও

ও ভিক্টর হুগো, ইংল্যাণ্ডে শেলী ও বায়রন গ্রীকদের সংগ্রামকে ইউরোপীয়দের সংগ্রামে পরিণত করতে চেষ্টা করলেন। শেলী লিখলেন 'আমরা সকলেই গ্রীক' (We are all Greeks)। কবি বায়রন গ্রীকদের সাহায্য করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করলেন। সুতরাং গ্রীক স্বাধীনতা সংগ্রাম ইউরোপে এমন একটি ভাবধারা সৃষ্টি করল যে ভাবধারা জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিবাদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখল এবং ভিয়েনা ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরোধিতা করতে থাকল।

Q. 5. Briefly describe the main features of the Eastern Question during the period 1815-1854. *Or*, **Who was Memet Ali? Write what you know about his relations with the Sultan of Turkey.**

মহম্মদ আলী : গ্রীক সংগ্রামের সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয় মহম্মদ আলীর সমস্যা। মহম্মদ আলি ছিলেন মিশরের পাশা বা গভর্নর। পাশা হিসেবে তিনি তুরস্কের সুলতানের অধীন হলেও কার্যতঃ তিনি স্বাধীন সুলতানের মত মিশর শাসন করতেন।

মহম্মদ আলীর তুরস্ক আক্রমণ ও তার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

গ্রীক স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি সুলতানকে গ্রীকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন এবং এই সাহায্যের প্রতিদান হিসেবে ক্রীট দ্বীপ পান। এতে কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্যালেস্টাইন ও এশিয়া মাইনর দাবী করেন এবং তার এই উচ্চাভিলাষ নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। মহম্মদ আলী সুলতানের অধীনস্থ পাশা হয়েও তুরস্ক সুলতানের অধীন প্যালেস্টাইন আক্রমণ করেন এবং সিরিয়ার রাজধানী পর্যন্ত দখল করে নিলেন। তাঁকে বাধা দেবার ক্ষমতা সুলতানের ছিল না। অতএব তিনি বাধ্য হয়ে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট সাহায্য চাইলেন, এবং একমাত্র রাশিয়া তাঁকে সাহায্য করতে সম্মত হল। সুলতান বাধ্য হয়েই রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করলেন। এই ঘটনায় রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনায় ইংল্যাণ্ড প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি ভীত হল এবং আপস মীমাংসার জন্য চেষ্টা করতে থাকল। অবশেষে ইংল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের চাপে পড়ে সুলতানকে গ্রীক সংগ্রামে সাহায্যের প্রতিদান হিসেবে মহম্মদ আলীকে

রাশিয়ার সাহায্যের মূল্য

সিরিয়া ছেড়ে দিতে হল। এইবার রাশিয়া তার সাহায্যের পুরস্কার দাবি করল। সুলতান রাশিয়ার দাবি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ফলে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সুলতানের সাথে উন্‌কেয়ার স্কেলেসী (Unkair Skelissi) চুক্তির দ্বারা ঠিক হয় যে দার্দেনেলিস প্রণালীতে রুশ জাহাজ

অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। যুদ্ধকালে রুশ জাহাজ ভিন্ন অন্য কারও জাহাজ এই প্রণালী দিয়ে যেতে পারবে না। সংক্ষেপে এই চুক্তির বলে রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরকে প্রায় রুশ হ্রদে পরিণত করবার সুযোগ পেল। স্বভাবতঃই এতে ইংল্যাণ্ড ও অপরাপর রাষ্ট্রবর্গ চিন্তিত হল এবং রাশিয়ার এই প্রতিপত্তি নষ্ট করবার অপেক্ষায় রইল।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ও মহম্মদ আলীর মধ্যে নতুন কলহের সূত্র ধরে এই সুযোগ এল। তুর্কী সুলতান সিরিয়া ছেড়ে দিলেও, তিনি সিরিয়া পুনরুদ্ধার করবার চেষ্টা করলে এই কলহের সৃষ্টি হল। ফ্রান্স এইবার মিশরের দাবি সমর্থন করল। কিন্তু ইংল্যাণ্ড সুলতানের পক্ষ নিল এবং অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সাহায্যে লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিতে মহম্মদ আলীকে কেবল মাত্র মিশরের পাশা বলে স্বীকার করা হল এবং উন্‌কেয়ার স্কেলেসীর চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া যেসব সুবিধা লাভ করেছিল সেগুলি নাকচ করা হল। অবশ্য বৃহৎ শক্তিগুলি তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা স্বীকার করে নিল। এই চুক্তিতে ইংল্যাণ্ডের কূটনৈতিক জয় সূচিত হয়। একদিকে যেমন কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার আধিপত্য রুদ্ধ করা হল, অপরদিকে নিকট প্রাচ্যে ফ্রান্সের প্রভাব বিস্তারে বাধা দেওয়া সম্ভব হল।

ইংল্যাণ্ডের হস্তক্ষেপ ও লণ্ডন চুক্তি (১৮৪০)

Q. 6. What were the causes and effects of the Crimean War ? What was its importance. *Or*, Discuss the significance of the Crimean War.

Ans. ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-'৫৬) : প্রায় দুশো বছর ধরে প্রতি ২০ বছর অন্তর রাশিয়া এবং তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ ঘটেছিল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধল সেটি হচ্ছে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে নবম যুদ্ধ। কিন্তু এই যুদ্ধটি পূর্বেকার যুদ্ধগুলি হতে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। এই যুদ্ধে তুরস্ক গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জার নিকোলাসকে নির্বান্ধব অবস্থায় এই সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। এমন কি যে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে তিনি ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৪৮) হাত হতে রক্ষা করেন সেই অকৃতজ্ঞ সম্রাট জার নিকোলাসকে কোনরূপ সাহায্য করলেন না। সংক্ষেপে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ মুসলমান সুলতানের পক্ষ নিয়ে খৃশ্চান জারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হল। এর পূর্বে তুরস্ক রাশিয়ার

ভূমিকা

বিরুদ্ধে কখনো এরূপ সামরিক এবং কূটনৈতিক সাহায্য পায়নি। পূর্বে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের বিরুদ্ধেই ছিল।

১৮৪০-৪১-এ বসফোরাস প্রণালীটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করে এবং ইউরোপের পাঁচটি রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে এটিকে আনা হল। নিকোলাস ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এটিকে সহজেই মেনে নিলেন। কারণ তাঁরা বুঝতে পারলেন যে উনকেয়ার স্কেলেসি সন্ধির শর্তগুলি কার্যকরী করা সম্ভব নয়। ১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার কার্যাবলী ইউরোপের তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলল কিন্তু সে অচিরেই বুঝতে পারল যে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার প্রশ্ন একটি ইউরোপীয় প্রশ্নে পরিণত হয়েছে এবং বৃটেন, ফ্রান্স প্রমুখ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের দিকে ঝুঁকেছে। তুরস্কের সাথে ইউরোপের এই নয়া সম্বন্ধ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হল। এবং এই যুদ্ধের গুরুত্ব এটির মধ্যেই রয়েছে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ: ঐতিহাসিকগণ নানারূপ কারণ উল্লেখ করে থাকেন। প্রথমতঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার সাথে ধর্মস্থানগুলির সংরক্ষণের প্রশ্ন নিয়ে বিবাদের মাধ্যমে নিজের সম্মান বাড়াতে চাইলেন এবং গ্রেটবৃটেন ও অষ্ট্রিয়াকে তাঁর দলে টেনে নিকোলাস প্রবর্তিত 'পবিত্র সংঘ' ভেঙে দিতে চাইলেন বা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ভিয়েনা ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের জন্য তিনি রাশিয়ার সাথে বিবাদ বাধাতে চাইলেন। দ্বিতীয়তঃ, কুচক্রী পামারষ্টোন ও ষ্টাটফোর্ড ডি র‍্যাডক্লিফের ইচ্ছার জন্য এটি দেখা দেয়। এই দুজন ইংল্যাণ্ডের এ্যাবাডিন মন্ত্রিসভায় শান্তি নীতি সহ্য করতে পারছিলেন না। এই সরকারকে অপদস্থ করবার জন্য তাঁরা অজ্ঞ অথচ যুদ্ধলিপ্সু জনসাধারণকে উত্তেজিত করলেন এবং ফ্রান্সের সাথে একজোটে একটা যুদ্ধ ঘটাতে চাইলেন। তৃতীয়তঃ, গ্রেটবৃটেন তুরস্ক সাম্রাজ্যে তার বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শিল্পে সংরক্ষণ নীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাশিয়াকে উচিত শিক্ষা দিতে চাইল বলে এই যুদ্ধ দেখা দিল। কিন্তু উপরিউক্ত অভিমতগুলিকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ বলা যায় না। যুদ্ধের আসল কারণ হল জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী রুশ বিরোধী তুরস্ক রাশিয়ার দাবিগুলি মানতে রাজি হল না কারণ সেগুলি তার সাম্রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করল। ফ্রান্স এবং গ্রেটবৃটেন তুরস্কের সাথে যোগ দিল, অষ্ট্রিয়াও এদের দিকে ঝুঁকে পড়ল কারণ এই ত্রিশক্তি রাশিয়াকে তার খুশীমত তুরস্কের বিরুদ্ধে কাজ করতে দিতে রাজি হল না। কারণ রাশিয়া এই সুযোগ পেলে এশিয়া মাইনর ও বল্কান অঞ্চলে রুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হত।

বিভিন্ন মত

মূল কারণ

পবিত্র স্থানের কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদঃ তুরস্কের ওপর রাশিয়ার দাবী শুরু হল ধর্মস্থানগুলির সংরক্ষণের প্রশ্ন নিয়ে। এই প্রশ্ন জটিল হল ফ্রান্সের নতুন রাজদূত লা ভ্যালেটের কনস্টান্টিনোপলে আসার পর। জেরুজালেম ও বেথলেহেমে ল্যাটিন খৃস্টান চার্চগুলির রক্ষক ছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ফলে এই চার্চগুলির পরিচালনায় ফ্রান্সের পক্ষ হতে গাফিলতি দেখা দেয়। ফলে এই চার্চগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাশিয়ার হাতে চলে যায়। লুই ফিলিপের আমল হতেই ফ্রান্স অবশ্য এই চার্চ-গুলির ওপব তার পূর্ব প্রভাব ফিরে পাবার চেষ্টা করে। লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ক্যাথলিকদের সন্তুষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন এবং এমন কি তিনি এর জন্য রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত হবার মনস্থও করলেন। তুরস্কের রাজধানীতেও ফরাসী ও রুশ কূটনীতিবিদদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। ১৮৫১তে মনে হল ফরাসীদের দাবিই মেনে নেওয়া হবে। এটি বুঝতে পেরে জার নিকোলাস তুরস্কের সুলতানকে ব্যক্তিগতভাবে জানালেন যে তিনি যেন পূর্ব অবস্থার কোন পরিবর্তন না করেন। সুলতান এটি গ্রাহ্য না করে ১৮৫২তে ফ্রান্সকে চিঠির মাধ্যমে জানালেন যে তার দাবি মেনে নিতে তিনি রাজি আছেন। সুলতান এটি মেনে নিলেও জেরুজালেমে এটি মানা হল না। ফলে নানারূপ রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হল। ফ্রান্স যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিল। রাশিয়া তুরস্ককে জানাল যে সে যদি পূর্ব অবস্থা চালু রাখে তা হলে রাশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করবে। ১৮৫৩-এর প্রথম হতেই জার নিকোলাস তুরস্কের বিরুদ্ধে কডা ব্যবস্থা গ্রহণ কবতে ইচ্ছুক হলেন। সুলতান তাঁব দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন সুতরাং তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবেই—এই হল নিকোলাসের মূল নীতি। ফলে ভীতত্রস্ত সুলতান ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকে পড়লেন; আবার ভীতিই তাঁকে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য করবে। নিকোলাস জানুয়ারী মাসেই তাঁর সৈন্য বাহিনীকে প্রস্তুত থাকবার নির্দেশ দিলেন এবং সেই সাথে সাথে সুলতানের নিকট এক বিশিষ্ট দূত পাঠালেন। এই দূত সুলতানের নিকট দাবি করল এই বলে যে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের কুচুক কৈনার্জির সন্ধির চার্চসম্বন্ধীয় শর্তগুলি পুরোপুরিভাবে তুরস্ককে মেনে চলতে হবে। এই সাথে সাথে নিকোলাস তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগ বাটোয়ারা করবার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা তৈরি করে গ্রেটবৃটেনের সম্মতির অপেক্ষায় রইলেন। এই সময় এবার্ডিন ছিলেন গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী, আর ক্লারেনডন ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তুরস্ক যখন বুঝতে পারল যে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড তাকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করবে তখন সে রাশিয়ার দাবিগুলি গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার মতিগতি বুঝে

ফ্রান্সের মনোভাব

ফরাসী নৌবাহিনী গ্রীসের স্যালামিশ নামক স্থানে পাঠালেন। ইংল্যাণ্ড নৌবাহিনী প্রেরণ করল না সত্য তবে ষ্টাটফোর্ড ডি র‍্যাডক্লিফকে বিশেষ দূত হিসেবে তুরস্কে পাঠালো। তিনি খুবই রুশ-বিরোধী ছিলেন এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্ককে ইংল্যাণ্ডের সাহায্য করা তার স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন।

১৮৫৩-এর এপ্রিল মাসে রাশিয়া ধর্মস্থান সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে একটি নক্সা প্রস্তাব তুরস্কের সুলতানের নিকট পেশ করল। এই প্রস্তাবে গোঁড়া খৃশ্চান চার্চের সর্ববিধ স্বাধীনতা তুরস্ক সরকারকে মেনে নিতে বলা হল। এই স্বাধীনতার আওতায় কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারই অন্তর্ভুক্ত করা হল না, ধর্মযাজকদের নাগরিক স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত করা হল। তুরস্ক রাশিয়ার এই প্রস্তাব মানতে রাজি হল না কারণ এটি তুরস্কের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যাবে। কারণ এটি মানলে অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়া তুরস্কে অবস্থিত সমস্ত গোড়া খৃশ্চানদের ওপর তার প্রভাব স্থাপনে উদ্যোগী হবে। তুরস্ক রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল রাশিয়া তুরস্কের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং ২৪শে জুন প্রুথ নদী অতিক্রম করবার জন্য তার সৈন্যদলকে নির্দেশ দিল। ইংরেজ ও ফরাসী সরকার নিজ নিজ নৌবাহিনী তুরস্ককে রক্ষা করার জন্য প্রেরণ করল। পামারষ্টোনের কথায় এর ফলেই যুদ্ধ অনিবার্য হল।

রাশিয়ার প্রস্তাব

কূটনৈতিক তৎপরতা: কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বাধল না। বৃটিশ ও ফরাসী সরকার ইতস্তত করতে লাগলেন। শক্তি বজায় রাখবার জন্য নানারূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হল কিন্তু কোনটিই কার্যকরী হল না। এগুলির মধ্যে ভিয়েনা এগ্রিমেণ্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াও এর দ্বারা ঠিক করল যে তুরস্কের সুলতান রাশিয়ার জারের নিকট যে প্রস্তাব পাঠাবেন তাতে এই রাষ্ট্র চারটির সম্মতি আছে। এই প্রস্তাবটি আসলে তৃতীয় নেপোলিয়নের তৈরি। এই প্রস্তাবে রাশিয়া ফ্রান্সের মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল তা দূর করার চেষ্টা করা হয় এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার কথাও বলা হয়। এই নোটটির গুরুত্ব রয়েছে এই কারণে যে চারটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমেই এটি তৈরী করা হয়েছিল এবং এটির দ্বারা প্রমাণিত হল যে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতার প্রশ্নটি একটি আন্তর্জাতিক প্রশ্ন। ভিয়েনা নোটের খসড়াটি নিকোলাসের নিকট যথাসময়ে পাঠান হল এবং তিনি এটি সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। কিন্তু তুরস্ক এই নোটটি অনিচ্ছার সাথে গ্রহণ করল। তুরস্কে তখন জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় মনোভাব বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে রাশিয়ার আক্রমণের

ভিয়েনা নোট

ফলে। চরমপন্থীরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাইছিল। গ্রেট বৃটেনের মন্ত্রিসভা ছাড়া জনসাধারণের রুশ-বিরোধী মনোভাব তুর্কী জনসাধারণকে উৎসাহিত করল। তুরস্ক সরকার নোটটি অগ্রাহ্য না করে এই নোটটির তিনটি পরিবর্তন দাবি করল। প্রশ্নটিতে বলা হল যে কুস্থক কৈনার্জির সন্ধি অনুসারে রাশিয়া ধর্ম ব্যাপারে যে সব সুযোগসুবিধা পেয়েছিল সেগুলি ছেড়ে দিতে হবে। তুর্কী সুলতানের প্রজাদের ওপর রাশিয়ার কোন প্রভাবই থাকতে পারবে না। ভিয়েনা নোটটি যদি অপরিবর্তিত থাকে তা হলে রাশিয়া এটি গ্রহণ করবে। কিন্তু তুরস্কের মতিগতি দেখে রাশিয়া আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করল। ফলে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের নীতি সমর্থন করল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ তে তুরস্কের সুলতান রাশিয়ার নিকট এই বলে এক চরম পত্র পাঠালেন যে বাশিয়া যদি পনের দিনের মধ্যে দানিয়ুব অঞ্চল ত্যাগ না করে তাহলে তুরস্ক যুদ্ধের পথই বেছে নেবে। বলাবাহুল্য রাশিয়া তুরস্কের চবমপত্র গ্রাহ্য করল না। ২১শে অক্টোবর তুরস্ক বাটুম অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু করল। তুরস্কের অনুরোধে বৃটিশ ও ফরাসী নৌবাহিনী দার্দেনেলিস প্রণালীব দিকে এগিয়ে গেল এবং কনস্টান্টিনোপলকে ঘিরে থাকল। অন্যদিকে বাশিয়া প্রথমে দানিয়ুব অতিক্রম কবল না তুবস্কই দানিয়ুব অঞ্চলে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করল এবং দুটি ছোটখাটো যুদ্ধে জয়ী হ'ল কিন্তু সিনোপের নিকট রাশিয়ার নৌবাহিনী তুরস্কের নৌবাহিনীকে ধ্বংস কবে দিল। এই নৌযুদ্ধেব খবর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে এক বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি করল। বৃটিশ জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাইল। এবং ১৮৫৪-এর মার্চ মাসে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধ দুবছর

যুদ্ধ শেষ

চলবার পর উভয় পক্ষই শান্তি চাইল। অষ্ট্রিয়া রাশিয়াকে চরম পত্র দেওয়ার ফলে রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হল। ইংল্যাণ্ড অবশ্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিল। ফ্রান্স সেবাস্তিপোলের পতনের পর আব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইল না। ফলে প্যারিসে শান্তি সম্মেলন ডাকা ঠিক হল। অষ্ট্রিয়া এবং পিডমণ্টও এতে যোগ দিল।

প্যারিসের সন্ধি: এই সন্ধি অনুসারে কৃষ্ণ সাগবকে সামরিক ঘাঁটিমুক্ত নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হল এবং স্থির হল যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের বাণিজ্য-

প্যারিসের সন্ধির শর্তগুলি

জাহাজ এই অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারবে। রাশিয়া এবং তুরস্ক কেউই এই অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি বা দুর্গ তৈরী করতে পারবে না। দানিয়ুবকে আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে ধরা হল। দার্দেনেলিস প্রণালী দিয়ে সব রাষ্ট্রের জাহাজই যাতায়াত করতে পারবে।

রাশিয়াকে তুর্কী সাম্রাজ্যের খৃষ্টান জনগণের রক্ষণাবেক্ষণের দাবি ত্যাগ করতে হল। ওয়ালাসিয়া ও মোলডাভিয়ার ওপর রুশ আধিপত্য দূর করা হল এবং দক্ষিণ বেসারাবিয়া তাকে ছেড়ে দিতে হল। তুর্কী সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্ব সম্মিলিত ভাবে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি গ্রহণ করল এবং তুরস্ককে ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোটের সদস্য করে নেওয়া হল।

ফলাফল যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল এরূপ (১) যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যা অধিক হয়েছিল। রাশিয়ার প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য হতাহত হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের ক্ষতিও বেশ হয়েছিল। তুরস্কের ক্ষতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। অধিকাংশের মতে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলে এত প্রাণহানি ঘটত না। এর ফলে গ্রেট বৃটেন তার সামরিক বিভাগে সংস্কার সাধন করল সামরিক চিকিৎসা বিভাগ এই সময় খোলা হয় এবং নতুন নতুন ঔষধের ব্যবহার শুরু হয়। আধুনিক ধাত্রীবৃত্তিও এই সময় হতে চালু হয়। যুদ্ধের ফলে যে অর্থ ঘাটতি হয়েছিল তা দূর করাব জন্য আয়ের ওপর কর ধার্য কবা হল এবং কালক্রমে প্রত্যেক সরকারেরই এটি একটি আয়ের ক্ষেত্র বলে মনে করা হ'ল। ফরাসী শাসন ব্যবস্থাতেও অনেক পবিবর্তন দেখা দিল।

প্রত্যক্ষ ফল

বৃটেন ও ফ্রান্সেব একজোটে তুবস্ককে সাহায্য করার ফলে তুরস্ক সম্বন্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির যেমন মনোভাবে পরিবর্তন এল, তেমনি তুরস্কের সুলতানও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সংস্কার সাধন করলেন। তুরস্কের পশ্চিমীকরণ নীতিও গৃহীত হল। যুদ্ধেব ফলে তুরস্কের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল তা দূর করবার জন্য তুরস্ক সরকার বিদেশী ঋণ গ্রহণ করলেন। ফলে বিদেশী ঋণ-দাতারা এবং রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেল।

প্যারিসে যে শান্তি বৈঠক বসল তাতে বৃটেন ও রাশিয়া ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। কারণ ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার ইতিমধ্যেই কিছুটা বন্ধুত্বের ভাব গড়ে উঠছিল। ভবিষ্যতে রাশিয়া যাতে তুবস্কের ওপর আব হামলা করতে না পারে তার জন্য বৃটেন বাশিয়ার ওপর কঠোর শর্ত আরোপ করতে চাইল। রাশিয়ার নিকট হতে দক্ষিণ বেসারাবিয়া তুরস্ক ফিরে পেল। প্যারিসের সন্ধির ফলে রাশিয়াকে দানিয়ুব নদীর উৎস হতে বেশ কিছুটা সরে আসতে হল। পামারস্টোন এটিকে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে মঙ্গলজনক বলে মনে করলেন। এই ব্যবস্থা অবশ্য বেশি দিন টেকেনি। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া এটি ভেঙে দেয়। দ্বিতীয়ত রাশিয়া তুরস্ক সুলতানের খৃষ্টান প্রজা ও ধর্মস্থানে তার পূর্ব অধিকার সমস্ত

রাশিয়াব দিক হতে

ত্যাগ করল। সমগ্র ইউরোপকে, কেবলমাত্র রাশিয়া নয়, গোড়া খৃষ্টানদের এবং রুমানিয়া প্রদেশের রক্ষক বলে স্বীকার করা হল। যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার ও দায়িত্ব নিল। বৃটেন, ফ্রান্স এবং অষ্ট্রিয়ার মধ্যে পৃথক একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হল যেটির দ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করলেন। তৃতীয়তঃ তুরস্কের ওপর রাশিয়ার নৌবলের প্রধান্য দূর করা হল এই হিসেবে যে কৃষ্ণ সাগরেব নিরপেক্ষতা ঘোষণা করা হল। এই অঞ্চলে রাশিয়া তাব নৌবাহিনী রাখতে বা সামরিক তৎপরতা চালাতে পারবে না। কৃষ্ণ সাগর আর রাশিয়ার লেক রইল না। এর দ্বারা রাশিয়ার সম্মানে খুবই আঘাত করা হল। পিটার দি গ্রেট ও ক্যাথারিনের জীবন-সাধনা নষ্ট হবার উপক্রম হল। পনের বছরের বেশি এই নিরপেক্ষতা রইল না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া সুযোগ বুঝে এটি ভেঙে দেয়।

রুমানিয়া সম্বন্ধেও পৃথক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তুরস্কের সুলতান তাঁব সাম্রাজ্যে বিভিন্ন সংস্কার সাধন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর মুসলমান ও খৃশ্চান প্রজাদেব মধ্যে বৈষম্যমূলক আইনকানুন বদ করা হল।

তুরস্কের দিক হতে

অষ্ট্রিয়াব দিক হতে দেখলে এই সন্ধিটি তার উৎফুল্লের কারণ হল না। দানিয়ুব অঞ্চলে তাব স্বার্থ এই সন্ধির দ্বাবা পুবোপুবিভাবে রক্ষিত হল না। ১৮৫৩তে প্রিনসিপ্যালিটিজ দুটি হতে তাকে সবে যেতে হল। বাশিয়াকে বেসাবেবিয়া ছেড়ে দিতে হওয়ায় অষ্ট্রিয়া খুশী হলেও এই অঞ্চলটি রুমানিয়া পায় এবং রুমানিয়ায় জাতীয়তাবাদ ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার হল এবং পরিশেষে অস্ট্রিয়ার শঙ্কাব কারণ হল।

অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া

প্রাশিয়ার দিক হতে দেখলে এ সন্ধি বিশেষ কিছু রদবদল হল না।

ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি হল সত্য কিন্তু স্থায়ী সুবিধা কিছু হল না। বৈঠকের সময় নেপোলিয়ন রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক নিবিড করবার জন্য চেষ্টা করেন এবং একই সাথে গ্রেট বৃটেনের সাথেও পূর্বেকার সম্বন্ধ বজায় বাখতে চাইলেন।

সন্ধিটি স্বাক্ষরিত হবার পব নেপোলিয়ন ও ক্লারেনডন কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে রাশিয়ার সাথে আলোচনা সুরু করলেন। এই সমস্যাগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ড সমস্যা প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন বলে নেপোলিয়ন ১৮৫৫তে অভিমত প্রকাশ করলেন। কিন্তু সন্ধি স্বাক্ষরিত হবাব পর তিনি পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে আর প্রশ্ন তুললেন না।

গ্রীস, রুমানিয়া পার্মা ও মডেনা সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হয় কিন্তু শেষ অবধি

নতুন কিছু করা হল না। সবশেষে ইটালির রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের প্রশ্ন ওঠে।

কূটনীতির ক্ষেত্রে : কূটনৈতিক ইতিহাসে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ দ্রাবকের কাজ করেছিল। এই যুদ্ধের পূর্বে কূটনীতির ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক বলে মনে করা হয়েছিল তা আর রইল না। রাশিয়ার সাথে অষ্ট্রিয়ার সহযোগিতা অসম্ভব বলে মনে হল। নিকোলাস ও নেসেলরোড যুদ্ধের পূর্বে রাশিয়ার সাথে অষ্ট্রিয়ার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব বলে মনে করতেন। এই যুদ্ধের সময় অষ্ট্রিয়ার কার্যকলাপ সেটি যে অসম্ভব তা প্রমাণ করে দিল। ইউরোপের রাজনীতিতে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার প্রভাব কমে গেল। রাশিয়া বা অষ্ট্রিয়াকে ইউরোপের রক্ষক হিসাবে কেউ মনে করল না। বরঞ্চ তাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সকলে অবহিত হল। অষ্ট্রিয়ার মত রাশিয়াও ফ্রান্সের সাথে মিতালি স্থাপনে তৎপর হল। তবে এর ফলে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের মত কূটনৈতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিল না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়াকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। যে প্রাশিয়াকে অষ্ট্রিয়া তার শত্রু বলে মনে করত সেই প্রাশিয়াই ১৮৫৯-এ অষ্ট্রিয়ার হয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী প্রস্তুত রাখল এবং অষ্ট্রিয়ার বন্ধু রূপে নিজেকে জাহির করল। রাশিয়ার পক্ষে ফ্রান্সের সাথে মিত্রতা বজায় রেখে চলতে অসুবিধা হল। নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষার চাহিদা রাশিয়ার পক্ষে মেটানো সম্ভব হল না। রাশিয়া অবশ্য প্রাশিয়ার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হল কারণ প্রাশিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় রুশবিরোধী কোন কার্য করেনি। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পোলিশ বিদ্রোহের দরুন রাশিয়ার সাথে ফ্রান্সের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবসান হল এবং রুশ প্রাশিয়া বন্ধুত্বের বুনিয়াদ গড়ে উঠল।

পরোক্ষ ফল

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও নিকট প্রাচ্য সমস্যা : ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট প্রাচ্য সমস্যাটিকে নতুন ভাবে রূপ দিল। এই যুদ্ধ তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন এবং খণ্ডীকরণের দিন পিছিয়ে দিল। তুরস্ক সাম্রাজ্য অটুট রাখবার জন্য শক্তিশালী ব্যবস্থা গৃহীত হল। ত্রিশক্তি চুক্তি এবং ফরাসী মিতালি এই সাম্রাজ্যের রক্ষা ব্যাপারে লৌহ প্রাচীরের ন্যায় কাজ করল। এই সমস্যা আর তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে সীমিত রইল না। যদিও পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বল্কান অঞ্চলের খৃষ্টানদের বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে সহানুভূতি দেখাবে। রুশ জনসাধারণের এই অঞ্চলের জনসাধারণের প্রতি ভ্রাতৃভাব জোরদার হবে সত্য, কিন্তু সেই সাথে রাশিয়াকে তার এই অঞ্চলের খৃষ্টানদের প্রতি পূর্ব মনোভাব পরিবর্তন করতে হয়। এই অঞ্চলের খৃষ্টানদের ওপর রাশিয়ার মোড়লি করা বন্ধ হয়ে গেল।

এই যুদ্ধের ফলে অবশ্য বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে স্বার্থ বিরোধ রয়ে গেল। বৃটেন রুশ বিরোধী নীতি মেনে চলল। কোন রাষ্ট্রই বিশ্বাস করত না যে এই চুক্তির শর্তগুলি টিকে থাকবে। রাশিয়া কৃষ্ণসাগর ও বেসারাবিয়া সম্পর্কের শর্ত ভেঙে ফেলতে তৎপর হল। প্রথম হতেই রাশিয়া এই সন্ধিটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে ঘোষণা করল। ইংল্যাণ্ড ও প্যারিস সন্ধির ওপর বিশ্বাস রাখতে পারল না এবং ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়াকে প্রকৃত মিত্র বলে মনে করতে পারল না। ফলে গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা টিকে রইল এবং ভবিষ্যতে নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধানে বৃটেনকে একাকী রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে উভয় সঙ্কটে পড়তে হল—রাশিয়ার বিরুদ্ধে গেলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাওয়া হবে, রাশিয়ার দাবী মেনে নিলে নিজের স্বার্থ হানি ঘটবে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর তুরস্ক আর কখনো এক সাথে বৃটেন ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার সাহায্য পাবে না। ভবিষ্যতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা নিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আলোচনা করবে, বৈঠক বসাবে সন্দেহ নেই তবে এই সব আলোচনার সকল উদ্দেশ্য হবে ইঙ্গ-রুশ মতবিরোধ বা রুশ-অষ্ট্রীয় মতবিরোধ দূর করা, যে দুটি বিরোধ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর বিশেষভাবে ফুটে ওঠে।

Q. 7. Give an account of the Eastern Question from the Crimean war to the Berlin congress. *Or,* **Discuss the significance of the Russo Turkish war of 1877.**

Ans. **ক্রিমিয়া যুদ্ধের পরবর্তীকালে নিকট প্রাচ্য সমস্যা** (১৮৫৬-১৮৭৮) : ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। এই যুদ্ধে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থের জন্য যোগদান করে। তুরস্কের অধীনে যে সকল খৃষ্টান জাতি ছিল তাদের মঙ্গলার্থে কিছুই করা হয় নি। এই জাতিগুলির মধ্যে **স্লাভগণই** শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। স্লাভগণ এই সময় স্বাধীনতার জন্য জলের ন্যায় রক্তক্ষয় করতেও দ্বিধা করল না। এর ফলে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা আরও জটিল হল।

বৈশিষ্ট্য

বল্‌কান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—রুমানিয়া : ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শেষে তুর্কী সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে গ্রীস, সার্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোকে মোটামুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখা যায়। মণ্টেনিগ্রো পুরোপুরি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এর পর মোলডাভিয়া ও ওয়ালাসিয়াকে যুক্ত করে একটি নতুন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এটির নাম হল রুমানিয়া। এ দুটি প্রদেশ নিজেদের একত্রিত করার চেষ্টা বহুদিন হতে করে

বল্‌কান রাজ্যগুলির সমস্যা

আসছিল। কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। তবুও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এদুটি প্রদেশের জনসাধারণের ঐকান্তিক চেষ্টায় সংযুক্তিকরণ সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং নতুন রাজ্য রুমানিয়ায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো প্রাশিয়ান যুদ্ধের সুযোগে রাশিয়া বল্কান অঞ্চলে নিজের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পুনরায় চেষ্টা চালাতে থাকে। রাশিয়া প্রথমেই ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্যারিসের সন্ধির শর্তগুলি ভেঙে দিয়ে কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে তার নৌশক্তি বৃদ্ধি করল। রাশিয়ার এই সন্ধিবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন রাষ্ট্রই বিশেষ প্রতিবাদ করল না।

বৃহৎ শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য

বোস্‌নিয়া, হারজেগোভিনা ও বুলগেরিয়াতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম : মোলডাভিয়া ও ওয়ালেসিয়ার এই সাফল্যে বোস্‌নিয়া ও হারজেগোভিনাতে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এই দুটি অঞ্চলে তুরস্ক তার শয়তানী শাসন নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছিল। প্যারিসের সন্ধিতে (১৮৫৬) খৃষ্টান প্রজাদের স্বার্থরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি তুরস্কের সুলতান দিয়েছিলেন তা পালন করলেন না। খৃষ্টানদের সম্মান, সম্পত্তি ও নিরাপত্তা তুর্কী শাসকদের ওপর নির্ভর করত। এই অসহনীয় অবস্থা হতে মুক্তি পাবার জন্য এই অঞ্চলের জনসাধারণ সংগ্রামের পথ বেছে নিল। রাশিয়াও তাদের সাহায্য করল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাতে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হল। এই বিদ্রোহ দাবাগ্নির ন্যায় বল্কান অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এদিকে বুলগেরিয়ার বিদ্রোহীরা কিছু সংখ্যক তুর্কী কর্মচারীকে হত্যা করলে সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে বুলগেরীয়দের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করলেন। বুলগেরিয়ার গ্রামে গ্রামে তুর্কী সৈন্যের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসের পাতাকে মসীলিপ্ত করল। বুলগেরিয়ার জনসাধারণের ওপর এই অকথ্য অত্যাচারের খবর যখন ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে পৌছাল তখন সেগুলিতে প্রতিবাদের ঝড় দেখা গেল। রাশিয়া এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

খৃষ্টানদের ওপর অত্যাচার

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কূটনৈতিক তৎপরতা : ভবিষ্যতে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ বাধবে মনে করে সর্বাপেক্ষা বেশি চিন্তিত হলেন বিসমার্ক। কারণ তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির সাথে সাথে বল্কান অঞ্চলে যদি রাশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে অষ্ট্রিয়ার সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। আবার রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া উভয়েই জার্মানীর মিত্ররাষ্ট্র ছিল। এই দুই মিত্ররাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ যাতে না বাধে তারজন্য তিনি

আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকলেন। বিসমার্ক ত্রিরাষ্ট্র চুক্তি অটুট রাখতে চাইলেন। কারণ এটি ভেঙে গেলে ফ্রান্সের পক্ষে ইউরোপে মিত্র জোগাড় করা কষ্টসাধ্য হবে না। অস্ট্রিয়ার দিক হতে দেখলে এ যুদ্ধ তার নিকট শুভদায়ক ছিল না। অস্ট্রিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যকে অটুট রাখবার ইচ্ছা পোষণ করছিল। তবে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাগাভাগির ফলে সে যদি কিছুটা অংশ পায় তাহলে তুরস্ক সাম্রাজ্য টিকে থাকুক বা না থাকুক তার নিকট কিছু এসে যাচ্ছিল না। ফ্রান্স জার্মানীর হাতে তার পরাজয়ের কথা ভুলতে পারছিল না এবং সর্বদাই জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থের পথ খুঁজছিল। তুরস্ক সাম্রাজ্যে ফরাসীরা বহু অর্থ লগ্নি করেছিল। সে কারণে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে সে চিন্তিত হল। এছাড়া এই যুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা তৎকালীন ফরাসী সরকারের ছিল না। ইংল্যাণ্ড সবচেয়ে অসুবিধায় পড়ল। ডিসরেলী পরিচালিত বৃটিশ সরকারের প্রথম লক্ষ্য ছিল বল্কান ও ভূমধ্যসাগরে রুশ প্রভাব নিশ্চিহ্ন করা। দ্বিতীয়ত মৃতপ্রায় তুরস্ক সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে না বল্কান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানে সাহায্য করবে এই দ্বন্দ্বের মধ্যে ইংল্যাণ্ড মতিস্থির করতে পারল না। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড সুয়েজ ক্যানালের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করেছিল। ফলে সুয়েজ অঞ্চলে তার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই আধিপত্য যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য ইংল্যাণ্ডের দিক হতে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখাই সবচেয়ে সহজ পন্থা বলে মনে হল। অবশ্য তুরস্ক সাম্রাজ্যের পুনর্বণ্টন ব্যাপারে যদি কোন আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে তা হলে ইংল্যাণ্ড ওই বৈঠকে সাগ্রহে উপস্থিত থাকবে বলে ডিসরেলী সরকার ঘোষণা করলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অপদার্থ সুলতান মুরাদকে গদিচ্যুত করে তাঁর ভাই দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তুরস্কের সুলতান হলেন। তিনি প্রথমেই বল্কান অঞ্চলের খৃষ্টান বিদ্রোহীদের ধ্বংস করবার মনস্থ করলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে ওসমান পাশার নেতৃত্বে এবং এক শক্তিশালী তুর্কী বাহিনী সার্বিয়ার প্রতিরোধ ভেঙে দিল। সার্বিয়া বিদেশী শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করল।

রাশিয়া এর জন্য যেন অপেক্ষা করছিল। রাশিয়া তুরস্কের সুলতানের নিকট বিভিন্ন দাবি জানাল। তুরস্কের সুলতান এই দাবিগুলি বিবেচনা করবার জন্য কনস্টাণ্টিনোপলে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক ডাকলেন। এই বৈঠকে জার্মানী রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে মধ্যস্থতা করল। ফলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বল্কান অঞ্চলের পুনর্গঠনের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হল। কিন্তু তুরস্কের সুলতান এটি মানতে রাজি হলেন না। রাশিয়া উপায়ান্তর না দেখে অস্ট্রিয়ার সাথে তুরস্ক সাম্রাজ্যের

ভাগ বাঁটোয়ারা ব্যাপারে একটা বন্দোবস্তে উপনীত হল। ঠিক হল যে সার্বিয়া এবং মণ্টেনিগ্রোর স্বাধীনতা স্বীকার করা হবে। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনায় অষ্ট্রিয়া তার আধিপত্য স্থাপন করতে পাববে। অন্যদিকে রাশিয়া রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া এই ব্যাপারে নিজের ইচ্ছামত কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারবে।

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ (১৮৭৭)

এই বন্দোবস্তেব পব রাশিয়া তুবস্কেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। রুমানিয়া মণ্টেনিগ্রো ও বুলগেরিয়া রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করল। সার্বিয়াও অচিরে রাশিযাব দিকে যোগ দিল। তুর্কীবা প্রথমে ভালভাবেই যুদ্ধ চালাল, এবং রুশ বাহিনীর প্রবল আক্রমণ প্রতিবোধ করে প্লেভনা (Plevna) রক্ষা করতে থাকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার নিকট এই সুরক্ষিত দুর্গটিরও পতন ঘটল। এর সাথে সাথে রাশিযাব সৈন্য বাহিনী তড়িৎ গতিতে বোসফোরাস প্রণালীর বক্রাকাব খাঁড়িতে কনস্টান্টিনোপলেব পোতাশ্রয়ের নিকটবর্তী স্থান স্টেফানোয় পৌছাল। এখানে পৌছানোর পব রুশ বাহিনী আর অগ্রসর হল না। কাবণ জার সংবাদ পেলেন যে রাশিয়া যদি কনস্টান্টিনোপল দখল করেন, তবে ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এদিকে তুর্কী সুলতান তার এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে রাশিয়াব সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

সান-স্টেফানোর সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই সন্ধির দ্বারা সুলতান মণ্টিনেগ্রো ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনায় অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়াব দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হল। আর্মেনিয়াতে সংস্কার প্রবর্তন করা হবে ঠিক হল।

সান-স্টেফানো সন্ধি (১৮৭৮)

রাশিয়া বাটুম, কারস্, বেসারাবিয়া ও দোব্রুদজা তুরস্কের নিকট হতে আদায় করল। দানিয়ুব হতে ইজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য স্থাপিত হল। এছাড়া দানিয়ুব অঞ্চলে তুরস্ক তার সামরিক ঘাঁটিগুলি সরিয়ে নেবে এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাশিয়াকে অর্থ দিতে স্বীকৃত হল।

মন্তব্য : সান-স্টেফানোর সন্ধি রাশিয়াব পক্ষে এক বিরাট জয়লাভ। এই সন্ধিটি তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তিমদশা ঘোষণা করল। রাশিয়ার সাফল্যে এক রাশিয়া ও বুলগেরিয়া ভিন্ন কেউই খুশী হল না। বরঞ্চ এই সন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। রুমানিয়া, সার্বিয়া ও গ্রীস এই সন্ধিব তীব্র সমালোচনা করল। এই রাষ্ট্রগুলি বুলগেরিয়ার উত্থানে ঈর্ষান্বিত হল। অষ্ট্রিয়া বলকান অঞ্চলে রাশিয়ার ক্ষমতা বিস্তারের

আশঙ্কায় এই সন্ধির সমালোচনা করল। ইংল্যাণ্ড বেশি করে শঙ্কাগ্রস্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিসরেলীর মতে সান স্টেফানোর সন্ধির ফলে বল্কান অঞ্চলে রাশিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত হবে। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের এইরূপ বিরোধিতা দেখে রাশিয়া ভীত হল এবং ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রমুখ রাষ্ট্রগুলির মতানুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সান স্টেফানোর সন্ধিপত্র পুনরায় পরীক্ষা ও বিচার করে সংশোধন ও পরিবর্তন করতে স্বীকৃত হল।

Q. 8. Describe the circumstances leading to the Congress of Berlin (1878). What were the main provisions of the Treaty of Berlin ? Did the treaty satisfy the political aspiration of the Balkan Nations ?

Ans. **বার্লিন সম্মেলন ও বার্লিন চুক্তি :** সান স্টেফানোর সন্ধি বাশিয়ার পক্ষে এক বিরাট জয়লাভ। তুর্কী সাম্রাজ্য ইউরোপ হতে নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হ'ল। বাশিযার এই সাফল্যে ইউরোপের অন্যান্য বৃহৎ শক্তি, বিশেষ করে ইংলণ্ড বেশী কবে শঙ্কাগ্রস্ত হল এবং বাশিয়াব শক্তি খর্ব করবার জন্য ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী প্রধান মন্ত্রী ডিস্‌রেলী ডার্ডানেলিস প্রণালীতে বৃটিশ নৌবাহিনী ও সুয়েজ খালের পথে ভারতবর্ষ হতে সৈন্য প্রেবণ করবাব ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে দেখে বাশিয়া সমস্ত পরিস্থিতিটি বিবেচনাব জন্য ইউবোপীয় শক্তিসমূহের এক বৈঠক আহ্বান করতে সম্মত হয। **ফলে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার মীমাংসা করবার জন্য বার্লিন নগরে একটি বৈঠক বসল** (১৮৭৮)। জার্মানীর চ্যান্সেলার **বিসমার্ক** এর সভাপতি হলেন **সান স্টেফানোর সন্ধি** বাতিল বলে গণ্য হল। এক নতুন সন্ধিপত্র স্বাক্ষবিত হল। এটিকেই Treaty of Berlin বা **বার্লিনের সন্ধি বলে**। ডিসরেলী স্বয়ং এই বৈঠকে যোগদান করেন। গ্রেট বৃটেন ছাডা রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক, ফ্রান্স, ইটালী এই সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।

বার্লিন চুক্তি দ্বারা :

(ক) মন্টিনেগ্রো, সার্বিয়া রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হল। (খ) রাশিয়া বেসারাবিয়া, কাবস্‌ বাটুম ও আর্মেনিয়াব কিছু অংশ পেল। (গ) রুমানিয়া দোব্রুদজা লাভ কবল। (ঘ) 'শান্তি ও সুশাসনের স্বার্থে' অষ্ট্রিয়াকে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা শাসন করবার জন্য বলা হয়। (ঙ) সান স্টেফানোব সন্ধির দ্বাবা বৃহৎ বুলগেবিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হল। মেসিডোনিয়াকে সুলতানের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হল। পূর্ব রুমেলিয়াকে সুলতানের অভিভাবকত্বে এক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হল। অবশিষ্ট অংশ বুলগেরিয়া নামে অভিহিত হল এবং

এখানে সুলতানের প্রভাব নামে মাত্র রাখা হল। ইংল্যাণ্ড সুলতানের সাথে আর একটি চুক্তির বলে সাইপ্রাস দ্বীপটি কুক্ষিগত করল। (চ) সুলতান থেসালী ও এপিরাসের কিয়দংশ গ্রীসকে সময়মত দেবেন বলে ঠিক হল। (ছ) তুরস্ক সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনের জন্য সুলতান সচেষ্ট থাকবেন বলে বলা হল। (জ) ভবিষ্যতে তুরস্কের উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত টিউনিস নামক প্রদেশটিতে ফ্রান্স তার বিশেষ অধিকার স্থাপন করতে পারবে বলা হল। ফলে ফ্রান্স কিছুটা সন্তুষ্ট হল। জার্মানী ও ইটালী কিছুই পেল না।

গুরুত্ব ও ফলাফল : উপরিউক্ত শর্তগুলি হতে সহজেই বোঝা যায় যে বার্লিন সম্মেলন বল্কান অঞ্চলের জনসাধারণের জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনার আশা আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থান্বেষী নীতির নিকট জলাঞ্জলি দিল। বার্লিন সন্ধির পর এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বল্কান অঞ্চলে অচিরেই গণ অভ্যুত্থান ও বিপ্লব শুরু হবে। তুরস্কও এই বৈঠক হতে কিছু শিক্ষালাভ করল যা তার ভবিষ্যত কাজে লাগল। সে দেখল তার 'তথাকথিত বন্ধুদের' সাথে তার শত্রু রাশিয়ার বিশেষ তফাৎ নেই। উভয়েই তার সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ গ্রাস করবার জন্য সদা চেষ্টিত রয়েছে। একারণেই তুরস্কের সুলতান পরবর্তীকালে জার্মানীর সাথে মিতালি পাতায় এবং জার্মানীর সাহায্যে তার সামরিক বিভাগে সংস্কার সাধন করে। অতএব বার্লিন সন্ধির পর জার্মানীর পক্ষে এক নতুন বন্ধু জোটানো সম্ভব হল। কিন্তু এটি ঘটেছিল অনেক পরে। বার্লিন চুক্তির অব্যবহিত পরেই বিসমার্কের কূটনীতির জাল ছিন্নভিন্ন হবার উপক্রম হল। রাশিয়া জার্মানীর অষ্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্বে ক্রুদ্ধ হল। পুরাতন রুশ-জার্মান বন্ধুত্বে ফাটল ধরল এবং ত্রিসম্রাট চুক্তি ভেঙে পড়ল। ফ্রান্স এতদিনে বন্ধু খুঁজে পেল। বিসমার্কের নিকট অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর বন্ধুত্বই মূল্যবান বলে মনে হল। বল্কান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদের যাতে প্রসার না ঘটে সেদিকে এবং রাশিয়ার অগ্রগতি বন্ধ করতে অষ্ট্রিয়াকে নিজের স্বার্থেই চেষ্টা করতে হল। অষ্ট্রিয়াকে রক্ষা করবার জন্য বিসমার্কও নিকট প্রাচ্য সমস্যার প্রতি সজাগ থাকলেন।

বার্লিন সন্ধির একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেটি হল এই সন্ধির ফলে কেউই সন্তুষ্ট হল না এবং প্রত্যেকেই পূর্বেকার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন অবস্থায় রইল। এই সন্ধি রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করল। বৃটেন দার্দানেলিস প্রণালীতে তার নৌবহর পাঠাল। ফলে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্ক আরও তিক্ত হল। অষ্ট্রিয়া ও বৃটেন তুরস্ককে শক্তিশালী করতে চেয়েছিল কিন্তু তুরস্কের নিজের পায়ে দাঁড়াবার কোন ক্ষমতাই যে নেই তা তারা বুঝতে পারল। ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর হলেও কেবলমাত্র

টিউনিস তাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। গ্রীস ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ওপর খুবই রুষ্ট হল। রাশিয়া বেসারেবিয়া এবং অষ্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা লাভ করলেও এতে তাদের আনন্দিত হবার কারণ ছিল না। অচিরেই এই স্থান গুলিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের তাণ্ডবলীলা দেখে দেবে এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে যুদ্ধের কিনারায় নিয়ে যাবে।

বার্লিন সন্ধির পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হল। জার্মানীকে কেন্দ্র করে ইউরোপে নতুন শক্তিসাম্য গড়ে উঠল সত্য কিন্তু এর ফলে ইউরোপে যে যুগের সূত্রপাত হল সেটিকে সশস্ত্র শান্তির যুগ (Armed peace) বলা হয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোরদার হল।

বার্লিন চুক্তি নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান করতে পারল না। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে এই চুক্তি বলকান জাতিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী ছিল, যেমন,—

বল্‌কান সমস্যা জটিলতর করল

বেসারাবিয়া অঞ্চল রুমানিয়ার নিকট হতে কেড়ে নিয়ে রাশিয়াকে দেওয়ায় রুমানিয়ার জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ন হল। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাকে অষ্ট্রিয়ার শাসনে রাখার ফলে সার্ব জাতীয়তাকে অগ্রাহ্য করা হল। মেসিডোনিয়াকে তুরস্কের শয়তানী শাসনের কবলে পুনরায় নিক্ষেপ করায় ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ বপন করা হল।

বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিনভাগে ভাগ করায় একদিকে যেমন রাশিয়া ক্রুদ্ধ হল, অপরদিকে বুলগেরীয় জাতীয়তাবাদ সংগ্রামশীল হয়ে উঠল।

এই সন্ধি অনুসারে ডিসরেলী বিনা যুদ্ধে এবং সসম্মানে শান্তিরক্ষা করেছেন বলে ঘোষণা করেন কিন্তু বার্লিন সন্ধির দ্বারা নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান হয় নি। এই অংশের পরবর্তী ইতিহাসই প্রমাণ করে যে, বার্লিন সন্ধি বল্‌কান অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি সুতরাং ডিসরেলীর পক্ষে সসম্মানে শান্তিরক্ষা করার কথা নিতান্ত দাম্ভিকতা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টির অভাব বোঝায়। এ ছাড়া, এই সন্ধির শর্তানুযায়ী অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড অহেতুক কিছুটা রাজ্যখণ্ড লাভ করল। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার নামে এটি রাজনৈতিক দস্যুতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বার্লিন সন্ধি বল্‌কান অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করতে ব্যর্থ ত হলই, বরঞ্চ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীজ এখানেই রোপিত হল। তুরস্ক সাম্রাজ্যকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে পারল না। নতুন নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হল।

সম্মানজনক শান্তি প্রতিষ্ঠা করেনি

উপসংহারে বলা যায় যে, বার্লিন সন্ধির কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়াও ব্যাপকভাবে হল। ইংল্যাণ্ড সাইপ্রাস দখল করার ফলে তুরস্ক ক্ষুব্ধ হল। অষ্ট্রিয়াকে সমর্থন করার জন্য জার্মানী রাশিয়ার বন্ধুত্ব হারাল। বিসমার্কের 'ত্রি-সম্রাট চুক্তি' বাতিল হয়ে গেল। জার্মানীর সাথে অষ্ট্রিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হল। ফলে এই দুই দেশের মধ্যে দ্বৈত সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। রুশ জার্মান সম্পর্কের অবনতি ঘটার ফলে রুশ-ফ্রান্স সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেল।

Q 9 Trace the history of Eastern Question from 1878 to 1890.

Ans. ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালীন নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ইতিহাস বার্লিন চুক্তিকে নাকচ করার ইতিহাস। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-রুমেলিয়া বার্লিন চুক্তি অগ্রাহ্য করে বুলগেরিয়ার সাথে যুক্ত হল। বার্লিন চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ এর বিরুদ্ধে কিছুই করল না। এই যুগটিতে আবার বল্কান অঞ্চলের স্বাধীনতা-প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দিল।

বুলগেরিয়া : বার্লিন চুক্তিতে বুলগেরিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। এই কৃত্রিম বিভাগ কিন্তু বেশিদিন টিকল না। স্টামবুলফের নেতৃত্বে বুলগেরিয়া ও পূর্ব রুমেলিয়ার পুনর্মিলনের আন্দোলন দিন দিন জোরদার হল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব রুমেলিয়ার তুর্কী শাসককে বিতাড়িত করা হল এবং পূর্ব রুমেলিয়া বুলগেরিয়ার সাথে সংযুক্ত হল। সার্বিয়া এতে অসন্তুষ্ট হল এই বলে যে এই দুটি রাষ্ট্রের সংযুক্তি বল্কান অঞ্চলের ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এর পর সার্বিয়া বুলগেরিয়া আক্রমণ করে কিন্তু পরাজিত হয় এবং অষ্ট্রিয়ার মধ্যস্থতায় কোনরকমে রক্ষা পায়।

বুলগেরিয়ার জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম

ইতিমধ্যে বুলগেরিয়াতে রুশ-বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদী দল বুলগেরিয়াকে রুশ-প্রভাবমুক্ত করবার চেষ্টা করে। তাদের দাবি ছিল "বুলগেরিয়া বুলগেরিয়ানদের জন্য।" রাশিয়া এর বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। এতে বুলগেরিয়াতে রুশপন্থী ও রুশ-বিরোধী দুটি রাজনৈতিক দল দেখা দিল। কিন্তু শেষে জাতীয়তাবাদীরাই জয়ী হল। বুলগেরিয়া হতে রুশ প্রভাব নিশ্চিহ্ন করা হল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়া সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করল এবং তুর্কী সাম্রাজ্যাধীন মেসিডোনিয়ার দিকে নজর দিল।

ষোড়শ অধ্যায়

সমাজতন্ত্রবাদ

সূচনা: সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রাচীনতম মতবাদের অন্যতম। দার্শনিক প্লেটোর রিপাব্লিক গ্রন্থে এর কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তবে আধুনিক কালে সমাজতন্ত্রের যে রূপ আমরা দেখি তার উদ্ভব ঘটেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ।

গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মত সমাজতন্ত্রবাদ উনিশ শতকের একটি বিরাট আন্দোলন। শিল্পবিপ্লব প্রসূত কারখানা প্রথার দোষত্রুটি দূর করার জন্যই সমাজতন্ত্রবাদ দেখা দেয়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশেরই জাতীয়সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বৈষম্যমূলক বণ্টন ব্যবস্থার জন্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই এর ফলভোগ করছিল। দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই হস্তগত করল। তাদের বলা হয় পুঁজিপতি সম্প্রদায়। অন্যদিকে কঠোর শ্রম করেও শ্রমিক-শ্রেণী জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদাও মেটাতে পারত না। ফলে তাদের মধ্যে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামী মনোভাব গড়ে উঠল। পুঁজিপতি সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর উপর মুষ্টিমেয় ধনী মালিকের অন্যায় প্রভুত্ব ও শোষণের ফলেই সমাজতন্ত্রবাদের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত মূলধন এবং ভূ-সম্পত্তি অধিকার করে মানুষের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করাকে বন্ধ করাই সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজ কর্তৃক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং আয় বণ্টন ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রবাদ বলা যেতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তিগত ভাবে মূলধন এবং সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা হয় না। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের মূল নীতি হল শ্রেণীহীন, বর্ণহীন সমাজের মৈত্রী বন্ধন, ধনী দরিদ্রের পার্থক্য নাশ, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন উপাদানের রাষ্ট্রীয়করণ এবং সকল নাগরিকের ওপর নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব অর্পণ। অতএব সমাজতন্ত্র এক বিশেষ সমাজের কথা বলে।

উৎপত্তি ও অর্থ

উদ্দেশ্য

Q. 1. Write a brief essay on the development of Socialist ideas between 1789 and 1848. (B. U. 1966)

Ans. সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা রুশোর রচনার মধ্যেও দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবের যুগে উগ্র জেকোবিনরা সমাজতন্ত্রবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা

করে। তারা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক জীবনে ও সমাজ ব্যবস্থায় সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আদর্শ কার্যকরী করবার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। কনভেনশনের আমলে বিশেষ করে সন্ত্রাস শাসনের সময় বিপ্লবী রক্ষীদল ও সন্ত্রাসকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের নির্ধারিত মূল্যে খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয় এবং প্যারিসের সর্বহারাদের বিনা মূল্যে সম্পত্তি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। ডাইরেক্টরী শাসনকালে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হলে মেহনতী জনতার নেতা ব্যাবুফ সরকারের উচ্ছেদ করে দেশে শোষণহীন সমাজ স্থাপনের চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ব্যাবুফ ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের চেষ্টা করেন। ব্যাবুফপন্থীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হলেও এই আন্দোলনের ফলে ডাইরেক্টরী শাসনের নীতিতে পরিবর্তন এল।

ফরাসী বিপ্লবের আমলে

নেপোলিয়নের আমলে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার লাভ করতে পারেনি। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সমাজতান্ত্রিকদের শক্তিও এসময় নগণ্য ছিল। কিন্তু এর পরই শিল্প বিপ্লবের কল্যাণে সমাজতন্ত্রবাদ ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকল। সমাজতন্ত্রবাদের প্রসারের ইতিহাসে রবার্ট আওয়েন, সেন্ট সাইমন, চার্লস ফোরিয়ার ও লুই ব্লাঙ্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালের সমাজতন্ত্রীরা

কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রীগণ: রবার্ট আওয়েন (১৭৭১—১৮৫৮) ইংরেজ সন্তান রবার্ট আওয়েন ছিলেন একজন নামকরা সমাজতন্ত্রী ও শিল্পপতি। কিন্তু সাধারণ শিল্পপতিদের মত মনোবৃত্তি তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি কারখানার শ্রমিকদের দুরবস্থা কিভাবে দূর করা যায় সে সম্বন্ধে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হতেই কার্যকরী ভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। এই বছরেই তিনি নিউলানার্ক নামক স্থানে একটি আদর্শ কারখানা স্থাপন করেন এবং তাঁর মতবাদের সত্যাসত্য জানবার চেষ্টা করতে থাকেন। কালক্রমে নিউলানার্ক আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে—শ্রমিক ও মিল মালিকদের নিকট তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এখানে তিনি প্রমাণ করেন যে শিল্পপতির লভ্যাংশ রেখেও শ্রমিক যাতে ভাল ভাবে জীবনধারণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা সম্ভব। পর পর তিনি আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা নামক রাজ্যে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে 'New Harmony' নাম দিয়ে সমবায় নীতির ভিত্তিতে একটি শিল্প নগরী স্থাপন করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। এর পর হতে আওয়েন ভাববাদী হলেন। তাঁর রচনাগুলিও অবাস্তব হতে থাকল। আওয়েন-এর মতবাদ খুবই সহজ ও

সরল—মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সহজেই হতে পারে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সহযোগিতার ভিত্তিতে মানুষের সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতাগুলি পরিচালিত হয়। এভাবে সামাজিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব। সমাজব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ তখনই হয় যখন একে অন্যের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে, ঘৃণা করে। এই মনোবৃত্তি দূর করতে হলে সার্বিক শিক্ষার প্রয়োজন।

রবার্ট আওয়েন তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলন ও সমবায় আন্দোলনের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক সংঘ আইন সংগত প্রতিষ্ঠান বলে সরকার মেনে নিতে বাধ্য হয়। আধুনিক সমবায় আন্দোলনেরও তিনিই পথিকৃৎ।

সেণ্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫): উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে সেণ্ট সাইমনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফরাসী বিপ্লব হতে তিনি বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রথম জীবনে তিনি চার্চের সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। পরে তিনি শিল্পায়নের দিকে নজর দেন। তিনি কর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন। তাঁর মতে মানুষকে কাজ করতেই হবে এবং সামাজিক উপযোগিতার ওপর সম্পত্তি ভোগের অধিকার নির্ভর করবে। তিনি যে কথা প্রচার করেন পরবর্তীকালের সমাজতন্ত্রীদের নিকট সেটি সমাদৃত হয়—'From each according to his capacity to each according to his work'. তিনি অভিজাততন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, গণতন্ত্রকে এক অকেজো মতবাদ বলে মনে করতেন।

চার্লস ফোরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭): ইনিও একজন ফরাসী সমাজতন্ত্রী এবং আওয়েন ও সেণ্ট সাইমনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি শিল্পবিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং শহরভিত্তিক সভ্যতার ধ্বংস কামনা করতেন। তিনি কারখানার পরিচালনায় ও উৎপাদনে শ্রমিকদের সরাসরি সম্পর্ক থাকা উচিত বলে মনে করতেন। শ্রমিকরা যাতে সানন্দে কাজ করতে পারে তার জন্য তাদের সুস্থ জীবনযাপনের উপযোগী বেতন দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। আওয়েনের মত তিনিও প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতার ওপর জোর দেন।

উপরিউক্ত তিনজন সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ববিদের রচনা মানুষের সুসংগত সমাজ জীবনের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। তাঁরা শিল্প বিপ্লবের ফলে যে কারখানা ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল তার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যে ত্রুটিগুলি জড়িত ছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। শ্রমিকদের দৈনিক জীবনযাত্রার অবস্থা ছিল অত্যন্ত

শোচনীয়। বাসস্থান ছিল বসবাসের অনুপযুক্ত, পরিবেশ ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও মজুরী যা' পেত তাতে জীবনধারণ করা অসম্ভব ছিল। এই শোচনীয় এবং অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা একদিকে যেমন প্রতিবাদ করলেন অন্যদিকে এর জন্য দায়ী করলেন মানুষের লোভ এবং প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তিকে। অতএব তাঁদের মতে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে এবং প্রতিযোগিতার স্থানে সহযোগিতার মনোবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সমাজে রামরাজ্য দেখা দেবে। বলা বাহুল্য তাঁরা সকলেই রোমান্টিক ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এবং একারণেই পরবর্তী কালে কার্ল মার্কস এঁদের 'অবাস্তব সমাজতন্ত্রী' বলেছেন।

লুই ব্লাঙ্ক (১৮১১-১৮৯২)**:** আওয়েন, সেন্ট সাইমন ও ফোরিয়ার ছিলেন সম্পূর্ণভাবে অবাস্তব সমাজতন্ত্রী। লুই ব্লাঙ্ক কিছুটা বাস্তববাদী ছিলেন। সমাজতন্ত্রের মতবাদকে তিনি কল্পনার রঙীন জগৎ হতে মাটির পৃথিবীতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Organisation of Labour তৎকালীন সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিকদের নিকট বাইবেল স্বরূপ ছিল। লুই ব্লাঙ্ক সরাসরি বলতেন যে রাজনৈতিক সংস্কার ভিন্ন সামাজিক সংস্কার অসম্ভব এবং সমাজতন্ত্রের অর্থই হল State Socialism বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র। তিনি 'Right to work'-যে মানুষের মৌলিক অধিকার সে সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন। এবং এর সাথে সাথেই তিনি ঘোষণা করেন যে সকল লোকের কর্মসংস্থানকরণ সরকারের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য। জনসাধারণের মধ্য থেকে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য দূর করাও সরকারের অন্যতম কর্তব্য। লুই ব্লাঙ্কের মতবাদ তৎকালীন শ্রমিক সম্প্রদায়কে খুবই প্রভাবিত করেছিল। ফলে তিনি ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের অন্যতম নেতারূপে পরিগণিত হন।

রাজনৈতিক বিপ্লবে যোগদান

ব্যর্থতার কারণ: উপরিউক্ত সমাজতান্ত্রিকরা এমন সমাজ স্থাপন করতে চাইতেন যে সমাজে সকলেই যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে এবং সকলের শ্রম দ্বারা লব্ধ আয় সকলের মধ্যে ন্যায্যভাবে ভাগ করা হবে। কার্ল মার্ক্স এদের নাম দেন— অবাস্তব আদর্শবাদী (Utopians)। এঁরা মনে করতেন যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেই মানুষের মনে সমাজতন্ত্রের ধারণা বদ্ধমূল হবে। জনসাধারণের নিকট প্রচারকার্য করা, জনসাধারণকে বিপ্লবী করে তোলা এরা পছন্দ করতেন না। একারণেই এঁরা সফলতা অর্জন করতে পারেননি।

এঁদের মতবাদ

অবাস্তব আদর্শবাদী সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেননি সত্য, কিন্তু তাঁদের মতামত শ্রমিক শ্রেণীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এঁদের প্রভাব

সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির ওপর তাঁদের চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদকে প্রকৃত ক্ষেত্রে কার্যকরী ও বাস্তবধর্মী করে তুললেন কার্ল মার্ক্স। তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে এক নতুন রূপ দিলেন।

Q. 2. Who was Karl Marx? What are his teachings? *Or,* What do you know about the life and views of Karl Marx? Discuss the major aspects of Marxian Socialism and analyse the major points of criticism levelled against it.

Ans. **কার্ল মার্ক্স:** কার্ল মার্ক্স ছিলেন জার্মানীর লোক। তিনি এক ইহুদী পরিবারে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জার্মানীর বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি পান এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তার মৌলিকতার জন্য অল্প বয়সেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ইতিহাসেও সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রথম হতেই তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমাজে আর্থিক বৈষম্যের কারণ ও তার প্রতিকার নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। তাঁর বিপ্লবী মতবাদের জন্য তিনি দেশ হতে বিতাড়িত হন এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেড়ান। শেষে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" অথবা "সাম্যবাদীর ইস্তাহার" প্রকাশিত হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "ড্যাস ক্যাপিট্যাল" লণ্ডন হতে প্রকাশিত হয়। তিনি জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর শেষ জীবন বড়ই দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছিল। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ নামক একজন জার্মান তাঁকে সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করেন এবং এই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব এখনও সকলের নিকট আদর্শনীয় হয়ে রয়েছে।

কার্ল মার্ক্স হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক দর্শনকে মানুষের জীবনসত্য উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য প্রয়োগ করেন। তিনি অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে জীবনের পরম সত্য অনুসন্ধান না করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই জীবনসত্য খুঁজেছেন। মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র

মার্কসীয় মতবাদ ও তার ব্যাখ্যা

চিরন্তন নয়, চিরদিন ছিল না। সমাজ-বিবর্তনের নির্দিষ্ট স্তরে যখন ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হয় এবং সেই সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দেয়, তখন শাসক-শ্রেণীর (শোষকও বটে) স্বার্থরক্ষার জন্য, শোষিত শ্রেণীর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হতে রক্ষা পাবার জন্যই রাষ্ট্রের ও

তার আনুষঙ্গিক আইনকানুন, পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে। সংক্ষেপে, নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থা রক্ষা করবার জন্য পেষণযন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র গঠনের মূলে রয়েছে শ্রেণীবহুল সমাজ-ব্যবস্থা। শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। অতএব রাষ্ট্রের উত্থান ও ধ্বংস ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যেই রয়েছে। এঙ্গেল্‌স্ বলেছেন, রাষ্ট্র কোন শাশ্বত বা চিরন্তন প্রতিষ্ঠান নয়। এমন সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ছিল না। সমাজ-বিবর্তনের যে স্তরে উৎপাদনের উন্নতি ও শ্রমবিভাগের ফলে ব্যক্তিগত ধনগত বৈষম্য এবং মানুষে মানুষে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থসংঘাত দেখা দিল সেই সময়ই সৃষ্টি হল রাষ্ট্র।

মার্ক্স মানব-সমাজের ইতিহাসের ধারা, বিভিন্ন যুগে আর্থিক অবস্থা ও তার পরিবর্তনের কারণ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করেছেন। তাঁর মতে শ্রেণী-বিরোধের মধ্য দিয়ে মানব-সমাজ এগিয়ে চলে এবং বিভিন্ন যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে। দেশের সম্পদ ও সম্পদ অর্জনের উপকরণ যখন যে শ্রেণী হস্তগত করে তখন সেই শ্রেণীই প্রভু হয়ে বসে। সমাজ বিকাশের প্রথম স্তরে যখন মানুষ ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সাধারণ অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ছোট ছোট সমাজে বাস করত, যখন শ্রম ছিল সাধারণ, তখন উৎপাদনের ফলের ওপর সমাজের সর্বসাধারণের মালিকানা ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানা তখন দেখা দেয় নি এবং শ্রেণীবিভাগ এবং এক শ্রেণী দ্বারা অন্য শ্রেণীকে শোষণও সম্ভব ছিল না। একারণে আদিম সমাজ-ব্যবস্থায় রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না। কিন্তু এর পর জমি যখন সমাজের একমাত্র সম্পদ বলে মনে করা হল, তখন সে যুগের জমিদার শ্রেণী সাধারণ লোকের ওপর আধিপত্য করতে শুরু করে। এবং জমির মালিকদের মালিকানা স্বত্ব রক্ষা করবার জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজেদের সুবিধার জন্য আইনকানুন তৈরী করে। পরবর্তীকালে শিল্প-বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং সংখ্যায় ধনিক সম্প্রদায় অর্থের বলে সমাজে প্রাধান্যলাভ করে। এই ধনতান্ত্রিক সমাজে একদিকে ধনিক শ্রেণী ও অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণী রয়েছে। অর্থাৎ একদিকে বিত্তবান ও অন্যদিকে বিত্তহীন। এদের মধ্যে স্বার্থসংঘাত অবশ্যম্ভাবী, কারণ এদের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। এই শ্রেণীসংঘাতের মধ্যে দিয়েই বিপ্লব আসবে। এবং বিপ্লবের ফলে যে নতুন সমাজের অভ্যুদয় ঘটবে, তা হবে সাম্যবাদী সমাজ। এই বিপ্লবে শাসন-ক্ষমতা যাবে বিত্তহীন সর্বহারা বা প্রলেটারিয়েটের হাতে। দেশের সমস্ত

সম্পত্তির মালিক হবে দেশের জনসাধারণ। এর ফলে শ্রেণী-শোষণের সহায়ক রূপে আর রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র বিলীন হবে।

মার্ক্স মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে মানুষের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি সবই নির্ভর করে অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার ওপর এবং মানুষের ইতিহাস এই অর্থনৈতিক সংঘাতেরই বিবরণ মাত্র। তাঁর মতে বর্তমানকালে ধনিক শ্রেণী যে আর্থিক লাভ করেন তা শ্রমিকগণেরই প্রাপ্য। কারণ তাদের শ্রমের ফলেই কাঁচামালগুলি শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত হয়।

মার্কস্ ধর্মকে ধুরন্ধর ও সুবিধাবাদীদের উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি মাত্র বলে মনে করেন। মানব-সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে শোষিতদের সংগ্রাম ধ্বংস করে দেবার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখবার জন্য ধর্মকে প্রয়োগ করে থাকে।

ধর্মের উৎপত্তির কারণ

মার্ক্সের মতে আধ্যাত্মিক জগৎ বলে কিছু নেই। ঈশ্বর, স্বর্গরাজ্য ইত্যাদি ফন্দিবাজদের সৃষ্টি। মিথ্যাই হল ধর্মের প্রথম কথা। স্বর্গ, ঈশ্বর, পারত্রিক কল্যাণ প্রভৃতি কথাগুলি গালভরা কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলি আসলে হল কুহক, যেগুলি পুঁজিপতিরা আত্মরক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছে।

মার্ক্সীয় মতে ব্যক্তির সজ্ঞানতা (consciousness) তার স্থিতি নির্ধারিত করে না, তার সামাজিক স্থিতি বা স্থানই তার সজ্ঞানতা নির্ধারিত করে। ব্যক্তি মনে করে যে সে তার ধারণা, কল্পনা, জীবনাদর্শ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় মতামতের জনক। এটা সর্বৈব মিথ্যা। তার অর্থনৈতিক অবস্থাই এগুলির জনক। ধর্ম কখনই মানুষের জীবনে প্রধান শক্তিরূপে কাজ করেনি। এমনকি মধ্যযুগেও ব্যক্তির জীবনে ধর্মের যে প্রভাব দেখা যায় সেটা ছিল কৃত্রিম।

ধর্ম সামাজিক অগ্রগতির পরিপন্থী

সমালোচনা: মার্ক্সের মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনেকে স্বীকার করে না। তাঁদের মতে অর্থনৈতিক প্রেরণাই মানব-সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে একমাত্র কারণ নয়। ধর্মভাব, দেশাত্মবোধ, যুগন্ধর প্রতিভা, ঐতিহ্য প্রভৃতি নানা প্রকার শক্তি ও প্রভাবের ফলেই মানব-সমাজের বিবর্তন ঘটে থাকে। মার্ক্স ধনিক শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে অহি-নকুল সম্বন্ধ দেখেছিলেন এবং শেষোক্ত শ্রেণীই যে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের প্রভু হবে তাও অভ্রান্ত নয়। কারণ, ধনিক শ্রেণী মার্ক্সের সময়ে যেরূপ শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করত আজকাল সেরূপ করা

সম্ভব নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া, মার্ক্সের মতবাদকে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

অর্থনীতি-ভিত্তিক সমাজব্যাখ্যা মার্ক্স-ই প্রথম করেন নি। উপনিষদে, কনফুসিয়াসের আদর্শে, বুদ্ধদেবের চিন্তায় এরূপ ব্যাখ্যা চোখে পড়ে। কিন্তু মানুষ এতে সন্তুষ্ট হয়নি। মানুষের সমাজ ও ভাবমানসের গঠনের মূলে অর্থনৈতিক শক্তিই একমাত্র কারণস্বরূপ, কিংবা শ্রেণীসংঘর্ষ মানবজাতির ইতিহাসের মূল সুর, এবং এসব কথা বিশেষ অবস্থায় মানুষ স্বীকার করতে পারে। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থা চিরকালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকে না। বিশেষ অবস্থায় মানুষের আচরণ তার জীবনের সমগ্র আচরণ নয়। মার্ক্স ধর্ম সম্বন্ধে যে-কথা বলেছিলেন তা ইউরোপে এক বিশেষ সময়ের পটভূমিকায় বলেছিলেন। তাছাড়া, এঙ্গেল্‌স্‌ও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "মার্ক্স কখনো দাবী করেন নি যে অর্থনৈতিক দিকটাই পরম নির্ণেয়, অন্যসব কিছু নয়।"

মার্কসবাদ অভ্রান্ত নয়

মার্ক্স এবং তাঁর অনুচরবৃন্দরা রাষ্ট্রবিরোধী। তাঁদের মতে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র বলে কিছু থাকবে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখা গিয়েছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতাই সবদিকে বাড়ানো হয়েছে। অন্ন, বস্ত্র, যাবতীয় ভোগের উপকরণ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-কল্যাণের কর্মসূচী রূপায়ণ, কর্মে নিয়োগ করার ক্ষমতা, সংবাদপত্র, বেতার, পুস্তক প্রকাশন সমস্ত কিছুই সাম্যবাদী (মার্ক্সপন্থী) রাষ্ট্রের হাতে। দেশে কোন বিরোধী দল নেই, যারা শাসক দলের ভুল-ত্রুটি বা অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করতে পারে। এরূপ দেশে আমলাতন্ত্রের বিশ্বগ্রাসী রূপ রয়েছে। এসব দেশে শাসন দ্বারা শোষণ চলেছে। বোরিস পাস্টারন্যাক তাঁর অমর গ্রন্থ 'ডাঃ জিভাগো'তে বলেছেন—সমাজ উন্নয়নের কথা ব'লছ? কাজে তার কতটুকু হয়েছে? কোথায় কতদূরে শ্রেণীহীন সমাজের অস্তিত্ব! একদলীয় রাষ্ট্রে সমষ্টিরই জয়গান, ব্যষ্টির নয়, আর এই সমষ্টি বা people হচ্ছে জপানো জনতা (an indoctrinated crowd)।

মার্কস ও তাঁর অনুগামীরা ধর্মকে জনসাধারণের আফিং বলে মনে করেন। ধর্ম ব্যক্তির মনকে পঙ্গু করে রাখে, শৃঙ্খলিত করে রাখে কুসংস্কারের আগলে। ফলে, সমাজ স্থিতিশীল হয়ে পড়ে, উন্নতি ব্যাহত হয়, সামাজিক ঐক্যের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। মার্ক্সের এই মতটি একটু তলিয়ে দেখলে এর ভ্রান্তি ধরা পড়ে। ধর্ম অধর্মের মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে তা মার্ক্স দেখতে পাননি। তিনি অধর্মকেই আসল ধর্ম বলে মনে করেছেন।

ধর্ম জনসাধারণের আফিং নয়

আসল ধর্ম মানুষকে স্বার্থপর করে না, তার মনে বিভেদের সুর তোলে না। বরঞ্চ 'সকলেতে আমি আমাতে সকলে' এই ভাব আসল ধর্মই মানুষের মনে জাগিয়ে তোলে।

উপসংহারে বলা যায় যে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই মার্কসের মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অল্প বিস্তর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে নিয়েছে।

মার্ক্সবাদের গুরুত্ব: মার্ক্সের মতবাদে যত ত্রুটি থাকুক না কেন এটি সত্য যে তিনিই প্রথম আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনার দ্বারা সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি ন্যায্য ও মানবোচিত ব্যবহার করবার আবশ্যকতা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর মতবাদ কোন ভৌগোলিক বা জাতিগত সীমারেখা স্বীকার করে না—'শ্রমিকদের কোন দেশ নেই, সকল দেশের নির্যাতিত শ্রমিকদের মনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করল এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগে আন্তর্জাতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করল। এর ফলে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ স্থাপিত হল। এছাড়া তাঁর মতবাদে বিশ্বাসীগণই রুশ-বিপ্লবের ন্যায় এক যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত করে ইতিহাসে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

রাশিয়া (১৮১৫-১৮৮১)

সূচনা : ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মহান অক্টোবর বিপ্লব রাশিয়ায় হঠাৎ দেখা দেয়নি। উনিশ শতকের রাশিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল। রাশিয়ায় একদিকে ছিল কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসন আর অন্য দিকে গ্রামভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন। এই স্বৈরাচারী শাসন আবার নির্ভর করত সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ওপর, ব্যক্তিবিশেষ অভিজাত বা শিল্প মালিকদের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন মনে করত না ; পশ্চিমী ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এবং অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। এই স্বৈরতন্ত্র কিন্তু ইউরোপ ও এশিয়ায় রাশিয়ার এক মহান দায়িত্ব রয়েছে বলে মনে করত। এবং এটি কার্যে পরিণত করবার জন্য যখন তৎপর হল তখন হতেই রুশসাম্রাজ্যবাদের করালরূপ আমরা দেখতে পাই।

রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরকার ভিত্তিক ছিল এবং এই সরকারের প্রধান ছিলেন জার স্বয়ং। জারের ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। একারণে প্রায় প্রত্যেক জারের সিংহাসনারোহণ ও মৃত্যু কালে রাশিয়ায় আভ্যন্তরীণ শান্তি অক্ষুণ্ন থাকতে পারেনি ; নানারূপ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। প্রথম আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর (১৯২৫) পর এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। প্রথম নিকোলাসের রাজত্বের শেষ বছরে দেশের অভ্যন্তরে নানারূপ গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। অবশ্য মৃত্যু তাঁকে এই বিপদ হতে রক্ষা করে। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসনকাল গোলযোগপূর্ণ। স্বাভাবিক মৃত্যু তাঁর হয়নি। ১৮৮১তে তিনি নিহত হন।

Q. 1. Describe in some details the reign of Alexander I of Russia.

Ans. জার প্রথম আলেকজাণ্ডার যখন রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৮০১) তখন ইউরোপে নেপোলিয়নের আধিপত্য স্থাপনের যুগ শুরু হয়েছে। প্রথম আলেকজাণ্ডার স্বভাবতঃ উদারমনা ছিলেন এবং তৎকালীন ইউরোপের উদারনৈতিক মতবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

ভূমিকা

নেপোলিয়ন ও জার আলেকজাণ্ডার : তিনি তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তৃতীয় কোয়ালিশনে যোগ দেন। অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য

করবার জন্য তিনি এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু ফ্রীডল্যাণ্ডের যুদ্ধে এই সৈন্যবাহিনী নেপোলিয়নের হাতে পরাজিত হল। জার আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ বিরতি করতে চাইলেন এবং নেপোলিয়নের সাথে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে টিলসিটের সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। আলেকজাণ্ডার পূর্বাঞ্চলে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখলেন। কিন্তু এই বন্ধুত্ব বেশি দিন টিকল না। আলেকজাণ্ডার নেপোলিয়নের নিকট হতে যেরূপ সাহায্য আশা করেছিলেন তা পেলেন না। কি তুরস্কের ক্ষেত্রে, কি পোলাণ্ডের ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন আলেকজাণ্ডারের মনস্তুষ্টি করতে পারলেন না। অন্যদিকে নেপোলিয়ান ও জারের নিকট প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং সমর্থন পেলেন না। ফলে দুজনের মধ্যে বিভেদ বাড়তিব পথে থাকল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করলেন। এই আত্মঘাতী আক্রমণে নেপোলিয়নেব সামরিক বাহিনী পর্যুদস্ত হল। সংক্ষেপে নেপোলিয়নের পরাজয়ে আলেকজাণ্ডারের অবদান কম ছিল না।

ইউরোপের পুনর্গঠন ব্যাপারে : নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপেব রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে আলেকজাণ্ডাব উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। তাঁর জন্য ইউবোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা ভিয়েনা বৈঠকে পরাজিত ফ্রান্সের ওপর কঠোর শর্তাবলী চাপিয়ে দিতে পারেন নি। ফ্রান্সের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজা অষ্টাদশ লুই তাঁর অনুরোধে ফ্রান্সে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি জার্মানীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর করে এক স্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর এই ইচ্ছা কার্যকরী হতে পারেনি।

পবিত্র চুক্তির স্রষ্টা হিসেবে : ইউরোপেব স্থায়ী শান্তিরক্ষার জন্য জার আলেকজাণ্ডার বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথমে একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তাঁব এই পরিকল্পনা পবিত্র চুক্তিরূপে দেখা দেয়। এই পরিকল্পনায় তাঁর মূল বক্তব্য ছিল যদি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ খৃষ্টধর্মকে অনুসরণ কবে তাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করেন তা হলে ইউরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকতে বাধ্য। এই পবিত্র চুক্তি আলেকজাণ্ডারের আদর্শ নিষ্ঠা ও রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচায়ক। সমসাময়িক রাজনীতির সাথে সম্পর্ক-বিবর্জিত ছিল বলে এ'টি কার্যকরী হতে পারে নি।

পোল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডে উদারনীতি : আলেকজাণ্ডারের উদারনীতির বাস্তব রূপায়ন ঘটে ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডে। ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডকে তিনি স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিলেন এবং এই দুটি অঞ্চলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার

সমূহ তিনি প্রবর্তন করেন। তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন যে এ দুটি অঞ্চলে উদারনীতিবাদের সাফল্য ঘটলে তিনি খোদ রাশিয়ায় এটি প্রবর্তন করবেন। ফিনল্যাণ্ড তখনো সুইডেনের অধীনে ছিল। ১৮০৯ খৃস্টাব্দে আলেকজাণ্ডারের অধীনে এটি চলে আসে। আলেকজাণ্ডার ফিনল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না। আগে যেরূপ আইনকানুন ও সংবিধান প্রচলিত ছিল তাই রেখে দেওয়া হল। এমন কি ফিনল্যাণ্ডের নিজস্ব সৈন্যবাহিনীও রয়ে গেল। ফলে ফিনল্যাণ্ডবাসী রাশিয়ার শাসনের কোন কুফলই বুঝতে পারল না। এটা সম্ভব হয়েছিল আলেকজাণ্ডারের উদারনীতির জন্য।

পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও আলেকজাণ্ডার উদারনীতির পরিচয় দেন। পূর্বেকার গ্রাণ্ড ডাচি অফ ওয়ারস ভিয়েনা বৈঠকের শর্তানুযায়ী জারের হাতে দেওয়া হয়। আলেকজাণ্ডাব এই অঞ্চলটিকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত না করে পৃথক একটি রাজ্যে পরিণত করলেন। এটির নাম হল পোল্যাণ্ড রাজ্য। একমাত্র ব্যক্তিগতভাবে জারেব আনুগত্য ছাড়া রাশিয়ার সাথে পোল্যাণ্ডের কোন যোগ রইল না। পোল্যাণ্ডে তিনি একটি সংবিধানও প্রবর্তিত করেন। এই সংবিধানে ডায়েট নামে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট পরিষদের ব্যবস্থা থাকল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ধর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হল এবং পোলিশ ভাষা সরকারী ভাষা বলে স্বীকৃতি পেল। এর ফলে তৎকালীন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নাগরিকদের যতটা ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল। পোলিশ-বাসীদের তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিস্বাধীনতা দেওয়া হল। কিন্তু পোল্যাণ্ডকে যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হল না, সেকারণে পোলিশ জনসাধারণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যায়। ফলে আলেকজাণ্ডার পোলিশবাসীদের প্রতি বিরক্ত হল এবং তাঁব রাজত্বের শেষের দিকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

আভ্যন্তরীণ নীতিঃ আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন কিন্তু সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। রাশিয়ার অগণিত ভূমিদাসদের দুরবস্থা দূর করার জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন। জারের নিজস্ব ভূমিদাসের সংখ্যা ছিল দেড় কোটির ওপব। এদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি প্রথমে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভূমিদাস প্রথা এতই জটিল ছিল যে তিনি সম্পূর্ণভাবে এদের অসুবিধাগুলি দূর করতে পারলেন না। তবে ভূমিদাস প্রথা তুলে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন—এই মনোভাব তিনি গড়ে তুলতে সাহায্য করেন এবং পরবর্তীকালে এটি উঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া, যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত রাশিয়ার পুনর্গঠনে তিনি মনোযোগী হন। তাঁর চেষ্টায় শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি কিছুটা দূর হয়। তিনি রাশিয়ার কারাগারসমূহের

অব্যবস্থার প্রতিকার করেন এবং—জনকল্যাণমূলক কাজে হাত দেন। তিনি কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা করেন। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রতি জেলায় সরকারী শস্যভাণ্ডার গড়ে তোলবার আদেশ দেন এবং রাশিয়া যাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য বিবিধ উপায় গ্রহণ করেন।

মন্তব্য: ১৮১১ হতে ১৮২০ পর্যন্ত আলেকজাণ্ডারের বৈদেশিকনীতি প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী ছিল। ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী ও স্পেনে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। আলেকজাণ্ডারের প্রগতিবাদী নীতির ফলে মেটারনিকের খুবই অসুবিধা হল। কিন্তু ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শুরু হতেই জারের বৈদেশিক নীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। এর মূল কারণ হল জারের চারিত্রিক গুণাগুণ। তিনি পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্রী শাসক ছিলেন। তার মধ্যে সর্বদাই স্ববিরোধী মনোভাব কাজ কবত। তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও সামঞ্জস্যের অভাব ছিল। যখন তিনি ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হতেন তখন বৈদেশিক নীতিতে উদারনীতির পরিচয় মিলত, এবং যখন ঐতিহ্যবাদী হতেন তখন প্রতিক্রিয়াশীল বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতেন। পোল্যাণ্ডবাসী যখন তাঁর প্রবর্তিত সংবিধানে ও শাসনে সন্তুষ্ট হল না, তখন তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করলেন। মেটারনিক জারের চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগ নিলেন তাঁকে উদারনীতি ও গণতন্ত্রের ধ্বংসকারীরূপে অভিহিত করলেন। উদারনীতির দ্বারা রাজ্য শাসন করলে দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয় তা তিনি জারকে বোঝাতে সক্ষম হলেন। ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে এই সময় যে কয়টি রাজনৈতিক ঘটনা ঘটল সেগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডার মেটারনিকের নিকট জানতে পারলেন। এর ফলে তিনি মেটারনিকের প্রদর্শিত পথেই যাত্রা শুরু কবলেন। তার আভ্যন্তরীণ ও ও বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি স্বৈরাচার সম্মত উপায়ে শাসন পরিচালনা করতে থাকলেন। ইউরোপের কোন রাষ্ট্রে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তা ধ্বংস করবার জন্য উৎসাহ দেখালেন। গ্রীকরা এই সময় তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কিন্তু আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার স্বার্থ উপেক্ষা করে গ্রীকদের সাহায্য দিলেন না। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডারের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

Q. 2. Give in some details the history of Russia under Nicholas I.

Ans. নিকোলাসের সিংহাসনারোহণ ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ: আলেকজাণ্ডার মৃত্যুর আগে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাসকে রাশিয়ার সিংহাসনে

উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, যদিও তাঁর অপর ভ্রাতা কনস্টেনটাইনের দাবি তখনও জোরাল ছিল। আলেকজাণ্ডারের হঠাৎ মৃত্যুতে রাশিয়ার পরবর্তী জার কে হবে এই নিয়ে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হল। নিকোলাস সেণ্ট পিটার্সবার্গ হতে তাঁর অগ্রজ কনস্টেনটাইনকে রাশিয়ার জার বলে ঘোষণা করলেন; অন্যদিকে কনস্টেনটাইন পোল্যাণ্ড হতে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাসকে রাশিয়ার জার বলে ঘোষণা করলেন। এর ফলে এক বিদঘুটে অবস্থার সৃষ্টি হ'ল এবং ১৮২৫-এর ডিসেম্বরের প্রায় তিন সপ্তাহ রাশিয়ার সিংহাসন খালি হয়ে পড়ে রইল। এই অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ নিল গুপ্ত সমিতিগুলি এবং স্বৈরতান্ত্রিক বিরোধী ব্যক্তিরা। কিছু সংখ্যক সামরিক অফিসাররাও এতে যোগ দেয়। ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্রোহ ঘটেছিল বলে বিদ্রোহীদের Dekabrists (Decembrists) বলা হয়। সেণ্ট পিটার্সবার্গে সৈন্যদল রাশিয়ার এক জাতীয় সভা আহ্বানের জন্য অভ্যুত্থান ঘটাল। এই বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রকারীদের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য যেমন ছিল না, তেমনি সংগঠন বলেও কিছু ছিল না। বিদ্রোহের জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তাও তারা গ্রাহ্য করেনি। একারণে নিকোলাসের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা খুবই সহজ হল। ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহ আপাতদৃষ্টিতে বিফল হলেও রাশিয়ার মেহনতী মানুষের মুক্তির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়ে রয়েছে। ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহের পরোক্ষ ফল বিখ্যাত বিপ্লবী হার্জেনের আবির্ভাব যিনি রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হার্জেন তাঁর নামকরা গ্রন্থ Development of Revolutionary ideas in Russia-তে ডেকাব্রিস্টদের বিপ্লবের পথিকৃৎ এবং প্রথম শহীদ বলে আখ্যাত করেছেন। ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ফল হল নিকোলাসের মনোভাবের পরিবর্তন। তিনি তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে এরূপ বিদ্রোহের পরিচয় পেয়ে খুব ক্রুদ্ধ এবং রক্ষণশীল হলেন। তিনি বিশ্বাস করলেন যে উদারনৈতিক নীতি অনুসরণ করে রাজ্য শাসন করা অসম্ভব কারণ এই নীতির বিনিময়ে কেবল আনুগত্যহীনতা ও অরাজকতা পাওয়া যায়। নিকোলাস তিরিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং এই দীর্ঘ তিরিশ বছর জারতন্ত্রের সাথে জনসাধারণের কোন সম্পর্ক রইল না।

ডেকাব্রিষ্ট অভ্যুত্থান

নিকোলাসের ওপর এর প্রভাব

আভ্যন্তরীণ নীতি: নিকোলাস একদিকে যেমন বাস্তববাদী ছিলেন অপরদিকে তিনি সংকীর্ণ ও সনাতনী মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। রাশিয়ায় তিনি পুরোপুরি স্বৈর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন

যে পশ্চিম ইউরোপের নিকট হতে রাশিয়ার শেখার কিছু নেই, রাশিয়ার প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা সমাজ সংস্কৃতি সমস্তই ভাল। পশ্চিমী সভ্যতার আমদানির ফলে দেশে অশান্তি দেখা দিয়েছে—এবং রাশিয়া তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। রাশিয়াকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং এটি সম্ভব হবে যদি সে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ধারা বেয়ে এগিয়ে চলে। সুতরাং নিকোলাসের আভ্যন্তরীণ নীতির মূল লক্ষ্য ছিল রাশিয়াকে পশ্চিমী উদারনীতি ও গণতন্ত্রের হাত হতে মুক্ত রাখা এবং রাশিয়ার মধ্যে যাতে চালু সমাজব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোন ভাবধারা প্রবেশ করতে বা গড়ে উঠতে না পারে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী : বিভিন্ন সংস্কার ঃ নিকোলাসের বিভিন্ন কার্যাবলীতে উপরিউক্ত নীতির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর প্রথম শাসনতান্ত্রিক কাজ হল ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ এবং ডেকাব্রিস্টদের বিচার। ডেকাব্রিস্ট আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে মাত্র পাঁচজনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল এবং কিছু সংখ্যককে সাইবেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠান হল। রুশ আন্দোলনকারীদের ওপর তিনি বিশেষ কঠোর হননি, যেমন হয়েছিলেন পোল আন্দোলনকারীদের ওপর। এতে তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। কারণ রাশিয়ার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই আন্দোলনকারীদের সংখ্যা বেশি ছিল। অভিজাত শ্রেণী নিকোলাসকে শত্রু মনে না করে তাঁকে সমর্থন করতে থাকল। যতই দিন যেতে থাকল জার হিসেবে নিকোলাস একজন কর্তব্যপরায়ণ স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হলেন এবং ইউরোপে বিভিন্ন রাষ্ট্রে তিনি একজন দক্ষ সম্রাট বলে স্বীকৃত হন। তাঁর আমলে রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। অবশ্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের যে ধারণা ছিল সে ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ হল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পূর্বে নিকোলাসকে ইউরোপের তথা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী রাজা বলে মনে করা হত।*

দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

নিকোলাস তাঁর শাসন শুরু করেন রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ্ হিসেবে নয়, সৈনিক হিসেবে। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের আগেই তিনি শাসন ব্যবস্থায় যেমন দুর্নীতি দূর করবার চেষ্টা করলেন তেমনি জার বিরোধী আন্দোলন কঠোর ভাবে দমন করবারও ব্যবস্থা করলেন। এর জন্য তিনি

* Queen Victoria of Great Britain marvelled that she could break fast with this greatest of all earthly Potentates.''

দুটি দমনমূলক আইন প্রবর্তন করেন। একটির দ্বারা পুলিশকে রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করবার জন্য অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেওয়া হল এবং অন্যটির দ্বারা রাশিয়ায় কড়া সেন্সার বিধি প্রবর্তন করা হল। থার্ড সেকসান (Department III) বা গোয়েন্দা বিভাগের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হল; এই বিভাগ নির্যাতননীতির দ্বারা জনসাধারণের মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করল।

এরা ইচ্ছা করলে যে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধ, নির্বাসিত করা এমন কি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারত। দ্বিতীয় আইনটির দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের, সংবাদ পত্রের, পুস্তক প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল।

কোন পুস্তক যদি রাজতন্ত্র, প্রচলিত ধর্ম এবং আইনানুগ সরকারকে কোন দিক হতে সমালোচনা করত তাহলে গ্রন্থকার ও প্রকাশকের অবস্থা সঙ্গীন হত।

চরম প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

এমন কি বিখ্যাত দার্শনিকদের গ্রন্থগুলিও রাশিয়ায় প্রবেশ করতে দেওয়া হতনা। শারীরবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থও নিষিদ্ধ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগ যদি সরকারের নিন্দা করবার সাহস পেত তা হলে সে বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হত। যীশু খৃষ্টের নীতিগুলি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করবার জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় রাশিয়াতেও বাইবেল সোসাইটি স্থাপন করা হয়। নিকোলাস এই সোসাইটিও বন্ধ করে দেন।

ডেকাব্রিস্ট বিদ্রোহের কারণ সমূহের অনুসন্ধান করবার জন্য তিনি যে কমিশন নিযুক্ত করেন সেই কমিশনের রিপোর্ট পাবার পর নিকোলাস আরও কঠোরভাবে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলি দমনে তৎপর হলেন। এই রিপোর্টে বলা হল যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকায় ডেকাব্রিস্ট আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া এই রিপোর্টে আভিজাত শ্রেণীকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে এবং কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার আনবার জন্য বলা হয়। নিকোলাস এই রিপোর্টের সিদ্ধান্তগুলি পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। কৃষি ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন আনা হল না এবং সামাজিক সংস্কারের দিকেও তিনি বিশেষ নজর দিলেন না। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত Kochubie কমিটি নিযুক্ত করলেন। এই কমিটিকে প্রচলিত সরকারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য বলা হল এবং অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে কোনগুলি চালু রাখা প্রয়োজন, কোন গুলি তুলে দেওয়া উচিত এবং সেগুলির বদলে কি কি শুরু করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে কমিটির অভিমত ব্যক্ত করতে বলা হল।

এই কমিটির নির্দেশ মত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনা হল। স্টেট কাউন্সিলকে রাষ্ট্রীয় বাজেট তৈরি করতে এবং খসড়া আইনগুলি সংশোধন

করবার ক্ষমতা দেওয়া হল। অবশ্য এই কাউন্সিলের দ্বারা সংশোধিত আইনগুলি ছাড়াও জার তাঁর ইম্পিরিয়াল চ্যান্সলারীর মারফৎ বিশেষ আইন বা অনুজ্ঞা জারী করতেন। এক একটি সিনেট সভা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে পরিণত হল। কিন্তু দেশের শাসন ব্যাপারে জারের নিজস্ব চ্যান্সলারী যেমন ছিল তেমনি রেখে দেওয়া হল। এটিতে কোনরূপ সংস্কার প্রবর্তন করা হল না। নিকোলাসের আমলে তাঁর চ্যান্সলারীতে কয়েকটি নতুন বিভাগ খোলা হয়—থার্ড ডিপার্টমেন্ট, আইন লিপিবদ্ধ করার ডিপার্টমেন্ট এবং ভূমিদাসদের অবস্থা এবং জারের খাস জমির উন্নতি বিধানের জন্য ডিপার্টমেন্ট। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করা হল এবং প্রদেশপালদের ক্ষমতা আরও বাড়ান হল।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

ভূমিদাসদের (Serfs) দুরবস্থা সম্বন্ধে নিকোলাস অবহিত ছিলেন। ভূমিদাসদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবাব জন্য তিনি পর পব ছয়টি কমিটি নিযুক্ত কবেন কিন্তু কমিটিগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী ভূমিদাসদের নিদারুণ অবস্থা দূর করবার জন্য বিশেষ কিছু করা হয়নি। এর মূল কারণ হল নিকোলাস অভিজাতদের স্বার্থেব পরিপন্থী কিছু করতে চাইতেন না। তবে ভূমিদাসদের দুরবস্থা দূর করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দমনমূলক নীতি গ্রহণ করা হল। এ বিষয়ে শিক্ষা-মন্ত্রী কাউন্ট উভারভ নিকোলাসের পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে উভাবভ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন শ্লোগান প্রস্তাব করলেন—'গোঁড়ামি, স্বৈরতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ'। কিছুদিনের মধ্যে এটিই সরকারের ঘোষিত নীতি হয়ে দাঁড়াল। নিকোলাস চার্চের স্বাতন্ত্র্য মানতেন না এবং জার চার্চের ওপরে বলে তিনি মনে করতেন। এই নীতির ফলে দেশে শিক্ষা বিস্তারে ভাটা পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হল না। দর্শন শাস্ত্রের চর্চা প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হল। গণিত শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হল। কারণ এই বিষয়টি সামরিক বিভাগে কাজে লাগে বলে তিনি মনে করতেন। অভিজাতদের সন্তান-সন্ততিরাই বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করবার অধিকারী বলে বলা হল। রুশ ছাত্রদের বিদেশে অধ্যয়ন করতে যাবার অনুমতি দেওয়া বন্ধ করে দিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হল। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনশোর বেশি ছাত্র থাকবে না বলে নির্দেশ দিলেন। ধর্ম সম্বন্ধেও নিকোলাস গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া গ্রীক চার্চের অন্ধ অনুগামী। একারণে এই ধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে

ধর্ম বা অন্য মত গ্রহণ করলে বা গ্রহণ করতে সাহায্য করলে কঠোরভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

নিকোলাস যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রাশিয়ায় বিধিবদ্ধ আইন বলে কিছু ছিল না। তিনি রাশিয়ায় আইন সংকলন ও প্রণয়নের কাজ সম্পূর্ণ করেন। এ বিষয়ে বৃদ্ধ স্পেরনিস্কি তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ হতে রাশিয়ায় যে সব আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল সেগুলি সংকলিত করা হল এবং ৪৫ খণ্ডে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বের করা হল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ১৫ খণ্ডে প্রচলিত কার্যকরী আইনগুলি প্রকাশ করা হল। এর ফলে কিন্তু রাশিয়ার বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত বৈষম্য দূরীভূত হল না। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান বা আইনের শাসন রাশিয়ায় দেখা দিল না।*

বিচার ব্যবস্থা

রাজধানী পিটার্সবার্গকে সুসজ্জিত করবার জন্য নিকোলাস উৎসাহী ছিলেন। বেশ কয়েকটি গির্জা ও রাজপ্রাসাদ এই সময় নির্মিত হয়। অবশ্য নিকোলাস ব্যক্তিগত ভাবে জাকজমক ভালবাসতেন না। নিকোলাসের অর্থ নৈতিক নীতিতে তাঁর গোঁড়ামির ভাল ও খারাপ দিক দেখা যায়। তাঁর রাজত্বের প্রথমার্ধে তিনি শিল্পে সংরক্ষণ নীতি মেনে চলেন। বিদেশ হতে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী প্রায় বন্ধ করে দেন। পরে অবশ্য তিনি এই নীতিতে পরিবর্তন আনেন এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে এবং আভ্যন্তরীণ শুল্ক নীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসেন। দেশের সীমান্ত শুল্ক চৌকীগুলি তুলে দেওয়া হয় এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আবার যাতে জিনিসপত্র এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় যেতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রুশ মুদ্রার নতুন মূল্য নির্ধারণ করা হয় এবং পুরানো কাগজী নোটের বদলে রৌপ্য মুদ্রা বাজারে চালু করা হয়। নিকোলাসের সময় রাশিয়া শিল্প বিস্তারের দিকে পা বাড়ায়। মস্কো একটি শিল্পসমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়। কার্পাস ও লৌহ শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে। তাঁর-ই সময় রাশিয়ায় সর্বপ্রথম রেল পথ স্থাপিত হয়।

অন্যান্য সংস্কার

নিকোলাস রুশ সাহিত্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন এবং রুশ ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর রাজত্বকালকে রুশ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা

* "...Yet this did not establish the rule of law as some historians have pretended, even if it eased the later judicial reform It was an academic operation, no more a legislative one". The New Cambridge Modern History. Vol. X

হয়। এই যুগে মহাকবি পুশকিন এবং ঔপন্যাসিক ডস্টয়িভ্স্কি, টুর্গেনিভ, গোগল রুশ সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে প্রথম সারিতে স্থান করে দেন।

পররাষ্ট্র নীতি ঃ রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় প্রথম নিকোলাস বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তাঁর অগ্রজ প্রথম আলেকজাণ্ডার যেমন মেটারনিকের কথা মত রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি পরিচালিত করতেন, নিকোলাস তা একেবারে বন্ধ করে দেন। মেটারনিকের কবল হতে বেরিয়ে এসে তিনি রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন আনেন। তাঁর বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার স্বার্থরক্ষা এবং ইউরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়াকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নেতা হিসেবে রাশিয়ার আবির্ভাবের পথ সুগম করা।

স্বাধীন নীতি

নিকোলাসের বৈদেশিক নীতিতে তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। আভ্যন্তরীণ নীতিতে তিনি যেমন উদার নীতি ও গণতন্ত্রের শত্রু ছিলেন এবং রাশিয়া হতে এ দুটিকে চিরতরে বিদায় দেবার চেষ্টা করেন, তেমনি বৈদেশিক নীতিতেও তিনি গণতন্ত্র ও বিপ্লবের বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করলেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে গণতন্ত্র ও বিপ্লবকে ইউরোপের কোন রাষ্ট্রে জয়যুক্ত হতে দিলে রাশিয়ার পক্ষেই তা বিপজ্জনক হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে নিকোলাস তাঁর বৈদেশিক নীতির মারফৎ রাশিয়াকে ইউরোপীয় রাজ্যগুলির নেতারূপে স্থাপনে চেষ্টা চালান। বিভিন্ন দেশের বিপ্লব বা বিদ্রোহ রুশ সৈন্যের মারফৎ তিনি ধ্বংস করতেও ইতস্তত করেন নি। অবশ্য এই সাহায্য তিনি পাঠিয়েছিলেন বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গের অনুরোধে। বলা বাহুল্য যে তিনি স্বদেশের সঙ্গে বিদেশেও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থক ছিলেন। এর ফলে অবশ্য তিনি সংস্কারকামী জাতীয়তাবাদীদের নিকট ঘৃণিত হয়েছিলেন।

ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পোল্যাণ্ডে ১৮৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। নিকোলাস কঠোর হস্তে এই বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি পোল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত শাসন কেড়ে নেন এবং পোল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। রুশ ভাষাকে পোল্যাণ্ডে সরকারী ভাষা রূপে গণ্য করা হল। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগঠনগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল। প্রতি বছর অসংখ্য পোল্যাণ্ডবাসীদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান হতে থাকল। পোলদের জীবনে ঘন অন্ধকার নেমে এল।

পোল্যাণ্ড

১৮৪৮-'৪৯ সালকে বিপ্লবের বছর বলা হয়। এই সময় ইউরোপের পনেরটি রাজ্যে বিপ্লব দেখা দেয়। পশ্চিম ইউরোপে মেটারনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। কিন্তু রাশিয়ার এই বিপ্লবের কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি। এ কারণে নিকোলাস সগর্বে নিজেকে ইউরোপে স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে ঘোষণা করেন এবং পুরানো ব্যবস্থা যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁর নির্দেশে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টের প্রস্তাবিত জার্মানীর রাজমুকুট গ্রহণ করতে গররাজী হন। হাঙ্গেরী অষ্ট্রিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট এই বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হন। নিকোলাস তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং রুশ সৈন্য প্রেরণ করে হাঙ্গেরীয়দের প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ করে দেন। এর ফলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পায়।

১৮৪৮-এর বিপ্লব দমনে অবদান

নিকোলাস ও নিকট-প্রাচ্য সমস্যা : বল্‌কান অঞ্চলে রাশিয়ার বিশেষ স্বার্থ রয়েছে এবং বল্‌কান অঞ্চলের খৃষ্টান অধিবাসীদের রাশিয়াই প্রকৃত নেতা বলে নিকোলাস মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ইউরোপে তুরস্কের টিকে থাকবার কোন অধিকার নেই বলে তিনি মনে করতেন। এ কারণে বল্‌কান অঞ্চলে রাশিয়ার পক্ষে হস্তক্ষেপের যখনই সুযোগ হয়েছে নিকোলাস তা হতে বিরত থাকেন নি। গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুযোগ তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেন। তাঁর হস্তক্ষেপের ফলেই গ্রীস সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি সচেতন হয় এবং পরিশেষে গ্রীস সাধারণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। গ্রীসের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে নিকোলাসের অবদান সবচেয়ে বেশি। এর জন্য তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তুরস্ক পরাজিত হয়ে তাঁর সাথে এ্যাড্রিয়ানোপল-এর সন্ধি (১৮২৯) করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধিতে রাশিয়া কিছু সুযোগ সুবিধা পায়। এরপর মিশরের শাসনকর্তা মহম্মদ আলি যখন তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সিরিয়া নামক প্রদেশটি দখল করে নেয় তখন অনন্যোপায় হয়ে তুরস্কের সুলতান নিকোলাসের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে রাশিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 'উনকেউর স্কেলাসি' চুক্তির দ্বারা তুরস্কের নিকট হতে কৃষ্ণসাগর ও দার্দেনেলিস প্রণালীতে অধিকার আদায় করে নেয়। অবশ্য রাশিয়া এই সুবিধা বেশি দিন ভোগ করতে পারল না। ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতার ফলে এই চুক্তির অদল বদল ঘটল। এরপর নিকোলাস তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবসানের জন্য সচেষ্ট হন। প্রথমে ইংল্যাণ্ড প্রমুখ রাষ্ট্রের সাহায্যে এটি করতে চান। যখন সম্ভব হল না তখন তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স

তুরস্কের দিকে দাঁড়াল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হল। রাশিয়া এই যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। রাশিয়ার পরাজয়ের মুখেই নিকোলাস পৃথিবী হতে বিদায় নিলেন।

রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি নিকোলাস কেবল মাত্র ইউরোপেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। সাইবেরিয়াকে তিনি উন্নত করতে চেষ্টা করলেন এবং মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার বিস্তার সাধনে মনোযোগী হন। ফলে ইংল্যাণ্ড তার ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে। ফলে ইঙ্গ-রুশ সম্পর্কে তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

Q 3 Describe briefly the reforms of Tsar Alexander II. What were the results of his reforms? ***Or*, Analyse the reforms introduced by Alexander II with special reference to the good and bad effects of the agrarian reforms.**

Ans. ১৮৫৫ হতে ১৮৭০ পর্যন্ত এই কয়টি বছর রাশিয়ার ইতিহাসে প্রস্তুতির যুগ বলে গণ্য করা হয়। এই সময়ে রাশিয়ায় শিল্পবিপ্লবের ফলাফল পুরোপুরিভাবে দেখা দেয়নি, যদিও শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল এবং নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে শক্তি যুগিয়েছিল। এই যুগে রাশিয়াকে ভৌমিক ক্ষতি যেমন স্বীকার করতে হয়নি, নতুন রাজ্যও সে কুক্ষিগত করতে পারেনি। এই যুগে রাশিয়ার ইউরোপীয় রাজনীতিতে তার প্রভাব বিশেষ খাটাতে পারেনি। কিন্তু ঠিক এই যুগেই রাশিয়ার অভ্যন্তরে সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়, নানারূপ সংস্কার ওপর হতে প্রবর্তিত হয় কিন্তু রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়নি। রাশিয়ায় যে সব সামাজিক সংস্কার সাধিত হয় সেগুলি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারা না হয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে হয়েছিল। রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনা হয়নি বলে রাজনীতির সাথে সমাজজীবনের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠল না। ফলে রাশিয়ায় এক বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হল।

সূচনা

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় প্রথম নিকোলাসের পুত্র দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হলেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসানের সাথে সাথেই তিনি আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য চেষ্টিত হলেন। এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রভাব যেমন কমে গেল

তেমনি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা সোচ্চার হল। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা এবং রাশিয়ার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণ আস্থা হারাল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিজেই মনে করলেন যে যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের কারণ হল তার সমাজ ও শাসনব্যবস্থা। একারণে তিনি সংস্কার কার্যে অগ্রসর হলেন। তবে জারের সর্বময় কর্তৃত্ব যাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর রাখলেন।

বিভিন্ন সংস্কার কার্য: সিংহাসনারোহণের সাথে সাথেই নতুন জারের সংস্কার কার্য শুরু হয়। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দশ বছর সংস্কার কার্যের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। প্রথমেই তিনি ডেকাব্রিস্টদের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন অথচ নির্বাসনে দিন যাপন করছিলেন তাঁদের মুক্তি দিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা দিলেন; বিদেশে ভ্রমণে উৎসাহ দিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারী বাধানিষেধ তুলে নিলেন। সংক্ষেপে নিকোলাস প্রবর্তিত কড়া সেন্সর প্রথার অবসান ঘটালেন।

ভূমিসংস্কার ও ভূমিদাস প্রথার অবসান: ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার একটি ঘোষণা জারী করলেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে জারের প্রত্যেক প্রজাই যাতে আইনের চোখে সমান মর্যাদা পায় এবং তার শ্রমলব্ধ উপার্জন শান্তিতে ভোগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া হবে। সমগ্র রাশিয়ায় এই ঘোষণাটিকে ভূমিদাস প্রথার অবসানের সূচনা বলে মনে করা হল। এর পর আলেকজাণ্ডার মস্কোর অভিজাতদের নিকট তার বক্তৃতায় ভূমিদাস প্রথা সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন: "আমাদের মঙ্গলের জন্যই সার্ফ প্রথার অবসান আমাদেরই করা উচিৎ কারণ বিলম্বে হলে তারা নিজেরাই যখন এই প্রথা তুলে দেবে তখন আমাদের করার কিছুই থাকবেনা।"

ভূমিদাস প্রথার অবসানের পূর্বে আলেকজাণ্ডার অভিজাতদের মতামত জানবার চেষ্টা করেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি একটি কমিটিও নিযুক্ত করলেন। বড় বড় জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। বড় জমিদাররা তাদের জমিদারী ছাড়তে রাজী হল না কিন্তু ছোট ছোট জমিদাররা, যাদের সংখ্যাই বেশি ছিল তারা ভূমিদাসদের স্বাধীন কৃষকে পরিণত করা উচিৎ বলে মনে করল। এদিকে ভূমিদাসরা বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল। এমত অবস্থায় জার ভূমিদাস প্রথা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব বলে মনে করলেন। তিনি একদিকে যেমন বিপ্লবকে ভয় করতেন অন্যদিকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরাজয়ের

শোক ভুলতে পারেন নি। এসব কারণে তিনি ভূমিদাস প্রথা তুলে দিতে মনস্থ করলেন এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি Edict of Emancipation বা এক মুক্তিনামার দ্বারা রাশিয়া হতে ভূমিদাস প্রথা বিলোপের নির্দেশ দিলেন।

ভূমিদাস প্রথার অবসানের ফলে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হল তা আলোচনা করার পূর্বে ভূমিদাসদের অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভূমিদাসদের অবস্থা

প্রথমতঃ রাশিয়ায় প্রাচীন কাল হতেই ভূমিদাস প্রথা চালু ছিল। কালক্রমে এই প্রথা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। রাশিয়ার ভূমির মালিক ছিল জারবংশীয় এবং প্রায় দেড়লক্ষ অভিজাত পরিবার। এরা নিজেরা চাষ করতে পারত না বলে সার্ফদের দ্বারা চাষ করাত। সার্ফদের সাথে জমির সম্পর্ক ছিল নিবিড়। যে খামারে তারা চাষ করত সে খামার সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ ছিল—এক ভাগের (প্রধান অংশের) উৎপন্ন ফসল সম্পূর্ণভাবে মালিক পেতেন, ভূমিদাসরা চাষ করে দিত, অন্যভাগে ভূমিদাসরা নিজ নিজ অংশ চাষ করত এবং উৎপন্ন শস্য তারাই পেত। তবে এই ভূমির ওপর তাদের কোন স্বত্ব থাকত না। এবং এর জন্য তাদের খাজনাও দিতে হত। প্রত্যেক সার্ফের জন্য নির্দিষ্ট জমি থাকলেও সার্ফরা যে গ্রামে বাস করত সেই গ্রামের সমস্ত জমি 'মির' নামে গ্রামের এক যৌথ সংস্থার হাতে থাকত। 'মির' সার্ফদের জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত জমির তত্ত্বাবধান করত এবং সার্ফদের প্রাপ্য ফসল ভাগ করে দিত। এই ফসলের ওপর নির্ভর করেই সার্ফদের জীবনধারণ করতে হত।

এছাড়া জমিদারদের জমিতে সপ্তাহে অন্ততঃ তিনদিন বিনা পারিশ্রমিকে চাষ-আবাদের কাজ করতে হত। জমিদারদের ইচ্ছানুযায়ী বেগারও খাটতে হত। সার্ফরা ক্রীতদাস ছিল না সত্য কিন্তু তারা জমি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারত না। একারণে তাদের ভূমিদাস বলা হয়েছে। নিজের নিজের জমির সাথে তারা এমনভাবে জড়িত ছিল যে ওই জমি হস্তান্তরিত হলে সার্ফরাও হস্তান্তরিত হত। সার্ফদের মালিকের সীমাহীন ক্ষমতা ছিল। প্রয়োজন হলে তাদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থাও মালিকরা করতে পারত।

রাশিয়ায় তখন সার্ফদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি। জারের নিজস্ব জমিদারিতে সার্ফের সংখ্যা ছিল প্রায় এর অর্ধেক। সার্ফপ্রথা রাশিয়ার অগ্রগতি ব্যাহত করছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধেও রাশিয়ায় এই মধ্যযুগীয় প্রথা চালু থাকায় বিদেশে রাশিয়ার সুনাম অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। অবশ্য

সার্ফপ্রথা তুলে দিলে কয়েকটি অসুবিধা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল। যেমন সার্ফদের মধ্যে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হবে, সামন্তদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা শোচনীয় হবে। জার আলেকজাণ্ডার সব দিক বিবেচনা করে এই প্রথা তুলে দিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া হতে সার্ফপ্রথা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হল। এই প্রথার অবসান ঘটিয়ে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন এবং রাশিয়ার প্রাক বিপ্লব যুগের ইতিহাসে তাঁকে মুক্তিদাতা জার বলে (Tsar Liberator) ভূষিত করা হয়।

ফলাফল ও সমালোচনা: ভূমিদাসদের মুক্তিনামায় চারটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল—: (ক) সার্ফদের রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার প্রদান করা হল, (খ) তারা ভূমিদাসত্ব হতে মুক্তি পেল, তারা অংশত জমির মালিক হল; (গ) কিন্তু এই মালিকানা সরাসরি তাদের না দিয়ে মিব (Mir) নামক গ্রাম্য যৌথ সংস্থাকে দেওয়া হ'ল। (ঘ) কৃষকদের জমির মালিকানা পাওয়ার বিনিময়ে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ল। এই ক্ষতিপূরণেব অর্থ কৃষকদের হয়ে 'মির' জমিদারদের দিতে বাধ্য থাকবে বলা হ'ল। যেহেতু তাদের অর্থের অভাব ছিল, সে কারণে সবকার হতে জমির মূল্য ধার্য করে জমিদারদের দেওয়া হল, এবং কৃষকদের নিকট হতে শতকরা ৬ ভাগ সুদে ৪৯ কিস্তিতে এই অর্থ আদায়েব ব্যবস্থা করা হল।

ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ফলে রুশ কৃষকরা আইনত স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তারা পেল না। তারা সরকারেব প্রজা হ'ল এবং জমিদারদের আর বাধ্যতামূলক ভাবে বেগার বা অর্থ দিতে হল না। সমগ্র রাশিয়ার কৃষি যোগ্য জমির প্রায় অর্ধেক মালিক হল কৃষকরা, যদিও এই মালিকানার সর্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের ছিল। কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে জমি ভোগ করতে পেল না। মির (Mir) বা গ্রাম্য-সংস্থা জমির মালিক হল অর্থাৎ জমির উপর যৌথ মালিকানা স্থাপন করা হল। জমি দেখাশুনা করার দায়িত্ব রইল মিরগুলিব ওপর। এবং মিরগুলিই জমির ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য দায়ী রইল। অর্থাৎ ভূমিদাস প্রথার অবসানের ফলে কৃষকরা ব্যক্তির অধীনতা হতে মুক্তি পেল সত্য কিন্তু তার বদলে যৌথ দায়িত্ব বর্তাল! এ ব্যাপারে অভিজাতদেব নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যে সব কমিটি স্থাপন করা হয়েছিল সেগুলির প্রধান লক্ষ্য হল যাতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা না বৃদ্ধি পায়। এরূপ হলে দেশে সর্বহারার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের পক্ষে সেটা মঙ্গলজনক হবে না বলে মনে করা হল। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষকদের জমির সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত করা হল যার ফলে তাদের পক্ষে জমি ছেড়ে শহরে মজুর

হবার জন্য ছুটে যাবার স্পৃহা কম থাকে। এছাড়া, কোন কৃষককে কৃষিকার্য ভিন্ন অন্য অন্য কাজ করতে হলে মির-এর অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হল। আর এই অনুমতি সহজে দেওয়া হত না, কারণ এতে গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের ক্ষতিপূরণের অংশ বেড়ে যাবে বলে। এ কারণে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আগে কৃষকদের পক্ষে কৃষিকার্য ছেড়ে কারখানার শ্রমিক হওয়া খুব সহজ ছিল না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মিরগুলিকে আর ক্ষতিপূরণ দিতে হল না, শেষ কিস্তি এর আগেই শেষ হয়েছিল।

এসব কারণে কৃষকরা ভূমিদাস প্রথার অবসানে খুব সন্তুষ্ট হল না। তারা প্রত্যেকের ভাগে যে জমি পেল জীবিকা নির্বাহের পক্ষে তা পর্যাপ্ত ছিল না। তারা এতদিন পর্যন্ত যে জমিতে বাস করত, চাষ করত তা অধিকার করবার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তারা একেবারে পছন্দ করল না। মির-এর কর্তৃত্ব জমিদারদের কর্তৃত্বের মতই তাদেব নিকট অসহ্য মনে হল। সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত কৃষকরা ভাল জমি পেল না, জমিদাররাই ভাল জমি নিজেদেব নামে রেখে দিলেন। অনুর্বর জমি কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিতে হল। এতে তারা অসন্তুষ্ট হল। রাশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে আবার জমির ক্ষতিপূরণ ছাড়াও কৃষকদের 'মুক্তি পণ' দিতে হল। মিরগুলিতে সাধারণ কৃষকদের স্থান হল না, যদিও এগুলিতে অভিজাতদের স্থান দেওয়া হয়নি, তবুও গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাই এগুলি পরিচালনার ভার নেয়। ফলে তাদের দয়ার ওপর কৃষকদের ছেড়ে দেওয়া হল। আবার জমি সংক্রান্ত বিবাদ মেটাবার জন্য জমিদার শ্রেণী হতে 'Arbiters of Peace' নিযুক্ত করা হল। এরা জমি বণ্টনের সময় তদারক করতে থাকেন।

কৃষকরা এসব কারণে ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধনে খুব খুশী হল না। ফলে রাশিয়ায় কৃষক আন্দোলন শুরু হল। ১৮৬১—'৬৩ মধ্যে এই আন্দোলন খুবই প্রবল আকার ধারণ করে। উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এই সুযোগ ছাড়ল না। তারা কৃষকদের নানাভাবে সাহায্য করতে শুরু করল। ফলে রাশিয়ায় রাজনৈতিক আন্দোলন এক নতুন রূপে দেখা দিল।

কৃষকদের পক্ষে মুক্তি-নামা শুভাশুভ ফল দিলেও অভিজাতদের নিকট এটি আশীর্বাদ স্বরূপ মনে হল। তারা একদিকে রাশিয়ার কৃষিযোগ্য ভূমির অর্ধেক খাসে রাখতে পারল এবং অন্যদিকে সার্ফদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হতেই শুধু রেহাই পেল না, নিকৃষ্ট জমির বদলে ক্ষতিপূরণ পেল। এর ফলে রাশিয়ায় অভিজাত শ্রেণী দুর্বল না হয়ে আরও শক্তিশালী হল। অভিজাতরা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের উদার মনোভাবাপন্ন নীতির বিরোধিতা করল না, বিরোধিতা করল বুদ্ধিজীবিরা।

অর্থনৈতিক দিক হতে কেবল ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধন রাশিয়ায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করল না বা কৃষিকার্যে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হল না। সরকার অভিজাত ও পুরোহিতদের মিরগুলির সদস্য হতে দিল না। এর ফলে কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের দায়িত্ব অনভিজ্ঞ ও উৎসাহহীন লোকেদের ওপর দেওয়া হল। ফলে কৃষি ব্যবস্থায় কোন নতুনত্ব দেখা গেল না; রাশিয়ায় কৃষিকার্যে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ পড়ল না। এদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল, কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেল না। যেহেতু মৃত্যুর পর পুত্ররাই জমির মালিকানা স্বত্ব পেত একারণে মিরগুলির প্রায় একটি দায়িত্ব হল নতুন বংশধরদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করে দেওয়া। জমি খণ্ডিত হতে থাকল এবং চাষের পক্ষে অযোগ্য হল। এর ফলে একজনের যখন জমির পরিমাণ কমে গেল তখন জমির প্রতি তার টান আর রইল না। কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা ছেড়ে দিল। দেশে দুর্ভিক্ষ বারংবার দেখা দিল। তাছাড়া কৃষকদের পক্ষে একই সাথে রাষ্ট্রীয় কর ও ক্ষতিপূরণের অর্থ দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এ কারণে বিপ্লব যাতে না ঘটে তার জন্য সরকার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কৃষকদের বকেয়া ঋণ মকুব করে দিলেন। সুতরাং ভূমিদাস প্রথার বিলোপের ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা যেমন কোন দিক হতেই ভাল হল না, তেমনি রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতিও তার ফলে দেখা গেল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা আনয়নে সাহায্য করল না। বরঞ্চ রাজনৈতিক অবস্থা আরও জটিল হল। জার আলেকজাণ্ডার ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধন করে নিজের শক্তি যেমন বাড়াতে পারলেন না, তেমনি তাঁর প্রতি কেহ কৃতজ্ঞতা দেখাল না। তাঁকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা চলতে থাকল।

তবুও এটি অনস্বীকার্য যে ভূমিদাস প্রথার অবসানে রাশিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা হল। দেশ হতে এক বিরাট সামাজিক অবিচার তুলে দেওয়া হল এবং বিশ্বে রাশিয়া নৈতিক শ্রদ্ধার পাত্র হল। এর কারণ হল রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলোপ করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হয়নি বা রক্তপাত ঘটেনি। কিন্তু রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলোপের প্রায় চার বছর পর দাসত্ব প্রথা বিলোপের প্রশ্নে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গৃহ যুদ্ধ শুরু হয়।

অন্যান্য সংস্কার : ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধনই জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের একমাত্র সংস্কার কার্য নয়, শাসন ব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগেই তিনি সংস্কার সাধন করেন।

বিচার বিভাগ: ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ফলে সার্ফদের উপর জমিদারদের কর্তৃত্বেরও অবসান ঘটল। এ কারণে জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত বিচারালয়গুলিকে টিকিয়ে রাখার আর কোন প্রয়োজন থাকল না। এর বদলে নতুন বিচারালয় স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল। জার আলেকজাণ্ডার বিচার বিভাগে সংস্কার প্রবর্তনের এই সুযোগ ছাড়লেন না। তিনি রাশিয়ার বিচার বিভাগ ঢেলে সাজবার মনস্থ করলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এক ঘোষণার দ্বারা এই সংস্কার শুরু করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই এই সংস্কারকার্য সম্পূর্ণ হল। এর ফলে এক দিকে যেমন বিচারকদের চাকরির স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা বিধান, প্রকাশ্য বিচার ও জুরি প্রথা দ্বারা বিচারের বন্দোবস্ত হল, অন্যদিকে দেশে আইনের শাসন চালু করার সার্থক প্রয়াস চলল। সিনেটকে সর্বোচ্চ আপীল আদালতে পরিণত করা হল। ছোটখাটো অপরাধের জন্য Justice of Peace নিযুক্ত করা হল। এরা স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হত। সাধারণ বিচারালয় হতে আপিল আদালতে আপিল করবার ব্যবস্থা থাকল। 'Regular Tribunal' নামক বিশেষ বিচারালয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিচার করবে বলে ঠিক হল।

স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দান: ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধনে কৃষককুল নানা কারণে অসন্তুষ্ট হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। এই সুযোগে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা উগ্র বামপন্থী ছিলেন তাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার করলেন। এমন কি তাঁরা জারতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা চালালেন। এরকম অবস্থায় জার মনে করলেন যে ভূমিদাসদের মুক্তির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সাথে চালু প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গতিবিধান প্রয়োজন; পশ্চিম ইউরোপের অনুকরণে রাশিয়াতে আধুনিকীকরণের প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন। তিনি আশা করলেন যে আধুনিকীকরণের ফলে দেশের অধিকাংশ লোক গোঁড়া বামপন্থী আন্দোলন হতে দূরে থাকতে চেষ্টা করবে। ফলে বিপ্লব দেখা দেবে না।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে জার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এক ঘোষণার দ্বারা তিনি সমগ্র রাশিয়ায় স্বায়ত্ত-শাসনের বুনিয়াদ স্থাপন করলেন। এই ঘোষণার দ্বারা প্রতি জেলায় Zemstvo বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠনের অনুমতি দিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় সকল শ্রেণীর জনসাধারণের ভোট দেবার অধিকার ছিল। জেলা Zemstvo সমূহের সদস্যরা প্রাদেশিক Zemstvo-এ তাদের প্রতিনিধি পাঠাত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি একবার মাত্র কয়েক

দিনের জন্য অধিবেশনে বসত এবং এই সময় তাদের নিযুক্ত অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত বাৎসরিক কার্য বিবরণী সম্বন্ধে আলোচনা করত। অবশ্য নানা বিষয়ে পরামর্শ দান করে গভর্নমেন্টের কাজে এরা সাহায্য করত। Zemstvoগুলির ওপর স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান এরাই করত। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দায়িত্বও এদের ওপর দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি, জেলখানা প্রভৃতির তদারকী করবার ক্ষমতা এদের ছিল। প্রথম দুবছরে জেলা Zemstvoগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে অর্ধেক ছিল অভিজাত ও অর্ধেক ছিল কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রাদেশিক Zemstvoগুলিতে অভিজাতদের সংখ্যা বেশি ছিল। কৃষকরা জমিদারদের সাথে একজোটে কাজ করতে সমর্থ হয়, কোথাও মনোমালিন্য দেখা দেয়নি। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে এই যে সরাসরি মিলন ঘটল সেটা একটা বিরাট ঘটনা। (এই Zemstvoগুলির মাধ্যমেই রাশিয়ার জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট রাশিয়ার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে ঋণী ছিল। অর্থের অভাবে Zemstvoগুলি তাদের ইচ্ছানুযায়ী জনহিতকর কার্যাবলী সুসম্পন্ন করতে পারত না। অবশ্য এর জন্য দায়ী Zemstvoগুলি ছিল না। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডগুলি যেরূপ কাজ করেছিল তার চেয়ে অনেক ভাল কাজ Zemstvoগুলি করতে সক্ষম হয়। পরিশেষে বলা যায় যে আলেকজাণ্ডার আঞ্চলিক এবং টলস্টয় তাঁদের উপন্যাসগুলিতে রাশিয়ার সামাজিক দোষক্রটিগুলি ফুটিয়ে তোলেন। স্বায়ত্তশাসন দান করলেও জাতীয় সভার ন্যায় কিছু স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। কারণ মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একজন স্বৈরতন্ত্রী শাসক।

শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার: দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার দেশের শিক্ষা সম্বন্ধেও চিন্তা করেছিলেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি আইনের দ্বারা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করলেন। এই আইনে বলা হল যে যেকোন ব্যক্তি বা সংস্থা জনসাধারণের জন্য স্কুল স্থাপন করতে পারে। এই স্কুলগুলি অবশ্য পরিচালিত হবে স্থানীয় Zemstvo-র শিক্ষা কমিটি দ্বারা। এই স্কুলগুলিতে কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। রুশ ভাষার মাধমেই শিক্ষাকার্য প্রদান করতে হবে। অরুশভাষী অঞ্চলের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা করা হল না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

সাধারণ লোকদের ছেলেরাও যাতে ভর্তি হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হল। বালিকাদের জন্য পৃথক স্কুলের ব্যবস্থা হল।

অন্যান্য সংস্কার: ১৮৬৫ তে জার এক নতুন সেন্সর প্রথা প্রবর্তন করলেন। এই নতুন আইনের দ্বারা ঠিক হল যে সংবাদপত্রের সম্পাদক বা গ্রন্থকার বেআইনী কাজ করলে বা আইনের বিরুদ্ধে গেলে তাঁকে প্রকাশ্যে দেশের আইন অনুসারে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। ১৮৭০তে তিনি রাশিয়ার শহরগুলিতে Zemstvoর মত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার অনুমতি দিলেন। অবশ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদেশপাল বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখা হল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জার সামরিক বিভাগেও সংস্কার সাধন করেন। সব শ্রেণীর ক্ষেত্রে ছয় বছরের জন্য বাধ্যতামূলক সামাজিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হল এবং এই শিক্ষার পর ৯ বছর রিজার্ভ বাহিনীতে থাকতে হবে ঠিক করা হল। অবশ্য পরিবারের একমাত্র রোজগেরেকে এই আইনের হাত হতে রেহাই দেওয়া হল। এছাড়া সামরিক বিভাগের প্রতি ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করা হল এবং সামরিক বিভাগকে নতুন ভাবে গড়ে তোলা হল।

প্রথমে দেশের শাসন বিভাগে বিশেষ সংস্কার প্রবর্তিত করা হয় নি। পরে নানারূপ সংস্কার সাধনের ফলে শাসন বিভাগে সংস্কার বা পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল অব্ মিনিস্টার বা মন্ত্রিসভা স্থাপন করা হল। তবে মন্ত্রিসভার স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা রইল না। কারণ জারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হতে জারের নির্দেশে সরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসেব বের করা হতে থাকল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অব রাশিয়া স্থাপন করা হল দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য।

শিল্পায়ন: দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে শিল্পের ক্ষেত্রে রাশিয়া বেশ কিছুটা উন্নতি করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর বিদেশী পুঁজির সাহায্যে রেলপথ প্রসারিত হল। এই রেলপথ প্রসারের ফলে রাশিয়া শিল্পায়নের পথে অনেকটা এগিয়ে গেল। বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এবং কার্পাস শিল্পে প্রভূত উন্নতি দেখা দিল। কয়লা ও খনিজ শিল্পের বুনিয়াদ এই সময় স্থাপিত হয় এবং ইস্পাত শিল্পও ইংল্যাণ্ডের সহায়তায় গড়ে ওঠে। অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় রাশিয়ার শিল্পায়নের কাজ ধীর গতিতে চলতে থাকল। শিল্পে অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রমজীবী সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে শ্রমিকরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিল।

রাশিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদন কম হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা

দিতে লাগল। তাছাড়া রাশিয়ায় কলকারখানাও খুব বেশি সংখ্যায় গড়ে ওঠে নি যার ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারত। অবশ্য অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার হাত হতে রেহাই পাবার জন্য রাশিয়ার অধীনে সাইবেরিয়া, ট্রান্সককেসাস ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যেতে শুরু করে। আগের সরকার অবশ্য জোর করে অবাঞ্ছিতদের এই সব অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠাত।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির সাথে আলেক-জাণ্ডারের প্রবর্তিত সংস্কারগুলির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। সংস্কারগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল স্বৈরাচারী জারের দ্বারা। এগুলির দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলন বন্ধ করা গেল না। রাশিয়ার প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল বিপ্লবী আন্দোলন। আপামর জনসাধারণ এতে যোগ দেয়নি। তবে এর উৎপত্তির মূলে ছিল বুদ্ধিজীবীরা এবং উনিশ শতকের রাশিয়ার সাংস্কৃতিক আন্দোলন। রাশিয়ার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন অভিজাত বা শহরে বসবাসকারী শিল্প বা বাণিজ্যে নিযুক্ত কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এবং সাহিত্যিক। এঁদের দ্বারাই উনিশ শতকে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা যায়।

সংগীতে ও সাহিত্যে রাশিয়া হঠাৎ এত উন্নতি করে যে শুধু রাশিয়াই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে গেল না, ইউরোপের সংস্কৃতিও বিশেষভাবে লাভবান ও ঐশ্বর্যশালী হল। সঙ্গীতকাররা তাঁদের সঙ্গীতের বিষয়বস্তু রাশিয়ার প্রাচীন সাহিত্য ও জনশ্রুতি ও লোকসাহিত্য হতে গ্রহণ করেছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক টুর্গেনেভ, ডসটয়েভ্সকি, টলস্টয় তাঁদের উপন্যাসগুলিতে রাশিয়ার সামাজিক দোষ ত্রুটিগুলিকে ফুটিয়ে তোলেন। এবং এগুলি দূর করবার আগে দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য বলে ইঙ্গিত দেন। যদিও এসব সাহিত্যিক বৃন্দের লেখায় বিশ্বজনীনতা দেখা যায় তবুও তাঁদের লেখার মধ্যে জাতীয়তাবাদ, রুশ জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের তীব্র ইচ্ছা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। তাঁদের রচনাবলী বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক আন্দোলন করতে উৎসাহিত করল। সরকারও এই সব মনীষীদের রচনাবলী নিষিদ্ধ করল না। ফলে একদিকে যেমন বিপ্লবী আন্দোলন দানা বাঁধল, অন্যদিকে সমগ্র বিশ্ব রুশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির গভীরতা সম্বন্ধে জানতে পারল। রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদ বিপ্লবী রূপ নেয়, কারণ এই জাতীয়তাবাদ ছিল ইতিহাসের বিরুদ্ধে, ভাগ্যের বিরুদ্ধে এবং দুঃখময় জীবনের বিরুদ্ধে। টলস্টয় তাঁর War and Peace নামক অমর গ্রন্থের মাধ্যমে রাশিয়ার জনসাধারণের মনে দেশপ্রেমের জোয়ার আনলেন।

রাশিয়ার সঙ্গীতকার ও সাহিত্যিকরা সকলেই অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর হতে রাশিয়ায় যে চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন দেখা দেয় তার নিদর্শন মেলে সংবাদপত্রগুলিতে, সাহিত্যে নয়। হার্জেন ও চারনেসেফস্কি এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। এরা দুজনেই উদারনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের চেয়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তন দাবী করলেন। অবশ্য তাঁরা ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধনে আনন্দিত হলেন। কিন্তু এর ফলাফলে দুজনেই নিরাশ হলেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং যে কোন পুস্তিকা মারফৎ এরা জারের নীতির তীব্র সমালোচনা করলেন এবং জনসাধারণকে বিপ্লবের পথ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। এই সুযোগে রাশিয়ায় মার্কসবাদ ও নৈরাজ্যবাদ বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেল। ফলে সন্ত্রাসমূলক কার্য ঘটতে থাকল এবং এর সাথে সাথে পুলিশী অত্যাচার ও প্রতিশোধ গ্রহণের মাত্রাও বৃদ্ধি পেল।

পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ : রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদের প্রসারে জার আলেকজাণ্ডার ও তাঁর কর্মচারীরা বিশেষ চিন্তিত হলেন না। তবে পোল্যাণ্ড ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে জাতীয়তাবাদের বহিপ্রর্কাশ তাঁদের চিন্তিত করে তুলল। পোলরা রুশসাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শান্তিভঙ্গকারী আন্দোলনবাজ জাতীয়তাবাদী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল। গ্রীকদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেমন সমগ্র ইউরোপ সাড়া দিয়েছিল তেমনি পোলরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সহানুভূতি পেয়েছিল। জার যখন রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা তুলে দিলেন তখন পোলরা আশা করল যে তাদের অবস্থা যাতে ভাল হয় তার জন্য জারের নিকট দরবার করলে তাতে হয়ত সুফল পাওয়া যাবে। রাশিয়ার সার্ফদের মালিকানা প্রবর্তনের এক সপ্তাহের মাধ্যই পোল্যাণ্ডের এগ্রিকালচার সোসাইটি জারের নিকট এক অনুরোধ লিপি পাঠাল যাতে পোলদের দুঃখদুর্দশা দূর করবার জন্য প্রার্থনা জানান হয়। এই সমিতিটি পোল্যাণ্ডে কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু কালক্রমে এটি পোল অভিজাতদের দ্বারা পরিচালিত একটি রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত হয়। এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আনয়ন করা এবং পূর্বেকার পোল্যাণ্ড রাজ্যের সীমানা নিয়ে নতুন পোল্যাণ্ডের উদ্ভব ঘটান। আলেকজাণ্ডার প্রথমে সহানুভূতির সাথে পোলদের অসুবিধাগুলি বিবেচনা করলেন এবং এগুলি দূর করবার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন। এই এগ্রিকালচার সোসাইটি ছাড়াও পোল্যাণ্ড আর দুটি রুশবিরোধী সংস্থা ছিল—রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক পরিচালিত একটি দল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পোল্যাণ্ডে

বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং সামান্য কারণে পোলরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রুশ সরকার এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করল— কৃষকদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে এই বিদ্রোহ হতে দূরে সরিয়ে রাখল। তাছাড়া পোল-বিদ্রোহীরা ইউক্রেন, লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট হতে কোন সাহায্য পেল না। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কঠোর হস্তে পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করলেন। পোলদের আগে যে সব স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা কেড়ে নেওয়া হল এবং সর্বপ্রকারে পোল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্যবোধ নষ্ট করবার চেষ্টা চলল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের পোলিশ বিদ্রোহ ব্যর্থ হল। এই বিদ্রোহে কৃষককুল যোগ দেয়নি। জার আলেকজাণ্ডার পোলিশ জমিদারদের বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করেছিলেন এবং বেশি জমি পাবার লোভ দেখিয়েছিলেন। কৃষকরা বেশি জমি পাবার জন্য উৎসুক ছিল, স্বাধীন হবার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না। তাছাড়া পোলিশ জমিদাররা কৃষকদের স্বার্থের দিকে মোটেই তাকাত না। পোল সরকারও কৃষকদের উন্নতির জন্য কিছু করেনি। একারণে বিদ্রোহের সময় কৃষকরা মনে করল যে ওটি অভিজাতদের বিদ্রোহ, নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য তারা আন্দোলন করছে এবং বিদ্রোহ যখন সাফল্যলাভ করল না তখন জমিদারদের ওপর দোষ ও দায়িত্ব চাপাল। এই বিদ্রোহের ফলে পোল্যাণ্ডের কৃষককুল বিশেষ লাভবান হল। জার এদের অসুবিধাগুলি সহানুভূতির সাথে দেখলেন এবং এরা যাতে রুশ কৃষকদের চেয়ে বেশি জমি পায় এবং কম ক্ষতি-পূরণ দিতে হয় তার ব্যবস্থা করলেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে এমন পরিবর্তন আনা হল যার ফলে কৃষকরা বেশি করে যোগদান করতে পারে। কিন্তু পোল্যাণ্ডের আলাদা অস্তিত্ব রাখা হল না, পুরোপুরিভাবে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হল। 'Kingdom of Poland' নামটি বদলিয়ে রাখা হল 'ভিশ্চুলা প্রদেশদ্বয়'। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়ে তোলা হল যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে পোলদের ধর্ম এবং ভাষা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত বন্ধ হয়ে গেল এবং এর পরিবর্তে একটি রুশ বিশ্ববিদ্যালয় চালু হল। ক্যাথলিক চার্চ স্কুল ও ব্যক্তিগত মালিকানার স্কুলগুলি যাতে না চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা হল এবং রুশ ভাষা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতে থাকল। পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের বিফলতার ফলে পোল জাতীয়তাবাদ রোমান্টিক জগৎ ছেড়ে বাস্তবমুখী হল। এই জাতীয়তাবাদ খারাপ অবস্থায় যতটুকু ভাল করা যায় সে দিকে নজর রাখল। পোল্যাণ্ডে নানারূপ শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা চলল এবং শিল্পজাত দ্রব্যগুলি রুশ সাম্রাজ্যে এক বিরাট বাজার পেল। পোল্যাণ্ডে পশ্চিমী ধাঁচে শিল্পায়ন এবং

অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিল যা রাশিয়ার অন্যত্র দেখা গেল না। সুতরাং পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের বিফলতার অন্যতম ফল হল পোল্যাণ্ডে শিল্পায়ন ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

পোল বিদ্রোহ রাশিয়ার সর্বপ্রকার উদারনীতির সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করল। প্রতিক্রিয়াশীলরা জাবের দুর্বলতা ও উদারনীতিকে এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী করল। এদিকে পোল বিদ্রোহের সুযোগে নিহিলিস্ট (Nihilist) নামে রাজনৈতিক বিপ্লবী দল দেশময় বিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বাবা জাব সরকারকে ভাবিয়ে তুলল। এসব কারণে জাব সংস্কাববিমুখ হলেন এবং দমননীতি অনুসবণ কবতে শুরু করলেন।

তিনি সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রেব স্বাধীনতা কেড়ে নিলেন এবং বিচার-ব্যবস্থার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রত্যাহার করলেন। লঘু অপবাধে গুরু দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হল। কিন্তু এত সতর্কমূমক ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও নিহিলিস্ট দলের কর্মীরা ধ্বংসাত্মক কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে থাকল—বহু সরকারী কর্মচারী এদের হাতে নিহত হল। জাবের প্রাণনাশেরও চেষ্টা চলল। এব ফলে জার আলেকজাণ্ডার তাঁর দমননীতিব বদলে জনসাধারণেব আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ প্রসারিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত করেন। এই কমিশন অনুসন্ধানের পর জারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট যে দিন জার অনুমোদন করে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করবেন ঠিক করলেন ঠিক সেই দিনই তিনি আততায়ীব হাতে নিহত হলেন। এই শোচনীয় ঘটনার ফলে রাশিয়ায় উদারনীতি অনুসাবে বাজ্য শাসন করার চেষ্টা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

বৈদেশিক নীতি : বৈদেশিক নীতিব ক্ষেত্রে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার জোরদার নীতির সাহায্যে বাশিয়াকে প্রাক-ক্রিমিয়া যুগের গৌরবে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা কবেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধেব পরাজযেব ফলে রাশিয়ার সম্মান বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। তাছাডা প্যাবিসের চুক্তিব সর্ত অনুযায়ী বাশিয়া ওয়ালাসিয়া ও মোলডেভিয়ার ওপর অভিভাবকত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের গোঁড়া খৃশ্চানদের ওপর তাব প্রভাব কমে যায়; কৃষ্ণসাগরে তার নৌবহর থাকতে পারল না এবং যে কৃষ্ণসাগরকে রাশিয়া তাব লেক ব'ল মনে কবত সেই সাগরেব নিরপেক্ষতা তাকে মেনে নিতে হল। অবশ্য সাময়িক ভাবে রাশিয়া এটি মেনে নিল। সংক্ষেপে প্যারিসের সন্ধিটি রাশিয়ার নিকট অভিশাপ স্বরূপ মনে হল। সন্ধিপত্রের রুশ বিরোধী শর্তগুলি তিনি ভেঙে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হলেন।

প্রথমে তিনি ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হল। বল্‌কান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ ও রাশিয়ার স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী হওয়ায় তিনি অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। ফ্রান্সের সাথেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠল না। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পোল বিদ্রোহের সময়, ফ্রান্সের রাজা তৃতীয় নেপোলিয়ন বিপ্লবী পোলদের প্রতি সহানুভূতি দেখান এবং রাশিয়ার কার্যাবলীর সমালোচনা করেন। ঠিক এই সময় প্রাশিয়া রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে ইউরোপে প্রাশিয়া রাশিয়ার মিত্র রাষ্ট্র রূপে পরিণত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ক রাশিয়ার সাথে পোল বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। প্রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনকে জার আলেকজাণ্ডারের একটি কূটনৈতিক জয় বলা যেতে পারে। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতিতে রাশিয়ার পুনরাগমন ঘটল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রভাব কমে যায়। প্রাশিয়ার সাথে মিতালির ফলে সেই প্রভাব ধীরে ধীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠি হতে থাকল।

অষ্ট্রিয়ার সাথে রাশিয়ার সম্বন্ধ দিন দিন তিক্ত হল। ফ্রান্সের ব্যবহারও আলেকজাণ্ডার ভুলতে পারলেন না। বিসমার্ক এই সুযোগ গ্রহণ করলেন ১৮৬৬ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে।

জার আলেকজাণ্ডার অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান ও ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থেকে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান সাম্রাজ্য গডে উঠতে সাহায্য করেন। আবার প্রাশিয়ার হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্যারিসের সন্ধির কৃষ্ণসাগর সম্বন্ধীয় শর্তগুলি ভেঙে ফেলবার সুযোগ পেলেন। কৃষ্ণ সাগরে পুনরায় রুশ রণতরী প্রবেশ করল, সিবাস্তোপোল দুর্গ পুনরায় সুরক্ষিত করলেন এবং কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে ক্রিমিয়া যুদ্ধের পূর্বে রাশিয়ার যেরূপ আধিপত্য ছিল তা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হল। গ্রেট বৃটেন এর বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাল কিন্তু পরে বিভিন্ন রাষ্ট্র রাশিয়ার এই কার্যকলাপ মেনে নিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জার আলেকজাণ্ডার জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সাথে এক জোটে ত্রি-সম্রাট সংঘ গডে তুললেন।

কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পর, জার আলেক-জাণ্ডার বল্‌কান অঞ্চল তথা তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি নজর দিলেন। ইউরোপের তৎকালীন রাজনীতি তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করল। ফ্রান্স তখন নিজের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত; অষ্ট্রিয়া ত্রি-সম্রাট সংঘের অন্যতম সদস্য, প্রাশিয়া বন্ধু-রাষ্ট্র। কেবলমাত্র গ্রেট বৃটেন রুশ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে চলছিল। তবে গ্রেট বৃটেন সে সময় নিজের সাম্রাজ্য নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

এই সুযোগে জার আলেকজাণ্ডার বল্‌কান অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৎপর হলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বল্‌কান অঞ্চলে তুরস্কের কুশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ বিদ্রোহ করে। তুরস্কের সুলতান বুলগেরীয়দের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাশিয়া এককভাবে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হল না। ১৮৭৮-এর শুরুতেই রুশ বাহিনী এড্রিয়ানোপল-এ প্রবেশ করল এবং সুলতান বাধ্য হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করলেন। সানস্টেফানোর সন্ধি-দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনায় রাশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল। রাশিয়া বাটুম, কারস্‌, বেসারাবিয়া ও দেব্রুিদজা তুরস্কের নিকট হতে আদায় করল এবং দানিয়ুব হতে ইজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য স্থাপিত হল। সানস্টেফানোর সন্ধি জার আলেকজাণ্ডারের জোরদার পররাষ্ট্রনীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

রাশিয়ার এই বিরাট সাফল্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে গ্রেট বৃটেন ও অষ্ট্রিয়া ভীত হল এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার হুমকী দেখাল। বিসমার্কের জার্মানীও রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল না। ফলে জার আলেকজাণ্ডার সমস্ত পরিস্থিতিটি বিবেচনার জন্য ইউরোপীয় শক্তিসমূহের এক বৈঠক আহ্বান করতে সম্মত হলেন। ফলে বার্লিন নগরে একটি বৈঠক বসল (১৮৭৮)। এই বৈঠকে সানস্টেফানোর সন্ধি বাতিল বলে গণ্য হল। এক নতুন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। এটিকে বার্লিনের সন্ধি বলে। বুলগেরিয়া হতে রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হল। অবশ্য রাশিয়া বেসারাবিয়া, কারস্‌, বাটুম ও আর্মেনিয়ার কিছু অংশ পেল।

বার্লিন সন্ধির ফলে রাশিয়ার সাথে জার্মানীর সম্পর্কে ভাঙন দেখা গেল। বিসমার্ক রাশিয়াকে ছেড়ে অষ্ট্রিয়াকে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে মনে করলেন এবং অষ্ট্রিয়ার সাথে দ্বি-শক্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত করলেন। জার আলেকজাণ্ডার নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন না। ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার সম্বন্ধ যাতে স্থাপিত হতে পাবে তার সূচনা তিনি করে যান।

বার্লিন সন্ধির ফলে বল্‌কান অঞ্চলে রাশিয়ার সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে গেল। জার আলেকজাণ্ডার এতে নিরুৎসাহ হলেন না। তিনি সুদূর প্রাচ্যে এবং মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হলেন। চীনের সাথে এক সন্ধি সাক্ষরিত করে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তবর্তী ভ্লাডিভস্টক বন্দর এবং আমুর নদী বিধৌত কয়েকটি অঞ্চল রাশিয়ার অধিকারে আনেন। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাজনীতিতে রাশিয়া এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এছাড়া মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রাশিয়া নিজের আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। উজবেকিস্তান,

তাজাকিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ক্রমে এসব অঞ্চল রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রুশ সাম্রাজ্যের সীমানা পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

More Questions

1. Discuss the internal power of Nicholas I consequent on the Decembrist revolt.

Ans. ২নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

2. Discuss the claim of Alexander II to be regarded as 'Tsar Liberator.'

Ans. ৩নং প্রশ্নের আলেকজাণ্ডারের আভ্যন্তরীণ সংস্কার সমূহ দেখ।

3. Analyse the reforms introduced by Alexander II with special reference to the good and bad effects of the Agrarian reform.

Ans. ৩নং প্রশ্নের আনুসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

4. Discuss the internal policy of Alexander II clearly demarcating the periods 1855-1865 and 1866-1881.

Ans. বৈদেশিক নীতি বাদ দিয়ে ৩নং প্রশ্ন দেখ।

Q. 4. Discuss the foreign power of Alexander II.

Ans. ৩নং প্রশ্ন দেখ।

Q. 5. Discuss the main features of the Polish revolt of 1863 What were it results ?

Ans. ৩নং প্রশ্ন দেখ।

Q. 6. What were the results of the reforms introduced by Alexander II. Why did these reforms fail ?

Ans. জার আলেকজাণ্ডার বিভিন্ন প্রকার সংস্কার সাধন করে রাশিয়াকে ইউরোপের একটি উন্নতশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এই সংস্কারগুলির ফলে রাশিয়ার জাতীয় জীবনে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। রাশিয়ার অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। জনসাধারণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য সচেষ্ট হয়। জার কিন্তু তাঁর সংস্কারকার্য বেশিদিন চালাতে পারলেন না। ফলে জনসাধারণ বিপ্লবের পথই বেছে নিল।

সংস্কারের ব্যর্থতা : জার আলেকজাণ্ডারের সংস্কার প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করেনি। প্রথমত রাশিয়ার পশ্চাদপদ অবস্থা এর জন্য অনেকটা দায়ী ছিল। দ্বিতীয়ত তিনি যে সব সংস্কার প্রবর্তন করলেন সেগুলির সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন ছিল শিক্ষিত, কর্মক্ষম, দুর্নীতিমুক্ত কর্মচারীর। কিন্তু তৎকালীন রাশিয়ায় এরূপ কর্মচারীর দেখা পাওয়া যেত না। তৃতীয়ত, পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ তাঁর সংস্কারপন্থী মনকে প্রতিক্রিয়ার দিকে নিয়ে আসে। তিনি গোঁড়া প্রতিক্রিয়াপন্থী হয়ে পড়লেন। ফলে পূর্বেকার সংস্কারগুলির বাস্তবে রূপায়িত হল কিনা সে সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। সবশেষে, নিহিলিস্টদের আন্দোলন তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে ব্যাহত করল।

Q. 7. Analyse the main features of the Nihilist movement and discuss the causes of its failure.

Ans. উনিশশতকের শেষার্ধে রাশিয়ার স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে মতবাদগুলি দেখা দেয় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেগুলির মধ্যে নিহিলিজম বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করেন। ফলে গোটা দেশে হতাশার ভাব দেখা যায়। এই হতাশার ভাব হতেই নিহিলিজমের উৎপত্তি। রাশিয়ার কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী মনে করলেন যে রাশিয়ার সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দরকার। এই পরিবর্তন কখনই আনা যাবে না যদি না রাজনৈতিক কাঠামো বদলাতে পারা যায়। এই ধারণা হতে নিহিলিজম শক্তি সঞ্চয় করে।

বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক টুর্গেনিভ তাঁর Fathers and Sons নামক গ্রন্থে 'নিহিলিজম' শব্দ ও এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এই গ্রন্থে যে ব্যক্তি কোন প্রকার কর্তৃত্বের নিকট মাথা নোয়ায় না, বা কোন প্রচলিত বিশ্বাসমূলক মতবাদে আস্থা রাখে না তাকে নিহিলিস্ট বলা হয়েছে। নিহিলিস্টরা প্রচলিত প্রথা প্রতিষ্ঠান, সংস্কার, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম সব কিছুই ধ্বংসযোগ্য বলে মনে করত। কারণ এগুলিকে ধ্বংস করতে না পারলে নতুন সমাজ গড়ে উঠবে না। এদিক হতে দেখলে নিহিলিজমকে নেতিমূলক মতবাদ বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতভাবে বিচার করলে নিহিলিজম কেবল ধ্বংসই চাইত না। তাদের সৃষ্টিধর্মী মনোভাবও ছিল। তারা ধর্মের স্থানে বিজ্ঞান, ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিস্বত্ববাদ, ব্যক্তিগত স্বার্থের বদলে সাধারণ স্বার্থ এবং কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পরিবর্তে স্বাধীন কমিউন নিয়ে গঠিত যৌথরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা তারা বলত। সুতরাং নিহিলিজম সার্বিক ধ্বংসবাদ নয়।

নিহিলিস্ট আন্দোলনে মোটামুটি তিনটি পর্যায় দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং পুঁথিগত আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই পর্যায়ের মূল প্রবণতা ছিল 'বুদ্ধিবৃত্তির মুক্তি'। এর উদ্দেশ্য ছিল এমন মানুষ তৈরি করা যারা কোন কিছুরই নিকট মাথা নত করবে না, কোন কিছু ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করবে না, Metaphysicsএর বদলে Physicsকে গ্রহণ করবে এবং যুক্তির কষ্টি-পাথরে সমস্ত কিছু যাচাই করবে। এ যেন অনেকটা প্রজ্ঞাবাদের মত। এই পর্যায়ের আন্দোলনের ফলে রাশিয়ায় স্ত্রী জাতির মুক্তির দিনের সূচনা হল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরু হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হতে। নিহিলিস্টরা এই সময় অনুপ্রেরণা লাভ করে প্যারি কমিউন, প্রথম ইণ্টারন্যাশনাল হতে। রাশিয়াতে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের প্রবর্তিত সংস্কারগুলি ব্যর্থ হওয়ায় নিহিলিস্টরা তাদের আন্দোলন জোরদার করবার সুযোগ পেল। এই পর্যায়ে নিহিলিস্টরা চিকিৎসক, নার্স, শিক্ষক, শিল্পী ও শ্রমিকরূপে দেশবাসীর সাথে নিবিড় ভাবে মেশবার চেষ্টা করলেন এবং গোপনে তাঁদের মতবাদ প্রকাশ করলেন।

জার সরকার এই সময় নিহিলিস্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করল। হাজার হাজার লোককে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান হল। এদিকে নিহিলিস্টরা দেখলেন যে তাঁরা জনসাধারণের অন্তর জয় করতে পারলেন না। তাছাড়া নিহিলিস্টদের মধ্যেই নানা দল-উপদলের সৃষ্টি হল। ফলে আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় শুরু হল। এই পর্যায়ে কিছু সংখ্যক নিহিলিস্ট সন্ত্রাস পন্থা গ্রহণ করলেন। এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল জারকে হত্যা করা। এঁদের হাতে বহু উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী নিহত হল। জারের প্রাণনাশের চেষ্টাও চলতে থাকল। জার কিছুটা ভীত হলেন এবং রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের কথা ভাবতে লাগলেন। তিনি Zemstvoগুলির সহায়তায় একটি শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন এবং এ বিষয়ে একটি কমিশন নিযুক্ত করলেন। কমিশনের রিপোর্ট যে দিন তিনি প্রকাশ করবার মনস্থ করলেন ঠিক সেই দিনই (১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ) জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিহিলিস্টদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে নিহত হলেন। ফলে একদিকে যেমন রাশিয়ায় উদারনীতি অনুসৃত হবার সকল আশা দূর হল, অন্য দিকে নিহিলিস্ট আন্দোলনও বন্ধ হয়ে গেল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

তৃতীয় নেপোলিয়ন ও দ্বিতীয় সাম্রাজ্য

Q. 1. Describe the circumstances which led to the establishment of the Second Empire in France under Napo'eon III.

Ans. ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের রাষ্ট্র বিপ্লবে রাজা লুই ফিলিপ সিংহাসনচ্যুত হয়ে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবি লার্মাটিন সাথে সাথে চেম্বার অব ডেপুটিজ-এ ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকারের নাম ঘোষণা করলেন। পরিষদের কয়েকজন উদারনৈতিক সদস্যদের নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়। লার্মাটিন নিজে বৈদেশিক মন্ত্রী হন এবং নরমপন্থী লেড্রুং রোলিন হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই সরকার গঠন করা সহজ হলেও এই সরকারের কর্তৃত্ব প্যারিস ও সমগ্র ফ্রান্সে সুপ্রতিষ্ঠিত করা কষ্টসাধ্য ছিল। এই সরকারের পিছনে ফ্রান্সের Le National নামক বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রটি ছিল কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা এই সরকারকে মানতে চাইল না এবং Le Reform সংবাদ পত্রটি সরকার-বিরোধী ছিল। অস্থায়ী সরকার সমাজতন্ত্রীদের হাত করবার জন্য লুই ব্লাকে ও আলবার্টকে মন্ত্রিসভায় যোগদান করবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাল। বহু আলোচনার পর সাধারণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে একটা রফা হল। এতে ঠিক হল যে অস্থায়ী সরকার ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে ইচ্ছুক, অবশ্য এ সম্বন্ধে যথা সময়ে জনসাধারণের মতামত নেওয়া হবে। 'যথা সময়ে মতামত নেওয়া হবে' এই কথা কয়টিই প্রমাণ করে দেয় যে তৎকালীন ফ্রান্সে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ফ্রান্সের ভাবী সরকার সম্বন্ধে মতবিরোধ ছিল। উদারনৈতিকরা সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিল। উগ্র গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা সর্বজনীন ভোটাধিকার দাবি করল এবং এমন প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করতে চাইল যে সরকার ফ্রান্সে সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তন করবে। অস্থায়ী সরকারে যে সব সদস্য ছিল তাদের মধ্যে এক আলবার্ট ছাড়া অন্য সকলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁরা কেউই বিরাট পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৮৪৮-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী জনতা লালঝাণ্ডাকে ফরাসী রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য দাবি জানাল কিন্তু লামার্টিনের আবেগপূর্ণ বক্তৃতার ফলে তারা এই দাবি প্রত্যাহার করে নিল। ফলে প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকাই ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা রয়ে গেল। কিন্তু

এর দ্বারা জনতার হাত হতে অস্থায়ী সরকার রক্ষা পেল না। উগ্রবামপন্থী সমাজতন্ত্রীরা ব্লাঙ্কীর নেতৃত্বে সরকারকে সদাসর্বদা ব্যস্ত রাখল। রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতিগুলিও এই সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অস্থায়ী সরকার শ্রমিক শ্রেণীর নিকট জনপ্রিয় হবার জন্য তাড়াতাড়ি কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করল। প্যারিস শহরে শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হল। প্রদেশসমূহেও এই নীতি বলবৎ করা হল। বিপ্লবের মূলমন্ত্র 'Right to work' সরকার মেনে নিল! এবং প্যারিসে বেকার লোকের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে জাতীয় কলকারখানা (National workshop) খোলা হল। এগুলিতে শ্রমিকদের কোন কাজের ব্যবস্থা ছিল না, সরকার হতে খুব অল্প বেকার ভাতা দেওয়া হতে থাকল। মনে হয় সমাজতন্ত্রী দলকে লোকচক্ষে হেয় করবার জন্যই এরূপ করা হয়েছিল। লুই ব্লা কিন্তু এটি চাননি; তিনি চেয়েছিলেন সমবায়ের ভিত্তিতে কারখানা চালু করা। অস্থায়ী সরকার শ্রমিকদের সমস্যাগুলির প্রতি নজর রাখবার জন্য লুই ব্লার সভাপতিত্বে একটি কমিশনও স্থাপন করেছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও নাগরিকদের অন্যান্য মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হল। এছাড়া ঘোষণা করা হল যে এপ্রিল মাসে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে ফ্রান্সের ভোটদাতাদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেল (২ লক্ষ হতে ৯০ লক্ষ)। কিন্তু ভোটদাতারা অধিকাংশই নিরক্ষর ও কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল—যাদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব বিশেষ করে দেখা গেল।

সাধারণ নির্বাচনের দিন এপ্রিল মাসে ঠিক করার ফলে রক্ষণশীলদের সুবিধা হল। কৃষককুল ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চিন্তিত হয়ে পড়ল। জাতীয় কর্মশালার সংবাদ তারা ইতিমধ্যেই পেয়েছিল। তারা মনে করল সমাজতন্ত্রীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেলে জমির ওপর মালিকানা স্বত্বও তুলে দেওয়া হবে। একারণে এপ্রিল মাসের নির্বাচনের ফলাফল পূর্ব হতেই ঠিক হয়ে গেল। এই নির্বাচন শেষে দেখা গেল শতকরা ৮৪ জন ভোট দিয়েছিল এবং এদের মধ্যে অধিকাংশট ভোট দিয়েছিল বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। ফলে সংবিধান সভায় ৮৭৬টি আসনের মধ্যে সমাজতন্ত্রীরা মাত্র ১০০টি আসনে জয়ী হয়। সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাজতন্ত্রী বা উদারনৈতিক দলভুক্ত বা প্রজাতন্ত্রী। মে মাসে এই সংবিধান সভার অধিবেশন বসলে অস্থায়ী সরকার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা এই সভার নিকট হস্তান্তরিত করে দেয়। সংবিধান সভা

দেশের শাসনকার্য চালিয়ে যাবার জন্য একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করল। এই কাউন্সিল হতে লুই ব্লাঙ্ককে ইচ্ছা করে বাদ দেওয়া হল। ফলে বামপন্থীরা বল প্রয়োগ করে ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য চেষ্টা করল। মে মাসের ১৫ তারিখে এক বিরাট বামপন্থী সশস্ত্র জনতা সংবিধান সভা আক্রমণ করে দখল করে নেয় এবং এই সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। হোটেল ডি ভিলিতে ব্লাঙ্কী, বারবেন প্রমুখ উগ্র বামপন্থী নেতারা এক আপতকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার স্থাপন করলেন। এটিকে ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিপ্লব বলা যায়। প্যারিসের জনতা এই বিপ্লবের দ্বারা ফ্রান্সের অন্যান্য অঞ্চলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে চাইল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হল। এবার জাতীয় রক্ষীদল পরিষদের পক্ষে থেকে জনতাকে শায়েস্তা করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। প্যারিসের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য একটি রক্ষীদল গড়ে তুলে ছিল। এই রক্ষীদল জনতার অভ্যুত্থান ধ্বংস করবার জন্য জীবন পণ করল। তারা প্রথমেই সংবিধান সভাকক্ষ হতে জনতাকে হটিয়ে দিল। ব্লাঙ্কী এবং বারবেনকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। বামপন্থীদের সমস্ত ক্লাব ও সমিতিগুলি ভেঙে দেওয়া হল। লুই ব্লা দেশ ছেড়ে পালালেন। আলবার্ট বন্দী হলেন। এব পর হোটেল ডি ভেলি পুনরধিকাব কবা হল। সর্বজনীন ভোটাধিকারে যে প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাব বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রীবা শুধু নিজেদের সর্বনাশই ডেকে আনল না, রক্ষণশীলদেব ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দিল। সমাজতন্ত্রীদের এই সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান এবং রাজপথে সংগ্রাম জনসাধারণের নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রতিও বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলল। ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক শক্তিগুলির ক্ষমতা কমে গেল। ফলে রক্ষণশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি পুনবায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

১৮৪৮-এর ২১শে জুন জাতীয় কর্মশালা বন্ধ কবে দেওয়া হলে প্যারিসের শ্রমিক সম্প্রদায় বিপ্লবের গান গাইতে গাইতে রাজপথে জমায়েত হল। দুদিন পরে তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এটি শ্রমিক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান বলে মনে হয়। নিরুৎসাহিত শ্রমিক শ্রেণী শোষণেব বিরুদ্ধে এই প্রথম মাথা তুলল এবং প্যারিসে প্রকৃত পক্ষে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হল। শ্রমিক শ্রেণীকে সার্থক বিপ্লবের পথে পরিচালিত করবার মত নেতা সেই সময় প্যারিসে ছিল না। ফলে বিপ্লব বিপথগামী ও ব্যর্থ হল। সেনাপতি কাভিকন্যাকের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে সরকার এই বিপ্লবের মোকাবিলা করতে চাইলেন। কাভিকন্যাক সামরিক বাহিনী

নিয়োগ করলেন এবং কামানের মুখে বিপ্লবীরা দাঁড়াতে পারল না। ২৫শে জুনের মধ্যেই এই অভ্যুত্থানের পরিসমাপ্তি ঘটল। এর পর চলল শ্রমিক নিধন যজ্ঞ। প্রায় ১১ হাজার ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করে নানারূপ শাস্তি দেওয়া হল। প্রায় ১০ হাজার ব্যক্তি এই বিপ্লবে প্রাণ দেয়। এ হতে শ্রেণী-সংগ্রামের রুদ্রমূর্তি সম্বন্ধে ধারণা হয়। জুনের অভ্যুত্থান ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের আশা সমূলে বিনাশ করল। প্রতিক্রিয়াশীলরা শাসনযন্ত্র হস্তগত করল। এদিকে দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের মত শাসনতন্ত্রের রচনা সম্পূর্ণ হল। এই শাসনতন্ত্রে 'কাজ পাবার অধিকার' স্বীকার করা হল না। তাছাড়া, দেশের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়া হল যিনি চারবছরের জন্য জনসাধারণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে ঠিক হল। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক-কক্ষ-বিশিষ্ট আইন সভা গঠিত হবে বলে বলা হল। ৭৫০টি আসন-বিশিষ্ট এই আইন সভার নির্বাচন প্রতি তিন বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল চার বছর করা হয় এবং একবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না বলে উল্লেখ করা হয়। রাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হল। সামরিক বেসামরিক বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, আইনের খসড়া রচনা প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির কর্ম পরিসরের মধ্যে আনা হল। এর ফলে সামরিক একনায়ক-তন্ত্রের পথ সুগম হল।

১৮৪৮-এর শেষের দিকে নতুন শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলে দেখা গেল যে নেপোলিয়নের ভ্রাতুস্পুত্র লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর 'নেপোলিয়ন' নামটাই তাঁকে নির্বাচনে জয়ী করে। পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী লুই নেপোলিয়নকে জনসাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতীক বলে মনে করল এবং এর জন্যই তারা তাঁকে বিপুল ভোটাধিক্যে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করল। লুই নেপোলিয়ন সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিলেন এবং ঘোষণা করলেন 'যারা এই চালু শাসনতন্ত্র বদলাতে চেষ্টা করবে তাদের তিনি দেশের ও জাতির শত্রু বলে মনে করবেন।'

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পথে: লুই নেপোলিয়ান খুবই দুরাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর সামনে একমাত্র আদর্শ ছিল জ্যেষ্ঠতাত নেপোলিয়ানের জীবনী। তিনি চালু শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেখালেও মনে প্রাণে ওটি গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন যে ফ্রান্সের অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রজাতন্ত্র চায় না। এবং প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা তিনি সহজেই ধরে ফেললেন। ১৮৪৯-এর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখে

তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ফরাসীরা বর্তমান শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। নতুন আইন সভায় রাজতন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। নেপোলিয়ান খুব সর্তকভাবে নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে বসাবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন এবং নিজেই সেই সুযোগ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলেন। প্রথমত, তিনি সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদ-গুলিতে নিজের সমর্থকদের নিযুক্ত করলেন। দ্বিতীয়ত, জনসংযোগের জন্য সমগ্র দেশ ভ্রমণ করলেন এবং জনসাধারণকে তাঁর আদর্শ ও নীতি সম্বন্ধে অবহিত করলেন। তৃতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ রোমান ক্যাথলিকদের সন্তুষ্ট করবার জন্য রোমে পোপের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটি ফরাসী সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন এবং রোমে ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডি প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদে দ্বিধা করলেন না। চতুর্থত, কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ঘটনাকে কাজে লাগালেন: (ক) রাজতন্ত্রীদের দ্বারা প্রভাবিত আইন সভা সমাজতন্ত্রীদের প্রতি খুবই বিরূপ ছিল। তাদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করবার জন্য একদিকে যেমন আইন সভার সমাজতন্ত্রী সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হল, অপর-দিকে প্রায় তিরিশ লক্ষ ব্যক্তির ভোটাধিকাব আইনের সাহায্যে হবণ করা হল। যারা ভোট দেবার অধিকাব হারাল তাদের মধ্যে অধিকাংশ হল শ্রমিক শ্রেণী আর এরাই ছিল সমাজতন্ত্রের সমর্থক। সংবাদপত্র, সভাসমিতি ও নাগবিকদের অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলি একে একে হরণ করা হল। (খ) আইন সভা যখন এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে তখন লুই নেপোলিয়ন কোন উচ্চবাচ্য না করে আইন সভাকে সমর্থন জানান। (গ) এর পর লুই নেপোলিয়নের কার্য-কালের মেয়াদ ফুরিয়ে এল। তাঁর পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও সংবিধান অনুযায়ী তিনি আর রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারবেন না। তিনি প্রথমে আইন সভার মতিগতি বুঝে নিলেন। সদস্যরা তাঁকেই পুনরায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ কববার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সদস্যরা সংবিধানে পরিবর্তন আনতে ইচ্ছুক হলেন না। উপায়ান্তর না দেখে নেপোলিয়ন হঠাৎ ক্ষমতা দখল করবার জন্য পরিকল্পনা নিলেন। (ঘ) তিনি গণতন্ত্রের সমর্থক বলে জনসাধারণের নিকট জাহির করলেন এবং ভোটাধিকার সংকোচন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি তাঁর ইচ্ছাব বিরুদ্ধে ঘটেছে বলে প্রকাশ করলেন এবং এগুলি অচিরে নাকচ করে দেওয়া উচিত বলে ঘোষণা করলেন। এরপর এগুলি বাতিল করে দেবার জন্য আইন সভার নিকট প্রস্তাব পাঠালেন। আইন সভা তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দিলে তিনি তাঁর অনুগত সৈন্যদলের সাহায্যে হঠাৎ আইন সভা আক্রমণ করে রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী সদস্যদের বন্দী করলেন (২রা ডিসেম্বর ১৮৫১) এবং জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করলেন যে প্রজাতন্ত্র ও

জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করবার জন্যই তিনি এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। এটা প্রমাণ করবার জন্য তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনরায় চালু করলেন। এরপর তিনি জনসাধারণকে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে থাকবার মেয়াদ দশ বছর করতে বললেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ সেই সময় তাঁকে ফ্রান্সের রক্ষাকর্তা বলে মনে করছিল। এ কারণে তাঁকে দশ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করতে জনসাধারণ দ্বিধা করল না। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জন্য নতুন এক শাসনতন্ত্র চালু করলেন। এই শাসনতন্ত্রে লুই নেপোলিয়ন নিজের হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা করলেন। সংক্ষেপে ফ্রান্সে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার কার্যকরী সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হল। এর সাথে সাথে সমগ্র দেশে দমননীতি চালান হল এবং লুই নেপোলিয়নের বিরোধী পক্ষদের শক্তি চূর্ণ করে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য ফ্রান্সের জনসাধারণ সানন্দে এই নতুন শাসনতন্ত্র মেনে নিল। লুই নেপোলিয়ন এইবার প্রজাতন্ত্র রাজ্যটিকে সাম্রাজ্যে পরিণত করতে ইচ্ছুক হলেন। অবশেষে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রায় সর্বসম্মত ভোটের বলে লুই নেপোলিয়ন তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের উত্তরাধিকারী রূপে **তৃতীয় নেপোলিয়ন** নামে ফ্রান্সের সম্রাট বলে বিঘোষিত হলেন।

Q. 2. Describe the home and foreign policy of Napoleon III. Why did he fail? *Or,* Give an account of the character and statesmanship of Napoleon III.

Ans. ১৮৪৮-এর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রীদেরই হতাশ করল না, ফ্রান্স উদারতন্ত্র বা গণতন্ত্রের পথে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের পর যতটা এগিয়ে গিয়েছিল সেই যাত্রাপথে হঠাৎ বিরতি পড়ল, কারণ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ক্ষমতা হস্তাগত করে যে শাসন প্রবর্তন করলেন সেটিকে একনায়কতন্ত্রী শাসন নামেই অভিহিত করতে হয়। তাঁর শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিপতিদের ও চার্চের সম্পদ রক্ষা করা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল নীতি মেনে চলা। এত দোষ থাকা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেছিলেন এবং দেশের অগ্রগতির (progress) সাথে শান্তি-শৃঙ্খলার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা প্রমাণ করবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। তবে তাঁর এই প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেনি। তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে অবশ্য ফ্রান্স অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে খুবই উন্নতি করে এবং তাঁর শাসনের শেষের দিকে ফ্রান্সে পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসন শুরু হয়।

ভূমিকা

১৮৪৮-এর বিপ্লবের পর ফ্রান্সে যে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তবে প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করে লুই নেপোলিয়ন ক্ষমতা হস্তগত করবেন একথা কেউই ভাবেন নি। কারণ লুই নেপোলিয়ন তখন ফ্রান্সে অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন।

জীবনী : লুই নেপোলিয়ন ছিলেন সম্রাট নেপোলিয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন নেপোলিয়ন তাঁর ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। লুই নেপোলিয়নের ভাগ্যে কিন্তু সুখভোগ বেশিদিন ছিল না। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর তিনি ও তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের জীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে এল। লুই নেপোলিয়নের কৈশোর ও যৌবন দুঃখকষ্টের মধ্যে কাটল। প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডে ও পরে ইটালীতে বসবাস শুরু করলেন। ইটালীতে এসে কারবোনারি নামক গুপ্ত রাজনৈতিক দলের একজন সক্রিয় সদস্য হন। ইটালী সম্বন্ধে এই সময় তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন পরবর্তীকালে ইটালীর দিক হতে তা শুভদায়ক হয়েছিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের ঐতিহ্যবাদী জনসাধারণ সম্রাট নেপোলিয়নের মহান আদর্শ ও গৌরবের কাহিনী ছড়াতে শুরু করল। তৎকালীন অশান্তির যুগে ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে নেপোলিয়ন ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা দেখা গেল। আর এর সাহায্যেই ফ্রান্সে বোনাপার্টিস্ট আন্দোলনের সূচনা হল এবং ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হল। লুই ফিলিপের শাসনকালে লুই নেপোলিয়ন জনসাধারণের এই নেপোলিয়ন-প্রীতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করলেন। ১৮৩৬ এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে স্টাসবুর্গ ও বুলোনে লুই নেপোলিয়ন বিদ্রোহের দ্বারা ফরাসী সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৮৩৬-এর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর তিনি ফরাসী সরকারের হাতে ধরা পড়েন এবং আমেরিকায় তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখান হতে তিনি পুনরায় ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন এবং ১৮৪০-এ ফ্রান্সে অবতরণ করেন। এবার ধৃত হয়ে তাঁর ছ বছরের জন্য জেল হয়। কিন্তু জেলখানা হতে তিনি ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। ইংল্যাণ্ডে তিনি স্পেশাল কনেস্টবলের চাকরি নেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করলেন। ফ্রান্সে নতুন উদ্দীপনায় ফিরে এলেন এবং জনসাধারণের সমর্থনে জাতীয় সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। এর পর তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে নয়া ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন।

সম্রাটরূপে: রাষ্ট্রপতি হয়ে লুই নেপোলিয়ন জাতীয় সভার সদস্যদের সাথে মিলে মিশে কাজ করতে পারলেন না। তিনি জনসাধারণের সহায়তা লাভ করতে চেষ্টা করলেন এবং সহজেই সেটি পেলেন। তিনি প্রথম হতেই সম্রাটপদে উন্নীত হওয়ার জন্য খুবই সতর্কতা অবলম্বন করলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করে শাসনতন্ত্রের কর্তৃত্ব হস্তগত করলেন। পরবৎসর (১৮৫২) তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করলেন। লুই নেপোলিয়ন তৃতীয় নেপোলিয়ন হলেন এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন।

উদ্দেশ্য ও কর্মনীতি: লুই নেপোলিয়ন নিজেকে তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। যৌবনে তিনি সম্রাট নেপোলিয়নের জীবনী ও কর্মকীর্তি সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে নিজে যে মূল্য নিরূপণ করেন সেটাই সঠিক বলে দৃঢ় বিশ্বাস করতেন। এ সম্বন্ধে তিনি 'Napoleonic Ideas' নামে একটি পুস্তকও রচনা করেছিলেন। এই পুস্তকে স্বনামধন্য নেপোলিয়নের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল, কিভাবে তিনি সেই উদ্দেশ্যে পৌছাতে চেয়েছিলেন এবং কেন পৌছাতে পারলেন না, কারা তার জন্য দায়ী ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যক্ত করেন।

এই পুস্তকে বলা হয় যে প্রথম নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক আদর্শগুলি বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যই সাময়িকভাবে একনায়কতান্ত্রিক শাসন ফ্রান্সে প্রবর্তন করেছিলেন কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত গণতন্ত্রের স্থাপনা করা। কিন্তু এই গণতন্ত্র তিনি স্থাপন করতে পারলেন না ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধিতার জন্য। অতএব লুই নেপোলিয়ন জ্যেষ্ঠতাতের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে চান বলে প্রচার করলেন।* তাঁর এই প্রচারে ফরাসী জনসাধারণ মুগ্ধ হল এবং তাঁকে ক্ষমতায় বসাল। অতএব তৃতীয় নেপোলিয়নের আদর্শ ছিল প্রথমে স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তন, যার ফলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং পরে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। এর সাথে সাথে অবশ্য বিদেশে ফ্রান্সের প্রভাব প্রতিপত্তি পুনরায় স্থাপনের কাজ সমানে চলবে। সংক্ষেপে তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ নীতি ছিল দেশে শান্তিশৃঙ্খলা আনয়ন করা এবং জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘব করা।

'The new empire that thus came into being was in theory the ideal of paternal monarchy' ***Grant and Temperley.***

আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা: তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থাকে দুটি পর্যায়ে ফেলা যায়: (ক) ১৮৫২ হতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর শাসনের প্রথম পর্যায় কাল হিসেবে ধরা হয়। এই সময় তিনি স্বৈরতন্ত্রী প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে গণ্য হন আর (খ) ১৮৬০ হতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর শাসনের দ্বিতীয় পর্যায়কালে তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে দেশ শাসন করবার চেষ্টা করেন। এই যুগটিকে উদারনৈতিক সাম্রাজ্যের যুগও বলা হয়।

শাসন ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়: লুই নেপোলিয়ন সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে এক স্বৈরতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক কাঠামো ঠিক রইল কিন্তু আসলে সম্রাটের সর্ব ব্যাপারে একক প্রাধান্য স্থাপিত হল। যেমন, নতুন সংবিধানে ঠিক হল যে, (ক) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তিন বছরের জন্য একটি আইন সভা থাকবে। এই আইন সভার আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট হল ২৫১। আইন সভার অধ্যক্ষ সম্রাট নিজে নিয়োগ করবেন। মন্ত্রীও তিনি নিয়োগ করবেন এবং এ কারণে আইন সভার নিকট তারা তাদের কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন না। সম্রাটই কেবল মাত্র আইনের প্রস্তাব করতে পারবেন। সংক্ষেপে, আইন সভার কোন ক্ষমতাই রইল না। (খ) প্রবীণ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সিনেট গঠিত হবে। এর সমস্ত সদস্য সম্রাট মনোনীত করবেন এবং সদস্যরা আমৃত্যু সভ্য থাকবেন। সংবিধানের রক্ষক হিসেবে সিনেট কাজ করবে এবং এমনকি সংবিধানের পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন সিনেটের দ্বারাই হবে। (গ) একটি রাষ্ট্র পরিষদ (council of states) গঠিত হবে। এই পরিষদের কাজ হবে দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করা। এই পরিষদের অধ্যক্ষ সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। এ ছাড়া দেশের সামরিক বাহিনী, যুদ্ধ, শান্তি-চুক্তি, বৈদেশিক ব্যাপারে সম্রাটই সর্বেসর্বা রইলেন। বিচার বিভাগেও সম্রাটের ক্ষমতা অপ্রতিহত রইল। তৃতীয় নেপোলিয়ন যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন তা সহজেই প্রথম নেপোলিয়ন প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার কথা মনে এনে দেয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা লক্ষ্য করলে তাঁর শাসনের চরিত্র নির্ণয় করা যায়। এই শাসন ব্যবস্থায় প্রায় সকল ক্ষমতাই কেন্দ্রীভূত করা হল সম্রাটের হাতে। আইন সভার সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে যদিও সর্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া হল, তবুও স্বাধীন নির্বাচনকে ব্যাহত করার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হতে থাকল। প্রাদেশিক ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের চিহ্ন রইল না। যাতে বিরোধী শক্তি মাথা তুলতে না পারে

তার জন্য কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা নেওয়া হল, সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের ওপর কড়া নজর রাখা হল। বিনা বিচারে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রইল, আর সন্দেহভাজনদের ওপর নজর রাখাবার জন্য গুপ্তচরে দেশ ভরে গেল। বাক্ স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হল। সংক্ষেপে তৃতীয় নেপোলিয়ন চতুর্দশ লুই-এর ন্যায় নিজেই রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হলেন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন অবশ্য প্রজাহিতৈষী সম্রাট রূপেই শাসন পরিচালনা করতে লাগলেন। দেশের সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য তিনি অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। সর্বহারাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এবং কয়েকটি শ্রমকল্যাণমূলক আইন প্রবর্তন করেন। প্যারিস নগরীকে তিনি আরও সুশোভিত করেন।

দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় কবার জন্য নেপোলিয়ন কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সকে ঢেলে সাজালেন। কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য কৃষককুল যাতে অল্প সুদে অর্থ পেতে পারে তার জন্য দেশময় কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করলেন। Credit mobilier ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্সেব শাখা অফিস খুলতে নির্দেশ দিলেন। এবং ফলে টাকার লেনদেন ব্যাপারে জনসাধারণের সুবিধা হল। তাছাড়া credit foncier হতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদেব অল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেবারও ব্যবস্থা করা হল। বলা বাহুল্য এর ফলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রুত গতিতে বেড়ে চলতে থাকল। ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য আভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রাচীর তুলে দিলেন এবং সমগ্র দেশে রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ফ্রান্সের রেলপথের প্রসার তিনগুণ বৃদ্ধি পেল। বৈদেশিক বাণিজ্যেব উন্নতির জন্য তিনি বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমত, বড় বড় বাষ্পীয় জাহাজ তৈরির ব্যবস্থা করলেন। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যক চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। বিভিন্ন দেশের সাথে অবাধে যাতে ব্যবসা বাণিজ্য চলতে পারে তার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের মত অবাধ বাণিজ্য বিধি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সাথে তিনি যে বাণিজ্যের চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন সেটি এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই হয়েছিল। এর ফলে ফ্রান্সের বণিক শ্রেণী ছাড়া অন্যান্যদের বিশেষ সুবিধা হয়।

দেশের দরিদ্র জনসাধারণর দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি দেশময় হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এসব

হাসপাতালের গরীবদের যাতে বিনা খরচায় সুচিকিৎসা হয় সেদিকে নজর রাখলেন। এছাড়া আতুরাশ্রম স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হল। দরিদ্রদের সেবাকার্যের জন্য অসংখ্য সেবা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হল। গরীব জনসাধারণ যাতে বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনতে পারে তার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। দেশের বেকার সমস্যা কিভাবে দূর করা যায় সে সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করেন এবং সরকারের আনুকূল্যে কয়েকটি কারখানা গড়ে তোলা হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ দূর করবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। কারণ ১৮৪৮ এর পর যে সব অভ্যুত্থান ফ্রান্সে ঘটেছিল সেগুলি প্রধানত শ্রমিকদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া, শ্রমিকশ্রেণীর উপর সমাজতন্ত্রী ও গোঁড়া বামপন্থীদের প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। একারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন শ্রমকল্যাণ মূলক কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কারখানায় নিযুক্ত থাকাকালীন শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে শিল্প বীমা প্রবর্তন করেন। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও ন্যায্য কারণে ধর্মঘট করা আইনসংগত বলে ঘোষণা করলেন। এর ফলে শ্রমিকদের অসন্তোষ যেমন কিছুটা কমল অন্যদিকে তারা তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন মেনে নিল।

প্যারিস নগরীকে ইউরোপের সৌন্দর্য, রুচি, সংস্কৃতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের পীঠস্থান রূপে গড়ে তোলবার জন্য তিনি তৎপর হলেন। তাছাড়া, প্যারিসকে নতুনভাবে গড়ে তোলবার আর একটা কারণও ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নের পূর্বে যে তিনটি বিপ্লব ঘটেছিল তার সূচনা হয় প্যারিসে। তাছাড়া ১৮৩০ ও ১৮৪৮ এর বিপ্লব দুটি মূলতঃ প্যারিসের জনসাধারণের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিসের ঘিঞ্জি বস্তী অঞ্চলের সরু গলিগুলিতে সরকারী পুলিশ বা রক্ষীদলের পক্ষে লড়াই করবার নানা অসুবিধা ছিল। নেপোলিয়ন ভাবলেন এগু'ল যদি অপসারণ করা যায় তাহলে একদিকে যেমন প্যারিসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, অপর দিকে প্রশস্ত রাজপথ তৈরী করার ফলে ভবিষ্যৎ বিপ্লবীদের সরকারের রক্ষীদলের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ হবে না। সুতরাং প্যারিসকে সৌন্দর্যময়ী করবার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হল। প্রখ্যাত স্থপতি Baron Haussman-এর পরিচালনায় একাজ চলতে থাকল। অচিরেই প্যারিস ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনে ফ্রান্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির পরিচয় পেল।

তৃতীয় নেপোলিয়ন এক সময় বলেছিলেন যে তাঁর পূর্ববর্তী দুটি রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটার কারণ হল এ দুটি রাজবংশ শ্রেণী-বিশেষের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিল ; জাতির সর্বসাধারণের উন্নতি কিসে হবে সে নিয়ে তারা চিন্তা করেনি এবং এর জন্যই তাদের পতন ঘটে। তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য তিনি যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাতে সকল শ্রেণীই উপকৃত হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৬০-৭০) : এই পর্যায়ে তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতিতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি এই সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। অবশ্য এর পিছনে কয়েকটি কারণও ছিল। প্রথমত, এই সময় হতে তাঁর পররাষ্ট্র নীতিতে ব্যর্থতা দেখা দেয়। যে আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলিতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন সেগুলিই ফ্রান্সেব দিক হতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতার সাথে সাথে আভ্যন্তবীণ ক্ষেত্রে নানারূপ সমস্যা দেখা দিল। রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়াসী হল। এদের বিরুদ্ধে দমন-মূলক নীতি গ্রহণ না করে দেশে নেপোলিয়ন কিস্তিবন্দী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। অতএব তিনি যে কিছুটা উদারনৈতিক মতাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৮৬০ হতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে এক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত করেন এবং তিনি তাঁর 'নেপোলিয়নের আদর্শাবলী' গ্রন্থে যে মত ব্যক্ত করেছিলেন তা বাস্তবে রূপায়িত করলেন। দ্বিতীয়ত, এই সময় হতে তিনি কঠিন ব্যাধিতে ভুগতে শুরু করেন। এই সময় তাঁর অনুরাগীদের নিকট তিনি বলেছিলেন যে 'মাঝে মাঝে' মনে হয় আমার বয়স ১০০ পেরিয়ে গেছে'। তৃতীয়ত, ফ্রান্সেব শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাঁর অবাধ বাণিজ্য নীতি অকেজো করবার জন্য খুবই চেষ্টা করছিল। চতুর্থত, ফ্রান্সের উগ্র ক্যাথলিকরা তাঁর ইটালী নীতির সমালোচনা শুরু করে। এসব কারণের জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন জনসাধারণের ওপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করলেন এবং ফ্রান্সে কিস্তিবন্দী গণতান্ত্রিকতার প্রবর্তন করলেন।

প্রথমেই তিনি রাজনৈতিক কারণে যাদের জেলখানায় রাখা হয়েছিল তাদের মুক্তি দিলেন। ১৮৬০ হতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি আইন সভাকে নানারূপ ক্ষমতা দান করলেন। প্রথম দফায় আইন সভাকে সম্রাটের উদ্বোধনী বক্তৃতার পক্ষ উত্তর দানের অধিকার দিলেন। এর ফলে আইন সভা সরকারী নীতির সমালোচনা

করবার সুযোগ পেল। দ্বিতীয় দফায় আইন সভার কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা হল। তৃতীয় দফায় মন্ত্রীদেরও নির্দেশ দেওয়া হল যে তাঁরা যেন আইন সভায় উপস্থিত হয়ে সরকারী নীতির ব্যাখ্যা করেন এবং সমালোচনার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু এগুলির প্রবর্তনের ফলে নেপোলিয়নের দিক হতে বিশেষ সুবিধা হল বলে মনে হয় না। কারণ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রজাতন্ত্রী দলের শক্তিবৃদ্ধি বিশেষভাবে ঘটছিল।

তৃতীয় নেপোলিয়নের মেক্সিকো পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবার ফলে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রাজনৈতিক দলগুলি আন্দোলন শুরু করল। সম্রাটের নিকট এখন দুটি পথ খোলা ছিল—দেশে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা বা দমননীতির আশ্রয় নেওয়া। দ্বিতীয় পথটি অনুসরণ করতে তাঁর ইচ্ছাও ছিল না শক্তিও ছিল না। এ কারণে ফ্রান্সে দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তনের জন্য তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ১৮৬৭ খৃঃ-এ আইন সভাকে মন্ত্রীদের প্রশ্ন করবার অধিকার দেওয়া হল। মন্ত্রীরাও নিজ নিজ কাজের জন্য আইন সভার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য হল। ১৮৬৮ খৃঃ-এ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভাসমিতি করবার স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হল। এর ফলে কিন্তু প্রজাতন্ত্রী দলগুলিরই বিশেষ সুবিধা হল। তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু করল। সাধারণ নির্বাচনেও সরকার-বিরোধী দলগুলির শক্তিবৃদ্ধি হল। অবশেষে সম্রাট উদারনৈতিক দলের পরামর্শে আইন সভার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করলেন। সিনেটের নিকট হতে সংবিধানের ওপর অভিভাবকত্বের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আইন সভাকে দেওয়া হল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠন করবে বলে ঘোষণা করা হল। এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন জনসাধারণের কাম্য কিনা তা জানবার জন্য এক গণভোটের ব্যবস্থা করা হল। জনসাধারণ বিপুল ভোটে এই নয়া ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানাল। এর সাথে সাথে তারা তৃতীয় নেপোলিয়নের পুত্রকে ফ্রান্সের ভাবী সম্রাট হিসেবেও স্বীকার করে নিল। এদিকে উদারনৈতিক দলের নেতা ওলিভিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন। ফরাসীরা মনে করল তাদের দেশে প্রকৃত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সম্রাট নিজেও ভাবলেন যে ফ্রান্সের সিংহাসনে তিনি আমৃত্যুকাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকবেন। কিন্তু সব কিছু বরবাদ হয়ে গেল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে সেডানের রণক্ষেত্রে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত ও শত্রু হস্তে বন্দী হলেন। এবং তার সাথে সাথে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটল।

বৈদেশিক নীতি : তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রাজত্বের প্রথম আট বছরের বৈদেশিক নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মর্যাদা খুবই বৃদ্ধি করে। প্যারিস ইউরোপীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়, বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদীরা তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্যপ্রার্থী হয়। এই সময়ের মধ্যে ইউরোপে এমন কোন আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটেনি যার সাথে তৃতীয় নেপোলিয়নের যোগ ছিল না। আবার তাঁর অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতিই তাঁর পতনের অন্যতম কারণ হয়েছিল। যখন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেন, তখনই ফ্রান্সের অভ্যন্তরে তাঁর বিরোধী দলগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে সমর্থ হয়। ফলে তিনি তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতিতে পরিবর্তন আনেন। আবার এই পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতার জন্য তাঁকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হয় এবং তিনি পরাজিত হন। এর সাথে সাথে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তাঁরও জীবনে ঘন অন্ধকার নেমে আসে।

বৈদেশিক নীতিতে নেপোলিয়ন শান্তিপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন—'The Empire is peace' কিন্তু তাঁর কার্যাবলী প্রমাণ করল তিনি শান্তিপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরঞ্চ নিজের আন্তর্জাতিক মর্যাদা,জনসাধারণকে চমকিত করা, নেপোলিয়নীয় গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এক শ্রেণীর জঙ্গীবাদী ফরাসীদের মনস্তুষ্টির জন্য বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতি তিনি গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে পড়েন।

তৃতীয় নেপোলিয়ন ভালভাবেই জানতেন যে লুই ফিলিপের পতনের অন্যতম কারণ তাঁর দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি। সে কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন চমকপ্রদ পররাষ্ট্রনীতি দ্বারা ফ্রান্সকে ইউরোপের রাজনীতিতে সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন এবং ফরাসী জনসাধারণকে এর দ্বারা তাঁর প্রতি অনুগত রাখলেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম আট বৎসর তিনি পররাষ্ট্রনীতিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হতে তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে দেউলিয়া ভাব দেখা দেয়।

বৈদেশিকনীতির সাফল্যের যুগে তিনি বহু কৃতিত্ব অর্জন করেন। এমন কি যখন তিনি দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে পোপকে রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এর ফলে ফ্রান্সের ভেতরে ও বাইরের ক্যাথলিকদের ধন্যবাদার্হ হন।

দ্বিতীয়ত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি ইংল্যাণ্ডের সাথে একজোটে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কারণ তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠতাত স্বনামধন্য প্রথম নেপোলিয়নের

পরিণাম স্মরণ করে রাশিয়ার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতেন। তাঁর ধারণা ছিল 'মস্কো অভিযানই' প্রথম নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ। এখন যদি তিনি রাশিয়ার শক্তি খর্ব করতে পারেন তবে একদিকে যেমন তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া হবে অন্যদিকে ফ্রান্সের রোমান ক্যাথলিকরা উল্লসিত হবে, তাঁর শক্তি ফ্রান্সে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য তৃতীয় নেপোলিয়নের জার প্রথম নিকোলাসের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল। নিকোলাস তাঁকে সম্রাট বলে সম্বোধন করতেন না।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফরাসীসৈন্য বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। এই যুদ্ধান্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্র হিসেবে প্যারিস নগরীকে নির্বাচিত করা হল। এ থেকে বোঝা যায় যে ফ্রান্স পুনরায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ঘরে বাইরে বিরাট খ্যাতি অর্জন করলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেকে জাতীয়তাবাদের সমর্থক বলে ঘোষণা করেন। প্যারিসের সন্ধিতে যখন ওয়ালাসিয়া ও মোলডাভিয়ার ওপর রুশ আধিপত্য দূর করা হয় সেই সময় তিনি এ দুটি প্রদেশকে নিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। এবং তাঁর এই প্রস্তাবের ফলস্বরূপ এই দুটি প্রদেশ রুমানিয়া নাম নিয়ে তুরস্কের নামমাত্র প্রভাবাধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁর তৃতীয় কাজ হল ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে সাহায্য করা। অস্ট্রিয়ার অত্যাচারে প্রপীড়িত ইটালীর প্রতি তৃতীয় নেপোলিয়নের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল, বিশেষ করে তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের মত তিনিও ইটালীর রণক্ষেত্রে কীর্তি অর্জন করবার প্রয়াসী ছিলেন। তাছাড়া ইটালী স্বাধীন হলে তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি হবে বলে তিনি মনে করেন। ফলে প্লমবিয়ার্সে কাভুরকে আহ্বান করলেন এবং তাঁর সাথে এক অলিখিত চুক্তি করলেন। তিনি অস্ট্রো-সার্ডিনিয়ান যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামলেন। অস্ট্রিয়া পরাজিত হতে থাকল। কেবল ভেনেসিয়া হতে অস্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করতে পারলেই ইটালীতে অস্ট্রিয়ার অধিকার একেবারে চলে যাবে, কিন্তু হঠাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভুরের সাথে পরামর্শ না করে ভিলাফ্রাঙ্কা নামক স্থানে যুদ্ধ বিরতিতে স্বাক্ষর করলেন। তাঁর এই কাজ ইটালীয়বাসীরা বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল বলে মনে করল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে তৃতীয় নেপোলিয়নের ইটালীয় নীতিতে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। আবার যখন তিনি স্যাভয় ও নীস হস্তগত করলেন তখন

একদিকে যেমন ইংল্যাণ্ড রুষ্ট হল, অন্যদিকে ইটালীর জাতীয়তাবাদীরা তাঁর প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করতে থাকল। তাছাড়া, ইটালীর জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য করবার ফলে তিনি ফ্রান্সের গোঁড়া ক্যাথলিকদের বিরাগভাজন হলেন। (বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'ইটালী ও জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠা' এই অধ্যায় দেখ।)

এর পর তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে বিফলতার যুগ দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কার্যকালে সাহার্য পাঠান নি। এর ফলে একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদীরা অসন্তুষ্ট হল, অপর দিকে রাশিয়ার জার তাঁর রুশ বিরোধী আচরণ ভুলতে পারলেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন। সুতরাং পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর সুনাম নষ্ট হল। বৈদেশিক নীতিতে যখন তিনি ব্যর্থতার সম্মুখীন ঠিক সেই সময়েই তৃতীয় নেপোলিয়ন উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত মেক্সিকোতে এক ফরাসী তাঁবেদার রাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেছিলেন যে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারলে জনসাধারণ তাঁর প্রতি আরও আনুগত্য দেখাবে এবং বৈদেশিক নীতি তাঁর ব্যর্থতার কথা ভুলে যাবে। একারণে তিনি সুদূর মেক্সিকোতে এক ফরাসী বাহিনী প্রেরণ করেন। মেক্সিকো সাধারণতন্ত্র এই বাহিনীর নিকট পরাজিত হলে তিনি একজন তাঁবেদারকে মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যখন বাধা দেয় তখন নেপোলিয়ন তাঁর সৈন্যদল অপসারণ করতে বাধ্য হন। ব্যর্থ মেক্সিকো অভিযান নেপোলিয়নের তথা ফ্রান্সের মর্যাদা নষ্ট করে এবং তাঁর পতনের পথ সুগম করে দেয়। তিন বছর মেক্সিকো ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় তৃতীয় নেপোলিয়ন ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব খাটাতে পারলেন না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে এবং এর পূর্বে অনুষ্ঠিত ডেনিস যুদ্ধে তাঁকে বাধ্য হয়ে নিরপেক্ষ থাকতে হয়। স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার হাতে অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। এর ফলে ফ্রান্সের স্বার্থহানি হল। ফ্রান্সের সীমান্তে শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সের পক্ষে মারাত্মক হল। এস্থলে স্যাডোয়ায় অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসীরা নিজেদের পরাজয় বলে মনে করল এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের ওপর খুবই রুষ্ট হল। তাঁর প্রতি ফরাসী জনসাধারণের যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল। তৃতীয় নেপোলিয়ন এটি বুঝতে পেরে নিজের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জঙ্গীবাদী নীতি গ্রহণ করলেন। এবং এই নীতি অনুযায়ী তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমার্ককে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে, দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা

ব্যর্থ ৫।

যেন বিপন্ন না করা হয়। তিনি আরও দাবি করলেন যে প্রাশিয়া যেভাবে শক্তিবৃদ্ধি করছে তা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে কারণে ইউরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখবার জন্য ফ্রান্সেরও শক্তিবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন এবং এখন ফ্রান্সের 'ক্ষতিপূরণ' স্বরূপ কিছু পাওয়া উচিত। তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্ভট দাবিতে বিসমার্ক-এর দৃঢ় ধারণা জন্মালো যে ফ্রান্সের সাথে প্রাশিয়ার যুদ্ধ ইতিহাসের যুক্তি অনুযায়ী অবশ্যম্ভাবী। তিনি ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। এদিকে যুদ্ধ প্রস্তুতির সাথে সাথে তিনি প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ বাধলে প্রাশিয়া যে জয়ী হবেই তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে দক্ষিণ-জার্মানীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি যে জাতীয়তাবাদী জনমতের চাপে প্রাশিয়ার দিকে যোগ দিতে বাধ্য হবে সে সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ বাধবার আগে তিনি কূটনীতির দ্বারা ফ্রান্সকে নির্বান্ধব করবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি রাশিয়াকে বোঝালেন যে, ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ হলে রাশিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্যারিসের চুক্তিতে কৃষ্ণসাগর সম্বন্ধীয় ধারাগুলি নাকচ করবার সুযোগ পাবে। এর ফলে রাশিয়া বিসমার্ককে সম্ভাব্য ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবার প্রতিশ্রুতি দিল। ইটালীও নিরপেক্ষ থাকবে বলে কথা দিল। অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষতা নীতি ভিন্ন অন্য কোন কথাই চিন্তা করল না। ইংল্যাণ্ড তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাজ্যগ্রাস নীতি ভাল চোখে দেখল না। ফলে বিসমার্কের সুবিধা হল। অতএব তৃতীয় নেপোলয়ন কূটনীতিতে বিসমার্কের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন এবং প্রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ বাধবার পূর্বে ফ্রান্স সম্পূর্ণ মিত্রহীন হয়ে পড়ল।

বিসমার্কের কূটনীতি

স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে বিসমার্ক তাতে যুদ্ধের অজুহাত খুঁজে পেলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনে এক বিদ্রোহের ফলে রানী ইসাবেলা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে স্পেনের সিংহাসন খালি হয়। স্পেনবাসী প্রাশিয়ার হোহেনজোলার্ন বংশীয় লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসবার প্রস্তাব করে। কিন্তু ফ্রান্সের রাজনৈতিক চাপে লিওপোল্ড ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। কিন্তু ফ্রান্স এতেও সন্তুষ্ট হল না। ফ্রান্স তার জার্মানীস্থ রাজদূতকে প্রাশিয়ার রাজার সাথে দেখা করবার নির্দেশ দিল এবং বলা হল রাষ্ট্রদূত যেন প্রাশিয়ার রাজার নিকট হতে এরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যাতে ভবিষ্যতে হোহেনজোলার্ন রাজবংশের কেউই স্পেনের

যুদ্ধের অজুহাত

রাজসিংহাসনের জন্য প্রার্থী না হন। এই সময়ে প্রাশিয়ার রাজা এমস্ নামক স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলেন। ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাঁর সাথে দেখা করে ফরাসী সরকারের দাবি জানালে রাজা এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তারযোগে তাঁর সাথে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কথাবার্তা বিসমার্ককে জানালেন। বিসমার্ক প্রথমে সেনাপতিদের নিকট হতে প্রাশিয়ার সমরপ্রস্তুতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে টেলিগ্রামের মূল বক্তব্য না বদলিয়ে তিনি ওটির সংক্ষিপ্তসার এমনভাবে তৈরী করলেন যে জার্মানরা পড়ে মনে করবে যে ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাদের প্রিয় রাজাকে অপমানিত করেছে। বিসমার্ক যা চেয়েছিলেন তাই-ই হল। তৃতীয় নেপোলিয়ন জনসাধারণের চাপে পড়ে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং পরাজিত হলেন। এই পরাজয়ের সাথে সাথে তিনি সিংহাসন হারালেন এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটল।

এমস্ টেলিগ্রাম

পতনের কারণ : তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন কোন আকস্মিক বা অচিন্তনীয় ঘটনা নয়। তাঁর পতন খুবই স্বাভাবিক ঘটনা এবং স্ববিরোধী নীতির মধ্যেই তাঁর পতনের কারণ নিহিত ছিল। প্রথমত, তাঁর চরিত্রের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট নীতির বালাই ছিল না। বহু পরস্পরবিরোধী গুণাগুণ তাঁর চরিত্রের মধ্যে ছিল। একদিকে তিনি নিজেকে স্বনামধন্য নেপোলিয়নের উত্তর সাধক বলে মনে করতেন আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন খুবই দুর্বল চরিত্রের লোক, ভীরু কাপুরুষও বলা চলে। দ্বিতীয়ত, তিনি ঘোষণা করেছিলেন সাম্রাজ্য হচ্ছে শান্তির দ্যোতক। কিন্তু কার্যকালে তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হলেন এবং দেশকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে গেলেন। তৃতীয়ত, তিনি জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এটি মেনে চলেন নি। অন্য জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ফ্রান্সের অধীনে আনতেও তিনি একই সাথে আগ্রহী ছিলেন। ফলে আদর্শ ও বাস্তবে অসংগতি অনিবার্য ভাবে দেখা দিল। আর এ অসংগতিই নিয়ে এল চরম বিপর্যয়। চতুর্থত, তাঁর শারীরিক অসুস্থতাও তাঁর পতনের অন্যতম কারণ ছিল। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি তাঁর নীতিগুলি ঠিক ভাবে বাস্তবে পরিণত করতে পারলেন না। পঞ্চমত, বৈদেশিক নীতিতে ব্যর্থতা তাঁর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। ষষ্ঠত, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের নেতা না হওয়ায় তাঁর পক্ষে ফ্রান্সের রাজনৈতিক দলগুলিকে এক দিকে যেমন সন্তুষ্ট করা সম্ভব হল না, অপর দিকে বিপদের সময় কোন দলই তাঁকে সাহায্য করল না। পরিশেষে বলা যায় যে তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের জন্য কেবলমাত্র তিনিই দায়ী ছিলেন না, তাঁর মন্ত্রীবর্গ ও জঙ্গীবাদী ফরাসী জনসাধারণও সমভাবে দায়ী ছিল।

Q. 3. Give an estimate of the character and statesmanship of Napoleon III.

Ans. ইউরোপের উনিশ শতকের রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে তৃতীয় নেপোলিয়নের নাম বিশেষভাবে স্মরণে রাখার মত। তিনি তাঁর কর্ম-কীর্তির দ্বারা মুহ্যমান ফ্রান্সকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে সমর্থ হলেন। ফ্রান্স পুনরায় তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হল এবং ইউরোপীয় রাজনীতিতে এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করল।

তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্রে বিপরীতধর্মী দোষগুণের সমাবেশ দেখা যায় বলে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকরা তাঁর সম্বন্ধে নানারূপ মত প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন। ঐতিহাসিক কিংলেক তাঁকে ডাকাত বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ভিক্টর হুগো তাঁর নাম দিয়েছিলেন ক্ষুদে নেপোলিয়ন (Napoleon the Little)। অন্য দিকে তাঁর পরম শত্রু বিসমার্ক তাঁকে দূরদর্শী ও অমায়িক বলেছিলেন। এই পরস্পর-বিরোধী উক্তিগুলির কারণ হল নেপোলিয়নের চরিত্রের অসামঞ্জস্য। কখনো তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেন, কখনো তিনি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আগ্রহী হন। তাঁর কার্যাবলী পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে তাঁর প্রতি ইতিহাস ও ঐতিহাসিকরা অবিচার করেছেন কি না।

যে ভাবে তিনি সাধারণ অবস্থা হতে সম্রাট পদে উন্নীত হন, তাতে তাঁর সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করে জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কেড়ে নিলেন। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন এবং তাঁর সময়ে ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব পুরোপুরিভাবে দেখা দেয়। তিনি ধনী-নির্ধন সকলকেই সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করেন নি। ফলে তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়। কারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে রাজনৈতিক অগ্রগতি জড়িত। অবশ্য রাজত্বের শেষার্ধে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসেবেই রাজ্য শাসন করতে মনস্থ করেন। এবং এটি কার্যে পরিণত করবার সমস্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এটি কার্যকরী হতে পারে না বৈদেশিক আক্রমণের জন্য, যার ফলে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যেরই পতন ঘটল।

বৈদেশিক নীতিতে প্রথমে তিনি সফলতা অর্জন করলেও পরে সর্বাধিক বিফলতা দেখা দেয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের ফলে তাঁর প্রতি রাশিয়া খুবই রাগান্বিত হল। ইটালীর ক্ষেত্রে তিনি দোদুল্যমান নীতি গ্রহণ করেন।

ফলে অষ্ট্রিয়া তাঁর প্রতি বিরূপ হল অপরদিকে ইটালীর শ্রদ্ধা হারালেন। মেক্সিকো অভিযান তাঁর সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে।

তবু বিরাট ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইউরোপের ইতিহাসে তাঁর দান কম নয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন অশান্ত, পীড়িত ও বিশৃঙ্খল ফ্রান্সে শান্তি, নিরাপত্তা ও গৌরব আনয়ন করেন। তিনি এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে জনসাধারণের বিশ্বাস ও আনুগত্য অর্জন করেন। তিনিই সুদূরপ্রাচ্যে ফরাসী প্রভাবাধীন অঞ্চলের গোড়া-পত্তন করেন। ইন্দোচীনে (আধুনিক ভিয়েৎনাম, লাওস ইত্যাদি) তিনি ফরাসী উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়ায় ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনে কৃতকার্য হন। তাঁর ঔপনিবেশিক নীতির ফলেই ফ্রান্স ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ইংল্যাণ্ডের সমপর্যায়ভুক্ত হয় এবং ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে সক্ষম হয়। তাঁর অনেক দোষত্রুটি ছিল সন্দেহ নেই, তবুও তিনি যে অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন সেকথা যেন সকলের স্মরণ থাকে। তাঁর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিষ্পিষ্ট অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতি ও জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন সর্বকালেই প্রশংসা পাবে।

More Questions

1. Discuss the circumstances in which the Second empire came into existence in France.

Ans. ১ নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

2. Describe briefly the history of the Second Republic of France.

Ans. ১ নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

3. Discuss the Home policy of Napoleon III, clearly demarcating the two phases.

Ans. ২ নং প্রশ্নের আনুষঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

4. Discuss the foreign policy of Napoleon III, showing the causes of its ultimate failure.

Ans. ১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

5. Napoleon III, was a man to whom both history and historians have done scant justice. Discuss.

Ans. ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

6. Give your own assessment of Napoleon III.

Ans. ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দেখ।

উনবিংশ অধ্যায়

ইউরোপ (১৮৭০-১৮৯০)

সূচনা: ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ইউরোপের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল। এই সময় জার্মান ও ইটালীবাসীরা নিজ দেশে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করল। জার্মানী ও ইটালীর মধ্য ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভাব ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তন আনল। ভিয়েনা কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক কাঠামো তৈরী করা হয়েছিল তার পরিবর্তন ঘটল। এবং ফলে উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদের জয় সূচিত হল। সমাজতন্ত্রবাদ অবশ্য এখনো শক্তিশালী হয়নি। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্যারিস কমিউনের মধ্যে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটল।

যুগটির বৈশিষ্ট্য: ১৮৭০ খৃষ্টাব্দর ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে উদারনৈতিক ভাবধারার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটেছে। ইউরোপের প্রায় সবগুলি দেশেই লিখিত সংবিধান ও পার্লামেণ্ট চালু হয়। ভোটাধিকার বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিকদের অধিকারগুলি জোরদার হয়। ১৮৭৮-এর বিপ্লবের ফলে এক রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব রাজ্যগুলি হতেই আইনের ক্ষেত্রে অসাম্য দূর করা হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া হতেও এটি বিদায় নেয়। কিন্তু উদারনৈতিক মতবাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সফল হতে পারেনি—দেশের পার্লামেণ্ট কর্তৃক executive-কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যেক দেশেই উদারনৈতিক দল এক প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সম্মুখীন হল। উদারনৈতিক দলগুলি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দল। এই নতুন দলটি হল শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের দল বা মুখপাত্র। এই দলটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে দেখা দিলেও এই দল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। ফলে উদারনৈতিক দল লক্ষ্যে ও নীতিতে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করে কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

জার্মানী ও ইটালীতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় জাতীয়তাবাদের চরম জয় সূচিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই রাষ্ট্র দুটিই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হয়। ইটালিতে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এই প্রচেষ্টা ইরিডেনটিসম-এর ফলে কিছুটা বাধা পায়। কিন্তু বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যায়, যার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এবং অস্ট্রিয়ায় জাতীয়তাবাদ কিছুটা বাধা পায়। বলকান অঞ্চলে অবশ্য জাতীয়তাবাদ জোরদার হয়।

এই যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রক্ষণশীল দলগুলি যুগোপযোগী হবার চেষ্টা করে। গ্রেট বৃটেনে ডিসরেলীর নেতৃত্বে টোরীদল গণতন্ত্রের পোশাক পরে নেয়। জার্মানীতে এই দল কৃষকদের স্বার্থের দিকে নজর দেয়। ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক সরকার টিকে থাকলেও রক্ষণশীল দল ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে এবং বেশ কিছুকাল ধরে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করে চলে। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ায় গণতন্ত্রের বিশেষ প্রসার ঘটতে পারেনি রক্ষণশীল দল ও মতবাদ বিশেষ শক্তিশালী ছিল বলে। এই শতকের শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কার্যকরী রূপে বর্তমান ছিল। তবে রাজতন্ত্র তার পূর্বেকার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং প্রত্যেক রাজ্যের সংবিধানের দ্বারা রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয় ও শ্রমিকসংস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিকশ্রেণীই মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায়। রাজতন্ত্রের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর আঁতাত সম্ভব বলে বিভিন্ন লেখক যে মত-প্রকাশ করেন তা কখনও সম্ভব হয়নি।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর রাজতন্ত্রের সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতদিন স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিল সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার পর রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করবার জন্য চেষ্টা করে। অবশ্য রাশিয়ায় এটির ব্যতিক্রম দেখা যায়। সংক্ষেপে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের এই মধ্যবিত্তশ্রেণী তার বিপ্লবী রূপ হারিয়ে ফেলে এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এটি সঞ্চারিত হয়, যদিও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় না। একারণেই ১৮৭১-এর প্যারিস কমিউনের অভ্যুত্থানের পর ১৯০৫-এর রাশিয়ার গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত ইউরোপের কোনি রাষ্ট্রেই গণ-অভ্যুত্থান প্রবল আকার ধারণ করেনি।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা ও শিল্পায়নের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেল। এসবের জন্য প্রত্যেক দেশে যে আভ্যন্তরীন পরিবর্তন দেখা দেয় তার বহিপ্রকাশ ঘটল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে। শিল্প বিপ্লব ইউরোপ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

উনিশ শতকে ইউরোপে যে সব রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার ভিত্তি হল অসম্ভব জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের জনসংখ্যা ছিল ১৮৭ মিলিয়ান, ১৮৫০-এদাঁড়ায় ২৬৬ মিলিয়ন, আর ১৯০০তে ৪০১ মিলিয়ান। সংক্ষেপে ১০০ বছরের মধ্যে জন্ম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির কারণ

হল মৃত্যুহার হ্রাস, শিল্পায়ন ইত্যাদি। এই সময় আবার শহরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। গ্রাম ছেড়ে লোকে শহরের দিকে পাড়ি দেয়। শহরভিত্তিক সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। ইউরোপ হতে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়রা বসতি স্থাপনের জন্য যাত্রা শুরু করে।

এই যুগে আন্তর্জাতিকতাও বৃদ্ধি পায়। দেশভিত্তিক অর্থনীতির বদলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কথা শোনা যায়—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং বিশ্ব শান্তির কথা এই সময় বিভিন্ন দেশের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল সেগুলিতেও উল্লেখ থাকে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাথে কবডেন চুক্তিতে এটির সন্ধান মেলে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই নীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। শিল্পে উন্নতিশীল দেশগুলি (রাশিয়া, জার্মানী ইত্যাদি) শিল্পে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে, ফলে বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নয়নে রাষ্ট্রের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায় এবং শীঘ্রই এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদে প্রসারিত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হল এবং একটি রাষ্ট্র অন্যটিকে তার শত্রু বলে মনে করতে থাকল।

প্রখ্যাত দার্শনিক ক্রোচে ১৮৭১ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটিকে লিবারেল এরা (liberal era) বলে আখ্যায়িত করেন। এর অর্থ হল এই যুগে রাজনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক ও উদারনৈতিক প্রথা, প্রতিষ্ঠানগুলি উদারনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যদিও এই যুগে সমাজতন্ত্রবাদ উদারনৈতিক ভাবধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দেয় এবং যুগটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মার্কস, এঙ্গেলসের বিজ্ঞান-সম্মত সমাজতন্ত্রবাদ ১৮৭০ খৃ:-এর পূর্বেই আত্মপ্রকাশ করে, ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাধারা এটির পরিপুষ্টি ঘটায়। উনিশ শতকের শেষের দিকে মার্কসীয় মতবাদ দুটি খাতে বইতে শুরু করে। একটিকে বলা হয় 'শোধনবাদ' (Revisionism)। এর স্রষ্টা ছিলেন এডোয়ার্ড বার্নস্টেন। মতবাদের দিক হতে শোধনবাদ ইংল্যাণ্ডের ফেবিয়ান সোসাইটির নিকট কিছুটা ঋণী বলে মনে হয় মার্কসীয় মতবাদের অপর দিকটির রূপ হল বিপ্লবী রূপ। লেনিন এই দিকটির সার্থক রূপায়ণে ব্রতী রইলেন। মার্কসীয় চিন্তাধারায় এ দুটি মতবাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল, যার রেশ আজও শেষ হল না।

জার্মানী (১৮৭০-১৮৯০)

Q. 1. Critically analyse the internal policy of Bismark with special reference to (a) the policy of Germanisation, (b) the Kulturkampf and (c) Socialism. *Or*, Briefly describe the internal history of Germany from 1870 to 1890. *Or*, Critically discuss Bismark's internal policy during the period 1870-1890.

Ans. **সূচনা :** ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধ জার্মানী ও ইটালিতে রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের আন্দোলনে পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং জার্মানী ও ইটালীতে জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন হয়। একথা অনস্বীকার্য যে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্যের জন্য দায়ী দল প্রাশিয়া ও তার সামরিক শক্তি। জনসাধারণের বিশেষ অবদান ছিল না। সে কারণে জার্মান সাম্রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হল তখন উদারনৈতিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষস্থান সেখানে হোল না। অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় বিসমার্ক জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি হাপসবুর্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জার্মান, চেক এবং ম্যাগায়ার জাতিদের অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু যখনই অষ্ট্রিয়া প্রাশিয়ার হাতে পরাজিত হল (১৮৬৬) তখন তিনি জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিঃস্ত্রণে রাখবার চেষ্টা করেন। এ হতে বোঝা যায় যে বিসমার্ক উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ব্যবহার করতে চাইতেন, যখন তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌছে যেতেন তখনই এই শক্তিকে আর বরদাস্ত করতে পারতেন না। তিনি জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল ও আঞ্চলিকতাবাদকে ধ্বংস করার জন্য। যখন তাঁর গণতান্ত্রিক শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় নি তখন তিনি জার্মান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্যগুলির কর্ণধারদের সাথে ব্যবহারে আন্তরিকতা দেখান। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে এটাই প্রমাণিত হল যে জার্মানীর ঐক্যসাধন সামরিক শক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হল এবং হোহেনজোলান´ বংশের নেতৃত্বে জার্মান্ রাজন্যবর্গের মিলিত প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হয়। জার্মানীতে আদি জাতীয় আন্দোলন ১৮৪৮-এ ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৮৭১ হতে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যাগুলি নতুন রূপে দেখা দেয়। এর কারণ হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির এই পরিবর্তন সাগ্রহে মেনে নিল, কারণ ইউরোপে তারা বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিসমাপ্তি চাইল। ১৮৭১-তে বিসমার্ক জার্মান সাম্রাজ্যকে

নয়া জার্মান রাষ্ট্রের স্বরূপ

'পরিতৃপ্ত' বলে ঘোষণা করলেন। এর দ্বারা তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন যে জার্মানীতে বা জার্মানীর বাইরে জাতীয়তাবাদী কোন অভ্যুত্থানকে নতুন রাষ্ট্র কোন প্রকারের সাহায্য ত করবে না, বরঞ্চ এগুলিকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর থাকবে।

নতুন শাসনতন্ত্র : ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্যের পত্তন জার্মানীর ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে। ভার্সাই সন্ধির ফলে দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া, ওয়াটেমবার্গ, ব্যাডেন, হেসী প্রভৃতি রাজ্যগুলি উত্তর জার্মান যুক্ত রাজ্যে যোগদান করল। ফলে জার্মানীতে প্রাশিয়ার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। নয়া জার্মান সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রে বিশেষ কিছু পরিবর্তন আনা হল না। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সংবিধানই মোটামুটি চালু রইল। পূর্বেকার রাষ্ট্রগুলির স্বায়ত্তশাসনাধিকার টিকে রইল। রাজ্যগুলির কর্ণধারদের সার্বভৌমত্তও নষ্ট করা হল না। প্রাশিয়ার রাজা যৌথরাজ্যের রাষ্ট্রপতি হলেও জার্মান রাজন্যবর্গের ওপর তাঁর আধিপত্য বিশেষ ছিল না। তবুও এই বছর হতে জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির আইনসভায় বিধিবদ্ধ আইনগুলির আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়া আর কিছু রইল না, এবং জার্মান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কর্মধারা বার্লিনকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হতে থাকল এবং বাণ্ডেস্‌রথ (যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ) ও রাইখষ্টাগের মাধ্যমেই জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হতে থাকল।

প্রাশিয়ার আধিপত্য

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সংবিধানে কিছু পরিবর্তনও আনা হল। এই সংবিধান অনুযায়ী যৌথরাজ্যের জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হল। উচ্চ পরিষদের নাম হল ব্যাণ্ডেসরথ। এই পরিষদে প্রাশিয়ার ১৭টি, স্যাক্সনির ৪টি, ম্যাকলেবার্গের ২টি, ব্রান্সউইকের ২টি, ব্যাভেরিয়ায় ৬টি, ওয়াটেমবার্গের ৪টি, ব্যাডেনের ৩টি, হেসীর ১টি আসন ছিল। এই পরিষদের বৈঠক বেসরকারীভাবে অনুষ্ঠিত হত এবং সাম্রাজ্যের এই পরিষদ শাসন ব্যবস্থার ওপর সাধারণ কর্তৃত্ব চালাত এবং সাম্রাজ্যের সমস্ত আইন-কানুন এর অনুমোদন ভিন্ন কার্যকরী হত না। আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাইখস্টাগ এই পরিষদকে সাহায্য করত। রাইখস্টাগের সদস্যরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। যৌথ রাজ্যের বাজেট প্রতিবছর রাইখস্টাগে পাস করাতে হত। যৌথ রাজ্যের রাষ্ট্রপতিকে সম্রাট আখ্যা দেওয়া হয় এবং প্রাশিয়ার রাজবংশ এই পদে অধিষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়। সম্রাট অর্থাৎ প্রাশিয়ার রাজার হাতে সাম্রাজ্যের নৌ ও স্থল বাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল। যৌথরাজ্যের কর্মচারীদের নিয়োগ সম্রাটই করতেন এবং আইনসভার আহ্বায়ক তিনিই ছিলেন। পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন চ্যান্সেলার এবং তিনিই একমাত্র

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার

দায়িত্বশীল মন্ত্রী ছিলেন। যৌথ রাষ্ট্রে একটি শুল্ক সংঘ স্থাপিত হয়েছিল এবং আবগারী খাতে যা আয় হত তা সমস্তই যৌথ কর্তৃপক্ষের আওতায় ছিল। ডাক বিভাগ, নৌবাহিনী এবং কনসুলার দপ্তর যৌথরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হল। কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক, শুল্ক সম্বন্ধীয়, নাগরিকত্ব, ব্যবসাবাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপ, রেলওয়ে, নদী ও খাল, ডাক ও টেলিগ্রাফ, সংবাদপত্র ও ফৌজদারী আইন প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারী ছিল। এই সংবিধানটি স্থায়ী হয়েছিল। এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ওয়েমার সংবিধানের পূর্বে এটিতে বিশেষ পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হয় নি।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল : রাইখস্টাগে এবং প্রাশিয়ার আইন সভায় রাজনৈতিক দলগুলির শক্তি দেখে জার্মান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মে। প্রথমে যে রাজনৈতিক দলটির কথা মনে আসে সেটি হল রক্ষণশীল দল। এই দলটিকে সরকারী দল বলা যেতে পারে। বিসমার্ক এই দলটির প্রথমে সদস্য ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর নীতির সাথে এই দলের মতপার্থক্য দেখা দিলে জার্মান সাম্রাজ্যে একটি নতুন রক্ষণশীল দল গড়ে ওঠে।

আদর্শ ও লক্ষ্য

দ্বিতীয় রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় উদারনৈতিক দলটিকে ধরা যায়। এই দলটি বিসমার্কের নীতিগুলি পুরোপুরিভাবে সমর্থন করত এবং দেশে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্যও দাবি জানাত। এই দলটিই জার্মান সাম্রাজ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই রাজনৈতিক দলের সমর্থনের জন্যই বিসমার্ক তাঁর আভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলি প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর জার্মান সাম্রাজ্যে সেণ্টার পার্টি বলে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। এই দলটি যৌথরাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরোধী ছিল এবং রাজ্যগুলির ক্ষমতা অটুট রাখবার পক্ষপাতী ছিল। এই দলটি উদারনৈতিকবাদের শত্রু ছিল। গোয়েলফ বলে দলটি জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনকে মেনে নেয়নি এবং দলটি পোল ও ডেনিসদের নিকট জনপ্রিয় ছিল।

শাসন সংস্কার : ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্ক একনিষ্ঠভাবে জার্মান সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করবার জন্য চেষ্টা করে যান। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে টিকে যাতে থাকে সে জন্য তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যান। এবং তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই জার্মানীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবর্তন ঘটে। তবে ১৮৬৬ ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলীতে জার্মানীর ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হয় নি। ১৮৭৮

বিসমার্ক-এর আভ্যন্তরীণ নীতি ও কার্যাবলী

খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্ক জাতীয় উদারনৈতিক দলের সমর্থনে বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন যার ফলে জার্মান সাম্রাজ্যে একতার ভাব কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন সংস্কার: বিসমার্ক প্রথমেই আইন ও বিচার বিভাগে বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করেন যার ফলে সমগ্র জার্মানিতে এক আইন বিধি প্রচলিত হল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনবিধি তৈরি করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হল। এই কমিশন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী বিচার বিষয়ক সংহিতা প্রকাশ করে এবং এটি সমগ্র দেশে সাগ্রহে গৃহীত হয়। এরপর আরো কয়েকটি আইনের দ্বারা দেশে একই প্রকারের বিচারালয় ও বিচারব্যবস্থা প্রচলিত হল। লিপজিগে একটি সুপ্রীমকোর্টও স্থাপিত হল। আইন ও বিচার বিভাগের সংস্কারের ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন করা হল, যার ফলে সমগ্র দেশের বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভবপর হল। দেশে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনার ফলে যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হল, আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। সমগ্র দেশে একপ্রকারের ওজন ও পরিমাপ প্রবর্তন করা হল এবং মুদ্রার ক্ষেত্রেও সংস্কার আনা হল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে সাত প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। বিসমার্কের চেষ্টায় সমগ্র দেশে একই প্রকারের মুদ্রা চালু করা হল। কাগজী মুদ্রার বদলে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বাজারে ছাড়া হল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হল। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েও বহু পরিবর্তন আনা হল। ডাক বিভাগেও বিরাট পরিবর্তন আনা হল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক রেল ব্যবস্থাকে একীভূত করার চেষ্টা চালানো হল এবং বিসমার্ক সমগ্র দেশের স্বার্থ চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন অংশে রেলপথ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। আইন বিভাগের ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তনের ফলে রাজ্যসরকারগুলির দায়িত্ব অনেক কমে গেল। তবে শিক্ষা, ধর্ম এবং পুলিশব্যবস্থা রাজ্যসরকারের এক্তিয়ারের মধ্যেই রইল। পরবর্তী কালে বিসমার্ক এগুলির ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।

সৈন্য-বিভাগেও সংস্কার প্রবর্তন করা হয়। জাতীয় রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার জন্য উপকূলভাগ বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা হল। প্রত্যেক রাজ্যে সামরিক ব্যাপারে প্রাশিয়ান পদ্ধতি গ্রহণ করা হল এবং সামরিকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন সম্রাট নিজে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের শাসন ব্যাপারে এক নতুন আইন প্রবর্তন করা হল। ঠিক হল যে প্রতি সাত বছর অন্তর সামরিক বিভাগের ব্যয়বরাদ্দের ও সৈন্যসংখ্যার জন্য রাইখস্টাগের সমর্থন নিলেই চলবে। এর ফলে জার্মান সৈন্যবাহিনী দ্রুত প্রসারিত হতে থাকল।

কুলটুরক্যাম্ফ বা সভ্যতার সংগ্রামঃ উদারনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের ফলে একদিকে যেমন সমগ্র জার্মান সাম্রাজ্যের অগ্রগতি হতে থাকল, তেমনি উদারনৈতিক নীতি গ্রহণ করার ফলেই রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাথে নতুন শাসন ব্যবস্থার সংঘর্ষ অনিবার্য ভাবে দেখা দিল, এর কারণ ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেই ফ্রান্স অষ্ট্রিয়া এবং বাভেরিয়ার উগ্র ক্যাথিলিক দলগুলি প্রশিয়া-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেছিল। তারা চেষ্টা করেছিল যাতে এক জোটে এই তিনটি রাষ্ট্র প্রাশিয়াকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি। জার্মানীর যখন রাজ্যনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হল এবং জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল তখন এই দল জার্মান সাম্রাজ্য যাতে বিপন্ন হয় তার চেষ্টায় রইল। বিসমার্ক চিরদিনই কোয়ালিশনকে ভয় করতেন। বিভিন্ন ক্যাথলিক দলগুলির এই নীতি তাঁকে ভাবিত করে তুললো। যাতে বিদেশী দল জার্মান সাম্রাজ্যে রোমান ক্যাথলিকদের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্ররোচিত না করতে পারে তার জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই সময় তিনি মনে করলেন যে জার্মান সাম্রাজ্যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে জাতীয় চার্চ প্রবর্তিত হওয়া উচিত। তিনি জার্মানীতে পোলিশ চার্চ থাকার কোন অর্থ নেই বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। কারণ পোলিশ চার্চ ছিল তাঁর মতে জাতীয়তা বিরোধী চার্চ। আর ঠিক এই সময় রাইখস্টাগে একটি ক্যাথলিক দল গড়ে ওঠে। বিসমার্ক তাঁর ধারণা যে অমূলক নয় তা বুঝতে পারলেন এবং উগ্র ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে নানারূপ দমনমূলক আইন প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। তবে দমনমূলক আইনগুলি প্রবর্তনের পূর্বে বিভিন্ন রাজ্যের আইন-সভাগুলিতে এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী দলের সাথে রোমান ক্যাথলিক দলের মতবাদের লড়াই শুরু হল। ক্যাথলিক দলগুলির মতে পোপ সম্রাটের চেয়ে বড় এবং চার্চ জাতির চেয়ে ঊর্ধ্বে। ব্যাডেন রাজ্যে প্রথম এই সংগ্রাম শুরু হল। স্কুল শিক্ষার কর্তৃত্ব নিয়ে এই বিবাদের সূত্রপাত হয়। সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং যাজকদের শিক্ষণের ওপর কর্তৃক স্থাপন করতে চায়। জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের সাথে সাথে এই সংগ্রাম আরও জোরদার হল। এটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হল। প্রশিয়া রাজ্যে এটি বিশেষ ভাবে দেখা গেল। ইতিমধ্যে পোপ কয়েকটি অনুজ্ঞা জারী করলেন যার ফলে প্রাশিয়া প্রভৃতি রাজ্যে ক্যাথলিকদের মধ্যেই

কেন এবং কিভাবে দেখা দিল

মতবিরোধ দেখা গেল। ক্যাথলিকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসীরা পোপের অনুজ্ঞা অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে রাজী হলেন না, এদের সাথে প্রোটেস্ট্যাণ্টরা যোগ দিলেন এবং তাঁরা এই সুযোগে জেসুইট সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চালালেন। বার্লিনে ছোটখাটো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধল। সমগ্র জার্মানীতে মহতী জনসভা মারফৎ জেসুইট সংঘকে বিতাড়িত করবার এবং পোপের অনুজ্ঞাগুলিকে নাকচ করে দেবার জন্য দাবি জানানো হল। এর ফলে ক্যাথলিক পার্টির মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। ক্যাথলিকদের মধ্যে যারা উদারনৈতিক মতাবলম্বী ছিল তাদের পক্ষে অবস্থা মারাত্মক হল—তাদের পক্ষে পোপ ও চার্চের পক্ষে থাকা অসম্ভব হল। যাঁরা পোপকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিল না, তাদের Old Catholic নাম দেওয়া হল। ক্রমে তাদের ধর্ম প্রচার এবং শিক্ষকতার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। Old Catholic-রা নিরুপায় হয়ে সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এই সংগ্রামকে উদারনৈতিকরা চার্চের পুরানো নীতির বিরুদ্ধে আধুনিক সমাজের মতবাদের লড়াই (Kulturkampf) বা সভ্যতার সংগ্রাম বলে আখ্যা দেওয়া হল। বিসমার্ক এটিকে রাজনৈতিক পর্যায়ে নিয়ে গেলেন এবং জার্মানীতে পোপের প্রভাব বিনষ্ট করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। পোপপন্থী ক্যাথলিকরাও এতে নিরুৎসাহ না হয়ে পূর্ণোদ্যমে সংগ্রাম চালাতে লাগল। বিসমার্ক এতে প্রমাদ গণলেন। তিনি ভাবলেন যে পোপপন্থীরা জার্মানীর ঐক্য বিনষ্ট করতে চায়। অতএব এদের প্রতি কোন রূপ করুণা দেখান অন্যায়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ১৮৭২ হতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পর পর ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি দমনমূলক আইন প্রবর্তন করা হল। এগুলিকে 'May Laws' বলা হয়ে থাকে। এই আইনবিধি প্রণয়নের পূর্বেই অবশ্য জেসুইট সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করা হল এবং পোপের সাথে কোন রূপ কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখা হল না। May Laws আইনবিধিতে মোট চারটি আইন লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রথমটিতে সমস্ত স্কুলগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রাধীনে আনবার ব্যবস্থা করা হল। এর পূর্বে কয়েকটি প্রদেশের স্কুলগুলি চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। দ্বিতীয়টিতে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হল সেগুলিকেই অন্য কথায় কুলটুরক্যাম্ফ বা সভ্যতার সংগ্রাম বলা হয়ে থাকে। এটির দ্বারা ঠিক করা হল যে জার্মান ছাড়া অন্য কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত কাউকে যাজকের পদে বা চার্চের অন্য কোন প্রকার কর্মচারী হিসেবে নেওয়া

বিসমার্কের নীতি

আইন

চলবে না। এরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই জার্মান হতে হবে এবং জার্মান স্কুলে (জিমানেসিয়ামে) স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে কোন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক দর্শন, ইতিহাস এবং জার্মান সাহিত্য এবং প্রাচীন মননশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। ধর্ম বিষয়ক সেমিনারগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হল, এবং বালকদের জন্য ধর্মীয় সেমিনার বন্ধ করে দেওয়া হল। ধর্মীয় সংস্থায় কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবার পূর্বে রাজ্যের কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতেই হবে এবং সরকার কোন কারণে এই অনুমতি নাও দিতে পারেন, তৃতীয় আইনের দ্বারা ধর্মীয় অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ বিচারালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হল। এই বিচারালয় ইচ্ছে করলে বিশপ ও পুরোহিতদের বরখাস্ত করতে পারবে। চতুর্থ আইনটির দ্বারা যারা রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাথে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করতে চায় সে ব্যাপারে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনবিধিগুলি যেহেতু প্রাশিয়ার সংবিধানে প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে গেল সে কারণে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সংবিধানে পরিবর্তন আনা হল।

এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

এই আইনগুলির বিরুদ্ধে পোপপন্থী ক্যাথলিকরা তুমুল আন্দোলন শুরু করল। এমনকি উগ্র লুথারপন্থীরাও এর বিরোধিতা করতে থাকল। উচ্চ পরিষদের রক্ষণশীল সদস্যরা এই আইনগুলির সমালোচনা করল। কিন্তু বিসমার্ক কোন প্রতিবাদই গ্রাহ্য করলেন না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের যে আইনগুলি তিনি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে দৃঢ় সংকল্প হলেন। বিশপরা সম্রাটের নিকট প্রতিবাদ লিপির দ্বারা জানিয়ে দিল যে এই আইনগুলি তারা মানবে না। পোপ এই সব বিশপদের সমর্থন করলেন। তিনি সম্রাটের নিকট এক প্রতিবাদ চিঠি পাঠালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আইনগুলি কঠোরভাবে কার্যকরী করা হল। এক বছরের মধ্যেই ৬ জন প্রাশিয়ান বিশপকে বিসমার্ক জেলখানায় পাঠালেন এবং ১৩০০টি গ্রামে চার্চের কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হল। এর প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখা গেল। ক্যাথলিকপন্থী জনসাধারণ সরকারের এই কার্যকলাপ সমর্থন করল না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের রাইখস্টাগের নির্বাচনে সেণ্টার দল বিশেষভাবে শক্তি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হল। ব্যাভেরিয়ার পোপপন্থী ক্যাথলিক দল জাতীয়

কেন ব্যর্থ হল

ক্যাথলিকদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে প্রাদেশিক আইন সভায় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দলে পরিণত হল। প্রাশিয়ান সরকার পোপপন্থীদের বিরুদ্ধে নানারূপ দমনমূলক আইন প্রবর্তন করলেন। কিন্তু এর দ্বারা

ক্যাথলিক দলকে পঙ্গু করা গেল না। সমগ্র সাম্রাজ্যে ক্যাথলিকরা জোর আন্দোলন চালাতে থাকল। নতুন নতুন সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করল এবং ক্যাথলিকদের সমর্থনে জনমত তৈরি থাকল। বন্দী বিশপরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান রূপেই থেকে গেলেন, অবশ্য তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধিদের মারফৎ কাজ চালাতে থাকলেন। এর বিরুদ্ধে বিসমার্ক এক আইন প্রণয়ন করলেন। এই আইনে বলা হল যে বিশপদের প্রতিনিধিদের দ্বারা কোনরূপ ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ বেআইনী এবং যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে দেশ হতে বিতাড়িত করা যাবে। এর ফলে গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে পুলিশ পুরোহিতদের ধর-পাকড় করতে চেষ্টা করল। গ্রামের জনসাধারণ পুরোহিতদের অবস্থিতি জেনেও পুলিশকে কোনরূপ সংবাদ দিল না। ফলে পুলিশের পক্ষে আইন অনুসারে পুরোহিত বিতাড়ন অসম্ভব হল। এই আইনটি যে ব্যর্থ হয়েছিল তা বিসমার্কও পরবর্তী কালে স্বীকার করেন। এর পরই সরকার অবশ্য একটি আইন প্রণয়ন করে জার্মানী হতে পোপের ভাণ্ডারে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিল। এর প্রত্যুত্তরে রোমান ক্যাথলিকরা জনসাধারণের নিকট হতে অর্থ তুলতে থাকল এবং গুপ্ত-পথে সমস্ত অর্থ পোপের ভাণ্ডারে যেতে থাকল। এর পর বিশপ ও পুরোহিতদের খালি পদগুলি নতুন লোক দ্বারা পূরণ করবার জন্য বিসমার্ক চেষ্টা করলেন। কিন্তু এতে বিশেষ সুফল পাওয়া গেল না। জনসাধারণ নতুন বিশপ বা পুরোহিতদের দ্বারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাতে চাইল না। সংক্ষেপে জনসাধারণ তাদের 'বয়কট' করল। এর বিরুদ্ধে বিসমার্ক আইন করে 'সিভিল ম্যারেজ' আবশ্যিক করলেন। কিন্তু এর দ্বারাও ক্যাথলিকদের পঙ্গু করা গেল না। ক্যাথলিকরা জনসাধারণের বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর সহানুভূতি লাভ করল। সাধারণ ব্যক্তিরাও তাদের 'নির্যাতিত' বলে মনে করল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ক্যাথলিক দলের বিশেষভাবে শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় বিসমার্কও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আইন সভায় তাদের সংখ্যা একশোর কাছাকাছিতে গিয়ে পৌঁছালো। বিসমার্ক ক্যাথলিকদের ক্ষমতা খর্ব করতে গিয়ে তাদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দিলেন। পরোক্ষভাবে পোপের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেল। রক্ষণশীল দলের সঙ্গেও বিসমার্কের বিচ্ছেদ ঘটল। প্রাশিয়ান পার্লামেন্টের ৭৩ জন সদস্য রক্ষণশীল দল হতে পদত্যাগ করে পুরনো রক্ষণশীল দল বলে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে তুললো। এই দল বিসমার্কের বিরুদ্ধে 'ধর্ম যুদ্ধ' শুরু করল এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দুটি রক্ষণশীল দলই বিসমার্কের চার্চবিরোধী

নীতির প্রতিবাদ করল। তারা কুলটুরক্যাম্ফের অবসান চাইল এবং শিক্ষার ব্যাপারে চার্চের কর্তৃত্ব থাকা উচিত বলে মত প্রকাশ করল। এর ফলে বিসমার্ক আতঙ্কিত হলেন। ইতিমধ্যে জার্মানীতে সমাজতন্ত্রীরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে নানারূপ আন্দোলন শুরু করে। বিসমার্ক ভাবলেন যদি ক্যাথলিক ও সমাজতন্ত্রীরা একযোগে পার্লামেণ্টে সরকারের বিরোধিতা করতে থাকে তাহলে সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে। একারণে তিনি ক্যাথলিকদের সাথে আপস-মীমাংসায় রাজী হলেন। তিনি মনে করলেন যে ক্যাথলিকদের চেয়ে সমাজতন্ত্রীরা আরও বিপজ্জনক এবং রাষ্ট্রের শত্রু। অতএব ক্যাথলিকদের সাহায্য পেলে তিনি সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করতে পারবেন। এই আশা নিয়ে বিসমার্ক ক্যাথলিকদের সাথে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাইলেন।

ইতিমধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে ক্যাথলিক পার্টিগুলির পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করা সম্ভব হল না। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রীরা ব্যর্থ হল। স্পেনে কারলিস্টরা বিশেষ কিছু করতে পারল না। ইটালীতে রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হওয়ায় পোপের অবস্থা সঙ্গীন হল, এবং অস্ট্রিয়ার সাথে জার্মানীর দ্বিশক্তি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় অস্ট্রিয়ার দিক হতে জার্মানীর ভয়ের কিছু রইল না। সংক্ষেপে বিসমার্ক বুঝতে পারলেন যে জার্মানীর বিরুদ্ধে ক্যাথলিক সংঘ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। আর ঠিক এই সময় পোপ নবম পায়াস-এর মৃত্যু হল এবং শান্তিপ্রিয় ত্রয়োদশ লিও পোপ নির্বাচিত হলেন। নতুন পোপ বাস্তবকে মেনে নিলেন। বিসমার্ক ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে অধিকাংশ আইনগুলি প্রত্যাহার করলেন এবং পোপের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তবে সিভিল ম্যারেজ ব্যবস্থা, জন্মমৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন এবং বিদ্যালয়ে সরকারী পরিদর্শন ব্যবস্থা টি কয়ে রাখা হল।

রেলওয়ে জাতীয়করণ: বিসমার্ক পার্লামেণ্টে সরকার বিরোধীদের অগ্রাহ্য করে সমগ্র জার্মানীর বৈষয়িক উন্নতির জন্য চেষ্টা চালাতে থাকলেন। প্রথমেই তিনি সমগ্র জার্মানীর রেলওয়ে ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। উদারনৈতিক দল এর বিরোধী ছিল। কিন্তু বিসমার্ক ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রাজ্যের রেলওয়েগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় নিয়ে এলেন। বিসমার্কের এই কার্যের ফলে পরবর্তী কালে জার্মানী বিশেষ সুফল ভোগ করেছিল। রেলওয়ে জাতীয়করণের পর বিসমার্ক জলপথে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। এটি জার্মানীর শিল্পায়নের

দিক হতে অপরিহার্য ছিল কেননা জার্মানীর শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি সমুদ্র হতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। বিসমার্ক জার্মানীর শিল্পাঞ্চলের সাথে বড় বড় রাজ্যগুলির সংযোগ স্থাপনের জন্য কয়েকটি বড় খাল খনন করান। এই খালগুলির মধ্যে ডাটমাণ্ড হতে এমস্ এবং এমস্ হতে এলব পর্যন্ত, মেন হতে ফ্রাঙ্কফোর্ট হয়ে রাইন নদী পর্যন্ত এবং এলব হতে লুবেক পর্যন্ত খাল খনন করা হয়। পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ কিয়েল খাল খনন করা হয়েছিল তবে এটির পিছনে জার্মানীকে নৌশক্তিতে প্রবল করার উদ্দেশ্যই বিশেষভাবে কাজ করেছিল। এলব, ওডার এবং ভিশ্চুলা নদীত্রয় খালপথে যুক্ত হওয়ার ফলে জার্মানীর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটল।

বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিসমার্ক বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমত তিনি সমস্ত রাজ্য ও শহরগুলিকে শিল্প সংঘের আওতায় আনলেন। আর এই শহরগুলিই এতদিন পর্যন্ত জার্মানীর বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে জাতীয় নীতি কার্যকরী হতে পারেনি।

উপনিবেশ নীতি: প্রথম দিকে বিসমার্ক জার্মানির জন্য উপনিবেশের প্রয়োজন নেই বলে মনে করতেন। এমনকি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পরাজিত ফ্রান্স যখন আলসেস ও লরেনের বদলে কিছু উপনিবেশ জার্মানীকে দিতে চায় বিসমার্ক তা প্রত্যাখ্যান করেন। উপনিবেশ স্থাপন না করার পিছনে অবশ্য বিসমার্কের একটি সুনির্দিষ্ট নীতি ছিল। তিনি মনে করতেন যে জার্মানী যদি উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হয় তাহলে অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সাথে (বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড) তার স্বার্থসংঘাত দেখা দেবেই। তাছাড়া বৃটিশ উপনিবেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের যা সুযোগ সুবিধা ছিল সেগুলি ভালভাবে কাজে লাগাতে পারলে জার্মান ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু জার্মানী যতই শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল ততই উপনিবেশ স্থাপনের তাগিদ তিনি বুঝতে পারলেন। তাছাডা, শিল্পে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করার ফলে জার্মানীর পক্ষে উপনিবেশ স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিসমার্ক এটি পরে বুঝতে পারেন এবং পরে উপনিবেশ স্থাপনে সচেষ্ট হন।

প্রথমদিকে বিসমার্কের উপনিবেশ স্থাপনে অমত থাকলেও জার্মানীর কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর হয়। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপে এবং আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি ও উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের পর বিসমার্ক উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর হন এবং অচিরেই আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরে জার্মানী বেশ কিছু সংখ্যক উপনিবেশ স্থাপনে সফলতা অর্জন করে। বেসরকারী প্রচেষ্টা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক চুক্তির ফলে এই উপনিবেশগুলি হস্তগত হয়। কালক্রমে আফ্রিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জার্মানীর উপনিবেশ গড়ে ওঠে। নিউগিনির কিছুটা অংশও জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। জার্মানী ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সের সাথে স্বার্থসংঘাত অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিল। অবশ্য বিসমার্ক যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ততদিন ইংল্যাণ্ডের সাথে উপনিবেশ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়নি। বরঞ্চ ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শক্তি খর্ব করার জন্য জার্মানীকে উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহ দেয়।

বিসমার্কের উপনিবেশ নীতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। প্রথমদিকে তিনি যদি উপনিবেশ স্থাপনের নীতি গ্রহণ করতেন তাহলে জার্মানীর পক্ষে সমৃদ্ধশালী অঞ্চল দখল করা সম্ভব হত। তাছাড়া, যে সব উপনিবেশ পরবর্তীকালে স্থাপিত হয়েছিল সেগুলি রাষ্ট্রের অধীনে আনতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। ফলে উপনিবেশগুলির উন্নতি ব্যাহত হয় এবং জার্মানীর শিল্প সংকট এড়ানো সম্ভব হয় না। বিসমার্কের বিলম্বিত ঔপনিবেশ নীতি জার্মানীর উপনিবেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা জোরদার করে। ফলে জার্মানী বিশ্ব-যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল।

শিল্পে সংরক্ষণ নীতি : জার্মানীর বৈষয়িক উন্নতির জন্য বিসমার্ক শিল্প বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন এবং এর পর জার্মানীর উন্নতিশীল শিল্পগুলিকে সুযোগ সুবিধা দেন। এর ফলে জার্মান শিল্পপতিদের পক্ষে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ বাজার সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দখলে আনা সম্ভব হল অপরদিকে বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ফলে জার্মানির শিল্পপতিদের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ স্থান নেবার পক্ষে সুযোগ উপস্থিত হল। শিল্পবিপ্লব পুরোপুরিভাবে জার্মানীতে দেখা দিল। বিসমার্কের সংরক্ষণ নীতি উদারনৈতিক দলের পছন্দ হয়নি। উদারনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে একটা অংশ বিসমার্কের এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। এর ফলে বিসমার্ক তাঁর ক্যাথলিক-বিরোধী নীতিতে পরিবর্তন আনলেন।

বিসমার্ক ও সমাজতন্ত্রবাদ : বিসমার্ক বরাবরই সমাজতন্ত্রবাদের শত্রু ছিলেন। তিনি এই মতবাদ যাতে জার্মানীতে শক্তি সঞ্চয় করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন।

শিল্পায়নের সাথে সাথে জার্মানীতে সমাজতন্ত্রীরা শ্রমিক শ্রেণীর ওপর প্রভাব স্থাপনে সফলতা অর্জন করে। ফ্রেডারিক লাসালের (Lasalle) নেতৃত্বে জার্মানীতে প্রথম শ্রমিক সংঘ স্থাপিত হয়। এই সংঘ অবশ্য পরিচালিত করত বুদ্ধিজীবীরা। পরে প্রথম আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠিত হবার পর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লাইবনেক্ট ও বেবেল এর নেতৃত্বে Social Democratic Party স্থাপিত হল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই দুটি সমাজতান্ত্রিক দল একত্রিত হয়ে Socialist Workingmen's Party of Germany গড়ে ওঠে। এই দল বিসমার্কের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। এমন কি জার্মানীতে যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হল সেটিও এই দল পছন্দ করেনি। ফ্রান্সের নিকট হতে আলসেস ও লরেন কেড়ে নেওয়া অন্যায় বলে এই দল মত প্রকাশ করে। এমনকি সম্রাটের প্রতি আনুগত্য দেখানো ত দূরের কথা তাঁর জীবননাশের চেষ্টাও চালানো হয়। এর ফলে বিসমার্ক সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা বিনষ্ট করবার জন্য তৎপর হলেন। তাঁর নিকট ক্যাথলিকদের চেয়ে সমাজতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতি-কারক বলে মনে হল। সমাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য তিনি দুপ্রকারের নীতি নিলেন—(ক) দমনমূলক এবং (খ) শ্রমিক কল্যাণমূলক। দ্বিতীয় নীতিটি দ্বারা তিনি শ্রমিক শ্রেণীর ওপর সমাজতন্ত্রীদের যে প্রভাব ছিল তা দূর করতে চান।

সমাজতান্ত্রিকদের লক্ষ

দমনমূলক নীতি : বিসমার্ক সমাজতন্ত্রবাদকে সভ্যতার শত্রু বলে মনে করতেন। রক্ষণশীল দল এবং উদারনৈতিক দলগুলিও সমাজতন্ত্রীদের রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষার বিঘ্নকারী বলে মনে করত। এর ফলে সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক নীতি গ্রহণ করা বিসমার্কের পক্ষে সহজ হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বেবেল ও লাইবনেক্টকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য দুবছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। তাছাড়া সমাজতন্ত্রীদের ওপর নানারূপ পুলিশী অত্যাচার চলতে থাকল। General Union of Workers নামে শ্রমিক সংঘটি ভেঙে দেওয়া হল। কিন্তু এর ফল ভাল হল না। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সমাজতন্ত্রীরা পার্লামেণ্টে ৯টি আসন দখল করেছিল আর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তারা ১২টি আসনে জয়লাভ করল এবং প্রায় ৫ লক্ষ ভোটদাতা সমাজতন্ত্রীদের ভোট দিয়েছিল। সমাজতন্ত্রীরা এতে নিশ্চয়ই উৎসাহিত হয়। যার ফলে সম্রাটের জীবননাশের চেষ্টা চলে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পরপর দুবার সম্রাটের জীবননাশের চেষ্টা করা হলে বিসমার্ক সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কঠোরতর আইন প্রণয়ন করলেন, আইনের দ্বারা সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারা, পুস্তক, সংবাদপত্র ও সভা সমিতি মারফৎ প্রচার করা বন্ধ করে দিলেন। এ বিষয়ে পুলিশকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হল।

যে কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বিতাড়িত করবার ব্যবস্থা করা হল। কিছুদিনের মধ্যে সমগ্র জার্মানীতে সমাজতন্ত্রী মতবাদে বিশ্বাসী সংবাদপত্রগুলির প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। পুস্তক-পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করা হল। ১৮৭৮-এর শরৎকালে বার্লিন হতে ৬৭ জন সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যকে বিতাড়িত করা হল। সমগ্র জার্মানীতে একমাত্র রাইখস্টাগ ছাড়া সমাজতন্ত্রীরা তাদের মতামত প্রকাশ করার স্থান পেল না। বিসমার্ক এখান হতেও তাদের বিতাড়িত করতে চাইলেন। কিন্তু এটি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হল না। সংবিধানগত প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় তাঁর পক্ষে এটি সম্ভব হল না।

বিসমার্ক প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন প্রায় বার বছর ধরে চালু ছিল। এই আইনের কবলে পড়ে প্রায় ১৫০০ ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ হতে হয় এবং ৯০০ জন নেতা দেশত্যাগী করে ছাড়ে। কিন্তু সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেও বিসমার্ক সমাজতন্ত্রবাদকে বিনষ্ট করতে পারলেন না, বরঞ্চ জার্মানীতে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার ঘটতে থাকল। ১৮৯০-এর রাইখস্টাগের নির্বাচনের ফলাফল দেখলে এটি সহজেই চোখে পড়ে। এই বছর সমাজতন্ত্রীদল ৩৫টি আসন দখল করতে সমর্থ হয়। ইতিমধ্যে বিসমার্কের পতন ঘটল। নতুন সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক আইনটি আর নতুন করে প্রবর্তন করলেন না। সুতরাং সমাজতন্ত্রীদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিসমার্ক জয়ী হতে পারলেন না।

রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্র ঃ বিসমার্ক সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দমনমূলক আইন প্রবর্তন করেই নিশ্চেষ্ট রইলেন না, তাদের প্রভাব যাতে জনসাধারণের, বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে প্রসারিত হতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি শ্রমিকদের সন্তুষ্ট এবং তাদের চিত্ত জয় করবার মানসে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এসম্বন্ধে তিনি যে নীতি নেন সেটিকে আমাদের যুগে State Socialism বলা হয়ে থাকে। বিসমার্ক শ্রমিকদের দুঃখদুর্দশা এবং আধি-ব্যাধি হতে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে মনে করলেন। একারণে ১৮৮৩ হতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রমিকদের জন্য ব্যাধিবীমা, অসুস্থতা বীমা এবং বার্ধক্যবীমা চালু করেন। ঠিক হল এসব ব্যবস্থা কার্যকরী করতে যে অর্থব্যয় হবে তা শ্রমিক, মালিক ও সরকারকে বিভিন্ন আনুপাতিক হারে অর্থ যোগান দিতে হবে। এছাড়া কারখানা আইন প্রবর্তন করে শ্রমিকদের কাজ করার সময় বেঁধে দেওয়া হল।

শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা

বিসমার্কের শ্রমিককল্যাণ কার্যক্রম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে খুবই প্রশংসিত হল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ তাঁর প্রদর্শিত পথেই অচিরে যাত্রা করল। এদিক হতে দেখলে বিসমার্ককে State Socialism-এর পথিকৃৎ বলা যায়। কিন্তু এত চেষ্টা করেও বিসমার্ক সমাজতন্ত্রবাদকে ধ্বংস করতে পারলেন না। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে বিসমার্কের তথাকথিত State Socialism কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেনি, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণ বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা এতে ছিল না। বিসমার্ক জার্মান রাষ্ট্রের বুর্জোয়া রূপ অটুট রেখে মাংসের টুকরা স্বরূপ ইন্সিওরেন্স ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সাময়িকভাবে তোষণ করা গেলেও তাদের বিপ্লবী মনোভাব ও সমাজতন্ত্রের চিরন্তন বাণী ধ্বংস করা গেল না।

জার্মানীকরণ নীতি: ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। কিন্তু এটি এক-জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখা দিল না। জার্মান সাম্রাজ্যে জার্মান জাতি ছাড়াও বিভিন্ন জাতি বাস করত—যেমন শ্লেজউইগের ডেনরা, পূর্বপ্রাশিয়ার পোলরা এবং আলসেস ও লরেনের ফরাসীরা। এছাড়া জার্মানীতে বহু ইহুদির বাস ছিল। তারা যদিও নিজেদের জার্মান জাতি বলে পরিচয় দিত তবুও তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখত। বিসমার্কের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ওপর জার্মানীকরণ নীতি পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ নষ্ট করে দেওয়া এবং জার্মানীকে এক-ভাষাভাষী রাষ্ট্রে পরিণত করা। বিসমার্ক জার্মান সাম্রাজ্যকে 'পরিতৃপ্ত' দেশ বলে ঘোষণা করেন। এর দ্বারা তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন যে জার্মানীতে বা জার্মানীর বাইরে জাতীয়তাবাদী কোন আন্দোলন জার্মান সাম্রাজ্যের নিকট হতে কোনরূপ সাহায্য পাবে না। বরঞ্চ এগুলিকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর থাকবে।

জার্মান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বসবাসকারী অ-জার্মানরা আন্দোলন শুরু করলে বিসমার্ক এক দিকে যেমন এই আন্দোলন বিনষ্ট করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, অপরদিকে অ-জার্মানদের ওপর জার্মানভাষা ও সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালানো হল। ইহুদিদের বিরুদ্ধে জার্মানদের বিদ্বেষ কাজে লাগানো হল। কিন্তু এত চেষ্টা করেও বিসমার্ক তার জার্মানীকরণের নীতিতে বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারেননি। পূর্ব প্রাশিয়ার পোল অধ্যুষিত অঞ্চলে জার্মান ভাষা প্রচলিত করতে গিয়ে বিসমার্ক বিফল হলেন।

Q. 2. Discuss the main features of the foreign policy of

Bismark and analyse its defects ; or, 'Germany under Bismark's guidance was the pivot of European politics'. ***Discuss.***

Ans. ১৮৭১ হতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটিকে 'বিসমার্কের যুগ' বলা হয়। এই যুগটিতে জার্মানী ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দুকে পরিণত হয় এবং সংক্ষেপে বলতে গেলে এই যুগে বিসমার্ক ইউরোপীয় রাজনীতির পরিচালক ছিলেন। তিনি যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে মৈত্রী ব্যবস্থা গড়ে তোলেন সেটার ওপর নির্ভর করে ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বহুদিন টিকে ছিল। তিনি জার্মানীকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। এই সময় তার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নবগঠিত জার্মান রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করা এবং ফ্রান্সকে প্রতিশোধ গ্রহণে বাধা দেওয়া।

পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য

রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন : জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই বিসমার্ক অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সাথে মৈত্রীমূলক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। কারণ নয়া জার্মান রাষ্ট্রের পক্ষে এদুটি রাষ্ট্রের সমর্থন একান্তভাবে কাম্য ছিল। তাছাড়া ফ্রান্স যাতে নির্বান্ধব অবস্থায় থাকে তার জন্যও এটির প্রয়োজন ছিল। রাশিয়ার মতিগতি বিসমার্ক ভালভাবেই জানতেন এবং রাশিয়ার দিক হতে জার্মানীর কোন আশঙ্কার কারণ নেই বলে মনে করতেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হতে রুশ-জার্মান প্রীতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। এবং যতই দিন যেতে থাকে রুশ-জার্মান বন্ধুত্ব আরও নিবিড় হয়। যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে রুশ জার্মান বন্ধুত্বে ফাটল ধরবার উপক্রম হয়েছিল, যেমন—শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্ন নিয়ে এবং অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময়। কিন্তু সুচতুর বিসমার্কের কূটনীতির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবের দ্বারা তা অচিরেই রোধ করা সম্ভব হয়। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময় রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকে এবং জার্মান সাম্রাজ্য গঠনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। একারণে বিসমার্ক মনে করলেন যে জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনে রাশিয়ার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেই জার্মান সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্য রাশিয়া নিশ্চয়ই সচেষ্ট হবে না। একারণে বিসমার্ক রাশিয়ার সাথে সুদীর্ঘকাল ধরে বন্ধুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে বলে ধরে নেন।

রুশ নীতি

বিসমার্ক রাশিয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে অস্ট্রিয়ার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করবার চেষ্টা করতে থাকলেন। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সাথে স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রচুর বাধা ছিল। প্রথমত, বিসমার্কের আগ্রাসী নীতির ফলে অস্ট্রিয়ার যা ক্ষতি হয়েছিল তা ফ্রান্সের ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশি বলে মনে

অস্ট্রিয়ান নীতি

হয়। বহু বছর ধরে অস্ট্রিয়া চেষ্টা করে আসছিল জার্মানীতে যাতে প্রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হতে না পারে এবং অস্ট্রিয়া মনে করত যে জার্মানীতে আধিপত্য বজায় রাখা ইউরোপে অস্ট্রিয়ার প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে টিকে থাকবার জন্য একান্তভাবে দরকার। কিন্তু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়ার পক্ষে জার্মানীতে তার প্রভাব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। একারণে অস্ট্রিয়া তার পরাজয় ও অপমানের কথা সহজে ভুলতে পারল না। বিসমার্ক এটি জানতেন বলেই অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে সদা সর্বদা সতর্ক থাকতেন। ফ্রাঙ্কো প্রাশিয়ান যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিসমার্ক তাঁর অনন্য সাধারণ কূটনীতির দ্বারা অস্ট্রিয়াকে নিরপেক্ষ রাখতে সমর্থ হলেন এবং জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের পর অস্ট্রিয়ার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ গড়ে তোলার কাজে মন দিলেন। ফ্রান্সের পরাজয় এই সম্বন্ধ গড়ে ওঠবার পক্ষে সহায়ক হল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দেই বিসমার্ক ভার্সাই হতে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার বেউস্টকে এক টেলিগ্রাম মারফৎ জার্মানীর জয়ের কথা জানান এবং অস্ট্রিয়ার সাথে জার্মানীর সম্বন্ধ নিকটতর হোক বলে আশা প্রকাশ করেন। বেউস্ট এর উত্তরে খুবই ভদ্রভাবে অনুরূপ আশা প্রকাশ করেন। সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ জার্মানীর সাথে অস্ট্রিয়ার মৈত্রীমূলক সম্বন্ধ স্থাপনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি একক ভাবে এটি বন্ধ করতে পারলেন না। ইতিমধ্যে বেউস্ট-এর স্থলে এ্যাণ্ডেসি অস্ট্রিয়া—হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার হলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিসমার্কের বন্ধু ছিলেন। এর ফলে জার্মানীর সাথে অস্ট্রিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সুবিধা হল। তবে বিসমার্ক খুব তাড়াতাড়ি এবিষয়ে অগ্রসর হলেন না। তিনি অস্ট্রিয়াকে জানিয়ে দিলেন যে অস্ট্রিয়ার সাথে জার্মানীর মৈত্রী স্থাপন তাঁর কাম্য কিন্তু এই মৈত্রী স্থাপনে রাশিয়ার সাথে জার্মানীর যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে সেটি যেন বজায় থাকে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া উভয়েই বল্‌কান অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনে আগ্রহী ছিল এবং একের স্বার্থ অন্যের পরিপন্থী ছিল। যাই হোক ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যের সম্রাট বার্লিন ভ্রমণে এলেন, রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে ও নিমন্ত্রণ করা হল। এর ফলে তিন সম্রাটের মধ্যে এক বৈঠক বসল। এদিকে বিসমার্ক, এ্যাণ্ডেসি ও গর্চাকফ—তিন জনে একত্রিত হয়ে এই তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কিভাবে গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে আলোচনা চালালেন। অবশেষে ১৮৭৩

ত্রি-সম্রাট সংঘ স্থাপন

খৃষ্টাব্দে-ত্রি সম্রাট সংঘ (Driekai serbund) স্থাপিত হল। অবশ্য তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল না। এই সংঘের উদ্দেশ্য অনেকটা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের 'পবিত্র সংঘ'-এর মত ছিল যেমন, রাষ্ট্রত্রয়ের সাম্রাজ্যিক অখণ্ডতা রক্ষা করা, পারস্পরিক স্বার্থ বজায় রাখা, ইউরোপে শান্তি অব্যাহত রাখা এবং নিজ নিজ রাজ্যে সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করা। এইভাবে ত্রি-সম্রাট সংঘের মাধ্যমে বিসমার্ক নয়া জার্মান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোট গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা দূর করলেন।

বিসমার্ক তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। ফলে বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ফ্রান্স ইউরোপে কোন মিত্র পেল না।

কিন্তু এই ত্রি-সম্রাট সংঘ কার্যকরী হল না। নিকট প্রাচ্যে (বলকান অঞ্চলে) রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে স্বার্থ সংঘাত দেখা দেওয়ায় এই সংঘ অকার্যকরী হয়ে পড়ে।

দ্বৈত সন্ধি—১৮৭৯

বার্লিন কংগ্রেসে (১৮৭৮) বিসমার্ক প্রকাশ্যে অস্ট্রিয়ার দা'ব সমর্থন করলে ত্রি-সম্রাট সংঘ ভেঙে যায়। এরপর বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সাথে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত করলেন। এটিকে দ্বৈত সন্ধি বলা হয়। এই চুক্তিটিতে কয়েকটি গোপন শর্ত ছিল। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর মধ্যে গোপন দ্বৈত সন্ধিটি রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধেই সৃষ্ট হয়েছিল। এই দ্বৈত সন্ধিটিতে ঠিক হয় যে রাশিয়া জার্মানী বা অস্ট্রিয়া যাকেই আক্রমণ করুক না কেন উভয় রাষ্ট্র এক জোটে রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। অন্য কোন শক্তি যদি এদুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনটিকে আক্রমণ করে তা হলে অপরটি নিরপেক্ষ থাকবে। বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সাথে যে দ্বৈত সন্ধি স্থাপন করলেন তা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অটুট থাকে।

বিসমার্কের চিরাচরিত নীতি ছিল রাশিয়ার সাথে সদ্ভাব রক্ষা করা, তা ছাড়া জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে কোন স্বার্থ সংঘাত ছিল না। একারণে তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ত্রি-সম্রাট সংঘকে পুনরায় সঞ্জীবিত করলেন। এই সঞ্জীবিত ত্রি-সম্রাট সংঘের নাম দেওয়া হল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের 'ত্রি-সম্রাট মিতালী।' এই সন্ধিটিও আত্মরক্ষামূলক

পুনরুজ্জীবিত ত্রিসম্রাট সংঘ ১৮৮১

ছিল। এই সন্ধিতে ঠিক হল যে এক তুরস্ক ছাড়া অন্য কোনও শক্তির সাথে যদি এই তিনটি রাষ্ট্রের যে কোনটির যুদ্ধ শুরু হয় তা হলে অন্য দুটি নিরপেক্ষ থাকবে। তুরস্কের সাথে যুদ্ধ শুরু হলে অবশ্য এই তিন শক্তি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে এবং বলকান অঞ্চলে এই তিন শক্তির মধ্যে কোনটিই নিজের খেয়াল খুশী অনুযায়ী পরিবর্তন আনবে না।

তবে এটা মনে রাখতে হবে যে ত্রি-সম্রাট মিতালী চুক্তিটির দ্বারা জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের দ্বৈত সন্ধি নাকচ হয়ে গেল না।

এরপর বিসমার্ক ইটালীকে দলে টানতে চাইলেন। কিন্তু ইটালীর সাথে অস্ট্রিয়ার স্বার্থ সংঘাত থাকায় এটি সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স যখন ইটালীকে অগ্রাহ্য করে টিউনিস দখল করল, তখন ক্ষুব্ধ ইটালী জার্মানীর সাথে সন্ধি করতে চাইল। কিন্তু বিসমার্ক ইটালীকে অস্ট্রিয়ার সাথেও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে বললেন। ইটালী নিরুপায় হয়ে অস্ট্রিয়ার সম্বন্ধে পূর্বেকার নীতি ত্যাগ করে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করল।

ত্রি-শক্তি মৈত্রী—১৮৮২

ফলে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের দ্বৈত সন্ধি **ত্রি-শক্তি মৈত্রীতে** (Triple Aliance) পরিণত হল। এই চুক্তি অনুসারে ঠিক হল যে ফ্রান্স যদি ইটালীকে আক্রমণ করে তা হলে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া উভয়েই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইটালীকে সাহায্য করবে। ফ্রান্স যদি জার্মানীকে আক্রমণ করে তাহলে ইটালী জার্মানীকে সাহায্য করবে। একাধিক শক্তি যদি এই তিনটি শক্তির যে কোনটিকে আক্রমণ করে তাহলে তারা একজোটে আক্রমণ-কারীদের বাধা দেবে এবং অস্ট্রিয়ার সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধলে ইটালী নিরপেক্ষ থাকবে। এই চুক্তির ফলে ইটালী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে রেষারেষির ভাব কিছুটা কমে গেল।

বিসমার্ক জানতেন যে কেবলমাত্র অস্ট্রিয়া ও ইটালীর বন্ধুত্ব লাভ করলেই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না। পূর্ব ইউরোপে জার্মানীর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য রাশিয়ার সাথে তিনি পুনর্মিলনের চেষ্টা করতে লাগলেন, কেননা বল্‌কান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের প্রশ্ন নিয়ে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে মনোমালিন্য দেখা যায় তার ফলে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'ত্রি-সম্রাট মিতালী' অকার্যকরী হয়ে পড়ে এবং বিসমার্ক বুঝতে পারেন যে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী মূলক চুক্তি সম্ভব নয়। একারণে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সাথে একটি নিরাপত্তাসূচক চুক্তি (Reinsurance Treaty) স্বাক্ষরিত করলেন। এই চুক্তি দ্বারা ঠিক হল যে, জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্স আক্রমণ এবং রাশিয়া কর্তৃক অস্ট্রিয়া আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন শক্তি জার্মানী বা রাশিয়া আক্রমণ করলে তারা পরস্পরের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে।

রুশনীতি

ইংল্যাণ্ডের সাথেও বিসমার্ক বন্ধুত্বভাব বজায় রাখলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের মিশর অধিকার সমর্থন করেন এবং জার্মানী উপনিবেশ চায় না বলে ঘোষণা করেন। ফলে জার্মানীর সাথে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কের অবনতি ঘটল না, বরঞ্চ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হল।

ইংল্যাণ্ডের সাথে সদ্ভাব

পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা : বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির ফলাফল সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই নীতির ফলে ১৮৭০ হতে ১৮৯০ পর্যন্ত বিসমার্কের নেতৃত্বাধীনে জার্মানী ছিল ইউরোপের মধ্যমণি। এই সময় জার্মান সাম্রাজ্য শত্রুর আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল না। এবং এর ফলে জার্মানীর পক্ষে শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে উন্নতি করা সম্ভব হয়েছিল। তবে তাঁর কূটনৈতিক ব্যবস্থা এত সূক্ষ্ম ও জটিল ছিল যে বিসমার্ক অপেক্ষা কম প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে এটি বজায় রাখা দুঃসাধ্য ছিল। তাছাড়া বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি ত্রুটিশূন্য ছিল না— প্রথমত, তিনি ভেবেছিলেন যে রাষ্ট্রজোট তৈরি করতে পারলেই জার্মান সাম্রাজ্যের সংহতি অটুট থাকবে, কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি যে রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোট দেখা দিতে পারে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা বলে কিছু নেই। আজকের বন্ধু আগামী কাল শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আর ঠিক এটাই ঘটেছিল, অবশ্য বিসমার্কের পতনের পর। দ্বিতীয়ত, তাঁর পররাষ্ট্রনীতি কোন মহান আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়নি। তিনি খুবই স্বার্থপর ছিলেন। জার্মানীর কিসে সুবিধা হবে, তার স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করা যাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি তাঁর পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত করতেন, ইউরোপের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করতেন না। এর ফলে পরবর্তীকালে ইউরোপে বিবদমান দুটি রাষ্ট্রজোট দেখা দেয় এবং ইউরোপ যুদ্ধের কিনারায় গিয়ে পৌছায়। এই অবস্থার জন্য বিসমার্ক কিছুটা দায়ী ছিলেন। তৃতীয়ত, তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় ; যেমন—অস্ট্রিয়ার সাথে রাশিয়ার বল্‌কান অঞ্চল নিয়ে স্বার্থ-সংঘাত থাকলেও বিসমার্ক উভয় রাষ্ট্রের সাথেই মিত্রতা স্থাপন করেন। কিন্তু এই মিত্রতা যে টিকতে পারে না তা তিনি বুঝেও বুঝতে চাননি। একারণে রাশিয়া পরবর্তী-কালে ফ্রান্সের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। তেমনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইটালীর বহু অভিযোগ ছিল। অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর ইটালীর দাবি ছিল। কিন্তু এদিকে নজর না দিয়ে বিসমার্ক উভয় রাষ্ট্রকে এক কূটনৈতিক সূত্রে বাঁধলেন। কিন্তু এটি ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য ছিল। বিসমার্কের পদত্যাগের পর একদিকে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে এবং অপরদিকে অস্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া ও ইটালী জার্মানীর শত্রু ছিল।

চতুর্থত, বিসমার্কের ফরাসী নীতিও সমর্থনযোগ্য নয়। ফ্রান্সের নিকট হতে আলসেস এবং লোরেন কেড়ে নেওয়া যে অন্যায় হয়েছিল তা বিসমার্ক বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেকারণে ফ্রান্সকে ইউরোপীয় রাজনীতিতে একঘরে করবার ব্যবস্থা

করেন। এর ফলে ফরাসীদের মধ্যে জার্মান বিরোধী মনোভাব তীব্র হল এবং ফ্রান্স প্রতিশোধ নেবার জন্য তৎপর হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল জার্মান ফরাসী দ্বন্দ্ব এবং এর জন্য বিসমার্ক অনেকাংশে দায়ী ছিলেন। পঞ্চমত, বিসমার্কের উপনিবেশ নীতিও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। জার্মানীর নিজ স্বার্থের জন্য উপনিবেশের প্রয়োজন ছিল তা বিসমার্ক বুঝতে চাননি। পরে যখন বুঝতে পারলেন তখন জার্মানীর ভাগ্যে লাভজনক উপনিবেশ জুটল না।

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত এই আলোচনা হতে এটাই বোঝা যায় যে, ১৮৭১ হতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্কের নেতৃত্বাধীনে জার্মানী ছিল ইউরোপীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। তবে বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি ত্রুটিশূন্য ছিল না। তাঁর কূটনৈতিক ব্যবস্থা এত সূক্ষ্ম ও জটিল ছিল যে বিসমার্ক অপেক্ষা কম প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে এটি বজায় রাখা দুঃসাধ্য ছিল।

শেষ জীবন ও মৃত্যু ঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় উইলিয়ম জার্মানীর সম্রাট হন। নতুন সম্রাট খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। বিসমার্কের সহিত তাঁর তীব্র মতভেদ হলে বিসমার্ক পদত্যাগ করেন এবং নিজ গ্রামে চলে যান। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই কর্মবীর দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ববর্তী আট বৎসর তাঁর বাসস্থান রাজনীতিবিদদের তীর্থস্থান ছিল।

উপসংহারে বলা যায় যে বিসমার্ক ছিলেন উনিশ শতকের ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। তাঁর বিচক্ষণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কূটকৌশল জার্মানীর ইতিহাসে অনন্য। তাঁর চেষ্টায় জার্মানী ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়।

Q. 3. Review briefy the history of the third Republic of France during the period 1871-1890.

Ans. ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর সেডানের রণক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয়ের সাথে সাথে ফ্রান্সে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে পুনরায় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল। এই প্রজাতন্ত্রকে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র বলা হয়। ওই তারিখে প্রাক্তন আইন সভার প্রজাতন্ত্রী সদস্যগণ হোটেল ভিলিতে সমবেত হয়ে একটি সাময়িক সরকার স্থাপন করেন। সেনাপতি ট্রচুকে এই সরকারের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। ইতিমধ্যে

সূচনা

জার্মান সৈন্য প্যারিসকে অবরোধ করে। পাঁচ মাস অবরোধ থাকার পর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের শুরুতে প্যারিস আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ওই সময় জার্মানীর সাথে ভার্সাই-এর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কয়েক মাস পরে ফ্রাঙ্কফোর্টের চুক্তি দ্বারা এটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে উভয় পক্ষ গ্রহণ করে।

সাময়িক সরকার : ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত এই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসল বোর্দো শহরে। বিশেষ করে সাময়িক সরকারের নিকট হতে ক্ষমতা গ্রহণ করবার জন্য এই অধিবেশন বসে। এই পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন রাজতন্ত্রী। অতএব পরিষদ ইচ্ছে করলেই এই সুযোগে ফ্রান্সে পুরানো রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। কিন্তু রাজতন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়ার ফলে এটি সম্ভব হল না। কিছু সংখ্যক রাজতন্ত্রী সদস্য দশম চার্লসের পৌত্রকে ফ্রান্সের রাজা করবার জন্য চেষ্টা করল, আর কিছু সংখ্যক লুই ফিলিপের পৌত্রকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসাতে চাইল। রাজতন্ত্রীদের অধিকাংশ এ বিষয়ে মনস্থির করতে না পারায় প্রজাতন্ত্রী সরকারই টিকে রইল। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের অন্যতম নেতা থিয়ার্সের হাতে সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা জাতীয় পরিষদ অর্পণ করল। থিয়ার্স একটি মন্ত্রিসভা গঠন করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে তাঁর সরকারের প্রধান কাজ হল জার্মানীকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ শোধ করে দেওয়া।

প্যারিস কমিউন : ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ জার্মান সৈন্য প্যারিসে প্রবেশ করে শহরটি দু'দিনের জন্য দখলে রাখল। জাতীয় পরিষদ তখন প্যাবিস হতে উঠে গিয়ে ভার্সাই প্রাসাদে অধিবেশন বসবে বলে ঠিক করল। ঠিক এই সময় প্যারিসের বিপ্লবী জনসাধারণ এক রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থান ঘটাল। এটিকেই প্যারিস কমিউন বলা হয়ে থাকে। ১৮ই মার্চ ১৮৭১ প্যারিসে কমিউন সরকার স্থাপিত হল। এই সরকারের ঘোষণায় প্যারিসকে স্বাধীন সার্বভৌম নগর হিসাবে বলা হল। প্যারিসের জনসাধারণের এই অভ্যুত্থানের পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, ফ্রাঙ্কো প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময় প্যারিস সবচেয়ে বেশি দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছিল। জার্মান বাহিনীর নিকট ফরাসী সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও প্যারিসের বিপ্লবী নাগরিকবৃন্দ সহজে আত্মসমর্পণ করেনি। প্যারিসের সেই বিপ্লবী জনসাধারণের এই সাহসিকতার কোন মূল্যই দিলনা প্যারিসের সাময়িক সরকার। বরঞ্চ প্যারিসবাসীদের ওপর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দিল। দ্বিতীয়ত, প্যারিস হতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ভার্সাই-এ অনুষ্ঠিত হবে এই ঘোষণায় প্যারিসবাসীরা অপমানিত বোধ করল এবং এর পিছনে জাতীয় পরিষদের গূঢ় অভিসন্ধি আছে বলে মনে করল। তৃতীয়ত জাতীয় পরিষদে রাজতন্ত্রীদের সংখ্যাধিক্য থাকায় তারা প্রজাতন্ত্রী

কেন দেখা দিল

সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়ল। চতুর্থত থিয়ার্স সরকার প্যারিসের জাতীয় রক্ষী বাহিনী ভেঙে দিল এবং প্যারিস হতে কামান প্রভৃতি সরাতে মনস্থ করল। প্যারিসের অনুভূতিপ্রবণ বিপ্লবী জনসাধারণ এটি সহ্য করতে পারলেন না। সরকারী বাহিনীর সাথে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন এবং এর সাথে সাথে বিপ্লবের রক্ত পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীন কমিউন-এর প্রতিষ্ঠা করলেন।

বিপ্লবীদের আদর্শ : কমিউনের আদর্শ ছিল প্রকৃত সাম্যবাদী আদর্শ। এই আদর্শ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের পরিবর্তে কয়েকটি স্বাধীন কমিউন স্থাপনে বিশ্বাসী। এই কমিউনগুলি সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন থাকবে এবং কারও এমন কোন ক্ষমতা থাকবে না যার দ্বারা একটি অন্যটির ওপর কর্তৃত্ব করতে পারে। সংক্ষেপে প্যারিস কমিউন শাসনের মাধ্যমে শোষণের অবসান চেয়েছিল।

কমিউন বিপ্লবের অবসান : এদিকে থিয়ার্স সরকার প্যারিস কমিউন ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর হল। ফলে প্যারিসে এক রক্তক্ষয়কারী গৃহযুদ্ধ দেখা দিল। সরকারী ফৌজ প্যারিস অবরোধ করল। এই অবরোধ ছয় সপ্তাহ ধরে চলেছিল এবং বিজয়ী জার্মান সৈন্যের চোখের সামনেই এটি ঘটল। দুপক্ষই বর্বরতা ও নৃশংসতার পরিচয় দিল। কমিউনপন্থীরা প্যারিসের আর্চবিশপ হতে শুরু করে খ্যাতনামা বুর্জোয়াপন্থীদের হত্যা করল এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। টুইলারী প্রাসাদ ও হোটেল ভিলিও বাদ গেল না। থিয়ার্স সরকারও যে নৃশংসতার পরিচয় দিল তা সর্বকালে সমালোচনার যোগ্য। প্রায় ৩৬ হাজার নরনারীকে প্যারিসের রাজপথে হত্যা করা হল এবং অসংখ্য লোককে গ্রেপ্তার করা হল।

প্যারিস কমিউনের সরকার একদিকে যেমন বিশ্বের প্রথম সাম্যবাদী সরকার, তেমনি এটিই হয়েছে প্যারিসের শেষ অভ্যুত্থান। ইতিপূর্বে প্যারিসই বিপ্লব ঘটিয়ে ফ্রান্সে অন্তত দুটি সরকারের পতন ঘটিয়েছিল কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সেটি সম্ভব হল না। এতে বোঝা যায় যে প্যারিসই ফ্রান্স নয়।

রাষ্ট্রপতি পদে থিয়ার্স : প্যারিসের পতনের পর হতেই তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসন কর্তৃত্ব শুরু হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সাময়িকভাবে থিয়ার্সকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করা হল। রাজতন্ত্রীরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এটি সমর্থন করল। এই সময় গামবেটার সাথে থিয়ার্সের মতবিরোধও দেখা দিল। থিয়ার্সের আমলে ফ্রান্স পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। থিয়ার্স সর্বপ্রথম জার্মানীকে ক্ষতিপূরণের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগেই মিটিয়ে দিলেন। এর ফলে

জার্মান সৈন্যদলকে ফ্রান্স ছেড়ে চলে যেতে হল। এই ঘটনা হতে বোঝা যায় যে ফ্রান্সের আর্থিক সংগতি পরাজয়ের ফলেও ভেঙে পড়েনি। এরপর থিয়ার্স যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের বিভিন্ন সমস্যা দূর করার কাজে ব্রতী হলেন। প্রথমেই তিনি যুদ্ধে বিনষ্ট রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিগুলির সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করলেন। তাছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য পুনরায় যাতে স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে তার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এমনকি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হল। এই প্রদর্শনীতে ফরাসী জনসাধারণের অক্ষয় প্রাণশক্তি যেন রূপ পেল।

থিয়ার্স সামরিক বাহিনীতে বিভিন্ন সংস্কার সাধন করলেন। ফ্রান্সে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হল। এর ফলে ভবিষ্যতে ফরাসী সৈন্যবাহিনী বিশেষভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। থিয়ার্স প্রাদেশিক শাসনে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন বলে আঞ্চলিক সংস্থাগুলির হাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হল। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়।

আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আনার সাথে সাথে নতুন সংবিধান তৈরির প্রশ্ন উঠল। রাজতন্ত্রীরা আর থিয়ার্সকে ক্ষমতায় রাখতে চাইল না। ফলে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে থিয়ার্সকে পদত্যাগ করতে হল এবং তাঁর স্থানে সেনাপতি ম্যাকমেহোনকে রাষ্ট্রপতি করা হল।

নতুন সংবিধান প্রণয়ন ঃ ইতিমধ্যে ফ্রান্সের স্থায়ী শাসনতন্ত্র নিয়ে নানারূপ মত-বিরোধ দেখা দিল। রাজতন্ত্রীরা পুরানো শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য সচেষ্ট হল। কিন্তু এই সময় রাজতন্ত্রীদের মধ্যে তিনটি দল দেখা দিল—একটি দল বোনাপার্টি বংশের শাসন পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা চালালো, দ্বিতীয়টি অরলিয়ঁ বংশকে ফিরিয়ে আনতে চাইল, আর তৃতীয়টি বুরবোঁ বংশের শাসনের পক্ষপাতী ছিল। অবশেষে এই তিনজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হল। ঠিক হল বুরবোঁ বংশীয় Comte de Chambord পঞ্চম হেনরী নাম নিয়ে ফ্রান্সের রাজা হবেন। তারপর অরলিয়ঁ বংশের কোন যুবরাজ ফ্রান্সের সিংহাসনে বসবেন। কিন্তু অসুবিধা হল Comte de Chambord-কে নিয়ে। তিনি বিপ্লবের ত্রিবর্ণ পতাকাতলে ফ্রান্সের রাজা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করতে রাজী হলেন না। তিনি চাইলেন বুরবোঁ বংশের পুরাতন লিলি লাঞ্ছিত শ্বেত পতাকা।

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

কিন্তু ফরাসীরা বিপ্লবের প্রতীক ত্রিবর্ণ পতাকা পরিত্যাগ করতে চাইল না। রাষ্ট্রপতি ম্যাকমেহোন ঘোষণা করলেন যে বুরবোঁদের শ্বেত পতাকা দেখলেই সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করবে। Chambord কিন্তু শ্বেত পতাকা সম্বন্ধে অনমনীয় মনোভাব দেখালেন। ফলে প্রজাতন্ত্র টিকে গেল। মাত্র

১টি ভোটের ব্যবধানে জাতীয় পরিষদে ফ্রান্সের জন্য 'প্রজাতন্ত্র' গৃহীত হল। এই প্রজাতন্ত্র তৃতীয় প্রজাতন্ত্র নামে খ্যাত এবং এটির স্থায়িত্বকাল অন্য দুটি প্রজাতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রজাতন্ত্র ফ্রান্সে ঠিক থাকে।

সংবিধানের স্বরূপ : ইতিমধ্যে নতুন সংবিধান তৈরি হয়ে গেল। এই সংবিধানে ফ্রান্সে পরিষদীয় গণতন্ত্র স্থাপন করা হল। রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক রাজার ন্যায় ক্ষমতা দেওয়া হল। একটি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা করা হল এবং দেশের আইনসভা উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ নিয়ে গঠিত হবে বলে বলা হল। উচ্চ ও নিম্ন পরিষদের নাম হল যথাক্রমে সিনেট ও হাউস অফ ডেপুটিজ। নিম্ন পরিষদের সদস্যরা সর্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত হবে বলে ঠিক হয়। রাষ্ট্রপতি ৭ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় সভার কাজ শেষ হল। নতুন সংবিধান অনুযায়ী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। তৃতীয় প্রজাতন্ত্র তার দীর্ঘ শাসনকাল শুরু করল।

বিভিন্ন সমস্যা : আভ্যন্তরীণ ইতিহাস : তৃতীয় প্রজাতন্ত্র নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হল। প্রথমেই রাজতন্ত্রীরা যাজকসম্প্রদায়ের সহযোগিতায় একটি অভ্যুত্থান ঘটাল। এটির নাম হল The Seize Nai of 1877. যাজকসম্প্রদায় একদিকে যেমন বুরবোঁ বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা চাইল অন্যদিকে পোপের ক্ষমতাও পুনঃ স্থাপনের চেষ্টা করল। এরফলে ইটালী সরকার রুষ্ট হল। এই দল বিসমার্কের ক্যাথলিক পীড়ন নীতিরও প্রতিবাদ করল। এর ফলে ফ্রান্সের নিম্ন পরিষদ শংকিত হল। যাজকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারল। এই সময় গামবেটা ঘোষণা করলেন যে চার্চই প্রজাতন্ত্রের প্রধান শত্রু। ঠিক এই সময় রাষ্ট্রপতি ম্যাকমেহোন মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিলেন। দেশের জনসাধারণ এতে ক্ষুব্ধ হল। তারা মনে করল যে যাজকদের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রপতি এই কাজ করেছেন। এরপর পরপর কয়েকটি মন্ত্রিসভা গঠিত হল। এগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীলদের স্থান হওয়ায় নিম্নকক্ষের সাথে মতবিরোধ দেখা দিল। শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও যাজকসম্প্রদায় কিন্তু তাদের ঐ ঈপ্সিত বস্তু পেল। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি ম্যাকমেহোন পদত্যাগ করায় জুলস্ গ্রেভি রাষ্ট্রপতি হলেন। তাঁর আমলে ফ্রান্সের শিক্ষাব্যবস্থা হতে চার্চের ক্ষমতা একেবারে বিনষ্ট করা হল। আর এটি সম্ভব হয় শিক্ষামন্ত্রী জুলস্ ফেরির জন্য। প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সংবিধানে কিছুটা পরিবর্তন আনা হল। ঠিক হল যে সিনেটের সদস্যরা আমৃত্যুকাল সদস্য থাকতে পারবেন না এবং ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রী রূপ অটুট রাখা

হবে এবং ফ্রান্সের প্রাক্তন রাজবংশের কোন বংশধর রাষ্ট্রপতিপদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে না।

তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রাথমিক যুগে (১৮৭৫ হতে ১৮৯০ এর মধ্যে) ফ্রান্সে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। এই সময় শিল্পায়নের ফলে ফ্রান্স বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। দেশে বাক্‌স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে মেয়র ও সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়।

বুলাঞ্জিস্ট আন্দোলন: ফ্রান্সের রাজতন্ত্রী ক্যাথলিক দল এবং রক্ষণশীলরা তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে স্থায়ী সরকাররূপে গ্রহণ করেনি। তাছাড়া এই সময় প্রজাতন্ত্রী দলে ভাঙন দেখা দেয়। জনসাধারণ প্রজাতন্ত্রী দলের দুর্নীতিমূলক শাসনে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে জনসাধারণের প্রজাতন্ত্রী সরকার-বিরোধী মনোভাব বেশ ফুটে ওঠে। এই নির্বাচনে রাজতন্ত্রী দল শতকরা ৪৫টি ভোট পায় এবং—নিম্নকক্ষে তারা বেশ কিছু সংখ্যক আসন দখল করে। অন্যদিকে প্রজাতন্ত্রী দলের মধ্যে সুযোগ্য নেতা না থাকায় এই দলকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ল। বুলাঙ্গার আন্দোলন এরূপ একটি আভ্যন্তরীণ সমস্যা যেটির সমাধান অকস্মাৎ হয়ে যায় এবং সরকারকে সমূহ বিপদ হতে রক্ষা করে। বুলাঙ্গার আসলে ছিলেন একজন সৈনিক। সামরিক খ্যাতি তাঁর বিশেষ ছিল না তবে তিনি সুন্দর দেহী ছিলেন এবং বক্তৃতাও মাঝামাঝি করতে পারতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্লেমেনসুর সমর্থন লাভ করেন বলে ফ্রান্সের সমরমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। সমরমন্ত্রী হয়েই তিনি সামরিক বিভাগে আমূল পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করলেন এবং সৈন্যদের হাত করবার জন্য বহু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করলেন। এমনকি তিনি কায়েমী স্বার্থবাদীদের ক্ষমতা বিনষ্ট করবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিলেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত হতে থাকল এবং তাঁকে দেশের পরিত্রাতারূপে অনেকে মনে করল। এর পরে বুলাঙ্গারের পক্ষে ফ্রান্সের এক নায়ক হবার কিছুটা সুবিধা হল। তিনি রাষ্ট্রপতি গ্রেভির বদনাম কাজে লাগাতে মনস্থ করলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় দিবসে তাঁকে প্যারিসের বিপ্লবী জনতা দেশত্রাতা রূপে গ্রহণ করল। বামপন্থী সংবাদপত্রগুলিও তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হল এবং বুলাঙ্গারের জার্মান বিদ্বেষী নীতি ফরাসীদের হৃদয় জয় করল। বুলাঙ্গারের হাত হতে রেহাই পাবার জন্য ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে গবলেট মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করল। পরবর্তী মন্ত্রিসভায় বুলাঙ্গারকে স্থান দেওয়া হল না। ফলে দেশের

বিভিন্ন স্থানে বুলাঙ্গারের পক্ষে নানারূপ আন্দোলন চলতে থাকল। এমনকি বুলাঙ্গারকে রাষ্ট্রপতি করবার চেষ্টা চলল। বুলাঙ্গারও এই সময় সংবিধান পরিবর্তনের কথা তুললেন। ঠিক এই সময় রাষ্ট্রপতি গ্রেভির উইলসন নামে জামাতা নানারূপ দুর্নীতির জন্য ধরা পড়ল। গ্রেভি পদত্যাগ করলেন। প্রজাতন্ত্রী দলে এই সময় ভাঙন ধরল। বুলাঙ্গার যদি সাহসী হতেন তাহলে এই সুযোগে তিনি ফ্রান্সের ক্ষমতা হস্তগত করে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এটি করতে সাহসী হলেন না। ফলে কার্নট রাষ্ট্রপতি হলেন। নতুন মন্ত্রিসভা বুলাঙ্গারের ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করবার জন্য তাঁকে সেনাপতির পদ হতে সামান্য কারণে পদচ্যুত করলেন। বুলাঙ্গার এই বার পুরোপুরি সরকারবিরোধী হলেন। তাঁকে রাজতন্ত্রী, ক্যাথলিক দল এবং রক্ষণশীলরা ত সাহায্য করলই, তাছাড়া ফ্রান্সের জনসাধারণও তাঁকে তাদের নেতারূপে গ্রহণ করল। তিনি বিভিন্ন স্থান হতে নিম্নপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন। বোনাপার্টি দলও বুলাঙ্গারকে সমর্থন করল। এদিকে প্যারিসে ব্যাস্টিল পতনের শতবৎসর পূর্তি উৎসবে বুলাঙ্গারকে সভাপতি করা হল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সেইন অঞ্চল হতে নির্বাচনে সরকারী দলের প্রার্থীর চেয়ে ৮০ হাজার ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হলেন। এই সময় যদি বুলাঙ্গার একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে পারতেন তাহলে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে কেউ বাঁচাতে পারত না। এবারও বুলাঙ্গার প্রয়োজনীয় সাহস দেখাতে না পারায় সুবর্ণ সুযোগ হারালেন। এইবার প্রজাতন্ত্রী সরকার বুলাঙ্গারের ভয়ে ভীত হল। তাঁকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ করার জন্য বিচার করার মনস্থ করল। বুলাঙ্গার এটি যখন অনুমান করলেন তখন ভয়ে বেলজিয়ামে পালিয়ে গেলেন। ফলে প্রজাতন্ত্রী সরকার এক সম্পূর্ণ বিপদের হাত হতে রক্ষা পেল। বুলাঙ্গারের অনুপস্থিতিতে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁর বিচার হল এবং বিচারে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। অবশ্য এর কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ বুলাঙ্গারের অকস্মাৎ পলায়নই বুলাঙ্গিস্ট আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটাল। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে বুলাঙ্গার তাঁর পলায়নের দ্বারা রক্ষা করলেন, নইলে এই সরকারের অবস্থা কি হত বলা শক্ত। বুলাঙ্গিস্ট আন্দোলনে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশ পেল এবং প্রজাতন্ত্রী-বিরোধী শক্তিগুলি এই আন্দোলন হতে শক্তি সঞ্চয় করল।

ঔপনিবেশিক নীতি: তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে ফ্রান্স তার সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটায়। ইউরোপে তার প্রভাব কমে গেলেও সাম্রাজ্য বিস্তারে এটি বাধা স্বরূপ ছিল না। বরঞ্চ ইউরোপের রাজনীতি হতে নিজেকে মুক্ত রেখে ফ্রান্স

তার সমস্ত শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারে নিয়োগ করে। এই সময় উত্তর আফ্রিকার টিউনিস নামক রাজ্যটি ফ্রান্স দখল করে। পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলও ফ্রান্সের অধীনে আনা হয়। এশিয়ার আনাম, টংকিং প্রভৃতি অঞ্চল ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এক বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরই ফরাসী সাম্রাজ্যের স্থান হয়। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসের প্রথমদিকে ফ্রান্সের সাথে ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ নিয়ে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয়। কিন্তু জার্মান ভীতির জন্য উভয়েই নিজ নিজ ঔপনিবেশিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়।

পররাষ্ট্রনীতি ঃ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের গ্লানি ভুলবার জন্য তৃতীয় প্রজাতন্ত্র জোরদার বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিসমার্ক যতদিন জার্মানীতে ক্ষমতাসীন ছিলেন ততদিন ফ্রান্সকে মিত্রহীন অবস্থায় থাকতে হয়। বিসমার্কের পতনের পর অবশ্য ফ্রান্স তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু পেল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সাথে ফ্রান্স মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এর পর ইংল্যাণ্ডের সাথে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাথে আন্তরিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি বলতে প্রধানত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকেই বুঝাত।

ইটালী (১৮৭০-১৮৯০)

Q. 4. Discuss the major problems which confronted united Italy from her unification till 1890.

Ans. ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এই ঐক্য ইটালীতে শান্তি আনতে পারেনি। ইটালী নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাগুলির সমাধান করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সত্য কিন্তু এগুলির সমাধান করা সম্ভব হয় নি। এ কারণেই বিংশ শতাব্দীতে মুসোলিনির আবির্ভাব ঘটে।

ইটালী রাষ্ট্রের সমস্যা

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও ইটালীতে জাতীয় সংহতির খুবই অভাব ছিল। প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা এবং রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতা এই যুগটিকে কলঙ্কিত করেছে। ইটালীর জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছিল না। অশিক্ষিত ও দুঃস্থ জনসাধারণ পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের গুণাগুণ বুঝতে পারল না। দেশে রাজনৈতিক ঐক্য দেখা দিলেও নৈতিক সংহতি

দেখা দিল না। তাছাড়া যেভাবে ঐক্য সাধন ঘটেছিল তা অনেকে পছন্দ করত না। সাধারণতন্ত্রী এবং গোয়েলফ দল রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল। এই সব দলকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সংবিধানে নানারূপ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাদেশিকতা দূর করবার জন্য পুরানো প্রদেশগুলি তুলে দিয়ে সমগ্র দেশকে কয়েকটি জেলায় ভাগ করা হল।

এই যুগটিতে অবশ্য ইটালীতে শিল্প-বিপ্লব দেখা দেয়। ফলে শিল্পবিপ্লব প্রসূত সমস্যা সমাধানের জন্যে সরকারকে চেষ্টা করতে হয়। কারখানা আইন প্রবর্তন করা হল এবং শ্রমিক সংঘগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। সরকারের ঘাটতি বাজেট সমস্যা দূর করবার জন্য নতুন কর ধার্য করা হয় এবং চার্চের সম্পত্তি বিক্রয় করা হল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এই সমস্যা আর রইল না।

পোপের সাথে ইটালী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নটি ছিল আভ্যন্তরীণ সমস্যা-গুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। তদানীন্তন পোপ ইটালীর রাজাকে বিধিসঙ্গত রাজা বলে স্বীকার করে নিলেন না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইটালীর পার্লামেন্টে The Law of Papal Guarantees' পাস করা হল। এই আইনের দ্বারা চার্চের সাথে নয়া রাষ্ট্রের কিরূপ সম্পর্ক হয় তা ঠিক করার চেষ্টা করা হয়। এই আইনে পোপকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং তাঁকে ভ্যাটিকানের সার্বভৌম শাসক বলেও স্বীকার করা হয়। কিন্তু গর্বিত পোপ নবম পায়স এই আইনটি গ্রাহ্যই করলেন না। বরঞ্চ তিনি ক্যাথলিকদের সরকারের সাথে অসহযোগিতা করার নির্দেশ দিলেন। চার্চের সাথে এই বিবাদ বহু বছর পযন্ত টিকে ছিল এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনী এই সমস্যার সমাধান করেন।

পররাষ্ট্রনীতি ঃ আভ্যন্তরীণ নীতির প্রতি জনসাধারণ যাতে মনোযোগী না হয় সে কারণে ইটালী সরকার চমকপ্রদ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইটালী ফ্রান্সের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। এর ফলে ইউরোপীয় রাজনীতিতে ত্রি-শক্তি চুক্তি দেখা দেয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত করবার পর ইটালী তার ভুল বুঝতে পারল। অষ্ট্রিয়ার অধীনে ট্রেন্ট, ট্রিয়েস্টি প্রভৃতি অঞ্চলগুলির প্রতি ইটালীর দাবি বহু দিনের। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইটালী ত্রিশক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় তার পক্ষে অস্ট্রিয়ার নিকট হতে এই অঞ্চলগুলি আর দাবি করার উপায় রইল না। একারণেই ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ না দিয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয় এই আশায় যে যুদ্ধে জিতলে তার দাবি পূরণ হতে পারে।

ত্রিশক্তি চুক্তি ১৮৮২

ফ্রান্সের সাথেও ইটালীর উপনিবেশ নিয়ে স্বার্থসংঘাত দেখা দেয়। ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকায় ইটালীর প্রভাব প্রতিষ্ঠায় প্রধান বাধা স্বরূপ ছিল। আর এই কারণেই ফ্রান্সের সাথে শত্রুতা দেখা দেয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সাথে ইটালীর এক বুঝাপড়া হয় এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইংল্যাণ্ডের সাথে ইটালীর বন্ধুত্বভাব বজায় থাকে।

ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক

রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হবার সাথে সাথে ইটালী পূর্ণোদ্যমে উপনিবেশের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এর পিছনে অবশ্য কারণ ছিল। প্রথমত, ইটালীতে অস্বাভাবিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্বিতীয়ত কিছুসংখ্যক ইটালিয়ান ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হয়নি বলে মনে করত। তারা অষ্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি অঞ্চলের ওপর দাবি করতে থাকে। এই অঞ্চলগুলিকে unreemed Italy (Italia Irrendenta) বলা হত। কিন্তু এ অঞ্চলগুলি ইটালীর পক্ষে পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব ছিল। কারণ ইটালী অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিল। ফলে সে আফ্রিকা মহাদেশে ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করতে থাকল। ইটালী আফ্রিকায় অবস্থিত এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আবিসিনিয়া গ্রাস করবার চেষ্টা করে। ১৮৯৫ ৯৬ খৃষ্টাব্দে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে এডুয়ার যুদ্ধে আবিসিনিয়ার নিকট পরাজিত হয় এবং আডিস আবাবার সন্ধি অনুসারে ইটালী আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। এডুয়ায় যুদ্ধে পরাজিত হলেও ইটালী কিন্তু উপনিবেশ বাড়াবার চেষ্টা হতে বিরত হল না। তরুণ তুর্কী বিপ্লবের ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ইটালী তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ত্রিপলি আক্রমণ করল। কিন্তু ত্রিপলি অধিকার করা ইটালীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। এরূপ অবস্থা হতে নিজেকে বাঁচবার জন্য ইটালী তুরস্কের রাজধানী কনস্তান্তিনোপল এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করল। এতে তুর্কী সরকার ইটালীর সাথে সন্ধি করল। এই সন্ধিতে ত্রিপলির ওপর ইটালীর অধিকার মেনে নেওয়া হল।

উপনিবেশিক নীতি

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইটালী নিরপেক্ষ থাকবে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সে ত্রিপাক্ষি চুক্তি বাতিল করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দিকে যোগ দেয়।

Q. 5. Trace the history of the Austrain Empire from 1850 to 1890.

Ans. অষ্ট্রিয়া ছিল একটি বহু-জাতি-ভিত্তিক সমস্যাসঙ্কুল রাষ্ট্র। জাতীয়তাবাদী একতা বলে কিছু ছিল না। ক্রোট, শ্লাভ, জার্মান, চেক, ইটালিয়ান, ম্যাগায়ার, পোল, রুথেন ও সার্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি এই সাম্রাজ্যে বাস করত। ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত জাতীয়তাবাদী মনোভাব অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে প্রসারিত হলে এই সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বলে মেটারনিক মনে

সূচনা

করলেন। তিনি জরাজীর্ণ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৮৪৮-এ এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিল। ভিয়েনা, বোহেমিয়া, মিলনি ও হাঙ্গেরীতে বিপ্লব প্রবল আকার ধারণ করে। মেটারনিক অস্ট্রিয়া হতে পালিয়ে যান। তাঁর পতনের সাথে সাথে তাঁর সৃষ্ট প্রাচীন অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাময়িক ভাবে পতন ঘটল। হাঙ্গেরীতে এই বিপ্লব গণতন্ত্র স্থাপনে সফলতা অর্জন করল। লুই কসুথের নেতৃত্বে হাঙ্গেরী স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া সম্রাট বিপ্লবের প্রথম আঘাত সহ্য করে প্রত্যাঘাত করবার মত ক্ষমতাবান হলেন। ইটালীতে বিদ্রোহ দমন করা হল। হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ রাশিয়ার সাহায্যে ধ্বংস করা হল। হাঙ্গেরীর স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণভাবে লোপ করা হল।

আভ্যন্তরীণ ইতিহাস: ১৮৪৮-এর বিপ্লবের ফলে বৃদ্ধ সম্রাট ফার্ডিনাণ্ড পদত্যাগ করলেন। এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম ফ্রান্সিস জোসেফ। ইনি সুদীর্ঘকাল (১৮৪৮-১৯১৬) অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন। এবং তাঁর রাজকালে অস্ট্রিয়ার ইতিহাসে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ফ্রান্সিস জোসেফ পরিপূর্ণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন এবং স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। অবস্থার চাপে পড়ে তাঁকে আবার বহু কিছু মেনে নিতে হয়।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ১৮৪৮-এর বিপ্লবান্দোলন কাটিয়ে উঠল। নিজের সামরিক বল ও কূটনীতি, রাশিয়ার সাহায্য, বিপ্লবীদের মধ্যে অনৈক্য অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করল। তবে এটা ঠিক যে ১৮৪৮ এর বিপ্লব অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে মধ্যযুগের অবসান ঘটায় এবং মেটারনিক ব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল।

ফ্রান্সিস জোসেফের রাজত্বকালের প্রথম দিকের ঘটনাগুলির মধ্যে অস্ট্রো-সার্ডিনিয়ান যুদ্ধ (১৮৫৯) এবং অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ (১৮৬৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম যুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়াকে লম্বার্ডি পিডমণ্ট সার্ডিনিয়ার হাতে তুলে দিতে হয়। এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে তাকে জার্মানী হতে হাত গুটিয়ে নিতে হয়। তাছাড়া দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলাফল অস্ট্রিয়ার দিক হতে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সিস যোসেফ বুঝতে পারলেন যে জাতীয়তাবাদকে পুরোপুরি অস্বীকার করে সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভব নয়। আংশিকভাবে জাতীয়তাবাদকে তিনি স্বীকার করে নিলেন।

যুদ্ধে পরাজয় ও তার প্রতিক্রিয়া

দ্বৈত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা: অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হাঙ্গেরী ছিল বহু প্রাচীন ঐতিহ্যময় দেশ। এই হাঙ্গেরীতে ম্যাগায়ার জাতি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। ১৮৪৮-এ হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং হাঙ্গেরীর স্বায়ত্তশাসন লোপ করা হল। হাঙ্গেরীতে দমননীতি কিন্তু অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। সম্রাট মনে করলেন যে প্রাশিয়ার হাতে

অস্ট্রিয়ার পরাজয়ের অন্যতম কারণ হল ম্যাগায়ার জাতির অসহযোগ নীতি। একারণে তিনি সাডোয়া যুদ্ধের অব্যবহিত পরই হাঙ্গেরীর সাথে একটা রফা করতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি হাঙ্গেরীর ম্যাগেয়ার নেতা Deak-এর প্রস্তাব মত অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে দ্বৈতরাজ্য স্থাপন করলেন। এর দ্বারা অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে দুভাগে ভাগ করা হল—অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী বা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী। ফ্রান্সিসকে অস্ট্রিয়ার সম্রাট বলা হল কিন্তু হাঙ্গেরীর তিনি হলেন রাজা। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও আর্থিক পরিচালনা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে হাঙ্গেরী স্বাধীন হল। ভিয়েনা হল অস্ট্রিয়ার রাজধানী আর বুদাপেস্ট হল হাঙ্গেরীর রাজধানী। হাঙ্গেরীতে পৃথক সংবিধান, আইনসভা এবং শাসনব্যবস্থা চালু হল। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও আর্থিক পরিচালনার জন্য যুক্ত মন্ত্রীসভা থাকবে বলে ঠিক হল। হাঙ্গেরীর সাথে এই আপসমূলক ব্যবস্থাকে Ausgleich বলা হয়। এই ব্যবস্থা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। Ausgleich প্রবর্তনের ফলে কিন্তু অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের জাতিগত সমস্যার সমাধান হল না। কারণ এর দ্বারা কেবলমাত্র একটি জাতিকে তোষণ করা হয়েছিল। অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিগুলির স্বার্থের দিকে নজর দেওয়া হল না। ফলে এই সব জাতিগুলি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে সংযুক্তি চাইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, কেবলমাত্র জার্মান অধ্যুষিত রাষ্ট্র হিসেবে অস্ট্রিয়া টিকে রইল।

হাঙ্গেরীর সাথে আপস

More Questions with Hints

1. Discuss the main features of the Constitution of Imperial Germany.

Ans. ১নং প্রশ্নের আনুসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

2. Discuss the main features of the foreign policy of Bismark and analyse its defects.

Ans. ২নং প্রশ্নের আনুসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

3. Germany under Bismark's guidance was the pivot of European politics.—Discuss.

Ans. বিসমার্কের বৈদেশিক নীতি দেখ।

4. Discuss Bismark's Colonial policy vis-a-vis his policy of protection.

Ans. বিসমার্কের উপনিবেশ নীতি ও সংরক্ষণ নীতি দেখ।

5. Bismark was not a creative statesman. Do you agree? Give reasons for your answer.

Ans. বিসমার্কের বৈদেশিক নীতির ত্রুটি—সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা—উপনিবেশ নীতি—জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে লিখতে হবে।

6. "Bismark more than justified his selection by the ruler of Prusia." Discuss. (C. U. 1961, '63)

Ans ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম উইলিয়াম প্রাশিয়ার রাজা হন। তাঁর সিংহাসন আরোহণের ফলে প্রাশিয়ার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়াকে জার্মানীর অবিসংবাদী নেতাতে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রথমেই তিনি প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠিত ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করতে চাইলেন। কিন্তু প্রাশিয়ার পার্লামেণ্ট ব্যয়াধিক্যের অজুহাতে তাঁর এই কাজে বাধা দিল। ফলে প্রাশিয়ায় এক শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। উইলিয়ম বিরক্ত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে চাইলেন। শেষে সামরিক মন্ত্রী রুন ও সেনাপতি মলটকির পরামর্শে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ককে চান্সেলার পদে নিযুক্ত করলেন।

বিসমার্কের লক্ষ্য ও আদর্শ এবং কার্যাবলী: (জার্মানীর ঐক্যসাধন দেখ)।

স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে এবং সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাজিত করে বিসমার্ক জার্মানীকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করলেন। তারপর তিনি এরূপ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করলেন যার ফলে বার্লিন ইউরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থল হল। তাঁর কৃতিত্বের ফলে ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব বহুদিন পর্যন্ত বজায় থাকল। শক্তিসাম্য রক্ষা করে তিনি বহুক্ষেত্রে যুদ্ধের কিনারা হতে ইউরোপকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। সংক্ষেপে তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে ইউরোপের রাজনীতির ভাগ্যনিয়ন্তাস্বরূপ ছিলেন। তাঁর কূটনৈতিক কার্যক্রমের ফলে জার্মানী ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সুতরাং একথা বলা চলে যে প্রাশিয়ার রাজা যে উদ্দেশ্যে বিসমার্ককে চান্সেলার পদে নিয়োগ করেছিলেন, বিসমার্ক তার অনন্যসাধারণ প্রতিভা দ্বারা সে উদ্দেশ্য কেবল কার্যকরী করেননি, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সম্মানে জার্মানীকে ভূষিত করেছিলেন।

7. What was the nature of the Paris Commune? What were the causes of the civil war between the Commune and the government of Thiers.

Ans. ৩নং প্রশ্নের প্যারিস কমিউন দেখ)

8. Make an analysis of the French Constitution of 1875 and describe the steps by which Republicanism was ultimately established.

Ans. ৩নং প্রশ্নের আনুষাঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেখ।

9. Discuss the problems which confronted the Third French Republic with special reference to Boulangism.

Ans. ৩নং প্রশ্নের উত্তর দেখ

ইউরোপ (১৮৯০-১৯১৯)

Q. 1. What are the chief characteristics of the period (1890-1914)? What is the importance of the year 1890 ?

Ans. ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটি ইউরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরাট তাৎপর্য-পূর্ণ যুগ। এই যুগটিতে প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়নি এবং কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে নি। এই যুগটিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ রাষ্ট্রে শিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে অর্থনৈতিক ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয় এবং বিশ্বের অনুন্নত দেশ সমূহে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে সার্বিক শোষণের পথ সুগম করে। ইউরোপে এই যুগটিতে শহর-ভিত্তিক সভ্যতার প্রবর্তন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখা দেয়। এই বৃদ্ধির চাপ কমাবার জন্য ইউরোপীয়রা বসবাসের জন্য আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে অধিক সংখ্যায় যেতে শুরু করে। প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে। গণতন্ত্রের প্রসার, শিক্ষার প্রসার, জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা এবং সংবাদপত্রের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। এই যুগটিকে অবশ্য কেবলমাত্র বৈষয়িক উন্নতি বা শিল্পোন্নতি বা গণতন্ত্রের প্রসারের যুগ বললেই যথেষ্ট হয় না, এই সব সমাজের সাথে তার পার্থক্য আরও গভীর ও ব্যাপক হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পর অবশ্য নবীন জাপানের শিল্প-বিপ্লব তথা বৈষয়িক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

যুগটির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি

এই যুগটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রধান প্রধান দিকগুলি ছিল বৈষম্যমূলক বৈশিষ্ট্য— এই যুগটিতে বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে অর্থনৈতিক মন্দাও দেখতে পাওয়া যায়, একশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান যেমন বেড়ে যায়, তেমন অন্যান্য শ্রেণীর আর্থিক দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের অবক্ষয় সূচিত হয়, একদিকে গণতন্ত্রের প্রসার, অন্য-দিকে সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্বৈরতন্ত্রের আগমন; আন্তর্জাতিক শান্তি—কিন্তু সশস্ত্র শান্তি (armed peace) বজায় থাকে।

এই যুগটির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি বজায় ছিল; বিশেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয় নি। ১৮৭১ হতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন যুদ্ধই সংঘটিত হয় নি। ১৮৫৪ হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগটি আমরা পার হয়ে এসেছি, তাতে দেখা যায় যে এই যুগটিতে বড় বড়

পাচটি যুদ্ধ ঘটেছিল, যেগুলির প্রত্যেকটিতেই একাধিক বৃহৎ রাষ্ট্র জড়িত ছিল। কিন্তু এই যুগটিতে ছোটোখাটো যুদ্ধ ঘটে থাকলেও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি তাতে লিপ্ত হয় নি। কারণ হল, এই যুগটিতে ইউরোপে **শক্তির ভারসাম্য** বজায় ছিল। ইউরোপের কোন শক্তি নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করত না, এবং একে অন্যের ভয়ে ভীত থাকত। বিসমার্ক যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেটি যুদ্ধনীতি নয়, ফরাসী আক্রমণ হতে নব রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার ব্যবস্থামাত্র। তেমনি ফ্রান্স নিজেকে জার্মান আক্রমণ হতে রক্ষা করবার জন্য বন্ধুর খোঁজে ব্যাপৃত থাকে এবং ঠিক সময়েই রাশিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। সংক্ষেপে, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের মানচিত্র যে রূপ পরিগ্রহ করে ১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত তাতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না, অবশ্য বল্‌কান অঞ্চল ছাড়া। ইউরোপের বাইরে অবশ্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে উপনিবেশ ও বাজার নিয়ে স্বার্থ-সংঘাত গুরুতর রূপ নেয়। আফ্রিকা ও এশিয়ায় এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয়। এই যুগটিতে আবার এশিয়ায় এক নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটে। জাপান পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করে এবং নিজেকে সর্বদিক হতে শক্তিশালী করে তোলে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনকে পরাজিত করে এবং ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জাপানের নিকট পরাজিত হলে জাপান শক্তিশালী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পরিগণিত হয়। 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভীতি' বলে জাপানকে মনে করা হতে থাকে।

এই যুগটিতে বার্লিন ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও কূটনীতির কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়—ভিয়েনা ও প্যারিস বার্লিন-এর জৌলুসের নিকট ম্লান হয়ে যায়। শক্তিশালী জার্মানীর ফ্রান্স বা অস্ট্রিয়ার শক্তিতে আর ভীত থাকবার প্রয়োজন হল না। তবুও ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়াকে এই যুগের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে মেনে নিতে হয়ই এবং জার্মানীও এটি উপলব্ধি করে। এ কারণে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মও এবিষয়ে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বছর। ১৮৭১ হতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটিকে 'বিসমার্কের যুগ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই যুগটিতে জার্মানী মধ্য ইউরোপের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয় এবং সংক্ষেপে বলতে গেলে এই যুগে বিসমার্ক ইউরোপীয় রাজনীতির পরিচালক ছিলেন। বার্লিনে রাজনৈতিক স্পন্দন যেরূপ অনুভূত হত অন্য কোন দেশের রাজধানীতে অনুরূপ হত না। বিসমার্ক জার্মানীকে ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স জার্মানীর হাতে পরাজিত হয়। ফরাসীরা এই পরাজয়ের কথা ভুলতে পারবে না তা বিসমার্কও জানতেন। সে কারণে ফ্রান্স

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের তাৎপর্য

যাতে ইউরোপে কোন মিত্র না পায় (যার ফলে জার্মানীর ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে) বিসমার্ক তাঁর কূটনীতি দিয়ে সে বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করেন। এর ফলেই **ত্রি-সম্রাট সংঘ** সৃষ্টি হয়। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া—এই তিনটি রাষ্ট্রের সম্রাটগণের মধ্যে একটি চুক্তি হল। এই ত্রি-সম্রাট সংঘের উদ্দেশ্য অনেকটা ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা সম্মেলনের পর যে **পবিত্র সংঘের** সৃষ্টি হয় তারই মতন। কিন্তু এই ত্রি-সম্রাট সংঘ খুব কার্যকরী হয নি। নিকট-প্রাচ্য সমস্যা নিয়ে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত রাশিয়ার মতানৈক্য ঘটলে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহিত **দ্বৈত সন্ধি** (Dual Alliance) স্থাপন করলেন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সন্ধির কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটে নি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করে। সুতরাং দ্বৈতসন্ধি **ত্রিশক্তি মৈত্রীতে** পরিণত হল। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ফ্রান্স ভীত হল এবং রাশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপনে তৎপর থাকল। কিন্তু বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ফ্রান্স ইউরোপে কোন মিত্র পেলে না। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত তিনি পৃথকভাবে এক সন্ধি করেন। এটিকে **রি-ইনস্যুয়রেন্স সন্ধি** বলা হয়। বিসমার্ক ইংলণ্ডের সাথেও মিত্রতা বজায় রেখে চলেছিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর ফলে জার্মানী হতে বিসমার্কীয় নীতি বিদায় নিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম নিজস্ব নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। তিনি বিশ্ব-রাজনীতিতে জার্মানীকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইলেন। জার্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য যাতে বাড়তে পারে সেদিকেও তৎপর হলেন এবং জার্মানীর নৌশক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হতে নতুন নীতি কার্যকরী হতে থাকে বলে বছরটি (১৮৯০) ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৯০ খৃঃ পর্যন্ত বিসমার্ক অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুতীক্ষ্ণ কূটনীতির দ্বারা যে রাজনৈতিক তথা কূটনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর পতনের ফলে (১৮৯০) সেই কাঠামো ভেঙে পড়ল। ফ্রান্স এযাবৎকাল যা চেষ্টা করে আসছিল (রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের সাথে মৈত্রী স্থাপন) তা সম্ভব হল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে এক চুক্তি হল—**দ্বিশক্তি মৈত্রী চুক্তি**। এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স অনেকটা নিরাপত্তা বোধ করল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত **আন্তরিক মৈত্রী** স্থাপন করে এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত রাশিয়ার এক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয় ; ফলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া পরস্পর মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হল। এটিকে **ট্রিপল্ আঁতাত** বা **ত্রিশক্তি মিতালী** বলা হয়। ১৯০৭

খৃষ্টাব্দে ইউরোপের যে দুটি বিবদমান রাষ্ট্রজোটের আবির্ভাব ঘটে এবং ইউরোপ দুটি পরস্পর বিরোধী সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয় তার সূচনা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দেই হয়েছিল।

Q 2. Briefly examine the formation of Triple Entente.

Ans. জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক বিসমার্ক স্পষ্টভাবেই বলিতেন যে জটিল সমস্যার সমাধান গণতন্ত্র দ্বারা হয় না, লৌহ-কঠিন নীতি ও সামরিক শক্তিই একমাত্র তার পন্থা। তিনি তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হলে এবং খুঁটিনাটি ভাবে সমরসজ্জায় সজ্জিত হতে পারলে আধুনিক কালে অনেক কিছু ঘটান সম্ভব। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করল অনেক রাষ্ট্রই। কেউ জার্মানীর সমর সজ্জার ভয়ে ভীত হল কেউ পররাজ্য গ্রাসের জন্য বিসমার্কের জঙ্গীবাদ গ্রহণ করল। এই সকল রাষ্ট্র একে অন্যকে সন্দেহ করল এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোট দেখা দিল।

ভূমিকা

এই রাষ্ট্রজোট গঠনের পশ্চাতে পরস্পর সন্দেহ ও স্বার্থ-সংঘাত কাজ করছিল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে দুটি পরস্পর-বিরোধী সমশক্তিমান রাষ্ট্রজোট গঠিত হ'ল।

পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠন

বিসমার্ক ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সাথে **দ্বৈত-সন্ধি** স্থাপন করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইটালী, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার দলে যোগ দেওয়ার ফলে দ্বৈত-সন্ধি **ত্রিশক্তি মৈত্রীতে** পরিণত হয়। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ফ্রান্স ভীত হ'ল। কিন্তু বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ফ্রান্স ইউরোপে কোন মিত্র পেল না। বিসমার্কের পতনের পর ইউরোপীয় রাজনীতিতে জটিলতা দেখা দেয়। জার্মানীর সম্রাট বিশ্বরাজনীতেতে জার্মানীকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইলেন। জার্মানীর সাম্রাজ্যও বৃদ্ধি করতে চাইলেন। এর ফলে বিসমার্কীয় নীতি বিদায় গ্রহণ করল, ত্রি-শক্তি মৈত্রীর বিরুদ্ধে এক নতুন রাষ্ট্রজোট দেখা দিল। এটিকে **ট্রিপল্ আঁতাত** বা ত্রিশক্তি মিতালি বলা হয়। এই ট্রিপল্ আঁতাত-এর কার্য হ'ল জার্মানীর সম্প্রসারণ নীতিকে বাধা দেওয়া এবং ত্রিশক্তি মৈত্রীর অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা।

বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির কাঠামো

বিসমার্কের পতনের পর ইউরোপীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে **রুশ-ফ্রান্স মৈত্রী চুক্তি** (Franco-Russian Alliance, 1893) এই মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করবার জন্য ফ্রান্স সবিশেষ চেষ্টা করে আসছিল কিন্তু

বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন তা সম্ভব হয় নি। তিনি একদিকে যেমন অষ্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করেন, তেমনি রাশিয়ার সঙ্গেও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পৃথকভাবে রি-ইনস্যুরেন্স সন্ধি করেন। কিন্তু বিসমার্কের পতনের সাথে সাথে জার্মানীর সম্রাট রাশিয়ার সঙ্গে রি-ইনস্যুরেন্স সন্ধিটি আর নূতন ভাবে স্বাক্ষরিত করলেন না। তিনি অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে অষ্ট্রিয়াকেই জার্মানীর আসল বন্ধুরূপে মনে করলেন। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর কেবলমাত্র যোগসূত্রই ছিন্ন হ'ল না, রাশিয়ার দিক থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে মিতালী স্থাপনে আর বাধা রইল না। ফ্রান্সও যেন এর জন্য অপেক্ষা করছিল। ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিশক্তি মৈত্রী স্বাক্ষরিত হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে।

ট্রিপল্ আঁতাত কি ভাবে দেখা দিল

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতির ফল

কিন্তু এর কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই রুশ সরকার ও ফরাসী সরকারের মধ্যে বন্ধুত্বভাব গড়ে উঠতে থাকে। ফরাসী পুঁজিপতিরা বিসমার্কীয় যুগেই রাশিয়ার বিভিন্ন শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ এবং রাশিয়াকে সমরোপকরণ সরবরাহ ক'রতে থাকে। কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরে প্রধানতম বাধা ছিলেন বিসমার্ক এবং রাশিয়ার জার-এর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিসমার্কের পতন এবং রাশিয়ার জার-এর বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়ার ফলে এই চুক্তি স্বাক্ষরে আর অন্তরায় রইল না। এক দিকে ফ্রান্স যেমন জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা পাবার জন্য মিত্র খুঁজছিল, তেমনি রাশিয়াও তার রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য বিদেশী পুঁজির জন্য ব্যগ্র হ'ল—এই পটভূমিকায় **ফরাসী-রুশ মৈত্রী** চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। এই মৈত্রী চুক্তিটির শর্তগুলি প্রথমে গোপন রাখা হয় এবং কেবলমাত্র ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এর শর্তাবলী প্রকাশিত হয়। চুক্তিটির শর্তগুলির মধ্যে প্রধানতম শর্ত ছিল—যদি জার্মানী বা জার্মানী ও ইটালী একত্রিত হয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করে তা হ'লে রাশিয়া তার সর্বশক্তি দ্বারা ফ্রান্সকে সাহায্য ক'রবে, তেমনি জার্মানী বা জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া একত্রিত হয়ে যদি রাশিয়া আক্রমণ করে তা হলে ফ্রান্স তার সমস্ত শক্তি দ্বারা রাশিয়াকে সাহায্য করবে।

ফরাসী-রুশ মৈত্রী চুক্তি

চুক্তিটির শর্তাবলী

ফরাসী-রুশ চুক্তিটি ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা সর্বপ্রথম 'বিসমার্কীয় ব্যবস্থায়' ফাটল সৃষ্টি করা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে বিসমার্ক যে নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন (ফ্রান্সকে মিত্রহীন রাখা) তার অবসান ঘটল।

চুক্তির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হ'ল যে ভবিষ্যতে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে আর একাকী ল'ড়তে হবে না। তাহা ছাড়া, এই চুক্তিটি ইউরোপে দুটি বিবদমান রাষ্ট্রজোটের আবির্ভাব ঘটাল।

ইংল্যাণ্ডের যোগদান : ভিয়েনা কংগ্রেসের পর থেকেই ইংল্যাণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে প'ড়ল। সে নিজস্ব স্বার্থপর নীতিতেই সন্তুষ্ট থাকল। ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর (১৮৫৬) থেকে ইংল্যাণ্ডের এই বিচ্ছিন্নতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

ইংল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও তার স্বরূপ

১৮৭৬ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড তার সাম্রাজ্য গঠনে নিজেকে নিবিষ্ট রাখে। স্বভাবতই এই যুগটিতে সে রাশিয়া ও ফ্রান্সকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, কারণ রাশিয়া ও ফ্রান্স উভয়েই ছিল ঔপনিবেশিক শক্তি—ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী। 'রুশ-ভীতি' ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র নীতিকে বহুদিন থেকে প্রভাবিত করেছিল। মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান ও সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার সম্প্রসারণকে ইংল্যাণ্ড কোন দিনই ভাল চোখে দেখে নি বরঞ্চ রাশিয়া যাতে এই অঞ্চলে আর আধিপত্য বিস্তার ক'রতে না পাবে তার জন্য ইংল্যাণ্ড আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সুদূর প্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার প্রভাব উক্ত অঞ্চল থেকে নষ্ট করবার জন্য চেষ্টা করে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের **ইঙ্গ-জাপ মৈত্রী চুক্তি** এই নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যাণ্ড হঠাৎ ফরাসী-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। এই সময় ফ্রান্স আফ্রিকায় নিজের সাম্রাজ্যবৃদ্ধির দিকে নজর দেয় এবং ইংল্যাণ্ডের

ফ্রান্সের সহিত মতবিরোধ

অধীনস্থ সুদানের উপর নিজের দাবী উত্থাপিত করে। মিশরকে কেন্দ্র করে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ব্রহ্ম সীমান্ত, শ্যামদেশ, মাদাগাস্কার প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য নিয়েও দুই দেশের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয়। তা ছাড়া, সুদূর-প্রাচ্যে ফ্রান্স রাশিয়ার দোসর ছিল। সুতরাং ইংল্যাণ্ড সুদূর-প্রাচ্যে ফরাসী রুশ আঁতাতকে ভাল চোখে দেখল না। নীল নদের অববাহিকা নিয়ে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধ দেখা দেয় এবং **ফ্যাসোডা ঘটনায়** (১৮৯৮) এই বিরোধের চরম রূপ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ফ্যাসোডা ঘটনা ঘটনাই থেকে যায়, এর ফলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ দেখা দেখা দেয় নি কারণ ফ্রান্স তার দাবী ত্যাগ করে ফ্যাসোডা অঞ্চল ছেড়ে চলে আসে এবং এই ভাবে যুদ্ধের কিনারা থেকে উভয় দেশই ফিরে আসতে সমর্থ হয়।

অপর দিকে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর সাথেও ইংল্যাণ্ড কোনরূপ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত করবার প্রয়োজন মন করল না। জার্মানী বহুবার মৈত্রী চুক্তির জন্য

ইংরেজ সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠায় কিন্তু ইংরেজ সরকার সকল প্রস্তাবই নাকচ করে দেয়। কিন্তু বিসমার্কের পতনের পর 'রুশ ও ফরাসী ভীতির' হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইংল্যাণ্ড যখন জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্থাপনে ব্যগ্র হ'ল তখন জার্মানী নিজেকে আর পরিতৃপ্ত দেশ বলে মনে করত না, বরঞ্চ জার্মানীর সম্রাট বিশ্বরাজনীতিতে জার্মানীকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে তৎপর ছিলেন এবং জার্মানীর নৌ শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী হলেন। অষ্ট্রিয়া এবং ইটালীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড মৈত্রী স্বাক্ষরিত করতে পারল না। সুতরাং ইংল্যাণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকল তার এই বিচ্ছিন্নতাকে 'dangerous Isolation' বলে মনে করা হয়।

ত্রিশক্তির সাথে মতপার্থক্য

ইংল্যাণ্ডের এই ভয়ঙ্কর একাকীত্ব তার সাম্রাজ্য-বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। সুদূর-প্রাচ্যে, ব্রহ্মদেশে, আফ্রিকাতে সে তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির সার্থক রূপায়ণে ব্রতী থাকতে পেরেছিল এবং কালক্রমে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের (বুয়র) সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড তার স্বার্থপর নীতির ত্রুটি বা বিপদ বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারে। এই সময় কোন রাষ্ট্রই তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি বরঞ্চ বুয়রদেরই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে উৎসাহ দিয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা নীতির সুফল ও কুফল

বিংশ-শতাব্দীর শুরু হতেই অবশ্য ইংল্যাণ্ড তার এই বিচ্ছিন্নতা ভেঙে ফেলতে তৎপর হল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে **ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি** ইংল্যাণ্ডের এই বিচ্ছিন্নতার মূলে কুঠারাঘাত করল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের সহিতও ইংল্যাণ্ডের সখ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পারস্পরিক সাহায্য যে অপরিহার্য তা বুঝতে পারল এবং একে অন্যের সাম্রাজ্য-বাদী শোষণমূলক নীতিকে সমর্থন করল। মরক্কোর ক্ষেত্রে জার্মান দাবীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে সাহায্য করে। ফলে মরক্কো ফ্রান্সের অধীনে চলে যায়। এ ছাড়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের মৎস্য-শিকার সম্পর্কে ফ্রান্সের অভিযোগ মেনে নিয়ে এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী দ্বীপ অঞ্চলকে ফ্রান্সের প্রভাবাধীন বলে স্বীকার করবার ফলে ইঙ্গ-ফরাসী মিতালীর পথ প্রশস্ত হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর ফলে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তি সম্ভবপর হয়।

ইংল্যাণ্ড এই নীতি কিভাবে কাটিয়ে উঠল

সপ্তম এডোয়ার্ডের ফরাসী-প্রীতি কারও অজানা ছিল না। তিনি জার্মান-বিরোধী ছিলেন, বিশেষ করে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মকে একেবারে সহ্য করতে পারতেন

না। সুতরাং তিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল। ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি যাতে সত্বর স্বাক্ষরিত হয় তার জন্য তিনি ব্যগ্র হলেন। এদিকে জার্মানীর নৌশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নতিও ইংল্যাণ্ডকে ভাবিত করল। জার্মানীই ইংল্যাণ্ডের আসল শত্রু বলে মনে করা হ'ল। ফলে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তি বা 'আন্তরিক মৈত্রী' (Entente Cordiale) স্বাক্ষরিত হ'ল। এই চুক্তিপত্রটিতে একটি 'পাবলিক কনভেনশন', দুটি ঘোষণা এবং কয়েকটি গোপনীয় শর্ত সন্নিবিষ্ট ছিল। 'কনভেনশন'টিতে ইঙ্গ ফরাসী সম্পর্কের ছোটখাটো স্বার্থগুলির মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। উত্তর আফ্রিকার কর্তৃত্ব সম্বন্ধেই চুক্তিটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স আফ্রিকায় বৃটিশ-বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করে এবং মিশরের উপর তার দাবী ত্যাগ করে। এর পরিবর্তে ইংল্যাণ্ড মরক্কোর উপর ফ্রান্সের দাবী মেনে নিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তির স্বরূপ

ইঙ্গ-ফরাসী 'আন্তরিক মৈত্রী চুক্তি' একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে 'আন্তরিক মৈত্রী' বাক্যাংশটি অর্থহীন। কারণ এটি মৈত্রী চুক্তিই ছিল না, বিপদের সময় একে অন্যকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিও এতে উল্লিখিত হয় নি। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে সকল সমস্যা নিয়ে মনকষাকষি চলছিল তাতে সেগুলির মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। তবে এটা মানতেই হবে যে, দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্যাগুলি যে মীমাংসা করতে পেরেছিল তা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই চুক্তিটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন উদাহরণ স্থাপন করল যার ফলে ভবিষ্যতে অনুরূপ উপায়ে বহু আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

তাৎপর্য

ইঙ্গ-রুশ বুঝাপড়া ও ত্রিশক্তি আঁতাত—ইঙ্গ-ফরাসী 'আন্তরিক মৈত্রী চুক্তি'ই ইঙ্গ-রুশ বুঝাপড়ার পথ সুগম করে দেয়। ইতিমধ্যে জার্মানী তার নৌশক্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি করতে থাকে এবং জার্মানীর ভবিষ্যৎ তার নৌশক্তির উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করে। ইংল্যাণ্ড এতে ভীত হয়ে পড়ে এবং নিজের বিচ্ছিন্নতা দূর করবার জন্য তৎপর হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। বলাই বাহুল্য যে, ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি এর বেশ কিছু বৎসর পূর্বেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী

রাশিয়ার সাথে কিভাবে ইংল্যাণ্ডের বুঝাপড়া সম্ভব হল

চুক্তি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দেই সম্ভব হল না কয়েকটি কারণের জন্য। প্রথমত. রাশিয়ার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিবাদ ছিল বহুদিনের। তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার কয়েকটি স্থানের উপর আধিপত্য বা প্রভাব বিস্তারের প্রশ্ন নিয়ে এই বিবাদ চলে আসছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই এই সকল বিবাদ যে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব তা দু পক্ষই বুঝতে পারে। তা ছাড়া, ইংলণ্ড এই সময় তার তুরস্ক নীতির পরিবর্তন ঘটায়। কারণ তুরস্কের সুলতান জার্মানীকেই তার মিত্র বলে মনে করতে থাকেন এবং জার্মানীকে বহু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে শুরু করেন। আবার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুশ জাপান যুদ্ধে রাশিয়া জাপানের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় এবং তার দুর্বলতা ধরা পড়ে যায়। ফলে ইংল্যাণ্ড বুঝতে পারল যে রাশিয়াকে ভয় করবার মতন কিছু নাই। বরঞ্চ তার সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে জার্মানীকে জব্দ করা যাবে। ফলে যেসব অঞ্চলে ইঙ্গ-রুশ বিরোধ চলছিল সেগুলির অবসান ঘটাবার চেষ্টা চলল। এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ বুঝাপড়া (Agreement) স্বাক্ষরিত হল। তিব্বত আফগানিস্থান পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে এই বুঝাপড়ার আওতায় আনা হল। ঠিক হল যে কোন পক্ষই এই অঞ্চলগুলিতে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হবেনা। ইংল্যাণ্ডের সাথে রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ফলে ট্রিপল আঁতাত সুপ্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য ট্রিপল্ আঁতাত ট্রিপল্ এল্যায়েন্সের মতন স্পষ্টভাবে লিখিত চুক্তি ছিল না। একে পারস্পরিক সাহায্যকারী সামরিক চুক্তি বলে মনে করলে ভুল হবে। কিন্তু যেহেতু ফ্রান্স রাশিয়ার মিত্র ছিল এবং বৃটেন ও ফ্রান্স ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছিল বিপদকালে কে কোথায় নৌবাহিনী রাখবে তার ফলে ইউরোপীয় রাজনীতিবিদরা মনে করলেন যে বৃটেন আঁতাত শক্তির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে এবং ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের হাত থেকে ফ্রান্সকে সাহায্য করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

চুক্তিটির তাৎপর্য

সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ৭ বৎসর পূর্বেই ইউরোপে দুটি বিবদমান রাষ্ট্রজোটের আবির্ভাব হল—**ট্রিপল্ এ্যালায়েন্স** ও **ট্রিপল্ আঁতাত**। ইউরোপ দুটি পরস্পর-বিরোধী সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হল।

মতামত

তবে এ সত্য যে কোন চুক্তিই পররাজ্য আক্রমণের জন্য স্থাপন করা হয় নি, বরঞ্চ শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এগুলো সম্পাদিত

করা হয়েছিল এবং যুদ্ধ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য দুটি রাষ্ট্রজোটই চেষ্টা ক'রছিল।

Q. 3. Discuss the foreign policy of Kaiser William II. How far did his policy differ from that of Bismark? Was Will am's policy responsible for the First World War?

Ans ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় উইলিয়াম জার্মানীর সম্রাট হন। তিনি খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। বহু বিষয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং রাষ্ট্রের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুরু করেন। অস্থিরতা তাঁর চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল এবং স্বৈরতন্ত্রে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ছাত্রজীবন পোট্‌সডাম রেজিমেন্টের মধ্যে কেটে ছিল বলে সামরিক বিষয় এবং সামরিক-গন্ধী সমাজ তিনি পছন্দ করতেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনভাবে বহু কিছু করতে চাইলেন কিন্তু বয়োবৃদ্ধ বিসমার্ক-এর উপস্থিতি তাঁর নিকট বাধাস্বরূপ বলে মনে হল। বিসমার্কের পক্ষেও যুবক সম্রাটের মন যুগিয়ে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করলেন।

উইলিয়ামের জীবনদর্শ

বিসমার্কের পতন ও প্রতিক্রিয়া

বিসমার্কের পতনের পর কেবলমাত্র জার্মানীর পররাষ্ট্র নীতিতেই পরিবর্তন এল না, ইউরোপের রাজনীতি এক জটিল আকার ধারণ করল। জার্মানী থেকে বিসমার্কীয় নীতি বিদায় গ্রহণ করল এবং ইউরোপের কূটনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হল। নতুনভাবে শক্তি-সমবায় গড়ে উঠল এবং কালক্রমে ইউরোপ দুটি পরস্পর-বিরোধী সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হল।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতি আলোচনা করবার পূর্বে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে হবে। তিনি সম্রাট হয়ে অবশ্য ঘোষণা করেন যে, জার্মানী শান্তি চায় যুদ্ধ চায় না এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেন এবং ইঙ্গ-জার্মান ও রুশ-জার্মান মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী চুক্তির এক খসড়াও তিনি পেশ করেন কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বিশেষ গরজ না থাকায় এটি কার্যে পরিণত হতে পারে নাই।

উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নীতির ক্রম পরিণতি

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিসমার্কের পতনের পর থেকে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র নীতিতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। অবশ্য এর পিছনে নানারূপ কারণও

ছিল। এই সময় জার্মানী ক্রমশঃ শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করে এবং এই উন্নতি রেখার উর্ধ্বগতি বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা জার্মানী ক'রতে থাকে। কিন্তু এইটি বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন ছিল উপনিবেশের বা সাম্রাজ্যের। বিসমার্ক শিল্পে উন্নতশীল জার্মানীর এই চাহিদা যেন বুঝেও বুঝতে চাননি। তিনি তাঁর সূক্ষ্ম কূটনীতিক কাঠামোকে স্থিতিশীল করবার জন্যই এইরূপ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলতেন 'জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ'। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ ছিল না। শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য তার বাজারের প্রয়োজন যেমন ছিল তেমনি শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করবার জন্য কাঁচামাল-এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই কারণে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারের দাবী উত্থাপন করলেন। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছাড়া জার্মানীর পক্ষে চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল সংগ্রহ করা বা শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করা অসম্ভব ছিল। পৃথিবীর জনবহুল ও সমৃদ্ধশালী অঞ্চলগুলি ইতিমধ্যেই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার কুক্ষিগত ছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে জার্মানী যখন তৎপর হল তখন সে দেখতে পেল যে লাভজনক সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য অঞ্চল আর পড়ে নেই। স্বভাবতই জার্মানী ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ল। জার্মানী বুঝতে পারল যে উপনিবেশ লাভ করতে হলে সামরিক শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য, আর এই সামরিক শক্তির প্রধান স্তম্ভ হতে হবে নৌবাহিনীকে। এই কারণে উইলিয়াম জার্মানীর নৌশক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দেন এবং ঘোষণা করেন যে জার্মানীর ভবিষ্যৎ নৌশক্তির উপর নির্ভরশীল। এতে ইংল্যাণ্ড ভীত, ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ফ্রান্স-এর সঙ্গে 'আন্তরিক মিত্রতা' স্থাপন করে,। ১৯০৭ খৃঃ রাশিয়ার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড এক বুঝাপড়া করে নেয়।

পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তনের কারণ

সাম্রাজ্য বিস্তারে উপনিবেশ স্থাপন ও নৌশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় উইলিয়াম প্রথমে থেকেই কিন্তু ইংরাজ-বিরোধী ছিলেন না। তিনি স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণ করবার পরই পররাষ্ট্র নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনেন, জটিল বিসমার্কীয় নীতি পরিত্যাগ করে এক সহজ সরল নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি বুঝতে পারলেন যে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে বলকান অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে যে বিরোধ চলছিল তার সুমীমাংসা হওয়া অসম্ভব। অতএব জার্মানীকে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে কোনটিকে প্রকৃত মিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য

অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সাথে সম্বন্ধ

জার্মানীর পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। তা ছাড়া অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে জার্মানদের জাতিগত ও ভাষাগত মিল ছিল প্রচুর। অস্ট্রিয়ার ভৌগোলিক অবস্থিতি জার্মানীর নিরাপত্তার দিক থেকে মূল্যবান বলে মনে করা হত। এই সকল কারণে তিনি রাশিয়া অপেক্ষা অস্ট্রিয়াকেই পছন্দ করলেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে বিসমার্ক ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে যে গোপন Reinsurance চুক্তি সম্পাদিত করেছিলেন সেটি আর নূতনভাবে স্বাক্ষরিত করলেন না। ফলে জার্মানী ও রাশিয়ার সঙ্গে বহুদিনের যোগসূত্র ছিন্ন হল।

ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্পর্ক

রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে সরাসরি সম্পর্ক ছিন্ন করবার পর উইলিয়াম ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্য সচেষ্ট হন। ইংল্যাণ্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁর আত্মীয়া ছিলেন এবং ইংল্যাণ্ডের রাজবংশের প্রতি তাঁর মনোভাব ভালই ছিল। কিন্তু কালক্রমে এই দুই জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেওয়ার ফলে উইলিয়ম যা ক'রতে চেয়েছিলেন তা সম্ভব হয় নি। বরঞ্চ তিনি তাঁর প্রজাদের মনোভাব অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে ব্যগ্র হন, হেলিগোল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে এই সম্পর্ক স্থাপনে তিনি সচেষ্ট হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে একটি চুক্তির দ্বারা জার্মানী আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইংল্যাণ্ডের প্রভাব বা আধিপত্য স্বীকার করে নিলে ইংল্যাণ্ড এর বিনিময়ে জার্মানীকে হেলিগোল্যাণ্ড প্রত্যর্পণ করে। উইলিয়মের রাজত্বের প্রথম সাত বৎসর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এই সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে সবিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু এর পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে স্বার্থসংঘাত দেখা দেয় এবং উইলিয়ামের সকল কার্যই ইংল্যাণ্ড সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। আফ্রিকার ক্যামেরুন অঞ্চলের পূর্ব সীমানা নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে যাতে মতবিরোধ না দেখা দেয় সে কারণে জার্মানী ফ্রান্সের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত করে। এই সময় ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে তার শত্রু বলে মনে করত। আবার যখন ইংল্যাণ্ড কেপ কাইরো রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করবার জন্য কঙ্গোর সাথে চুক্তি করে তখন জার্মানী ও ফ্রান্স এই চুক্তির কয়েকটি শর্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ৩১৪ বৎসর উইলিয়ম নিজেই জার্মানীর পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা করেন। এই সময় তিনি 'অগ্রসর নীতি" (Forward Policy) গ্রহণ করেন। তিনি কেবলমাত্র জার্মানীকে ইউরোপেই সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করতে

চাইলেন না, বিশ্বরাজনীতিতে জার্মানী যাতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারে সেদিকে নজর দিলেন, জার্মানীকে শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে পরিণত করতে চাইলেন এবং আটলান্টিক মহাসাগরে জার্মান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ তৎপর হলেন। জার্মানীর প্রভাব যাতে অস্ট্রিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের বাইরেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সময় জার্মান পররাষ্ট্র নীতির বিঘোষিত নীতি ছিল Drang nach osten—পূর্ব দিকে অগ্রসর হও এবং এই নীতি যাতে কার্যকরী হতে পারে তার জন্যে জার্মান সামরিক কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার এবং জার্মান পুঁজি তুরস্ক সাম্রাজ্যে বিভিন্ন উপায়ে প্রবেশ করতে লাগল। তুরস্কের সৈন্য দলকে আধুনিকীকরণে জার্মানী সাহায্য করল এবং জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ও জার্মান পুঁজির সাহায্যে তুরস্কে রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত সরাসরি রেলপথ স্থাপনের পরিকল্পনাও নেওয়া হ'ল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম কনস্টান্টিনোপল এবং জেরুজালেম ভ্রমণে গেলেন এবং নিজেকে মুসলিম ধর্মের রক্ষকরূপে ঘোষণা করলেন। কাইজারের এই নীতিতে ইংল্যাণ্ড শঙ্কিত হ'ল কারণ বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হলে ভারত-সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ হতে পারে বলে মনে করল। ফলে ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক তিক্ত হ'ল। এই তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পেল দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদের বিদ্রোহের সময়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জার্মানী দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করে। এই অঞ্চলে ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর স্বার্থ-সংঘাতের মূল কারণ হল ট্রান্সভালের বুয়র প্রজাতন্ত্রের অর্থনৈতিক উন্নতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই অঞ্চলে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ইংল্যাণ্ড এই অঞ্চলটি কুক্ষিগত করবার চেষ্টা করে। ইংল্যাণ্ড থেকে বহু লোক ট্রান্সভালে আগমন করে এবং বিদ্রোহের সাহায্যে এই অঞ্চল অধিকার করবার প্রয়াস পায়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ অধিকৃত রোডেশিয়া হতে ডাঃ জেমিসনের নেতৃত্বে কয়েকশত ইংরাজ ট্রান্সভাল দখলের জন্য সচেষ্ট হয়। ট্রান্সভাল সরকার তাদের গ্রেফতার করে ইংরাজ সরকারের হাতে অর্পণ করেন। 'জেমিসন রেড'-এর ব্যর্থতায় কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ট্রান্সভালের প্রেসিডেন্টকে টেলিগ্রাম মারফৎ অভিনন্দন জানান। ফলে ইংরাজরা জার্মান সম্রাট-এর উপর খুবই রুষ্ট হয়। অন্যদিকে বুয়ররা ভবিষ্যৎ ইংরাজ আক্রমণের বিরুদ্ধে জার্মান সাহায্য পাবে বলে মনে করতে থাকে; যার ফলে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের

ইংল্যাণ্ডের সহিত মত-বিরোধ-এর কারণ

তুরস্ক নীতি

আফ্রিকা-নীতি

সঙ্গে বুয়ররা যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় উইলিয়াম বুয়রদের কোন সাহায্যই করতে পারেন নি। অতএব এ কথা বলতে অত্যুক্তি হবে না যে উইলিয়ম তাঁর ক্রুগার টেলিগ্রামের দ্বারা একদিকে যেমন বুয়রদের সর্বনাশ করলেন অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণকে জার্মান বিরোধী করে তুললেন। এতে জার্মানীর কিন্তু কোন লাভ হ'ল না।

সুদূর প্রাচ্য নীতি

ইতিমধ্যে সুদূর প্রাচ্যেও ইঙ্গ-জার্মান স্বার্থ সংঘাত দেখা দিল। এই অঞ্চলে উইলিয়াম ইংরাজ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেন এবং রাশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে একযোগে কাজ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইংল্যাণ্ড ভীত হয়ে জাপানের সঙ্গে এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইতিমধ্যে জার্মানী তার সপ্তবর্ষ নৌ-পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কাইজার ঘোষণা করেন—'Our future lies on the waters'। এর ফলে জার্মানী এক শক্তিশালী নৌ-বাহিনী তৈরী করল এবং কিয়েল খাল খননের ফলে জার্মান নৌ-বাহিনী এখন থেকে সরাসরি বাল্টিক সাগর থেকে উত্তর সাগরে যেতে সক্ষম হ'ল। এই সময়কার জার্মান নৌসেনাধ্যক্ষ তিরপিজ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, ইংল্যাণ্ডই জার্মানীর প্রধানতম শত্রু, কারণ ইংল্যাণ্ডের বাধাদানের ফলেই জার্মানী তার সাম্রাজ্য গঠন করতে পারছিল না।

ইংল্যাণ্ডের আপোষ

ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জোসেফ চেম্বারলেন এই ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের জন্য শেষ চেষ্টা করেন এবং এমনকি তিনি ইংল্যাণ্ডের ত্রিশক্তি চুক্তিতে সই করবার কথাও উল্লেখ করেন। উইলিয়ম এবং জার্মান পররাষ্ট্র মন্ত্রী বুলো (Bulow) এরূপ চুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু জার্মান জনসাধারণের ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের জন্য এই চুক্তি কার্যকরী হ'ল না। তা ছাড়া তাঁরা মনে করলেন যে ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী চুক্তি তখনই সম্ভব হবে যখন জার্মানী তার নৌশক্তি বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনা ত্যাগ করবে, যা জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং জোসেফ চেম্বারলেনের ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রীর আলোচনা ব্যর্থ হ'ল।

উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া

উইলিয়মের জোরদার বৈদেশিক নীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ-ইঙ্গ-ফরাসী আন্তরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মরক্কো সংকটকালে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। আগাদির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তাতেও উইলিয়ম বিশেষ সাফল্যলাভ করেন নি, বরঞ্চ এখানে জার্মানীর নৈতিক পরাজয় ঘটে।

বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতির কিছুটা পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বিসমার্ক তাঁর কূটনীতিতে বিচার শক্তির ব্যবহার করতেন। যে সমস্ত নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি বিচার-বিবেচনা-প্রসূত ছিল। অন্যদিকে উইলিয়ম-এর পররাষ্ট্রনীতিতে আবেগের স্থান বেশী ছিল। তিনি মুখে যা বলতেন কাজে তা করতেন না। এর ফলে বিভিন্ন দেশ তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপমানজনক ভাষা ব্যবহার করতেন এবং বদ্ধমুষ্টি (Mailed fist) 'ঝকঝকে অস্ত্র' প্রভৃতির উল্লেখ করে জার্মানীর সামরিক শক্তির প্রতি সকলের দৃষ্টিই শুধু আকর্ষণ করলেন না, বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে সমর সজ্জায় উৎসাহিত করলেন। ফলে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিসমার্ক জার্মানীকে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং জার্মানীকে কেউ যাতে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য সদা চেষ্টিত থাকতেন। উইলিয়ম কিন্তু এতেই সন্তুষ্ট থাকলেন না। তিনি বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখলেন এবং জার্মানীকে বিশ্বরাজনীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তৃতীয়তঃ, বিসমার্ক উপনিবেশ ও নৌশক্তি নিয়ে মাথা ঘামান নি, উইলিয়ম এই দুটির দিকেই বেশি নজর দেন। চতুর্থতঃ, বিসমার্ক ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করবার প্রয়াসী ছিলেন, উইলিয়ম ইংল্যাণ্ডকে জার্মানীর আসল শত্রু বলে মনে করলেন। সবশেষে, বিসমার্ক-এর কূটনৈতিক কাঠামো এরূপ জটিল ছিল যে, এই কূটনৈতিক কাঠামো বজায় রাখবার জন্য একজন বিসমার্ক-এর প্রয়োজন ছিল; অন্যদিকে উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতি কূটনীতির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকল না। তাঁর নীতি ছিল সহজ ও সরল। তিনি যাকে মিত্র বলে মনে করতেন তার সাথেই মৈত্রী চুক্তি বজায় রাখতেন; সকল রাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করবার তিনি প্রয়াসী হন নি এবং জার্মানীর স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি তাঁর পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত করেছিলেন যেটি বিসমার্ক করেন নি।

বিসমার্কের সহিত কাইজারের পররাষ্ট্র নীতির পার্থক্য

উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনা করা হয়ে থাকে কারণ কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক তার নীতিকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন, তাঁরা উইলিয়মের জার্মান সাম্রাজ্যের গুণগান, এবং Pan-German League প্রতিষ্ঠায় সাহায্য, তাঁর Weltpolitic এর ধ্বনি এবং নৌশক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীজ দেখতে পান। ঐতিহাসিকদের এই অভিমতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কাইজার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য তাঁর পররাষ্ট্র নীতি দায়ী কিনা

দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে পররাষ্ট্র নীতিতে বিসমার্কীয় নীতি পরিত্যাগ করেন নি। বিসমার্ক পররাষ্ট্র নীতির যে বুনিয়াদ প্রস্তুত করেছিলেন উইলিয়ম তার উপর ভিত্তি করেই তার পররাষ্ট্র নীতি গড়ে তুলেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে ত্রিশক্তি চুক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। বিসমার্ক রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। উইলিয়ম এই নীতি ত্যাগ করেন নি যদিও তিনি রাশিয়ার সঙ্গে Reinsurance Treaty পুনরায় স্বাক্ষরিত করার প্রয়োজন মনে করেন নি। রাশিয়া যাতে অসন্তুষ্ট না হয় তার জন্যই কাইজার ইংল্যাণ্ডের মৈত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বিসমার্ক-এর মতন তিনিও প্রথমে ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক যাতে বন্ধুত্বপূর্ণ থাকে তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু পরে তাকে এই নীতি ত্যাগ করতে হয়, কারণ ইংল্যাণ্ডকেই জার্মান জনসাধারণ তাদের প্রকৃত শত্রু বলে মনে করতে থাকে।

তবে এটা মনে রাখতে হবে যে উইলিয়ামের ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে নীতি বাস্তব ছিল। শিল্পক্ষেত্রে জার্মানীর অগ্রগতির ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হ'ল তার সমাধান ছিল উপনিবেশ স্থাপনে এবং অর্থনৈতিক বাজার হস্তগত করার মধ্যে। এই দুটি ক্ষেত্রেই ইংল্যাণ্ড কিন্তু জার্মানীর বাধা ছিল। সুতরাং উইলিয়াম ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যে নীতি গ্রহণ করেন তা অস্বাভাবিক ছিল না; বিসমার্ক ক্ষমতাসীন থাকলে অনুরূপ নীতিই গ্রহণ করতেন বলে মনে হয়।

Q. 4. Trace the history of the Third French Republic during the period between 1890 and 1914.

Or

Discuss the problems which confronted the Third French Republic with special reference to (a) the Dreyfus case and (b) the problem of the Church.

Ans. ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ফ্রান্সের ছয়টি বিভিন্ন প্রকারের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় অধিকাংশ লোক মনে করেছিল যে তৃতীয় প্রজাতন্ত্র বেশিদিন টিকবে না; কারণ এর পূর্বে যে দুইটি প্রজাতন্ত্র ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে দুটিই খুব অল্পকাল স্থায়ী ছিল। তা ছাড়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বেশ কিছু সংখ্যক ফরাসী রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল। তবুও পরবর্তী কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রই ফ্রান্সের ইতিহাসে অন্যান্য প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা

ভূমিকা

বেশিদিন টিকে থাকে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ফ্রান্স শাসন করে যায়।

তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের নানাবিধ সমস্যা

১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় প্রজাতন্ত্র বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাগুলির মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন, যুদ্ধে পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ, শাসনতান্ত্রিক এবং বুলাঙ্গইজম্ প্রধান ছিল। এই সকল সমস্যার সমাধান তৃতীয় প্রজাতন্ত্র ক'রতে সক্ষম হয়েছিল বলেই আমরা ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রজাতন্ত্রী সরকারের ক্ষমতা বাড়তির দিকে থাকে। আইন সভায় প্রজাতন্ত্রী সদস্যের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলে এবং সমাজতন্ত্রী দলও শক্তিশালী হতে থাকে।

আভ্যন্তরীণ ইতিহাস : এই যুগে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে নানা সমস্যা দেখা যায়। একদিকে রাজতন্ত্রী ও ক্যাথলিক যাজকশ্রেণী প্রজাতন্ত্রের যেমন বিরোধিতা চালিয়ে যেতে থাকে অন্যদিকে তেমনি সমাজতন্ত্রীগণ নানারূপ দাবী উত্থাপিত করে। ক্যাথলিক চার্চের সমস্যা, পানামা কেলেঙ্কারী এবং ড্রেফুস মামলা এই যুগের প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের প্রধান সমস্যা ছিল। নব পর্যায়ে শ্রমিক আন্দোলনও এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে ধরা যেতে পারে।

ক্যাথলিক চার্চ সমস্যা

তৃতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ফ্রান্সের ক্যাথলিক চার্চ তথা যাজকবৃন্দ এই সরকারকে ভাল চোখে দেখল না। প্রজাতন্ত্রের যাতে পতন ঘটে তার জন্য সর্বদাই চেষ্টা চলল। প্রজাতন্ত্রী সরকার শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে সকল আইন প্রণয়ন করেন সেগুলি পরোক্ষভাবে ক্যাথলিক চার্চের স্বার্থবিরোধী ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রগতিমূলক আইন প্রজাতন্ত্রী সরকার প্রণয়ন করেন, যেগুলির অধিকাংশই রাজতন্ত্র ও যাজকতন্ত্র বিরোধী ছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জেসুইটদের ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত করা হয়। এর ফলে ক্যাথলিক চার্চ প্রজাতন্ত্রী বিরোধী হয়ে পড়ে। বুলাঙ্গারকে কেন্দ্র করে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাতে ক্যাথলিক চার্চের হাত ছিল বলে মনে করা হয়।

লিও XIII এই সময় ক্যাথলিক ধর্মগুরু(পোপ)ছিলেন। তিনি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন এবং তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে নেবার জন্য তিনি ফরাসী ক্যাথলিক যাজকদের পরামর্শ দেন। কিন্তু উগ্রপন্থীরা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করল না। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকার প্রধান যাজক লেভিগ্রি নৌ-অফিসারদের প্রজাতন্ত্রী

সরকারের সম্মানাদি প্রদর্শনার্থে এক ভোজ দেন। তাঁর এই কার্যে ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা খুবই মর্মাহত হন এবং তাঁরা প্রজাতন্ত্রী সরকারকে ক্যাথলিক চার্চের চরম নির্যাতক বলে অভিহিত করেন। কিন্তু লিও XIII তাদের কার্যে বিচলিত হন নি। তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ঘোষণার দ্বারা জানান যে, ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রী সরকার আইনানুগ সরকার। প্রত্যেক ক্যাথলিকের উচিত এই সরকারকে স্বীকার করে নেয়া এবং তিনি ফ্রান্সে **ক্যাথলিক পার্টি** স্থাপন করবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। পোপের এই ঘোষণা কিন্তু কার্যকরী হ'ল না। রাজতন্ত্রীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পোপের পরামর্শ অচল বলে মত প্রকাশ করল। কিন্তু কিছু সংখ্যক যাজক ও রাজতন্ত্রী পোপের এই ঘোষণার ফলে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে 'ক্যাথলিক র‍্যালি' দলের ৩৫ জন সদস্য আইনসভায় নির্বাচিত হন এবং কালক্রমে এই সংখ্যা কমে যেতে থাকে।

ড্রেফুস মামলায় ক্যাথলিক চার্চের ভূমিকা নগণ্য ছিল না। এর ফলে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রী সরকার ভীত হয়ে ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা ধ্বংস করবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'ল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী ওয়ালডেক রুশো যে বক্তৃতা দেন তা থেকে তদানীন্তন ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। তাঁর মতে—"The real peril confronting France arose from the growing power of religious orders,—of monks and nuns." তিনি গণতান্ত্রিক জনসাধারণকে চার্চের ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি সম্বন্ধে অবহিত করলেন। এর ফলে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এক আইন প্রণয়ন করা হ'ল যার ফলে ক্যাথলিক চার্চের উপর সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করবার সুবিধা হল। এই আইন দ্বারা ঠিক হল যে ধর্ম সংগঠন বা আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী অনুমতি বাধ্যতামূলক হবে। এর পর কয়েকটি আইন দ্বারা বহু আশ্রম বন্ধ করে দেওয়া হ'ল এবং শিক্ষাক্ষেত্র হতে যাজক শ্রেণীর প্রভাব নষ্ট করে দেওয়া হ'ল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আবার নতুন আইন প্রণয়ন করা হ'ল। এর দ্বারা ঠিক হল যে, যাজকগণ আর রাষ্ট্র থেকে বেতন পাবে না। চার্চের সম্পদ বৃদ্ধি হলে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকবে না। পোপ ও ফ্রান্সের যাজকবৃন্দ এই আইন গ্রহণ করলেন না। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আর একটি আইনের দ্বারা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের আইনে যাজকদের যে সকল সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তাও নাকচ করা হ'ল এবং এই আইনটিই বলবৎ রইল। ফরাসী জনসাধারণ এই আইনের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ করল না। তৃতীয় প্রজাতন্ত্র এইভাবে ক্যাথলিক চার্চের সমস্যার সমাধান ক'রল।

পানামা কেলেঙ্কারী: (১৮৯২-৯৩) পানামা কেলেঙ্কারীতে প্রজাতন্ত্রী সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী কোম্পানী দ্বারা সুয়েজ-খাল খনন সম্পূর্ণ হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পানামা খাল খনন করবার জন্য একটি ফরাসী কোম্পানী স্থাপিত হয়। এই কোম্পানী সুয়েজ খ্যাত ডি-লেসেপ্‌স্‌কে পানামা খাল খননের জন্য নিয়োগ করে এবং তাঁকে কোম্পানীর ডিরেক্টার বলে ঘোষণা করে। তাঁর নামের জন্য অসংখ্য ফরাসী মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায়ের লোক এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে। কিন্তু কোম্পানীর অব্যবস্থায় এবারও অসাধু কর্মচারীদের জন্য খালের খননকার্য কিছুই অগ্রসর হল না কিন্তু শেয়ার হোল্ডারদের অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দেই এই কোম্পানী দেউলিয়া হয়। কিন্তু এটি যাতে প্রকাশ না পায় তাঁর জন্য কোম্পানীর পক্ষ থেকে বহু অর্থ প্রজাতন্ত্রী সরকারের সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাদের উৎকোচ হিসেবে দেওয়া হয়। কোম্পানীর দেউলিয়া প্রাপ্তির সংবাদ এবং রাজনৈতিক নেতাদের উৎকোচ গ্রহণ কিন্তু চাপা রাখা যায় নি। যখন এটা প্রকাশ পেল তখন জনসাধারণ বিচার বিভাগীয় তদন্তের এবং কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য জোর আন্দোলন চালায়। সরকার বাধ্য হয়ে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তদন্তের ফলে বহু তথ্য প্রকাশ পায়, ফলে জনসাধারণের নিকট রাজনৈতিক নেতারা হেয় প্রতিপন্ন হন।

পানামা কেলেঙ্কারী

ড্রেফুস মামলা: ১৮৯৪ খৃঃ ড্রেফুস ঘটনা বা বিষয়টি ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক জটিল ঘটনা, যে ঘটনাটির জটিলতা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে দূরীভূত হয়নি। এই বিষয়টি নিয়ে বহু প্রকল্পের অবতারণা হয়েছে, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন ফ্রান্সের আলসাস প্রদেশের অধিবাসী ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত আলফ্রেড ড্রেফুস-এর বিরুদ্ধে ফ্রান্সের শত্রু জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয়। বলা হয় যে, ড্রেফুস অর্থের বিনিময়ে গোপনীয় সামরিক তথ্যাদি জার্মানদের চিঠি মারফৎ জানিয়ে আসছিল এবং ওই সম্বন্ধে একটি চিঠি ফ্রান্সে অবস্থিত জার্মান এ্যাম্বাসীর ফেলে দেওয়া কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। চিঠিটিতে কোন নাম না থাকায় বড় বড় সামরিক কর্মচারীরা গোপন বৈঠকে বসেন এবং তাঁরা দুজন অধস্তন সামরিক কর্মচারীর কথায় বিশ্বাস করে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, চিঠির লেখক ড্রেফুস ভিন্ন আর কেউ নন। বলাই বাহুল্য যে ড্রেফুস ছিলেন ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ঐ সময় ফরাসী সামরিক বিভাগের অধিকাংশ

অফিসারই ইহুদি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। ফলে ড্রেফুসকে চরম শাস্তি পেতে হল। এক লোক-দেখানো সামরিক বিচারে ড্রেফুসকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সামরিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে ড্রেফুস-এর সামরিক মর্যাদার চিহ্ন (তরবারি ইত্যাদি) কেড়ে নিয়ে তাঁকে অস্বাস্থ্যকর Devil দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হল। আশ্চর্যের বিষয় ফ্রান্সের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ এর প্রতিবাদ করল না। কেবলমাত্র ড্রেফুস-এর আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাদ জানাল। কিন্তু এতে কাজ কিছুই হল না।

ড্রেফুস মামলা শেষ হয়ে যেত যদি না পিকার্ট নামক সামরিক গুপ্তচর বিভাগের কর্নেল এই ঘটনাটি পুনরুত্থান করতেন। তিনি সামরিক বিভাগের মন্ত্রীর নিকট জানালেন যে ড্রেফুস-এর বিরুদ্ধে যে দলিলটি ব্যবহার করা হয়েছে তা আসলে এস্টারহাজি নামক এক সামরিক অফিসারের কীর্তি। কিন্তু এতেও কোন কিছুই হল না, সমরমন্ত্রী নিশ্চেষ্ট রইলেন এবং কর্নেল পিকার্টকে টিউনিসিয়ায় বদলী করা হল।

ইতিমধ্যে ড্রেফুস ঘটনাকে নিয়ে গণতান্ত্রিক জনসাধারণ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হল। তাঁরা এই ঘটনার পিছনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কবাল ছায়া দেখতে পেলেন এবং ড্রেফুস-এর পরাজয় অর্থ গণতন্ত্রের পরাজয় বলে মনে করলেন। স্বভাবতঃই তাঁরা ড্রেফুস মামলার পুনর্বিচারের দাবী জানালেন। সিনেটের সহ-সভাপতির বক্তৃতা ও প্রখ্যাত লেখক এমিল জোলার লেখনীর মাধ্যমে এই দাবী প্রকাশ পেল। এমিল জোলা 'I Accuse' নাম দিয়ে এক দীর্ঘ চিঠি প্রকাশ করলেন। কিন্তু এতেও কিছুই হল না। প্রজাতন্ত্রী সরকার এই বিষয়টি ধামাচাপা দেবার জন্য বহু চেষ্টা করলেন এবং নিজেদের অন্যায় কার্য ঢাকবার জন্য হাজারটা অন্যায় কার্য করতে থাকলেন। এমিল জোলাকে এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে হ'ল এবং পিকার্টকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ড্রেফুস মামলাটি নতুনভাবে দেখা দিল। ইতিমধ্যে মেলিন সরকারের পতন ঘটে এবং ব্রিসন-এর নেতৃত্বে নতুন সরকার কার্যভার গ্রহণ করে এবং ক্যাভিকন্যাক সমরমন্ত্রী হন। তিনি আইনসভায় ড্রেফুস মামলা সম্বন্ধে তিনটি দলিল পাঠ করে সদস্যদের শোনালেন। সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ সদস্যই ড্রেফুসকে দোষী বলে ভোট দিলেন। আইনসভার এই সিদ্ধান্ত সমগ্র ফ্রান্সে প্রচার করা হ'ল। কিন্তু ইতিমধ্যে ড্রেফুস-পন্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তাঁরা ড্রেফুস মামলাকে কেবলমাত্র সুবিচারের প্রশ্ন ও ব্যক্তি-বিশেষের ঘটনা বলে মনে করলেন না, তাঁরা এইটিকে প্রজাতন্ত্রী ও বামপন্থীদের সঙ্গে রাজতন্ত্রী ও রক্ষণশীলদের জয়-পরাজয়ের

প্রতীক হিসেবে মনে করলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, সমরমন্ত্রী আইনসভার যে দলিল তিনটি পাঠ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে দুটি হচ্ছে অনাবশ্যক এবং তৃতীয়টি জাল দলিল ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হল যে তথাকথিত দলিলটি কর্নেল হেনরী জাল করেছেন বলে সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট নিজেই স্বীকার করেছেন। এই সংবাদ প্রকাশের পর হেনরী আত্মহত্যা করেন। সমরমন্ত্রী উপায় না দেখে পদত্যাগ করলেন। ফ্রান্সে ড্রেফুস-পন্থীরা তীব্র আন্দোলন শুরু করলেন। সরকার বাধ্য হয়ে ড্রেফুস মামলাটি ফ্রান্সের উচ্চতম আদালতে প্রেরণ করলেন। এই আদালতে যখন মামলাটি চলছিল সেই সময় ড্রেফুস-বিরোধী প্রেসিডেন্ট ফোরে-এর মৃত্যু হল এবং ড্রেফুসপন্থী এমিল লুভে রাষ্ট্রপতি হলেন (১৮৯৯)। এই সময় লণ্ডন হতে এস্টারহাজি সংবাদপত্রে প্রকাশ করলেন যে ড্রেফুস-এর বিরুদ্ধে যে দলিলটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি তিনিই লিখেছিলেন। ফলে আদালত ড্রেফুস মামলাটি পুনর্বিচারের জন্য নির্দেশ দিল। কিন্তু এই বিচারও ঠিকভাবে হল না। সামরিক বিভাগ তার পূর্ব সিদ্ধান্ত বজায় রাখবার চেষ্টা করল এবং ড্রেফুসকে দোষী বলে পুনরায় ঘোষণা করা হল। কিন্তু রাষ্ট্রপতি লুভে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে ড্রেফুসকে মুক্তি দিলেন কিন্তু এতে কোন লোকই সন্তুষ্ট হল না। ড্রেফুস-বিরোধীরা রাষ্ট্রপতিকে সন্দেহ করতে থাকল এবং ড্রেফুসপন্থীরা ন্যায় বিচার চাইলেন। সরকার বিপদে পড়লেন। উপায়ন্তর না দেখে ড্রেফুস ব্যাপারটা যাতে পুনরায় উত্থাপিত হতে না পারে তার জন্য এক আইন প্রণয়ন করে ড্রেফুস মামলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। ফলে কিছুদিনের জন্য ড্রেফুস মামলার পরিসমাপ্তি ঘটল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ ড্রেফুস মামলাটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ হলেন। ড্রেফুস মামলার পুনর্বিচার শুরু হলে বিচার শেষে ঘোষণা করা হ'ল যে, ড্রেফুস সত্যসত্যই নির্দোষ, এস্টারহাজিই প্রকৃত দোষী এবং পূর্বেকার বিচার বিচারের প্রহসন ছিল। ফলে ড্রেফুসকে তাঁর পূর্বেকার সামরিক মর্যাদায় ভূষিত করা হ'ল। সামরিক বিভাগে তাঁকে উচ্চতম পদ দেওয়া হ'ল এবং তিনি Legion of Honour পদবী পেলন। ড্রেফুস মামলা ফ্রান্স তথা গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ড্রেফুস-এর জয়কে গণতন্ত্রের জয় বলে মনে করা হয়।

শ্রমিক আন্দোলন : এই যুগে ফ্রান্সে শ্রমিক অন্দোলন নতুন ভাবে দেখা দেয়। শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রীদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সন্ত্রাসবাদীরাও এই সময় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাকুনিন ও ক্রপটকিনের নেতৃত্বে তারা পরিচালিত হ'ত। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এর ফলে প্রজাতন্ত্রী সবকাব শ্রমিক কল্যাণমূলক কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেন।

শ্রমিক আন্দোলন

সাম্রাজ্য বিস্তার : তৃতীয় প্রজাতন্ত্রেব আমলে ফ্রান্স তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটায়। ইউরোপে ফ্রান্সেব প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষুদ্র হলেও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তাবে তা বাধাস্বরূপ ছিল না বরঞ্চ ইউরোপের রাজনীতি থেকে নিজেকে মুক্ত বেখে ফ্রান্স তার শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারে নিয়োগ করে। ফলে এক বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্য গড়ে উঠল। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে ফরাসী সাম্রাজ্য কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করে তা নিম্নলিখিত তথ্য থেকে সহজেই বুঝা যাবে—১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সেরে অধীনে যে সকল অঞ্চল ছিল সেগুলির মোট লোকসংখ্যা ছিল তিন মিলিয়ান। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা দাঁডায় ষাট মিলিয়ান। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পবই ফরাসী সাম্রাজ্যের স্থান হল। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ কবেছিলেন রাষ্ট্রপতি ফোবে। ফবাসী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর আফ্রিকা। আলজেরিয়া, টিউনিস, মবক্কো, ফবাসী কঙ্গো, সাহারা, মাদাগাস্কার দ্বীপ, গিনি, আইভরি কোস্ট ও নাইজেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এশিয়ায় ইন্দোচীনে ফরাসীরা তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে। এই সময় উপনিবেশ নিয়ে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয়। কিন্তু জার্মান ভীতিব জন্য উভয়েই নিজ নিজ ঔপনিবেশিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয় (১৯০৪)।

সাম্রাজ্য বিস্তার

পররাষ্ট্র নীতি : ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পবাজয়ের গ্লানি ভোলার জন্য ফ্রান্স জোরদার পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিসমার্ক যতদিন জার্মানীতে ক্ষমতাসীন ছিলেন ততদিন ফ্রান্সকে ইউরোপীয় রাজনীতিতে অপাংক্তেয় থাকতে হয়। ১৮৭০ হতে ১৮৯০ পর্যন্ত ফ্রান্স ইউরোপে কোন মিত্র জোগাড় করতে পারে নি। বিসমার্কের পতনের পর অবশ্য ফরাসী পররাষ্ট্র নীতিতে এক নতুন পর্যায় দেখা দিল। ইউরোপে ফ্রান্স তার বহু আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু পেল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এর পর ইংল্যাণ্ডের

সঙ্গে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায় এবং দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে আন্তরিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি বলতে প্রধানত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকেই বোঝাত।

Q. 5. Discuss the growth of the Eastern Question from the Berlin Congress till the Balkan wars.

Ans. ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালীন নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ইতিহাস বার্লিন সন্ধিকে নাকচ করে দেবার ইতিহাস। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব রুমেলিয়া বার্লিন সন্ধি অগ্রাহ্য করে বুলগেরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হল। বার্লিন চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ এর বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে কিছুই করল না। এই যুগটিতে আবার বল্কান অঞ্চলের স্বাধীনতা-প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংঘাত দেখা দিল এবং এই স্বার্থ-সংঘাতের ফলে নিজেদের মধ্যে তারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হল। পূর্ব রুমেলিয়া যখন বুলগেরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করে তখন সার্বিয়া সামরিক শক্তির সাহায্যে বাধা দেয়, কিন্তু বুলগেরিয়ার নিকট পরাজিত হয় এবং শেষে অষ্ট্রিয়ার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়।

ভূমিকা

আর্মেনিয়ান ও গ্রীক প্রশ্ন: ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নিকট-প্রাচ্য সমস্যায় নতুন দুটি জটিল সংকট দেখা দিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্মী আর্মেনিয়ানরা শয়তান তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। বার্লিন কংগ্রেসে আর্মেনিয়ানদের বলা হয়েছিল যে তাদের প্রতি তুরস্ক সরকার যাতে ভাল ব্যবহার করে তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হবে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়ানরা বুঝতে পারল যে বার্লিন কংগ্রেসে তাদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল তা অর্থহীন—তুরস্ক সরকার তার নিপীড়নমূলক নীতির পরিবর্তন করবে না এবং তুর্কী কুশাসন হতে রক্ষা পাবার একমাত্র পথ হচ্ছে বিদ্রোহ এবং তা বৈদেশিক সাহায্যে। এই সময় তুরস্কের সুলতান ছিল দ্বিতীয় আবদুল হামিদ। তার মতন অত্যাচারী সুলতান ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। আর্মেনিয়াদের উত্থান ধ্বংস করবার জন্য এই সুলতান বদ্ধপরিকর হন এবং অসহায় আর্মেনিয়ানদের হত্যা করবার জন্য তুর্কী সৈন্য ও গোড়া কুর্দ মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হল। কয়েক মাসে হাজার হাজার আর্মেনিয়ান খৃষ্টানদের হত্যা করা হল। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড এই আর্মেনীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও কোনই ফল হল না। কারণ রাশিয়া,

আর্মেনিয়ান প্রশ্ন

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ
বার্লিন সন্ধির (১৮৭৮) পর
ভিয়েনা
হাঙ্গেরী
বোসনিয়া
বেলগ্রেড
সার্ভিয়া
রুমানিয়া
বুখারেষ্ট
বুলগেরিয়া
সোফিয়া
কৃষ্ণ সাগর
কনস্তান্তিনোপল
এথেন্স
ক্রীট
সাইপ্রাস
রোম
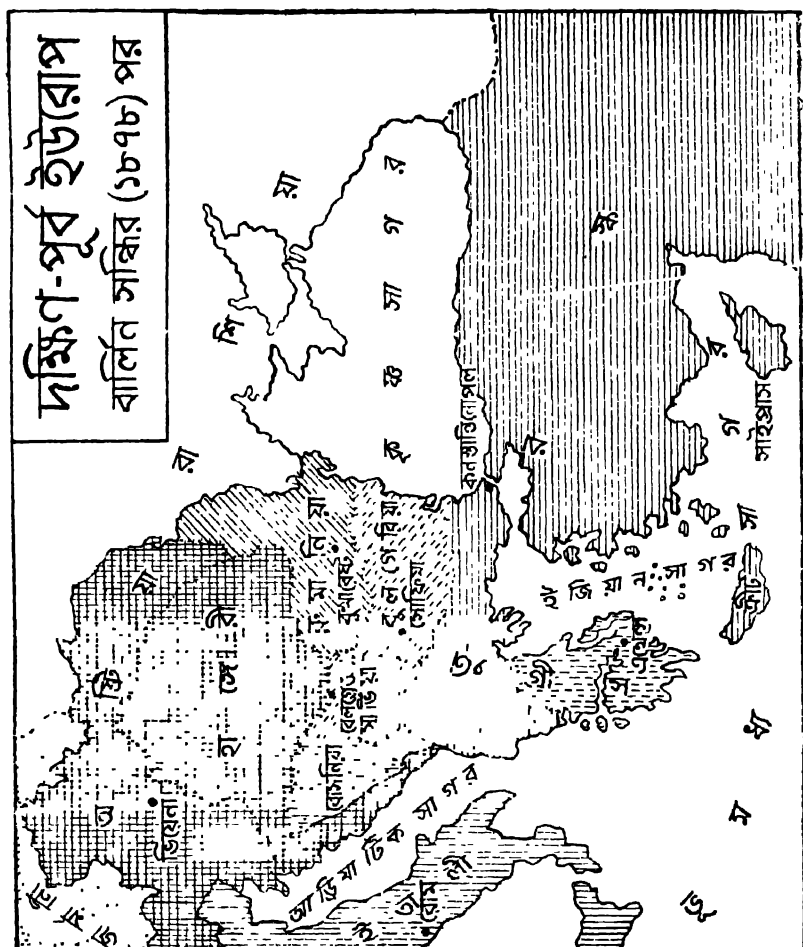
জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়া তুরস্কের এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে নিজ নিজ স্বার্থের জন্য কিছুই বলার প্রয়োজন মনে করল না। রাশিয়া বুলগেরিয়ার ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, সে কারণে আর দ্বিতীয় বুলগেরিয়া সৃষ্টি করতে চাইল না। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া এই সময় তুরস্কের সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপনে উদগ্রীব ছিল। এই সকল কারণে 'আর্মেনীয় হত্যাকাণ্ড' অবাধে চলেছিল এবং খৃষ্টান শক্তিবর্গ তাদের ধর্মাবলম্বীদের রক্ষা করবার জন্য কিছুই করল না।

আর্মেনিয়ানদের উত্থান ব্যর্থ হলেও তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীকদেব কার্যাবলী নিকট-প্রাচ্য সমস্যাকে জটিল করে তুলল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ক্রীট তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তুরস্ক সরকার তা ধ্বংস করবার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

গ্রীক সংকট

ক্রীটে বসবাসকারী খৃষ্টানদের অবস্থা শোচনীয় হলে গ্রীস ক্রীটে তুরস্কের বিরুদ্ধে এক সৈন্যদল প্রেরণ করে। এতে তুরস্ক গ্রীসের প্রতি রাগান্বিত হয়ে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে অবশ্য গ্রীস পরাজিত হয়। গ্রীসেব অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে দাঁডায় তখন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং ইটালী এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং তুরস্কেব সুলতানকে শান্তি স্থাপনে বাধ্য কবে। গ্রীসকে যুদ্ধেব খেসাবত দিতে হয়। কিন্তু ক্রীট স্বায়ত্তশাসন লাভ করে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তুবস্ক সাম্রাজ্যের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পডে। এই বৎসর তুরস্কের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহেব ফলে নতুন সরকাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তরুণ তুর্কী আন্দোলন সাময়িক ভাবে সাফল্যলাভ কবে। কিন্তু তুবস্কের এই আভ্যন্তবীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে বল্‌কান অঞ্চলে তুবস্কেব শাসনের অবসান হবার উপক্রম হল। এই অঞ্চলে কনস্টান্টিনোপল, বসফোরাস প্রণালী, দার্দেনালিস এবং ম্যাসিডোনিয়া ভিন্ন আর কোন অঞ্চলই তুরস্কের অধীনে রইল না। এবং এই অঞ্চলগুলির উপর ও সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বলকান রাষ্ট্রগুলির নজর পডল এবং এগুলি দখল করবার জন্য সদা-চেষ্টিত রইল। তরুণ তুর্কী আন্দোলনের সুযোগে তুবস্ক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল স্বার্থান্বেষী ইউবোপীয় শক্তিবর্গ নিজ নিজ সুবিধামত কুক্ষিগত করল; অষ্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হারজেগেভিনা নামক দুটি অঞ্চল নিজ সাম্রাজভুক্ত করল, ফলে সার্বিয়া অষ্ট্রিয়ার শক্রতে পরিণত হল। কারণ বোসনিয়া ও হারজেগেভিনায় বহু সার্ব বসবাস করত। তারা সার্বিয়ার সাথে যুক্ত হতে চেয়েছিল। বুলগেরিয়ার রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করে বুলগেরিয়াকে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করলেন। এই দুটি ঘটনাই বার্লিন চুক্তির বিরোধী ছিল বলে অনেক মনে করলেন যে চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি এর প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু কার্যকালে সেরূপ কিছুই

হল না। রাশিয়া একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের পক্ষপাতী ছিল কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এ বিষয়ে কোনরূপ আগ্রহ না দেখানোর ফলে কিছুই হল না। অস্ট্রিয়া কর্তৃক বোসনিয়া ও হারজেগেভিনা কুক্ষিগত করার ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল। জার্মানী অস্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করায় রাশিযার সঙ্গে তার বন্ধুত্বে ফাটল ধরল এবং 'ত্রিসম্রাট লীগ' ভেঙ্গে গেল। পরবর্তীকালে রাশিয়া জার্মানীর শত্রু ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগ দিল।

বল্‌কান যুদ্ধ : বলকান যুদ্ধ 'তরুণ তুর্কী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ছিল। তরুণ তুর্কী দল তুরস্কে ক্ষমতা হস্তগত করবার পর তুরস্কের সাম্রাজ্য যাতে অটুট থাকে তার জন্য সবশেষ চেষ্টা করে এবং তুরস্কের জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তুর্কী সাম্রাজ্যর অ-তুর্কী প্রজাদের তুর্কী জাতিতে পরিণত করবার জন্য এই সরকার 'তুর্কীকরণ' নীতি গ্রহণ করল। এই নীতির বিরুদ্ধে গ্রীস, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র **'বল্‌কান সংঘ'** গঠন করল।

প্রথম বলকান যুদ্ধ (১৯১২) কারণ ও ফলাফল

১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই সংঘ মেসিডোনিয়ার খৃষ্টানদের জন্য তুরস্কের নিকট সুশাসনের দাবি পেশ করে; কিন্তু তুরস্ক এটা অগ্রাহ্য করে। ফলে বল্‌কান সংঘ **প্রথম বলকান যুদ্ধের** অবতারণা করল। যুদ্ধ শুরু হওযার একমাসের মধ্যে 'বলকান সংঘ' তুরস্কের সৈন্যদলকে প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই পরাজিত করল। কেবলমাত্র এড্রিনোপল, স্কুটারি এবং জানিনা তুরস্কের হাতে থাকল। তুরস্কের শোচনীয় পরাজয় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে চিন্তিত করল, বিশেষ করে বল্‌কান জাতীয়তাবাদের এই জয় অস্ট্রিয়াকে খুবই চিন্তায় ফেলল। কারণ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যেও বিভিন্ন জাতি বসবাস করত। তাদের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদ প্রবল হলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য টিকতে পারে না। সুতরাং অস্ট্রিয়া নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার সবিশেষ চেষ্টা করল। রাশিয়াও বল্‌কান সংঘের এই বিজয়কে ভাল চোখে দেখল না। সার্বিয়া যাতে আড্রিয়াটিক সাগরের নিকটবর্তী স্থান না পায় তার জন্য অস্ট্রিয়া চেষ্টা করল এবং ঐ অঞ্চলে আলবেনিয়া নামক নতুন জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়া উচিত বলে ঘোষণা করল। বুলগেরিয়া যাতে কনস্টান্টিনোপল হস্তগত করতে না পারে তার জন্য রাশিয়া চেষ্টার ত্রুটি করল না। এই সকল চেষ্টার ফলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এক সম্মেলন বসল এবং এই সম্মেলন যুদ্ধ বিরতির চেষ্টা করে। কিন্তু বল্‌কান সংঘের অত্যধিক চাহিদার ফলে যুদ্ধ বন্ধ হল না। তুরস্ককে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হল কিন্তু এর ফলে তার অবস্থা আরও শোচনীয় হল। কেবলমাত্র কনস্টান্টিনোপল ছাড়া ইউরোপে তুরস্কের

আর কোন স্থানই রইল না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন চুক্তি দ্বারা প্রথম বল্‌কান যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই চুক্তি দ্বারা ঠিক হয় যে কনস্‌টান্টিনোপল ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল তুরস্কের অধীনে থাকবে। আলবেনিয়া নামে এক নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং গ্রীস ক্রীট দ্বীপ পাবে।

লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে 'বল্‌কান সংঘ' ভেঙে যায় এবং বল্‌কান রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধে লিপ্ত হল। এর ফলে দেখা দিল **দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ** (১৯১৩)। দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধের কারণ হল সার্বিয়া কর্তৃক ম্যাসিডোনিয়া দখলে বাধা, বুলগেরিয়ার এড্রিয়ানোপল না-পাওয়া এবং গ্রীসের স্যালোনিকা অধিকার। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বুলগেরিয়া তার পূর্বতন মিত্র সার্বিয়া ও গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, এবং এর সাথে সাথে দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ শুরু হল। দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধে বল্‌কান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থসংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ছাঁদ (pattern) পরিস্ফুট হয় এবং এর ফলে এনভারের নেতৃত্বে তুরস্ক কিছুটা সুবিধা করে নিতে পারল। তুরস্ক পুনরায় এড্রিয়ানোপল দখল করে এবং রুমানিয়াকে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধের ফলে লণ্ডন চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাল না। কারণ বৃহৎ শক্তিবর্গ তখন পরস্পর একে অন্যকে সন্দেহ ও ভয় করছিল। তারা জানত যে বল্‌কান যুদ্ধে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে 'বল্‌কান যুদ্ধ' যেটিকে আঞ্চলিক যুদ্ধ বলা যেতে পারে তা ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হবে। জার্মানী ও অস্ট্রিয়া একদিকে হবে এবং ফ্রান্স ও রাশিয়া অন্যদিকে থাকবে।

দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ
১৯১৩

এদিকে দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধে বুলগেরিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট **বুখারেস্ট সন্ধিতে** স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল। এই চুক্তি অনুসারে রুমানিয়া দোবরুজা পেল। সার্বিয়া ও গ্রীস তাদের আশাতীত পরিমাণ অঞ্চল পেল। তুরস্ক এড্রিয়ানোপল ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল পুনরধিকার করতে সমর্থ হল। বুলগেরিয়া প্রথম বলকান যুদ্ধে প্রাপ্ত স্থানগুলির অর্ধেকেরও বেশি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

দুটি বলকান যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আরও জটিল ও ঘোরাল করল। কোন পক্ষই বিশ্বাস করল না যে চুক্তির শর্তগুলি টিকে থাকবে। সার্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রো এখন থেকে মনে করতে থাকল যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারাই বোসনিয়ার সার্বদের মুক্ত করা যাইবে। বুলগেরিয়া মনে প্রাণে তার প্রতিবেশী সংঘের এই বিজয়কে ভাল চোখে দেখল না এবং এই রাষ্ট্রগুলির ধ্বংস কামনা করতে থাকল

এবং তুরস্ক ও অস্ট্রিয়াকে তার সম্ভাব্য মিত্র বলে মনে করল। রাশিয়া তুরস্কের দুর্বলতা দেখে নিজেকে বল্‌কান অঞ্চলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টায় থাকল এবং বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিয়া ও রুমানিয়াকে সাহায্য করতে মনস্থ করল। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বল্‌কান যুদ্ধ দুটি এই অঞ্চলে কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারল না, বরঞ্চ এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশ এরূপ অবস্থায় নিয়ে গেল যার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল।

যুদ্ধ দুইটির তাৎপর্য

Q. 6. Discuss the success and failure of the young Turk Movement.

Ans. ঊনিশ শতকে তুর্কী সাম্রাজ্য দ্রুতগতিতে পতনের দিকে অগ্রসর হয়। এর ক্রমাগত অবক্ষয় বোধ করবার জন্য ইংল্যাণ্ড প্রমুখ রাষ্ট্র চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারে নি। তুরস্কের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার অভাব থাকায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর তুরস্কের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় না।

ভূমিকা

তুরস্কের সমাজব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় এবং জনসাধাবণেব রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া ধ্বংস করবাব জন্য ধর্মকে বাবহার করা হত। অবশ্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিছুটা সংস্কার সাধনেব চেষ্টা চলেছিল যেহেতু এই সংস্কাব প্রচেষ্টা সুলতানী উদ্যোগেই হয়েছিল—জনসাধারণের সহযোগিতায় হয় নি, সে কাবণে এটা ব্যর্থ হয়ে যায়।

তুরস্কের অবস্থা

সংস্কার আন্দোলন ব্যর্থ হবাব পব তুরস্কে আবদুল হামিদেব জুলুম রাজত্ব শুরু হয়। তিনি তুরস্ক সাম্রাজ্যের জনসাধারণকে মধ্যযুগীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করতে চাইলেন। এব জন্য তিনি Pan-Islam অন্দোলনকে জোরদার করলেন এবং খলিফা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সদা চেষ্টিত রইলেন। জার্মানী প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থের জন্য সুলতান হামিদের এই প্রচেষ্টা যাতে কার্যকরী হয় তার জন্য সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবস্থা সঙ্গীন হল। ঘন ঘন আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দিল। রুমানিয়া, ক্রীট, আর্মেনিয়া, মেসেডোনিয়া প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। তুর্কী সুলতান এই সকল বিদ্রোহ দমনে নৃশংসতা দেখালেও ধ্বংস করতে পারল না। অন্যদিকে তুরস্কের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিদেশীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেল।

আবদুল হামিদেব প্রতিক্রিয়াশাল নীতি ও তাহাব ফলাফল

তুরস্ক সাম্রাজ্যকে এই সঙ্কটময় অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য অবশেষে গণ-আন্দোলন দেখা দিল। তুরস্কের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণের মধ্যে ইতালীর কার্বোনারি ও নির্বাসিত পোলিশ বিপ্লবীদের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। ফলে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় তুর্কী বিপ্লবীদের এক সংঘ। প্রথমে এই সংঘের কার্যাবলী খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই বিপ্লবী সংঘের নামকরণ হল 'The Committee of Union and Progress' এবং পরবর্তীকালে তাই 'তরুণ তুর্কী' নামে অভিহিত হয়। 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এনভার পাশা, তালাত এবং জামাল এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তরুণ তুর্কী আন্দোলন, এর উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি

'তরুণ তুর্কী' বিপ্লবের আদর্শ ছিল অনেকটা ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের আদর্শের মতন। তরুণ তুর্কী বিপ্লবীরা তুর্কী জাতীয়তাবাদী ছিল এবং **তুর্কী জাতি, ইসলাম ধর্ম** এবং **পাশ্চাত্য সভ্যতা** তরুণ তুর্কী বিপ্লবের বাণী ছিল। সুলতান আবদুল হামিদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অবসানকল্পে এরা প্রথম থেকেই সচেষ্ট হল। এর জন্য সৈন্যদলের যে সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য তা তারা জানত। এই কারণে তুর্কী সৈন্যদলকে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করে তোলবার জন্য তারা সচেষ্ট হল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাদের এতদিনের প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করল। সালনিকায় অবস্থিত তৃতীয় সৈন্যদল বিপ্লবীদের দলে যোগদান করল এবং দ্বিতীয় সৈন্যদলের সাহায্যে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের বাতিল শাসনতন্ত্র চালু করে কনস্টান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। সুলতান আবদুল হামিদ প্রমাদ গুনলেন এবং হঠাৎ নিজেকে সংস্কারপন্থী এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে একমত বলে ঘোষণা করলেন। স্বেচ্ছাচারী সুলতান রাতারাতি নিয়মতান্ত্রিক সুলতানে পরিণত হলেন এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যে গণতন্ত্রের হাওয়া বইতে থাকল। সুলতান বাধ্য হয়ে পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার নীতি মেনে নিলেন এবং এর উপর ভিত্তি করে নির্বাচনের মাধ্যমে এক জাতীয় পরিষদ আহ্বান করলেন। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন। আবদুল হামিদের এই 'ডিগবাজি'। তুর্কীদের বিস্মিত করল এবং সর্বজনীন উৎসব আনন্দের মধ্যে তরুণ তুর্কীরা সরকারী অফিস প্রভৃতির পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন এবং এক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। তরুণ তুর্কী বিপ্লবের সফলতা অর্জনে অনেকে বল্‌কান জাতীয়তাবাদের জয় দেখতে পেলেন এবং সাময়িকভাবে 'তরুণ তুর্কী দল' গ্রীক, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া

কিভাবে ক্ষমতা হস্তগত করল

তরুণ তুর্কী দলের কার্যক্রম

এবং সার্বদের প্রতি ভ্রাতৃপ্রতিম ব্যবহার করতে ইচ্ছুক হওয়ায় ইউরোপীয় জনগণের মনে আশার সঞ্চার হল।

এনভার বে-এর হাতে তুরস্ক সাম্রাজ্য শাসনের কর্তৃত্ব বর্তাল। তিনি একটি কমিটির মারফৎ শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। নতুন আইনসভার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকায় তরুণ তুর্কী দল যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন সেগুলি বিনা প্রতিবাদে পাস হল। সুলতান হামিদ কিন্তু নিশ্চেষ্ট রইলেন না। তিনি গোপনে তরুণ তুর্কী বিপ্লব ধ্বংস করবার জন্য তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এক প্রতিবিপ্লব সংঘটিত করিয়ে 'তরুণ তুর্কী' সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু এই প্রতিবিপ্লব বেশীদিন টিকল না। 'তরুণ তুর্কী' দল সালোনিকায় পুনরায় সৈন্যদলের সমর্থনপুষ্ট হয়ে রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করল এবং প্রতিবিপ্লবী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করল। আবদুল হামিদকে সিংহাসনচ্যুত করে তার ভ্রাতা পঞ্চম মহম্মদকে তুরস্কের সিংহাসনে বসান। তিনি শান্তশিষ্ট সুলতান ছিলেন এবং তরুণ তুর্কীদের নীতি ও কর্মপদ্ধতি মেনে চলতে থাকলেন। তুর্কী সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন এনভার, তালাত ও জামাল।

নূতন সরকারের স্বরূপ

প্রথমে তুর্কী আন্দোলনের মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতির জয় সূচিত হলেও এটি কিন্তু বেশিদিন রইল না। যতই দিন যেতে থাকল তরুণ তুর্কী সরকার ততই রক্ষণশীল ও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল। তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি তরুণ তুর্কী সরকারের নিকট হতে বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক নীতি আশা করেছিল, কিন্তু তার বদলে দেখতে পেল পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী নীতির নতুন রূপায়ণ। নতুন তুর্কী সরকার সাম্রাজ্যের সর্বত্র 'তুর্কীকরণ' নীতি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হ'ল। গ্রীক, আর্মেনীয় এবং আরব জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করতে সবিশেষ চেষ্টা করল। ফলে তুর্কী সাম্রাজ্যের সর্বত্র সরকারবিরোধী আন্দোলন দেখা দিল। প্রথম বল্কান যুদ্ধে এই আন্দোলন বিশেষ রূপ পেল।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

তরুণ তুর্কী বিপ্লবের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। তরুণ তুর্কী বিপ্লবের সাফল্যকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ ও বল্কান জাতিগুলি তুরস্কের দুর্বলতা বলে মনে করল এবং এর ফলে তারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বার্থ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করল। প্রথমে অষ্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হারজিগেভিনা নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিল। এই দুই অঞ্চল সে তুরস্ক সুলতানের নামে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে শাসন করে আসছিল। অষ্ট্রিয়ার এই কার্যে 'তরুণ তুর্কী'

সরকার ক্রুদ্ধ হলেও কিছুই করতে পারল না। দ্বিতীয়ত, বুলগেরিয়ার রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড তুরস্ক সুলতানের সার্বভৌম কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন।

উপরিউক্ত দুটি কার্যই বার্লিন সন্ধির পরিপন্থী ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ঐ সন্ধি স্বাক্ষরকারী কোন শক্তিই কার্য দুটির নিন্দা বা প্রতিবাদ করল না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের তৃতীয় প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ইটালী কর্তৃক লিবিয়া অধিকারে। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইটালী আফ্রিকায় সুলতানের অধীনস্থ লিবিয়া নামক অঞ্চলটি কুক্ষিগত করল। কনস্টান্টিনোপলের সন্নিকটে রোড্‌স এবং ডোডেকেনিজ দ্বীপপুঞ্জেও ইটালী আক্রমণ চালাল। 'তরুণ তুর্কী' সরকার কিন্তু এতে ভীত হ'ল না। বরঞ্চ ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মনস্থ করল। ইতিমধ্যে আলবেনিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহ দমন করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করে 'তরুণ তুর্কী' সরকার ইটালীর সহিত সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হল। ফলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লজেনের চুক্তি সম্পাদিত হল। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইটালী ত্রিপলি নামক স্থানটি নিজের অধিকারে আনতে সমর্থ হল।

তুর্কী-ইটালীয় যুদ্ধে তুরস্কের সামরিক দুর্বলতা আরও প্রকাশ পেল অধিকন্তু বল্‌কান অঞ্চলে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি 'তরুণ তুর্কী' সরকারের মনোভাব এই অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থা আরও জটিল করে তুলল। খৃষ্টান সম্প্রদায়কে তুরস্ক সরকার সমানাধিকার দিতে অস্বীকার করায় প্রথম বল্‌কান যুদ্ধ দেখা দিল। এই যুদ্ধে 'তরুণ তুর্কী' সরকার পরাজিত হয়ে শান্তির জন্য আবেদন জানালে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন চুক্তি দ্বারা শান্তি স্থাপিত হল। বলকান অঞ্চলে বহু দিনের তুর্কী সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটল।

Q. 7. Narrate the history of Italy from 1870 till the First World War with special reference to her foreign and colonial policy.

Ans. ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এই ঐক্য ইটালীতে শান্তি আনয়ন করতে পারে নি। ইটালী নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়।

সূচনা

এই সমস্যাগুলির সমাধান করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সত্য কিন্তু এগুলির সমাধান করা সম্ভব হয় নি। এই কারণেই বিংশ শতাব্দীতে মুসোলিনীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও ইটালীতে জাতীয় সংহতির খুবই অভাব ছিল। প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা এবং রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতা এই যুগটির ইটালীর ইতিহাসকে মসীময় করেছিল। এ ছাড়া, ইটালীয় জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছিল না, অশিক্ষিত ও দুঃস্থ জনসাধারণ পার্লামেণ্টীয় গণতন্ত্রের উপকারিতা বুঝতে পারল না। ফলে গণতন্ত্রের নামে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হল। Ghelf নামক রাজনৈতিক দলটি এমন কি ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্যের আন্দোলনকে ভাল চক্ষে দেখত না। এই সকল সমস্যা দূর করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকার প্রথমে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সাধনে তৎপর হলেন। পুরাতন প্রাদেশিক বিভাগের বিলুপ্তি ঘটিয়ে সমগ্র দেশকে কয়েকটি জেলায় (ফ্রান্সের ন্যায়) বিভক্ত করা হল। এর ফলে কিছুটা শাসনতান্ত্রিক সংহতি ইটালীতে দেখা দিল।

ইটালী রাষ্ট্রের সমস্যা

এই যুগটিতে ইটালীতেও শিল্পবিপ্লব দেখা দেয়। এর ফলে শিল্পবিপ্লব প্রসূত সমস্যার সমাধানের জন্যে সরকারকে চেষ্টা করতে হয়। শ্রমিক কল্যাণ-মূলক কয়েকটি আইন প্রচলন করা হয় এবং কারখানা সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়। শ্রমিক আন্দোলনও স্বীকার করে নেওয়া হ'ল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নির্বাচন প্রথার সংস্কার সাধন করে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার নীতি গ্রহণ করা হ'ল।

এই সময় ইটালীর আর্থিক দুরবস্থা চরমে ওঠে। প্রতি বৎসরই আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হচ্ছিল। সরকার এই ঘাটতি পূরণের জন্য অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু এর ফলে সরকারের ঋণের বোঝা সীমা অতিক্রম করল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ নতুন কর ধার্য করলেন। এর ফলে জনসাধারণ সরকারবিরোধী হয়ে উঠল। চার্চের সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণের মাত্রা কমাতে সচেষ্ট হল।

আর্থিক অসুবিধা

পোপের সহিত ইটালীর সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নটি ছিল আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। তদানীন্তন পোপ ইটালীর রাজাকে বিধিসঙ্গত রাজা বলে স্বীকার করে নিলেন না এবং ক্যাথলিকদের সরকারের সহযোগিতা না করায় নির্দেশ দিলেন। চার্চের সঙ্গে এই বিবাদ বহুদিন পর্যন্ত টিকে থাকে এবং বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মুসোলিনী এই সমস্যার সমাধান করেন।

পররাষ্ট্র নীতি : আভ্যন্তরীণ নীতির প্রতি যাতে জনসাধারণ বিশেষভাবে মনোযোগী হতে না পারে সে কারণে ইটালী সরকার জোরদার বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। এর পূর্বেই ইটালী ফ্রান্সের উপর রাগান্বিত হয়ে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে

মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয় (১৮৮২)। এর ফলে ইউরোপীয় রাজনীতিতে ত্রি-শক্তির সন্ধি দেখা যায়। এ সন্ধি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পর যতই দিন যেতে থাকল ইটালী তার ভুল বুঝতে পারল। অষ্ট্রিয়ার অধীনে Trent, Trieste এবং এ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব-উপকূল অঞ্চলের প্রতি ইটালীর দাবি বহুদিনের। ইটালী মনে করত যে এই অঞ্চলগুলি ইটালীর প্রাপ্য। অতএব তাদের মতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হয় নি। সুতরাং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইটালী ত্রিশক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় তার পক্ষে অষ্ট্রিয়ার নিকট হতে এই অঞ্চলগুলির আর দাবী জানাবার উপায় রইল না এবং এতে বন্ধুত্ব টুটে যাবার সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই ইটালী তার ভুল বুঝতে পাবে এবং ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন না করে মিত্র পক্ষের (ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স) দিকে যোগদান করে।

ত্রিশক্তি চুক্তির দুর্বলতা

ফ্রান্সের সঙ্গেও ইটালীর উপনিবেশ নিয়ে স্বার্থসংঘাত দেখা দেয়। উত্তর আফ্রিকায় ইটালীর প্রভাব প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল ফ্রান্স। এই কারণে ফ্রান্সের সঙ্গে শত্রুতা দেখা দেয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইটালীর সঙ্গে ফ্রান্সের টিউনিস সম্পর্কে বুঝাপড়া হয়; এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালীর মনোমালিন্য কিছুটা দূরীভূত হ'ল।

ফ্রান্সের সহিত সম্বন্ধ

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ইটালীর ভূমধ্যসাগরের উপর আধিপত্য নিয়ে মনকষাকষি চলে। জার্মানীর মধ্যস্থতায় ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এই অঞ্চল সম্বন্ধে এক নৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্বভাব গড়ে উঠল।

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক

ঔপনিবেশিক নীতি: রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হবার সাথে সাথে ইটালী উপনিবেশ বিস্তারে মনোযোগী হয়। ক্রিস্পির প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে ইটালী পূর্ণোদ্যমে উপনিবেশের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আফ্রিকায় অবস্থিত এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে ইটালী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া গ্রাস করবার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। আবিসিনিয়ার সম্রাট মেনিলেক ইটালীর এই আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ফলে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এডুয়ার (Adua) যুদ্ধে ইটালীর সৈন্যদল সম্পূর্ণভাবে মেনিলেক পরিচালিত আবিসিনিও সৈন্যদলের নিকট পরাজিত হয়। ইটালী আবিসিনিয়ার সহিত সন্ধি করতে বাধ্য

সাম্রাজ্যবিস্তারের নীতি ও তার ফলাফল

হয়। **আডিস আবাবার** সন্ধি অনুসারে ইটালী আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল। এডুয়ার পরাজয় ইটালী ভুলতে পারল না। এই পরাজয়ে ইউরোপীয় শক্তিবর্গও চিন্তিত হ'ল। আফ্রিকাবাসীরা এই পরাজয়ে উল্লসিত হ'ল এবং তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ দেখা দিল।

এডুয়ার যুদ্ধে পারাজিত হলেও কিন্তু ইটালীর উপনিবেশ বিস্তারবাসনা নষ্ট হ'ল না। জিওলিটির প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে ইটালী পুনরায় উপনিবেশের সংগ্রামে নেমে পড়ল। তরুণ তুর্কী বিপ্লবের ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার পূর্ণ সুযোগ ইটালী গ্রহণ করল। ত্রিপলি দখল করবার জন্য ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ইটালী এক নৌবাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু ত্রিপলি অধিকার করা ইটালীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এইরূপ অবস্থা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ইটালী তুরস্কের রাজধানী কনস্তান্তিনোপল এবং নিকটবর্তী রোডস্ এবং দোদেকেনিস দ্বীপে অভিযান প্রেরণ করে। 'তরুণ তুর্কী' সরকার ইটালীর এই আক্রমণে ভীত ছিল না; কিন্তু ঠিক এই সময় আলবেনিয়াতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে তরুণ তুর্কী সরকার ইটালীর সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছুক হ'ল এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লজেনের সন্ধি দ্বারা ত্রিপলির উপর ইটালীর অধিকার স্বীকার করে নিল। ইটালী দোদেকেনিজ দ্বীপপুঞ্জ তুরস্ককে ফিরিয়ে দিল।

তুর্কী-ইটালী সম্বন্ধ

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইটালী নিরপেক্ষ থাকবে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সে ত্রিশক্তি চুক্তি বাতিল করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দিকে যোগ দেয়।

Q. 8. Discuss the internal and foreign policy of Alexander III of Russia. Show with reference to the Industrial development of Russia and Count Witte's part in it that Alexander III's reign was not an unmitigated evil.

Ans. দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করে বিপ্লবীরা মনে করেছিল যে রাশিয়ায় তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু ঠিক এর বিপরীত হল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে বিশ্বাসী প্রথম পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে পরিবর্তন এল। নূতন জার স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের নীতি ও চরিত্র

কোন প্রয়োজন নেই বলে মনে করতেন। রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর অনমনীয় ধারণা ছিল এবং তাঁর মধ্যে কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির অভাব দেখা যায়। পিতার শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তাঁর পিতাই যে দায়ী ছিলেন তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে তাঁর পিতার উদারনৈতিক চিন্তাধারা ও জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা জাগাতে সাহায্য করবার ফলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করলেন এবং তাঁর পিতার আমলের আইন-কানুন, শাসন-সংস্কার নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করেন ও রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থাকে পুনরায় মধ্যযুগীয় অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রাশিয়ার জনমানসে যে পরিবর্তন এসেছিল এবং রুশ-সমাজ যে স্তরে উন্নীত হয়েছিল সেখান থেকে তাদের চ্যুত করবার শক্তি তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের বা অন্য কারও ছিল না। সুতরাং তৃতীয় আলেকজাণ্ডার প্রথমেই ভুল নীতির বশবর্তী হয়ে যে চেষ্টা চালান তা ব্যর্থ হয়। কিছুদিন পর তৃতীয় আলেকজাণ্ডার বুঝতে সক্ষম হন যে তাঁর স্বৈরতন্ত্র অটুট রাখতে হলে তৎকালীন রাশিয়ার সমস্যাগুলির সমাধান একান্ত আবশ্যক। এই সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছিল একদিকে কৃষির অবনতি ও কৃষকদের দুঃখদুর্দশার জন্য, অন্য দিকে শিল্পায়নের জন্য। এই দুটি ক্ষেত্রেই সরকার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিল, কারণ তৃতীয় আলেকজাণ্ডার পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থে হস্তক্ষেপ করবার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং এই দুটি শ্রেণীকে তার শক্তির স্তম্ভস্বরূপ মনে করতেন।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের নীতিনির্ধারক ছিলেন তাঁর ভূতপূর্ব গৃহ-শিক্ষক প্রাচীনপন্থী পবেডোনেসটেভ, যিনি হোলি সিনোডের প্রধান প্রোকিউরেটরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পবেডোনেসটেভ রাশিয়ার বিসমার্ক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিসমার্কের ন্যায় তাঁর কোন গুণই ছিল না। তিনি গতিশীল সমাজকে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখতে বদ্ধপরিকর হলেন এবং আধুনিক সভ্যতাকে বিনষ্ট করে মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক সমাজ পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসন, ভোটাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। ফলে নূতন জারও এইগুলির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হলেন এবং পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি সমস্ত বিরোধী শক্তিকে ধ্বংস করতে চাইলেন। এর সঙ্গে গোঁড়া ধর্মীয় শিক্ষা এবং রুশীকরণ নীতি প্রবর্তন করা হল। প্রাদেশিক ভাষাগুলির যাতে উৎকর্ষ না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। সংখ্যালঘু জাতিগুলির

প্রতিক্রিয়াশীল আভ্যন্তরীণ নীতি

উপর রুশ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার নীতি লওয়া হয়। বলাই বাহুল্য যে এই নীতির দ্বারা সংখ্যালঘু জাতিগুলির জাতিসত্তা নিশ্চিহ্ন করবার ব্যবস্থা হয়।

অন্যদিকে বিপ্লবী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লুপ্ত হল। শ্রমিক-কৃষকদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা হল। কৃষকদের উপর জমিদারগণ বিনা বাধায় যাতে অত্যাচার চালাতে পারে তার ব্যবস্থা হল। জেমস্‌টভোগুলির ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হল, গরীবদের নিকট শিক্ষার পথ রুদ্ধ করা হল। ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হল। সংক্ষেপে, তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক অভিশাপ নিয়ে আসে।

শিল্পের প্রসার

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে অবশ্য শিল্পায়নের গতি দ্রুততর হয়। এর জন্য অবশ্য জার দায়ী ছিলেন না, দায়ী ছিলেন অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধান কউণ্ট উইটে (Witte)। জার-শাসিত রাশিয়ায় উইটের মতন দক্ষ রাজকর্মচারী খুব কমই দেখা যায়। উইটে বুঝতে পেরেছিলেন যে রাশিয়ার শক্তি নির্ভর করছে তার প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগবার ক্ষমতার উপর। তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বেচ্ছাচারী জারতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অপরিহার্য। এর ফলে রাশিয়ায় শিল্পায়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। নতন নূতন রেলপথ স্থাপিত হয়। শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিল্পের কেন্দ্রীকরণ শুরু হয়। ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তৈল শিল্পে রাশিয়ার উন্নতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিল্প-সংরক্ষণ নীতিও রাশিয়া গ্রহণ করে। অবশ্য একথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে রাশিয়ার শিল্পে এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল বিদেশী পুঁজি আহ্বান করে। ফলে রাশিয়া বিদেশী পুঁজিপতিদের নাগপাশে আবদ্ধ হল এবং রুশ অর্থনীতির উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

বৈদেশিক নীতি

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বের শেষের দিকে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর সঙ্গে **রিইনসুরেন্স চুক্তি** পুনরায় স্বাক্ষরিত না হওয়ায় রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে এক মিত্রতা-মূলক চুক্তি সম্পাদন করে (১৮৯৩)। একে **দ্বিশক্তি চুক্তি** বলা হয়। এই দ্বিশক্তি চুক্তি ইউরোপের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা ইউরোপ দুটি শিবিরে বিভক্ত হল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার অবশ্য জার্মানী ও

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক নীতি গ্রহণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন।

Q. 9. Give an account of the reign of Nicholas II.

Ans. জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ার জার পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর শাসনকাল তাঁর পিতার শাসনকালেরই অনুরূপ ছিল। শাসনকার্যে তিনি তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। রাশিয়ার জার-স্বেচ্ছাতন্ত্র যাতে অটুট থাকে তার জন্য তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় নিকোলাসের চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল না বলে কুচক্রী রাসপুটিন প্রমুখ সন্দেহভাজন চরিত্রের লোকের দ্বারা তিনি সহজেই প্রভাবিত হয়েছিলেন। সংক্ষেপে রাশিয়ার জার হবার জন্য যেরূপ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন নিকোলাসের তা ছিল না।

দ্বিতীয় নিকোলাসের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিজ্ঞ পোনিয়া ডোনেসটেভ এবং স্বেচ্ছাচারী প্লেভ-এর দ্বারা পরিচালিত হন। এর ফলে নির্যাতনমূলক শাসন রাশিয়ায় প্রবর্তিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনের দাবী এবং উদারনৈতিক মতবাদ ধ্বংস করবার সবপ্রকার চেষ্টা করা হয়। ইহুদী নিধন পরিকল্পনানুসারে চলতে থাকে। বুদ্ধিজীবীদের উপর অত্যাচার সহের সীমা অতিক্রম করে। ফিনল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেওয়া হয় এবং এই দেশটিতে 'রুশীকরণ নীতি' প্রবর্তিত হয়। গুপ্তচরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রগতিবাদীদের সম্বন্ধে সমস্ত খবরাখবর নেবার ব্যবস্থা করা হল এবং কারণ না দেখিয়ে বহু নিরপরাধ ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হ'ল। রাশিয়ায় এই অসহনীয় অবস্থা দূরীকরণের জন্য অবশ্য প্রগতিপন্থীরা তৈরি হতে থাকল এবং জনসাধারণের সরকারবিরোধী মনোভাবের অভিব্যক্তি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবে দেখা গেল।

আভ্যন্তরীণ নীতি

শিল্পায়নের তাগিদে বিদেশী পুঁজি গ্রহণ করার ফলে রাশিয়ার জাতীয় ঋণ বাড়তির পথে থাকে, এমন কি রুশীয় ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। ১৮৯৪ হতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে রাশিয়াকে প্রতি বৎসর ৪০ কোটি রুবল সুদ হিসেবে বিদেশী পুঁজিপতিদের দিতে হ'য়। এদিকে দেশের গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হল। কর দেবার ক্ষমতা জনসাধারণের ছিল না। শহরাঞ্চলে শ্রমিকদেরও অবস্থা ভাল ছিল না। এর ফলে তাদের সাম্যবাদী মতবাদের আওতায়

অর্থনৈতিক অবস্থা

আনা সহজ হল। মার্কসপন্থীরা শ্রমিকদের মনোযোগ শিল্পের ক্ষেত্র হতে সরিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের দিকে নিবিষ্ট করতে সক্ষম হল। তারা বুঝলো যে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে না পারলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে না। বড় বড় শহরে ও কলকারখানায় শ্রমিক সংঘ স্থাপিত হল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নামে এক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল 'League of Emancipation' নামে এক রাজনৈতিক দল। উদারনৈতিক জমিদার ও বুর্জোয়ারা এর সদস্য ছিল। এই দল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে অবশ্য জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বিশেষভাবে দেখা গেল। ইউক্রেন, পোল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া, এস্টোনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সমাজতন্ত্রী দল প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হ'ল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লেনিন তাঁর (স্ফুলিঙ্গ) পত্রিকাটি প্রকাশ শুরু করেন। এদিকে অর্থনৈতিক সংকট জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করল। নানাস্থানে ধর্মঘটও দেখা দিল। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে পৌছাল। কৃষকগণ খাজনা দেওয়া বন্ধ করল। কিন্তু এই সকল বিচ্ছিন্ন অভ্যুত্থান কার্যকরী হ'ল না। জার সরকার এইগুলি ধ্বংস করতে সক্ষম হ'ল।

এই পটভূমিকায় দেখা দিল **রুশ-জাপানের যুদ্ধ** (১৯০৪-৫)। এই যুদ্ধে রাশিয়া জাপানের হাতে ভীষণভাবে পরাজিত হ'ল। এর ফলে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। জনসাধারণ এই পরাজয়ের জন্য দেশের স্বেচ্ছাচারী, অকর্মণ্য, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারকে দায়ী করল। এই সময় প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী প্লেভকে হত্যা করা হয়। কলকারখানায় ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

নিকোলাস মন্ত্রী মিরস্কীর পরামর্শে জেমসট্‌ভোগুলিকে এক জাতীয় সম্মেলনে মিলিত হবার অনুমতি দিলেন। একবার এই অনুমতি দেবার ফলে একে ফিরিয়ে আনা শক্ত হ'ল। জেমসট্‌ভোগুলির জাতীয় সম্মেলনে মৌলিক অধিকার দাবী করা হ'ল। এর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সম্পত্তিভোগের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশ, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, নির্বাচনমূলক প্রতিনিধি সভা গঠন, শাসনতন্ত্র-প্রণয়ন, সংবিধান সভা স্থাপন-এর দাবী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিকোলাস এই দাবীগুলির মধ্যে কয়েকটি দাবী এক ঘোষণার দ্বারা স্বীকার করে নিলেন সত্য কিন্তু এর দ্বারা তিনি তাঁর স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা বিন্দুমাত্র কমাতে চাইলেন না এবং জনসাধারণকে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ দেবার কোন

ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলেন না। ফলে জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন তীব্রতর হ'ল। এর ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা গেল **১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব**। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী **রবিবার** সেণ্টপিটর্সবার্গের শ্রমিকগণ সম্রাটের নিকট তাদের দাবীদাওয়া লিখিতভাবে পেশ করবার জন্য গেপেন নামক এক ধর্মযাজক-এর নেতৃত্বে জারের শীতকালীন রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে জারের সৈন্যদল এই নিরস্ত্র শ্রমিক মিছিলের উপর অজস্র গুলীবর্ষণ করে। এই দিনটি রাশিয়ার ইতিহাসে **রক্তাক্ত রবিবার** বলে পরিচিত। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্থান, তেমনি রাশিয়ার ইতিহাসে রক্তাক্ত রবিবারের স্থান রয়েছে।

১৯০৫ সালের বিপ্লব ও তার ফলাফল

রক্তাক্ত রবিবার

'রক্তাক্ত রবিবার'-এর প্রতিবাদে সমগ্র দেশব্যাপী শ্রমিক ধর্মঘট, গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিল। অন্যান্য দেশের শ্রমিকগণও ধর্মঘট করে সমবেদনা জানাল। জার সরকার ভীত হয়ে সামরিক আইন জারি করলেন। বিপ্লবী মনোভাব সৈন্যদলের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সাময়িকভাবে বিদ্রোহ দমন করেন এবং ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন করলেন। জারের কঠোর দমননীতির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী দল পুনরায় সক্রিয় হ'ল। জারের খুল্লতাত প্রতিক্রিয়াশীল সারগিয়াসকে হত্যা করা হ'ল। অবশেষে জার নিকোলাস প্রজাদের এক প্রতিনিধি সভা (ডুমা) আহ্বান করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু এই ডুমায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা স্থান পেলেন না। কেবলমাত্র বিত্তশালী জমিদার বুর্জোয়াগণ ভোটাধিকার পেল। ৫২৪ জন সদস্যের প্রথম ডুমার অধিবেশন বসলে জার এর সদস্যদের জানিয়ে দিলেন যে তাঁদের কাজ হ'ল পরামর্শ দেওয়া, শাসন কার্যে তাদের কোন ক্ষমতা নেই। প্রথম ডুমা যখন ভূমি সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'ল তখন জার এই ডুমা ভেঙ্গে দিলেন এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী স্টলিপিনকে প্রধান-মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। স্টলিপিনের নীতি ছিল এক দিকে দমন করা অন্য দিকে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এদিকে ক্যাডেটপন্থীরা প্রথম ডুমা ভেঙে দেবার পর ফিনল্যাণ্ডে পালিয়ে সেখান হতে একটি ঘোষণা জারি করলেন। এই ঘোষণাকে Vibrog Manifesto বলা হয়। এতে কৃষকদের সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখতে বলা হয়।

ডুমার আহ্বান

প্রথম ডুমা ভেঙ্গে দেবার পর এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। নির্বাচনের পূর্বে উদারনৈতিক দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করে রক্ষণশীল দলগুলিকে নির্বাচনে জয়ী

হতে সাহায্য করার চেষ্টা করা হলেও দ্বিতীয় ডুমায় বামপন্থী সদস্য সংখ্যাই বৃদ্ধি পেল। এতে রাজতন্ত্র ভীত হয়ে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলকে রাষ্ট্র-বিরোধী বলে অভিহিত করল এবং দ্বিতীয় ডুমাও ভেঙে দেওয়া হ'ল। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদলের সদস্যদের বিরুদ্ধে অকথ্য অত্যাচার চালানো হল।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক সংকট দেখা দিল। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটল। জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে সামরিক আইন, পুলিশী অত্যাচার সমানে চালানো হ'ল। আন্তর্জাতিক অবস্থাও এই সময় বেশ জটিল হয়ে উঠল। জার বাধ্য হয়ে তৃতীয় ডুমা আহ্বান করলেন। এই ডুমাতে জমিদার শ্রেণী হতে বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধি প্রেরণ করবার ব্যবস্থা পূর্বেই করা হয়েছিল। জমিদার শ্রেণীর মধ্যমণি হলেন স্টলিপিন নিজে। তিনি ভূমি-সংস্কারের নীতি গ্রহণ করলেন। প্রথমেই তিনি গ্রাম্য 'মির' ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলেন; বৃহৎ খামার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন এবং ভূমিহীন কৃষকদের ভূমির অধিকারী হতে সাহায্য করলেন।

স্টলিপিন সংস্কার

স্টলিপিনের এই সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এক আলোড়নের সৃষ্টি করল। ক্যাডেটরা এই সংস্কার মনে প্রাণে গ্রহণ করল এবং বিপ্লবের পথ ত্যাগ করল। সমাজ-বিপ্লবী দল দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। যারা বিপ্লব শেষ হয়েছে মনে করল তাদের নাম হল মেনশেভিক, আর যারা মনে করল বিপ্লব মাত্র শুরু হল তাদের বলা হতে লাগল বলশেভিক।

ইতিমধ্যে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সমগ্র ইউরোপ প্রকম্পিত করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'ল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এক যোগে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জার সরকারের চরম অকর্মণ্যতার ও অব্যবস্থার জন্য যুদ্ধের উপকরণের অভাবে দলে দলে রুশ সৈন্য জার্মান সৈন্যদের হস্তে নিহত ও বন্দী হতে লাগল। সৈন্যদলে ঘোর অসন্তোষ দেখা দিল। দেশে চরম খাদ্যাভাব ঘটল। শহরের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রাশিয়া

আন্দোলনকারীদের প্রতি সৈন্যদের গুলী চালাতে আদেশ করলে তারা সে আদেশ অমান্য করল। সৈনিক, শ্রমিক ও কৃষক এক জোটে শান্তির দাবী জানাল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে একটি গণ-অভ্যুত্থান হ'ল। পেট্রোগ্রাডে এই অভ্যুত্থান ঘটে। বিপ্লবীরা জয়ী হ'ল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটল।

জারতন্ত্রের অবসান

পররাষ্ট্র নীতি : পররাষ্ট্র নীতিতে দ্বিতীয় নিকোলাস বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। অবশ্য রাশিয়ার সাম্রাজ্য বৃদ্ধির দিকে তিনি বিশেষ নজর রেখেছিলেন এবং সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার করবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। যার ফলে ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধ দেখা দেয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সাথে ইংল্যাণ্ডের এক মিত্রতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিকে Anglo-Russian Entente বলা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধে রাশিয়া নিজেকে বিশেষভাবে জড়িয়ে ফেলে। ফলে সার্বিয়ার পক্ষ নিয়ে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়াকে অস্ত্রধারণ করতে হয়। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল।

Q. 10. What were the Causes and effects of the European expansion in the 19th century ?

Ans. ইউরোপের বাইরে ইউরোপের বিস্তৃতি উনবিংশ শতাব্দীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহের পরেই ইউরোপের প্রসারের প্রথম পর্ব শুরু হয়। ফলে, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া— এই তিনটি মহাদেশে ইউরোপীয়গণ দলে দলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তার ফলে এই মহাদেশগুলি ইউরোপীয়দের বাসস্থানে পরিণত হয়। এশিয়া মহাদেশে কিন্তু ইউরোপীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করে নি। এর প্রধান কারণ এশিয়ার সকল অঞ্চলই ঘন বসতিপূর্ণ, সে কারণে এশিয়ায় ইউরোপীয়গণ সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিই গ্রহণ করেছিল। আফ্রিকাও অবশ্য এ নীতি হতে বাদ গেল না।

সূচনা

ইউরোপীয় বিস্তার নীতির কারণ : উনিশ শতকে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যেন সাড়া পড়ে গেল। এর একাধিক কারণ অবশ্য ছিল।

অর্থনৈতিক কারণ : ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের ফলে কলকারখানাগুলির জন্য প্রচুর কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল। সাম্রাজ্য থাকলে কাঁচামাল অল্প মূল্যে পাওয়া সম্ভব। অবশ্য কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যগুলিও বিক্রয় করা প্রয়োজন। সাম্রাজ্য থাকলে এগুলি বিক্রয়ের খুব সুবিধা এবং প্রচুর লাভে বিক্রয় করা সম্ভব। সেজন্য এই সময় উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্বাপেক্ষা অধিক বেশি লাভজনক হয়ে উঠল। এ কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার উর্বর ও দুর্বল দেশগুলির প্রতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি পড়ল এবং এই দেশগুলি নিজ নিজ আয়ত্তাধীনে আনবার জন্য ব্যগ্র হল।

রাজনৈতিক কারণ : ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এই সময় সাম্রাজ্য স্থাপনে পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। সাম্রাজ্য ও বিদেশে সামারিক ঘাঁটি রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করে বলে তারা মনে করল। এই মনোবৃত্তির ফলে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হল।

সামাজিক কারণ : শিল্প-বিপ্লবের ফলে এই সময় ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই বেকার-সমস্যা দেখা দেয। সাম্রাজ্য স্থাপন তখনকার দিনে বেকার সমস্যার অন্যতম সমাধান বলে বিবেচিত হ'ত।

এই সময় পবিত্র খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি চেষ্টা করে। ইউরোপীযগণ মনে করত যে কালো চামড়ার লোকেরা অত্যন্ত অসভ্য ও অনুন্নত। তাদের ধর্মমত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। অতএব শ্বেতাঙ্গ লোকদের অধীনে এলে এবং তাদের ধর্মমত গ্রহণ করলে কালো চামড়ার লোকেরা সভ্য হয়ে প্রগতির পথে অগ্রসর হবে। এইভাবে প্রগতির নামে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করা হয। সে কারণে খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করে।

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলেও সাম্রাজ্য বিস্তারের সুবিধা হয়। বিজ্ঞানের কল্যাণে রেল, স্টীমার, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী যেন ছোট হয়ে গেল। দেশে-বিদেশে যাতায়াত অবাধ এবং সংবাদ আদানপ্রদান সহজ হ'ল। কোন দেশই আর বিচ্ছিন্ন থাকতে পারল না। ইউরোপীযগণের পক্ষে পৃথিবীতে অগম্য স্থান বলে কিছু রইল না।

ফলাফল : (ক) ইউরোপীযগণের জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ নিয়ে কাড়াকাড়ি ও সংঘর্ষ দেখা দিল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র জার্মানি ও ইটালীর ঈর্ষার পাত্র হ'ল এবং এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল। (খ) যে সকল ইউরোপীয় রাষ্ট্র সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তারা তাদের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলির প্রজাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। এর ফলে শোষিত ও লাঞ্ছিত জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীর এশিয়া ও আফ্রিকা যে ঐক্য ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছে তা সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

Q. 11. Show how the Partition of Africa was effected between different European powers. ***Or*** **Give a brief account of the Partition of Africa.**

Ans. **আফ্রিকায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ এবং অধিকার স্থাপন :** উনিশ শতকেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা

তীব্র ভাবে দেখা দেয়। ইউরোপীয়রা প্রথমে এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় কম-বেশি উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। আফ্রিকা মহাদেশের প্রতি তারা সব শেষে মনোযোগী হয়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আফ্রিকাকে একাধিক কারণে 'কৃষ্ণ মহাদেশ' বলা হত। এর অভ্যন্তরভাগ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের তখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানা ছিল না। মরু, মালভূমি এবং বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ এ পর্যন্ত নিগ্রোজাতীয় আদিম অধিবাসীদের অধিকারে কেউই হাত দিতে এগিয়ে যায় নি। উনিশ শতকের শেষার্ধে কয়েক জন দুঃসাহসী ধর্মপ্রচারক ও পর্যটকের চেষ্টায় আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ আবিষ্কৃত হল এবং সভ্যজগতের নিকট পরিচিত হল। এর পরেই ইউরোপের সাম্রাজ্য-লোলুপ রাষ্ট্রগুলির শ্যেনদৃষ্টি আফ্রিকার ওপর পড়ল।

আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় রাজ্যগুলির বিস্তার নীতি

আফ্রিকায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অধিকার স্থাপন: লিভিংস্টোন, স্ট্যানলী, ব্রুস, বার্টন ও স্পেক প্রভৃতির নাম আফ্রিকা আবিষ্কারের ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁদের সমবেত চেষ্টা সফল হয়েছিল। এরপর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আফ্রিকায় বাণিজ্যকেন্দ্র ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা দেখা দিল। এবং সকলেই আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যত্নবান হয়ে ওঠে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে আফ্রিকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ায় বিশেষ অসুবিধা হয়নি। এই মহাদেশকে যখন তারা ভাগ করে নিল তখন ইউরোপ ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মহাদেশ এবং অন্যান্য মহাদেশের ওপর তার আধিপত্য আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপীয়দের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামরিক শক্তি তাদের আফ্রিকা বিভাগে উৎসাহিত করল। উন্নত পর্যায়ের সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা ইউরোপীয়দের সামরিক শক্তির সাহায্যে উপনিবেশ স্থাপনকে জোরদার করে। এর ফলে বিশ বছরের মধ্যেই প্রায় সমগ্র আফ্রিকাকে তারা ভাগাভাগি করে নিতে পারল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকালে কেবল মাত্র দুটি স্বাধীন দেশ চোখে পড়ে—মরক্কো ও ইথিওপিয়া। পরে এদুটিও আর স্বাধীন রইল না।

আফ্রিকা বিভাগ: আফ্রিকার চূড়ান্ত ভাগাভাগি এবং সমগ্র মহাদেশে ইউরোপীয় অধিকার বিস্তারের আগে পর্যন্ত এই মহাদেশে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কতদূর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মরোক্কো
আলজিরিয়া
ত্রি পো লি
কায়রো
সাহারা মরুভূমি
সিনিগাল
সিয়েরা লিওন
নাইজিরিয়া
আবিসিনিয়া
বেলজিয়াম কঙ্গো
কেপ কলোনী
পর্তুগাল
স্পেন
বেলজিয়াম
জার্মানী
ইতালী
বৃটিশ
আফ্রিকায় ইউরোপীয় জাতিসমূহের অধিকার (১৮৯৩)

ডাচ কলোনী : ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ডাচ কেপ কলোনী ইংল্যাণ্ডের অধিকারে আসে। এর পর ইংল্যাণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করতে শুরু করে কিন্তু দুই বিরোধী শক্তি তাকে বাধা দেয়—প্রধানত আফ্রিকার স্থানীয় উপজাতিগুলি এবং দ্বিতীয়ত ওলন্দাজ জাতীয় বুয়ররা। বুয়ররা ইংরেজ শাসন গ্রহণ করতে রাজী হ'ল না। তারা ইংরেজ শাসন থেকে রেহাই পাবার জন্য ইংরেজ অধিকৃত এলাকার বাইরের দিকে সরে যেতে লাগল এবং কালক্রমে নাটাল ও অরেঞ্জ নদীর অববাহিকা অঞ্চলে এবং ট্রান্সভালে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল। এই ভাবে ইংরেজ ও বুয়র মিলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

দক্ষিণ আফ্রিকা

ফ্রান্সের প্রচেষ্টা : ওয়াটারলুব যুদ্ধের পর ফ্রান্স আফ্রিকার উপকূলভাগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আলজেরিয়া ফরাসী অধিকারভুক্ত হয়ে গেল। দলে দলে ফরাসীরা আলজেরিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করতে শুরু করল। তা ছাড়া পর্তুগালের অধীনে কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্র আফ্রিকার উপকূলভাগে ছিল।

বেলজিয়াম : আফ্রিকাতে উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্য বিস্তার করবার চেষ্টা করেন ক্ষুদ্র বেলজিয়াম রাজ্যের রাজা লিওপোল্ড। কয়েক বৎসরের মধ্যে বেলজিয়াম কঙ্গো নদীর অববাহিকায় একটি বিরাট অঞ্চল অধিকার করে নিল এবং এই অঞ্চলটির নাম দিল 'কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য'। কিন্তু এটা আদৌ স্বাধীন ছিল না। প্রথমে বেলজিয়ামের রাজার এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল।

কঙ্গো

বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড কঙ্গো অববাহিকার উন্নয়ন এবং আফ্রিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তাঁর রাজধানী ব্রাসেলস্-এ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এক সম্মেলন ডাকলেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ইটালী, এবং রাশিয়া প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি এতে যোগ দেয়। এই সম্মেলনের ফলে 'International African Association' নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হ'ল। ঠিক হ'ল এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় ব্রাসেলস্এ থাকবে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রে এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপিত হবে। এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হবে আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু কার্যকালে এই সংগঠন বিশেষ কিছুই করতে পারল না। বরঞ্চ বেলজিয়ামের সাফল্যে উৎসাহিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ কঙ্গো অববাহিকার

বিভিন্ন অংশের ওপর দাবি জানাতে থাকে। ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং অন্যান্য দেশ হতে অভিযাত্রীদল এসে আফ্রিকায় নিজ নিজ উপনিবেশ স্থাপনে সচেষ্ট হয়। এই অনিয়ন্ত্রিত উপনিবেশ স্থাপনের ধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। বিসমার্ক এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে ঠিক হয় যে, কোন রাষ্ট্র যদি আফ্রিকায় কোন অংশ দখল করতে চায়, সে ক্ষেত্রে দখলকারী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রকে আগে তা জানিয়ে দেবে। কার্যকালে এই সিদ্ধান্ত কিন্তু কোন রাষ্ট্রই মেনে চলেনি এবং রাষ্ট্রগুলি সুবিধামত নিজ নিজ উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং পার্শ্ববর্তী উপনিবেশ-এর অধিকারী ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে সীমান্ত নির্ধারিত করে নেয়। উদাহরণ হিসাবে ইংল্যাণ্ডের সাথে পর্তুগালের, বেলজিয়ামের এবং জার্মানির, ফ্রান্সের সাথে বেলজিয়ামের, স্পেনের এবং জার্মানির মধ্যে আফ্রিকার উপনিবেশ নিয়ে যে সব চুক্তি হয় সেগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

বার্লিন সম্মেলন, ১৮৮৪

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে সমগ্র আফ্রিকাকে খণ্ড খণ্ড করে ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নেয়। বাকী থাকে শুধু আবিসিনিয়া এবং লাইবেরিয়া।

ভাগাভগির ফলে কোন্ দেশ কতটা পেল তা দেখা যাক্।

ইংল্যাণ্ড: ইংল্যাণ্ডই আফ্রিকার অধিকাংশ ভাল স্থানগুলি দখল করল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড মিশরকে নিজের আয়ত্তে আনল। এরপর সুদানও ইংল্যাণ্ডের অধীনে চলে গেল। আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগের অধিকাংশ ভাল জায়গাগুলিও ইংরেজদের অধীনে আসে। এই অঞ্চলে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট নামে দুটি স্বাধীন ওলন্দাজ (হল্যাণ্ড) রাজ্য ছিল। এরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র নামে পরিচিত। ইংরেজরা এই দুটি রাজ্যও গ্রাস করে। এছাড়া কেপ কলোনী, বাসুতোল্যাণ্ড, নাটাল, নাইজিরিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডাও ইংরাজদের অধীনে আসে। আফ্রিকার ত্রিশ লক্ষাধিক বর্গমাইল পরিমিত স্থান ইংরেজ অধিকারে আসল।

ফ্রান্স: আফ্রিকায় ইংরেজদের পরই ফরাসী সাম্রাজ্যের স্থান। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি নিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি ফোরে। ফরাসী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল উত্তর আফ্রিকা। টিউনিসিয়া, মরক্কো, আলজেরিয়া, সাহারা মরু অঞ্চল, মাদাগাস্কার দ্বীপ নিয়ে আফ্রিকায় ফরাসী সাম্রাজ্য গঠিত হল।

বেলজিয়াম: বেলজিয়াম ইউরোপে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হয়েও আফ্রিকায় এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করল। মধ্য আফ্রিকার ৯ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী বিশাল কঙ্গো দেশটি বেলজিয়াম নিজ অধীনে রাখল।

ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র: বেলজিয়াম কঙ্গোর দক্ষিণে পর্তুগাল একটি নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলে। এই উপনিবেশ আঙ্গোলা নামে পরিচিত এবং

পর্তুগাল

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। পূর্ব উপকূলে মোজাম্বিক অঞ্চলে পর্তুগাল এক বিরাট উপনিবেশ গড়ে তোলে।

আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য স্পেনও ব্যগ্র হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে

স্পেন

বিও-ডি অরো এবং মরক্কোর একাংশ নিজের অধিকারে আনতে সক্ষম হয়।

ইটালী ও জার্মানী উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতায় অনেক পরে অংশ গ্রহণ করে। এর ফলে ভাল ভাল অঞ্চলগুলি থেকে তারা বঞ্চিত হয়। তা

ইটালী ও জার্মানী

ছাড়া বিসমার্ক জার্মানীকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' বলে প্রথমে প্রচার করেন এবং এই নীতির ফলে জার্মানী উপনিবেশ স্থাপনে প্রথমে আগ্রহী ছিল না। পরবর্তীকালে শিল্প প্রসারের ফলে উপনিবেশের প্রয়োজন জার্মানী উপলব্ধি করে এবং আফ্রিকায় নাইজার নদীর পশ্চিমে টোগোল্যাণ্ড এবং পূর্বে ক্যামেরুন, আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং পূর্ব উপকূল থেকে ট্যাঙ্গানিকা হ্রদ পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ জার্মানীর অধিকারে আসে।

রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইটালী উপনিবেশ বিস্তারে মনোযোগী হয়। ক্রিসপির প্রধান মন্ত্রিত্বকালে ইটালী পূর্ণোদ্যমে ঔপনিবেশিক সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং আফ্রিকায় অবস্থিত এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। তুরস্কের সাথে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের ফলে ইটালী ত্রিপোলি এবং সাইরেনাইকার অধিকার লাভ করল। পরে এই দুটি অঞ্চল একত্রিত করে নাম দেওয়া হ'ল লিবিয়া।

এটা ঠিক যে আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ হয় নি। তবে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য ও স্বার্থসংঘাত বিশেষভাবে দেখা

আফ্রিকা বিভাগের স্বরূপ

দেয়। ইংল্যাণ্ডের সাথে ফ্রান্সের, ফ্রান্সের সাথে ইটালীর, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাথে জার্মানীর মনোমালিন্য ঘটেছিল। তা ছাড়া স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। মিশর-সুদানের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সংঘর্ষ, বুয়রদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সংঘর্ষ, আবিসিনিয়ার সঙ্গে ইটালীর সংঘর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Q. 12. Write Short notes on the following—
(a) Boer war, (b) Fashoda Incident, (c) Agadir Incident.

(a) **বুয়র যুদ্ধ:**—দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ (হল্যাণ্ডবাসী) উপনিবেশের অধিবাসীদের বুয়র বলা হ'ত। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ চলবার সময় ইংল্যাণ্ড বুয়র অধ্যুষিত অঞ্চলটির উপর প্রভাব বিস্তার করে। এতে বুয়রদেব সঙ্গে ইংরেজদের মনোমালিন্য দেখ দেয়। ইংরেজ আধিপত্য সহ্য করতে না পারায় বুয়রগণ আফ্রিকার অভ্যন্তবে প্রবেশ কবে নূতন নূতন অঞ্চল আবিষ্কাব করে বসবাস করতে শুরু করে। ইংরেজগণ কিন্তু ছাডবাব পাত্র ছিল না। এই নব-আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলিও তারা নিজেদেব অধীনে আনবার জন্য সচেষ্ট হ'ল। এভাবে নাটাল ইংরেজবা দখল করে নিল। বুয়বগণ অরেঞ্জ নদীর তীরবর্তী স্থানে উপনিবেশ গডে তুলল। তাও ইংবেজবা গ্রাস করল। অবশেষে বুয়বগণ ট্রান্সভালে বসবাস করতে শুরু করে। স্যাণ্ডরিভার কনভেনশন দ্বারা ইংরেজবা বুয়ব অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় (১৮৫২)।

এব পর প্রায় ২০ বছব বুয়ররা শান্তিতে বাসবাস করতে সক্ষম হয়। এই সময়েব মধ্যে বুয়রগণ তাদেব রাজ্যগুলিব উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়। এতে ইংরাজদেব নজর এ অঞ্চলগুলিব উপর পডল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা এই অঞ্চলগুলি গ্রাস করবার চেষ্টা করে কিন্তু গ্লাডস্টোন মন্ত্রিসভা বুয়রদের স্বাধীনতা হরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলে বুয়রদেব স্বাধীনতা বজায় রইল।

ইতিমধ্যে বুয়ব অঞ্চলে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হ'ল। বহু ইংরাজ বুয়র অঞ্চলে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করবাব চেষ্টা করলে বুয়বগণ ভীত হ'ল। তারা নিজেদেব রাজনৈতিক ক্ষমতা অব্যাহত রাখবাব জন্য ইংবাজ আগন্তুকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখল। এতে ইংবাজগণ রুষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইংরাজদের সাহায্য চাইল। রোডেসিয়া থেকে ডাঃ জেমিসনের নেতৃত্বে কয়েকশত ইংরাজ ট্রান্সভালে বে-আইনীভাবে প্রবেশ করলে বুয়র সরকার তাদের বন্দী করে ইংবাজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কিন্তু এদের কোনরূপ শাস্তিই দিল না। বরঞ্চ ট্রান্সভালের ইংরাজগণ যাতে রাজনৈতিক অধিকার পায় তার জন্য বুয়র সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। এবং এর ফলে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বুয়র যুদ্ধ দেখা দিল।

এই যুদ্ধে বুয়রগণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের প্রতি সহানুভূতি জানায়। ইংল্যাণ্ড কা'রও নিকট থেকে সহানুভূতি পেল না। কিন্তু ইংল্যাণ্ডই এই যুদ্ধে জয়ী হয়।

(b) **ফাসোডা সংকট :**—মিশরের পিছনে সুদান ও নীলনদের উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল অবস্থিত। এই অঞ্চলটি মিশরের পাশা মামেট আলি জয় করে নিজ রাজ্যের সঙ্গে একত্রিত করেছিলেন। মাধী পদবীধারী এক ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে সুদান ১৮৮১-৮৫ খৃষ্টাব্দে মিশর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে সক্ষম হয় এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মিশর ইংল্যাণ্ডের অধীনে চলে এলে স্বভাবতই ইংল্যাণ্ড মিশরের পূর্বতন অঙ্গরাজ্য সুদান পুনরায় জয় করতে মনস্থ করে এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্বাধীন ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করে ইংল্যাণ্ড সুদান জয় করে।

ইংল্যাণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সেরও নীলনদের অঞ্চল-এর প্রতি লোভ ছিল। ইংল্যাণ্ডের সতর্কবাণী সত্ত্বেও ফ্রান্স এই অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী কঙ্গোপ্রদেশ হতে সেনাপতি মারচাদ নেতৃত্বে একটি ফরাসী বাহিনীকে উচ্চ নীলনদের অববাহিকা অঞ্চলে পাঠানো হল।

এই বাহিনী সুদানের রাজধানী খার্টুম্-এর ৬০০ মাইল-এর কাছাকাছি এক স্থানে উপনীত হয়ে ফরাসী পতাকা উত্তোলিত করল। এই স্থানটিই হ'ল বিখ্যাত ফাসোডা অঞ্চল। ইংরেজ সেনাপতি কিচেনার এই সংবাদ পেয়েই পাঁচটি গানবোট ভর্তি সৈন্যসামন্ত নিয়ে ফাসোডা অভিমুখে রওনা হলেন। ফরাসী সেনাপতি মারচাদ কিচেনারকে অভ্যর্থনা জানালেন কিন্তু বলতে ভুললেন না যে তিনি ফরাসী অঞ্চলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। এর উত্তরে কিচেনার ফরাসী সেনাপতিকে জানালেন যে ফরাসীরা ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে রয়েছে এবং তিনি যেন সত্বর এই অঞ্চল ত্যাগ করেন এবং ফরাসী পতাকা অবনমিত করেন।

এর ফলে কয়েক সপ্তাহ ধরে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হ'ল। অবশেষে ফ্রান্স তার দাবী ত্যাগ করে ফাসোডা অঞ্চল ত্যাগ করল। যুদ্ধের কিনার থেকে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ফিরে এল।

ফাসোডা সংকট এটাই প্রমাণ করে যে সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আফ্রিকায় গিয়েছিল, তথাকার আদিম অধিবাসীদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসবার জন্য নয়। এ ছাড়া, ফাসোডা সংকটের সময় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সম্পর্কের যেরূপ অবনতি ঘটে, ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর আর অনুরূপ অবনতি ঘটে

নি, কিন্তু ফাসোডা সংকটের পরই ইঙ্গ-ফরাসী সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি ঘটে এবং ইঙ্গ-ফরাসী আন্তরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

(c) **আগাদির ঘটনা:** ফ্যাসোডা সংকট যেমন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল অনুরূপভাবে আগাদির ঘটনা জার্মানী ও ফ্রান্সকে যুদ্ধের কিনারায় নিয়ে যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফলে সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ থাকে।

মরক্কো দেশটিকে কেন্দ্র করে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। টিউনিস দখল করবার পর ফ্রান্স মরক্কোর উপর নজব দেয় এবং এই অঞ্চলটি দখল করবার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা শুরু করে। জার্মানী কিন্তু প্রথম থেকেই এই নীতির বিরোধিতা করে এবং ফ্রান্সকে জানিয়ে দেয় যে মরক্কো কোন ক্রমেই গ্রাস করা চলবে না। ইতিমধ্যে তুরস্কের সঙ্গে জার্মানীর কাইজাব দ্বিতীয় উইলিয়ম মধুর সম্পর্ক গড়ে তুললেন এবং নিজেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যেব বক্ষক বলে ঘোষণা কবলেন। বলাই বাহুল্য, মরক্কো তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি অর্ধ-স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই নীতি ঘোষণার পব কাইজাব মবক্কোর আঞ্চলিক অখণ্ডতা বক্ষা কববার জন্য চেষ্টা করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাইজার নিজে মবক্কো ভ্রমণে যান এবং তাঞ্জিয়ারে জার্মান জনসাধাবণের নিকট এক বক্তৃতায় জার্মান নীতি ঘোষণা করেন। তিনি মরক্কোর সুলতানেব স্বাধীনতা, বাণিজ্যিক অধিকাব, মুক্তদ্বার, সমানাধিকার (ইউরোপীয়দের) এবং সংস্কাবেব দাবী জানান। এর পরই মরক্কোর প্রথম সংকট দেখা দেয়।

এই ঘটনার পর মরক্কো সমস্যার সমাধান করবাব জন্য আলজেয়ার্সে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে। এই বৈঠকে মবক্কোব সুলতান ফ্রান্সের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নীতির সমালোচনা করলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও এই বৈঠকে যোগদান করল। বহু বাকবিতণ্ডার পব এই বৈঠকের মাধ্যমে মরক্কো সম্বন্ধে একটি সাময়িক আপস হ'ল।

কিন্তু শীঘ্রই মরক্কো নিয়ে পুনরায় সংকট দেখা দিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে মরক্কোয় আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল দেখা দেয়। জার্মানী মরক্কোতে হস্তক্ষেপ করে। ফলে ফ্রান্স ও জার্মানীর সঙ্গে একটি বুঝাপড়া হয়। এতে ঠিক হ'ল যে মরক্কোতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অধিকার থাকবে কিন্তু জার্মানী অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে মরক্কো নিয়ে পুনরায় সমস্যার সৃষ্টি হ'ল। মরক্কোর ফেজ শহরে গোলযোগ দেখা দিলে ফ্রান্স অন্য শক্তিকে না জানিয়ে একক-ভাবে সৈন্য

প্রেরণ করে। ফ্রান্সের এই একতরফা কার্যে জার্মানী ক্রুদ্ধ হ'ল। এবং মরক্কোয় জার্মান স্বার্থ রক্ষা করার জন্য প্যানথার নামক এক যুদ্ধ জাহাজ মরক্কোর বন্দর আগাদিরে প্রেরণ করল। প্যানথার-এর উপর নজর রাখবার জন্য ইংল্যাণ্ড তার নৌবাহিনী ফ্রান্সের পক্ষে প্রেরণ করল। বলাই বাহুল্য যে এই সময় ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল এবং এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একে অন্যের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে নজর দিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দেখা দিল আগাদির ঘটনা (Agadir Incident) কিন্তু এই ঘটনা বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে সক্ষম হ'ল না। জার্মানী,—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুগ্ম শক্তিকে ভয় পেল এবং কঙ্গো চুক্তি দ্বারা এই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটাল। মরক্কো ফ্রান্সের অধীনে চলে গেল।

Q. 13. What were the causes of the great war of 1914-1918 ? Who was responsible for it and why ?

Ans. বিশ শতকের সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ ঘটনা—মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে দুটি সর্বগ্রাসী যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধটি শুরু হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। প্রত্যেক যুদ্ধের পিছনে দু-প্রকারের কারণ থাকে—পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ। কোন একটিমাত্র কারণে যুদ্ধ ঘটে না। বিভিন্ন কারণের এবং স্বার্থের সংঘাতের ফলেই যুদ্ধ দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধও বিভিন্ন কারণের জন্য সংঘটিত হয়েছিল।

পরোক্ষ কারণ ঃ (ক) জঙ্গীবাদ—জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক বিসমার্ক স্পষ্টভাবেই বলতেন যে, জটিল সমস্যার সমাধান গণতন্ত্র দ্বারা হয় না, লৌহকঠিন-নীতি ও সামরিক শক্তিই একমাত্র পন্থা। তিনি তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হলে এবং খুঁটিনাটিভাবে সমরসজ্জায় সজ্জিত হতে পারলে আধুনিককালে অনেক কিছু ঘটান সম্ভব। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করল অনেক রাষ্ট্রই। কেউ জার্মানীর সমরসজ্জার ভয়ে ভীত হল, কেউ পররাজ্য গ্রাসের জন্য বিসমার্কের জঙ্গীবাদ গ্রহণ করল। এই সকল রাষ্ট্র একে অন্যকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করল এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোট দেখা দিল।

(খ) আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোট—এই রাষ্ট্রজোট গঠনের পশ্চাতে পরস্পর সন্দেহ ও স্বার্থসংঘাত কাজ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দুটি পরস্পর-বিরোধী সমশক্তিমান রাষ্ট্রজোট গঠিত হ'ল। জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালী সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হ'ল। এটি ত্রিশক্তি চুক্তি (Triple Alliance) বলে খ্যাত। এই চুক্তিতে ফরাসীরা ভীত হ'ল, কারণ জার্মানী ও ইটালী হতে সরাসরি ফ্রান্স

আক্রমণ করা সম্ভব। রাশিয়াও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মিতালী করল। এরা প্রত্যেকেই জার্মান-বিরোধী ছিল, সুতরাং মিত্রতা স্থাপনে কোনরূপ বাধা হ'ল না। এই তিন শক্তি—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া—জার্মান-আক্রমণ রোধ করবার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করল। একে ত্রিশক্তি মিতালী (Triple Entente) বলে।

(গ) **জাতীয়তাবাদ**—জাতীয়তাবাদ বা উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। জার্মানী ও ইটালীর ঐক্যসাধনের ইতিহাসে এর অবদান সর্বাগ্রে রয়েছে। কিন্তু নিকট-প্রাচ্যে অর্থাৎ বল্‌কান অঞ্চলে যখন এই জাতীয়তাবাদ তীব্ররূপে দেখা দিল তখনই নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হ'ল। যেমন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে নানাজাতির সমাবেশ হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদ দেখা দিল তখন বিভিন্ন জাতি নিয়ে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য কি করে টিকে থাকবে?

অষ্ট্রিয়াকে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে, নচেৎ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দিয়ে পৃথক পৃথক জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে হবে। কোন সাম্রাজ্যই ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে না। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যও নিজ রাজ্যের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করতে চাইল এবং যে সকল রাষ্ট্র এইরূপ ধ্বংসকারী (অষ্ট্রিয়ার পক্ষে) মতবাদ প্রচারে সাহায্য করছিল তাদের বিরুদ্ধেও অষ্ট্রিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'ল। ফলে বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল।

(ঘ) **জার্মান-ইংরাজ বিরোধ**—জার্মানী ব্যবসাযক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের প্রধান প্রতিযোগী হয়ে দাড়িয়েছিল। আফ্রিকার বিস্তৃত রাজ্যলাভের পর জার্মানীর সাম্রাজ্যলিপ্সা আরও প্রবল হয়ে উঠল। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম বিরাট নৌ-বাহিনী সজ্জিত করে ইংল্যাণ্ডের উদ্বেগের সৃষ্টি করলেন! তুরস্কের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে জার্মানী বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করলে ইংল্যাণ্ড আরও শঙ্কিত হ'ল। ফলে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল।

(ঙ) **ফ্রান্স-জার্মান বিরোধ**—ফরাসীরা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারে নি। এছাড়া ফ্রান্সের আলসাস ও লোরেন নামক সমৃদ্ধশালী দুটি প্রদেশ জার্মানী কেড়ে নিয়েছিল; ফলে ফরাসীদের মধ্যে জার্মান-বিরোধী মনোভাব প্রচণ্ডরূপে ছিল। ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কামনা বহুপূর্ব থেকেই করছিল।

(চ) **সাম্রাজ্যবাদ**—সাম্রাজ্যবাদ (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদী জার্মানী ও ইটালীর বিরোধ দেখা দিল। ইটালী অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর

বিরুদ্ধে (নিজের সুবিধার জন্য) ত্রিশক্তি চুক্তি ভঙ্গ করে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগদান করে। তথাপি এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে জার্মানীর ও ইটালীর অতৃপ্ত সাম্রাজিক আকাঙ্ক্ষা এই বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

প্রত্যক্ষ কারণ: সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড—ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ যখন এইরূপ পারস্পরিক বিদ্বেষ, সন্দেহ ও মদোন্মত্ততায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠিক সেই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যা বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করল—সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডই এই ঘটনা। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড বল্‌কানের বসনিয়া (Bosnia) প্রদেশে সস্ত্রীক সফরে বার হয়েছিলেন। ২৮শে জুন সেরাজেভো (Serajevo) শহরে সার্ভিয়ার এক তরুণ আততায়ীর হস্তে যুবরাজদম্পতি নিহত হন। সার্ভিয়া বল্‌কান অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। তারা জাতিতে স্লাভ ছিল এবং তারা অষ্ট্রিয়ার শাসিত স্লাভ প্রদেশ অধিকার করে জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। সুতরাং অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়াকে শত্রুরূপে মনে করত। সার্ভিয়ার এক আততায়ীর হস্তে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের মৃত্যু হলে অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়ার উপর আবণ্ড ক্ষিপ্ত হ'ল এবং সার্ভিয়া সরকারের নিকট এক অপমানজনক চরমপত্র প্রেরণ করল। এধারে রাশিয়ার সম্রাট নিজেকে বল্‌কান উপদ্বীপের স্লাভরাজ্যগুলির অভিভাবক বলে মনে করতেন। সার্ভিয়ার জনসাধারণও স্লাভ ছিল। সুতরাং রাশিয়া সার্ভিয়ার পক্ষ অবলম্বন করল এবং সার্ভিয়াকে অষ্ট্রিয়ার চরমপত্রে ভীত হতে নিষেধ করল। অষ্ট্রিয়া তার প্রেরিত চরমপত্রের সন্তোষজনক উত্তর না পেলে সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (২৮শে জুলাই, ১৯১৪)। রাশিয়া সার্ভিয়ার পক্ষ অবলম্বন করলে জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (ত্রিশক্তি মিতালী অনুযায়ী) ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে মিলিত হ'ল। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে জার্মান বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করলে ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। পরে বিভিন্ন সময়ে তুরস্ক, বুলগেরিয়া জার্মানীর সঙ্গে এবং ইটালি, পর্তুগাল, রুমানিয়া, গ্রীস, জাপান, চীন এবং সর্বশেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির (ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া) সঙ্গে যোগদান করে।

যুদ্ধের জন্যে কে দায়ী—যুদ্ধারম্ভের সময় অষ্ট্রিয়া-জার্মানীর পক্ষে যারা ছিলেন তাদের মতে রাশিয়া এই যুদ্ধের জন্য প্রধানতঃ দায়ী এবং ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডও কতকাংশে দায়ী, কারণ ইঙ্গ-রুশ-ফরাসী প্ররোচনা ছাড়া সার্ভিয়ার পক্ষে অষ্ট্রিয়ার ভ্রূকুটি অবহেলা করা সম্ভব ছিল না।

অন্যদিকে মিত্রশক্তি পক্ষাবলম্বীগণের মতে জার্মানীই এই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, কেননা জার্মানী সমগ্র পৃথিবীতে নিজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার সঙ্কল্পে মেতে উঠলে যুদ্ধ দেখা দেয়।

এ বিষয়ে লুঙ্গি আলবার্টানির অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য :

To attribute the responsiblity for making War on July 1914 to the central powers is not to deliver judgment in the conditions which drove Austria and Germany acted as they did···is not to assert that from their own point of view they had not good reasons for seeking to change a state of affairs injurious directly to Austria and indirectly to Germany. The same holds good in respect of the tempest that was being unloosed. Nay they seemed almost ready to welcome it on certain conditions, ······in the conditions which drove Austria and Germany acted as they did···is not to assert that from their own point of view they had not good reasons for seeking to change a state of affairs injurious directly to Austria and indirectly to Germany. ······The fact is that the question of the origins of the War is an entirely different one from that of the rights and wrongs of the War·· ···All that we can affirm····· is that even if one or both of the central powers had sufficient reasons for starting a War, would have been a wrong decision on their part to do so in conditions unfavourable to themselves, throwing the world into chaos only to bring about their own defeat and ruins.

অতএব একথা অবশ্যই বলা যায় যে কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী ছিল না। বৃহৎ পঞ্চশক্তি—জর্মানী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া সমভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী ছিল।

Q.. 14. What was the nature of the First World War? What were the War objectives of contending states?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি : ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ শুরু হল তা দীর্ঘ চার বছর তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল। বহুদিক হতে সে যুদ্ধ আমাদের ইতিহাসে

তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এর আগেও ইউরোপে বহু যুদ্ধ ঘটেছে, যেমন, নেপোলিয়ানের সাথে যুদ্ধ এবং বিপ্লবী ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ, ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ ইত্যাদি। এসব যুদ্ধে যেসব দেশ জড়িয়ে পড়েছিল তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না এবং এসব যুদ্ধ চলেছিলও বহুদিন ধরে। উনিশ শতকের ইউরোপে যুদ্ধ ঘটেছিল এবং সার্বিক শান্তি বজায় ছিল না সত্য, কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের মত সর্বাত্মক যুদ্ধ এর আগে আর ঘটেনি। মারণাস্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে এভাবে আগে কাজে লাগানো হয়নি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি এর আগের কোন যুদ্ধই করতে পারেনি। যুযুধান প্রত্যেক রাষ্ট্রই সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল কারণ সকলেই বিশ্বাস করত যে এই যুদ্ধের ওপর তাদের স্থিতি নির্ভর করছে। স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে এই যুদ্ধ চলেছিল। এবং এই যুদ্ধটিকে প্রথম জনযুদ্ধ বলা হয়ে থাকে।

প্রথম সার্বিক যুদ্ধ

যুদ্ধাদর্শ: অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য যখন সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং রাশিয়া সার্ভিয়াকে রক্ষা করার জন্য সৈন্যসামন্ত সজ্জিত করল তখনই নিকট-প্রাচ্য সমস্যা জটিলতর রূপ নিল। তৎকালীন অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের নিকট এই যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষার যুদ্ধ—সার্ভিয়ার আক্রমণ হতে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ এবং রাশিয়ার বল্‌কান অঞ্চলে অখিল শ্লাভ রাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সার্ভিয়ার নিকট এই যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম। কারণ অস্ট্রিয়ার চরম প্রস্তাব মেনে নিলে সার্ভিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব থাকত না। এ কারণে সার্ভিয়ার এই সংগ্রামকে মধ্য ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রই সহানুভূতির চোখে দেখল কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে সার্ভিয়ার জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করল রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্র যার কাছে সার্ভিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করা বড় ছিল না। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়া ও জার্মানির প্রভাব যাতে বল্‌কান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার বিরুদ্ধে সর্ভিয়াকে কাজে লাগান।

স্ব-বিরোধী আদর্শ

এই স্ববিরোধী নীতি যুদ্ধের শুরু হতেই দেখা যায়। যার ফলে যুদ্ধাদর্শ সম্বন্ধে কোন পক্ষেরই ধারণা স্পষ্ট ছিল না এবং রাষ্ট্রজোট দুটির সদস্যদের মধ্যে নীতিগত মিল দেখতে পাওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক বৃটেন ও ফ্রান্স স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়ার সাথে গাঁটছড়া বাধায় নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসই দেখা যায়, গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ কেবলমাত্র একটা বুলি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোন পক্ষেরই যুদ্ধনীতি

স্বার্থসিদ্ধিই মূল আদর্শ ছিল

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ
উত্তর সাগর
জুটল্যাণ্ড
গ্রেট ব্রিটেন
বাল্টিক সাগর
১৯১৮ খৃঃ জার্মানদের অগ্রসর সীমা
রাশিয়া
প্যারিস
পশ্চিম রণাঙ্গন
রোম
আলবেনিয়া
বলকান রণাঙ্গন
গ্রীস
তুর্কী
ভূমধ্য সাগর
স্থলযুদ্ধের প্রধান স্থানসমূহ
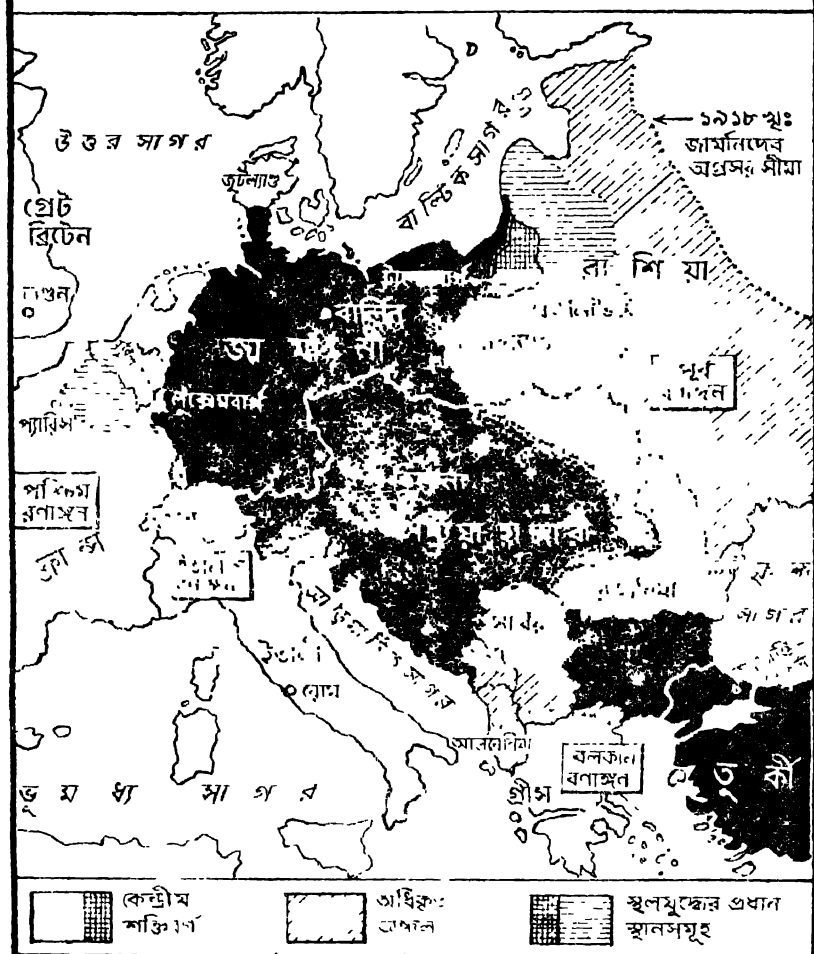
গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য পরিচালিত হয়নি। দুই পক্ষেরই যুদ্ধনীতি যুদ্ধে জয় ও আত্মরক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

Q. 15. Briefly state the courses of the First Great War.

Ans. যুদ্ধের গতি : যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী বিদ্যুৎগতিতে শত্রুপক্ষকে আঘাত হানতে চেষ্টা করে। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা গ্রাহ্য না করে (বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা কোন শক্তি ভাঙতে চেষ্টা করবে না বলে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিতে জার্মানী আগেই স্বাক্ষর করেছিল) বেলজিয়ামের ওপর দিয়ে ফ্রান্সের দিকে জার্মান সৈন্যবাহিনী এগুতে থাকে। মারণাস্ত্রের জোর বেশি না থাকায় জার্মানবাহিনী যুদ্ধ বাধার এক মাসের মধ্যেই সমস্ত প্রতিরোধ ধ্বংস করে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীর পনর মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌছাল। কিন্তু এখানে জেনারেল জোফ্রের নেতৃত্বে ফরাসীবাহিনী মার্নে নদীর যুদ্ধে জার্মানবাহিনীর গতিরোধ করতে সমর্থ হয়। জার্মানবাহিনী এখান হতে আর এক পাও এগুতে পারেনি এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে এরূপ অবস্থা বহু দিন পর্যন্ত টিকে থাকে এবং এখানে পরিখা যুদ্ধ (Trench Warfare) শুরু হয়। তবে বহু চেষ্টা করেও মিত্রপক্ষ জার্মানবাহিনীকে এ অঞ্চল হতে হটাতে পারেনি।

প্রথম বছর

পশ্চিম রণাঙ্গনে

পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকে।

পূর্বরণাঙ্গন : এই রণাঙ্গনে রাশিয়া প্রথমে জার্মানীর ভেতরে প্রবেশ করে। কিন্তু শীঘ্রই সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গের ও লুডেনডর্ফের নেতৃত্বে জার্মান সৈন্য **টানেনবার্গের** যুদ্ধে (Battle of Tannenburg Sep. 1914) রুশ সৈন্যদলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। রুশ সৈন্যদলের এক বিরাট অংশ বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং প্রায় আশি হাজার রুশসৈন্য জার্মানদের হাতে বন্দী হয়। জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়ী হলেও অষ্ট্রিয়া কিন্তু রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। জার্মানী তার মিত্র অষ্ট্রিয়ার ওপর হতে রাশিয়ার সামরিক চাপ কমাবার জন্য পোল্যাণ্ড অঞ্চলে এক পাল্টা আক্রমণ চালায়। কিন্তু এতে ফল বিশেষ হয় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও পূর্বরণাঙ্গনে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যুদ্ধের অবস্থা মোটামুটিভাবে অনিশ্চিত বলা যেতে পারে।

পূর্ব রণাঙ্গনে

জলপথেও দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রবল নৌযুদ্ধ শুরু হয়। জার্মানী ইংরেজ নৌবাহিনীর কবল হতে রক্ষা করবার জন্য তার নৌবাহিনীকে নিজের সুরক্ষিত বন্দরে

রেখে দেয়। জার্মান নৌবাহিনীর ইংরেজ ও ফরাসী নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার মত ক্ষমতা ছিল না। অবশ্য জার্মানীর কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ ইংরাজ ও ফরাসী নৌশক্তির বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করে জার্মান নৌশক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে যায়। তবে একথা ঠিকই যে, যুদ্ধের প্রথম হতেই নৌশক্তিতে ইংরেজদের প্রাধান্য বজায় ছিল।

জলপথে

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের গতি কয়েকটি অঞ্চলে তীব্র হয়। দূরপ্রাচ্যে জার্মানী বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। জাপান ইংরেজপক্ষে যোগ দেয় এবং দূরপ্রাচ্যে জার্মানীর প্রভাবাধীনে যে সব অঞ্চল ছিল সেগুলি দখল করে নেয়। মধ্যপ্রাচ্যে অবশ্য জার্মানীর শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। তুরস্ক জার্মানীর দিকে যোগ দেবার ফলে কৃষ্ণসাগর দিয়ে রাশিয়ার সাথে ইংরেজ-ফরাসী শক্তির যোগাযোগ রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে। পশ্চিম রণাঙ্গণে যুদ্ধের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। ইংরেজ-ফরাসী শক্তি শত চেষ্টা করেও জার্মান বাহিনীকে ফ্রান্স হতে বিতাড়িত করতে পারল না। পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপুল সাফল্যলাভ করে। গোটা পোল্যাণ্ড জার্মানরা দখল করে নেয়। জার্মানদের হাতে বারবার পরাজিত হবার ফলে রুশ সৈন্যদলের মনোবল ভেঙে পড়ে। জারতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা রুশবাসীদের নিকট স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে এবং রাশিয়ায় আসন্ন বিপ্লবের প্রস্তুতি চলতে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যে মেসোপটেমিয়াতে ইংরেজ সেনাদল জার্মান ও তুর্কী সৈন্যদলের নিকট পরাজিত হয়।

দ্বিতীয় বছর

রাশিয়ার পরাজয়

নৌযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই বছরের শুরু হতেই জার্মানরা ডুবো জাহাজের ব্যবহার করতে থাকে। জার্মান ডুবো জাহাজগুলি জলের তলা থেকে অকস্মাৎ মাথা তুলে জাহাজের উপর টর্পেডো ছাড়ত এবং আবার জলে ডুবে পালিয়ে যেত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যে সব জাহাজ যুদ্ধ এলাকায় গোলা-বারুদ, খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যাচ্ছিল তাও জার্মান ডুবো জাহাজের হাত থেকে রক্ষা পেল না। ফলে আমেরিকানরা তাদের জাহাজগুলি ধ্বংস হওয়ায় রুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের যাত্রীবাহী লুসিটানিয়া জাহাজখানি যখন জার্মানরা ডুবিয়ে দিল তখন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব জার্মানীর বিরুদ্ধে গেল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইটালী ইঙ্গ-ফরাসী জোটে যোগ দেয় এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করে কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। সংক্ষেপে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের গতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ইউরোপে অষ্ট্রো-জার্মান শক্তিই সফলতা অর্জন করে। সার্ভিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। তবে জার্মানী যুদ্ধ

ডুবো জাহাজের আক্রমণ

ইটালীর যুদ্ধে যোগদান

তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেষ্টা করেও বিফল হয়। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠে এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জার্মানী যে সুবিধা করতে পারবে না তা তারা বুঝতে পারল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হ'লে ভার্দুন ও সোম-এর যুদ্ধ। জার্মানরা ভার্দুন-এর যুদ্ধ শুরু করে প্যারিস দখল করবার জন্য। ভার্দুন এলাকায় জার্মান চাপ কমাবার জন্য মিত্রপক্ষ সোম (Somme) অঞ্চলে এক পাল্টা আক্রমণ চালায়। এই দুটি অঞ্চলেই দীর্ঘকাল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল এবং উভয় পক্ষই বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্যের জয় অব্যাহত থাকে। রুমানিয়া জার্মান বাহিনীর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করে। অবশ্য এই বছরেই গ্রীস ও পর্তুগাল ইঙ্গ-ফরাসী জোটে যোগ দেয়।

তৃতীয় বছর

গ্রীস ও পর্তুগালের যুদ্ধে যোগদান

এই বছরেব জুটল্যাণ্ডের নৌযুদ্ধও প্রসিদ্ধিলাভ করে। জার্মানী এই প্রথম ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনীর সম্মুখীন হয়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হয় প্রচুর এবং জয়-পরাজয় অনিশ্চিত থেকে যায়।

জুটল্যাণ্ডেব নৌযুদ্ধ

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। ডুবো জাহাজে যুদ্ধ চালাবার বিরুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর নিকট প্রতিবাদ জানায় কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইঙ্গ-ফরাসী জোটকে প্রচুর ঋণ ও খাদ্যসম্ভার দিচ্ছিল, অথচ জার্মানী কিছুই পাচ্ছিল না। এই বিষয়টি জার্মানির উষ্মার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জলপথে জার্মানী যতই নিষ্ঠুর হতে থাকে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও ততই তার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মনে করল যে এই যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে জার্মানীর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আত্মরক্ষার সংগ্রাম। আমেরিকা স্থির করল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার নীতি হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে এই যুদ্ধে সাহায্য করা এবং তার পর বিজেতা ও বিজিত রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে গণতান্ত্রিক বিশ্বজনীনতা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনা করা। এই আদর্শ সামনে রেখে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইঙ্গ-ফরাসী জোটের পক্ষ নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়।

চতুর্থ বছর

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল রাশিয়ার বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অবসান ঘটল এবং রাশিয়া যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াল। সে জার্মানীর সাথে এক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত করল।

রাশিয়ার বিপ্লব

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানী যুদ্ধ শেষ করবার জন্য তৎপর হ'ল। পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে সে পশ্চিম রণাঙ্গনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে। তার উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী বাহিনীকে ইংরেজ বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করা। কিন্তু সেনাপতি মার্শাল ফসের নেতৃত্বে মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী-আমেরিকান বাহিনী জার্মানীর প্রতিরোধ ব্যূহ তছনছ করে ফেলে। ফলে সমগ্র রণাঙ্গনে জার্মানদের পরাজয় ঘটতে থাকে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর জার্মানী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এর আগেই তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়া বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছিল। যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুসারে জার্মানী তার অধিকৃত অঞ্চলগুলি থেকে সরে গেল এবং এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

যুদ্ধের শেষ বছর

জার্মানীর আত্মসমর্পণ

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

Q. 16. Write what you know about Russia under the Czars. Or, Give a picture of Russia in the 19th century with special reference to position of Czar, Church, Feudal lords and the common people.

Ans ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া সর্বদিক হতে অনুন্নত ছিল। ফলে, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় এক বিপ্লব হয়। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় এটিও পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করে।

জার-শাসিত রাশিয়ার অবস্থা: রাশিয়ার সম্রাটকে জার বলা হত। রাশিয়ার বিখ্যাত জার মহামতি পিটারের (১৬৮২-১৭২৫) প্রচেষ্টায় রাশিয়া একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তার পর দ্বিতীয় ক্যাথারিনের চেষ্টায় রাশিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্র-পরিবারের মধ্যে অন্যতম সদস্যরূপে গণ্য হবার যোগ্য হয়ে ওঠে। এর পর নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাশিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ইউরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও ইউরোপের উন্নত দেশগুলির তুলনায় রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। রাশিয়ার জার গোয়েন্দা পুলিস ও সৈন্যের সাহায্যেই ইচ্ছামত দেশ শাসন করতেন। গণতন্ত্র বলে কিছুই ছিল না। প্রদেশগুলিতে প্রদেশপালেরাই হর্তাকর্তা ছিল। গ্রাম অঞ্চলে মির নামক গ্রামপঞ্চায়েত ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল। তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কিছুই ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে ডুমা বা জাতীয় সভা নামক একটি প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হয় কিন্তু নানা কারণে এই সভা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে নি।

জারতন্ত্রের অকর্মণ্যতা

এই সময়ে ধর্মযাজকদের ক্ষমতা প্রচুর ছিল। জনসাধারণ অশিক্ষিত থাকার ফলে নানারূপ ধর্মীয় কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। ফলে, ধর্মযাজকদেব স্বর্ণ যুগ দেখা দেয়। যাজক সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল।

রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থায় উৎকট পার্থক্য ছিল। জনসংখ্যার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনই গুরুত্ব ছিল না। জনগণের বিপুল অংশই ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। অভিজাত এবং চাষী—এই দুই শ্রেণীতে এরা বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ জমির মালিক ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। অর্থ নৈতিক জীবনে চাষী ছিল তাব মনিবের ওপর নিভবশীল। তারা ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য জাব দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডাব এক আইন দ্বাবা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভূমিদাসদেব ভূমি না দিয়ে মুক্ত কবলেন। এতে তাদেব অর্থ নৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হল।

সামাজিক বৈষম্য

উনিশ শতকে রাশিয়া ছিল একটি কৃষিপ্রধান এবং শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত দেশ। অবশ্য কয়েকটি শহরাঞ্চলে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলির অধিকাংশেরই মালিক ছিল বিদেশীরা। এই সমস্ত মিল-মালিকেরা শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

রাশিয়ায় এই অবস্থা বেশীদিন রইল না। ইউরোপের অন্যান্য দেশ হতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ রুশ দেশেও এসে পৌছাল। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা এবং বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্রছাত্রীরা দেশে শাসনসংস্কার দাবি করল। জার কঠোর হস্তে এসব দাবি বন্ধ করতে চেষ্টা করলে দেশে একাধিক সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে উঠল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডাব এদের হাতে প্রাণ দিলেন।

Q. 17. Describe the causes of the Russian Revolution of 1917. Write a short account of the same.

Ans. রুশ-বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এটি বিংশ শতাব্দীর মানব-ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। রুশ-বিপ্লবের ফলে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সূচনা

বিপ্লবের কারণ ঃ রুশ-বিপ্লব একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। এ এক দীর্ঘ-কালব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের এক পূর্ণাঙ্গ পরিণতি। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় রুশ-বিপ্লবও অনেকগুলি কারণের সমষ্টিগত ফল। এই কারণগুলি ছিল বিভিন্ন ধরনের এবং ব্যাপক।

রাশিয়ার সম্রাটদের জার বলা হ'ত। রোমানফ বংশীয় জাররা তিন শতাব্দী ধরে রাজত্ব করছিলেন। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা বা ফ্রান্সের ন্যায় কোন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা রাশিয়ায় ছিল না। গোয়েন্দা পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্যে জার দেশ শাসন করতেন।

রাজনৈতিক কারণ

ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ রাশিয়ায় পৌঁছাল তখন শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জারের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে লাগল। দেশে একাধিক সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে উঠল। জারের অনেক কর্মচারী এদের হস্তে নিহত হলেন। দেশে অনেক রাজনৈতিক দল স্থাপিত হ'ল এবং শাসন-সংস্কার দাবী করল। জার এদের দাবী গ্রাহ্য করলেন না। দমনমূলক আইন ও কঠোর নির্যাতন দ্বারা জার সংস্কার আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করেন। অগণিত দেশভক্তদেব সুদূর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মার্ক্সপন্থী সাম্যবাদী দলটি প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলিব মধ্যে ঐক্য না থাকায় জাবেব নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ধ্বংস করতে পারল না। অবশ্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয় হলে শাসন-সংস্কারেব দাবী কবে এক বিপ্লব দেখা দেয়। কলকারখানায় ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। এই বিপ্লবী মনোভাব সৈন্যদলের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সাময়িক ভাবে বিদ্রোহ দমন করলেন এবং প্রজাদেব এক প্রতিনিধি সভা (ডুমা) আহ্বান করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ডুমায় জনসাধারণেব প্রতিনিধিরা স্থান পেল না। জার ঘোষণা করলেন ডুমার সদস্যগণ কেবল পরামর্শ দিতে পারবে, শাসন-ব্যবস্থা পবিচালিত হবে পূর্ববৎ জারেরই নির্দেশে। কিন্তু এই সময় জারের হস্তে কোন ক্ষমতা ছিল না। কুচক্রী রাসপুটিন জার দ্বিতীয় নিকোলাসেব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে যথেচ্ছাচার চালালেন। রাজ্য শাসনের যা কিছু ব্যবস্থা সবই রাসপুটিন কবতে লাগলেন। একদিকে এই রাসপুটিন চালিত দুর্নীতি-অনাচারের পঙ্কিল স্রোত, আর একদিকে শাসন বিশৃঙ্খলার ফলে দেশের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠল। দেশের জনসাধারণের মনে অসন্তোষ-বিদ্রোহের তীব্র বহ্নি জ্বলতে থাকল। এই সময় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সমগ্র ইউরোপ প্রকম্পিত করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সঙ্গে একযোগে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জার সরকারের চরম অকর্মণ্যতার ও অব্যবস্থার জন্য যুদ্ধের উপকরণের অভাবে দলে দলে রুশ-সৈন্য জার্মান-সৈন্যদের হস্তে নিহত ও বন্দী হতে লাগল। সৈন্যদলে ঘোর অসন্তোষ দেখা দিল।

দেশে চরম খাদ্যাভাব ঘটল। শহরের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। আন্দোলনকারীদের প্রতি সৈন্যদের গুলি চালাতে আদেশ করলে তারা সে আদেশ অমান্য করল। সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিক একজোটে শান্তির দাবী জানাল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে একটি গণ-অভ্যুত্থান হ'ল। পেট্রোগ্রাডে এই অভ্যুত্থান ঘটে। বিপ্লবীরা জয়ী হ'ল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কুখ্যাত রাসপুটিন পূর্বেই নিহত হন। এই বিপ্লবে সোশ্যালিস্ট রিভল্যুশনারি ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এই দুটি দল প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। এর পর রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়। অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে বলশেভিক দল লেনিনের নেতৃত্বে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করল।

অর্থ নৈতিক : রাশিয়ার অর্থ নৈতিক সমস্যা রুশ জনসাধারণকে বিপ্লবী করে তুলল। কলকারখানায় শ্রমিকদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়ে। অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ছিল বিদেশীরা। এরা শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। বিশ্বযুদ্ধের ফলে অর্থ নৈতিক সঙ্কট প্রবলভাবে দেখা দিল। কৃষকদের জোরপূর্বক সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের ফলে কৃষিকার্য অবহেলিত হ'ল।

সামাজিক : রুশ-সমাজ দুভাগে বিভক্ত ছিল—অভিজাত শ্রেণী ও সার্ফ সম্প্রদায়। অভিজাত শ্রেণীই ভূমির মালিক ছিল, যদিও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সার্ফদের ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয় তথাপি তাদের ব্যক্তিগত অধিকারে জমি ভোগ করবার অধিকার দেওয়া হয় নি। এই কারণে কৃষকদের অর্থ নৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে। ধর্মযাজকগণও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ ধর্মযাজকই অর্থ পিশাচ, বিলাসী এবং আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। রাশিয়ার সমাজ-জীবন তারা আরও কলুষিত করে তুললেন।

মানসিক : এই সময় রাশিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় নূতন চিন্তাধারা প্রবর্তিত হয়েছিল। বহু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও চিন্তাশীল লোকেদের সম্মিলিত সাধনায় রাশিয়ায় এক নূতন যুগের অবতারণা ঘটল। টলস্টয়, গোর্কি, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গোনিভ, গোগল প্রভৃতি সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ অকর্মণ্য ও অযোগ্য স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এক দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করেন। লেনিনের প্রবর্তিত রুশ বলশেভিক্ বিপ্লবীদের মুখপত্র সুবিখ্যাত প্রাভদা পত্রিকার অবদানও কম নয়। তখনকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গণবিপ্লববাদী পত্রিকাটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'বলশেভিক' বিপ্লবীদের মুখপত্র হলেও রুশ-জনসাধারণের মধ্যে প্রাভদা পত্রিকা পড়বার প্রবল ঝোঁক দেখা দেয়। এ হতে বুঝতে

পারা যায় যে জনসাধারণ যথেচ্ছাচারী জার এবং দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাততন্ত্রের কিরূপ বিপক্ষে গিয়েছিল।

Q. 18. What are the results of the First Great War.

Ans. প্রথম বিশ্বব্যাপী মহাসমরের ফল একদিক থেকে যেমন বেদনাদায়ক, অন্যদিকে তেমনি শুভসূচক হয়েছিল।

খারাপ ফল : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ বহু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। অনেক দেশে যুদ্ধ শেষে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। এই যুদ্ধে ধন ও প্রাণের ভীষণ হানি হয়। দুই পক্ষের প্রায় এক কোটি সৈন্য নিহত হয় এবং নিহত বেসামরিক লোকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ত্রিশ লক্ষ।

মহাযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কট উপস্থিত হয় এবং কোন রাষ্ট্রই এটা হতে রক্ষা পায় নি। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পরিমাণ কমে যাওয়ায় বেকারের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অনেক দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে।

সুফল : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানব ইতিহাসের ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

পৃথিবীর মানচিত্রে পরিবর্তন : এই মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জাপান পৃথিবীর নানাস্থানে অবস্থিত জার্মান উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। ইউরোপে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং কয়েকটি রাষ্ট্রের আয়তন কমে যায়। অবশ্য কয়েকটি রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পায়। তুরস্কের অধীনস্থ আরব দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে।

গণতন্ত্রের প্রসার : যুদ্ধের ফলে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পতন ঘটেছিল এবং বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের প্রসার হতে থাকে। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রুশ-বিপ্লবের পর রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক আলোড়নের সৃষ্টি করল। গণতন্ত্রের প্রসারের ফলেই বিভিন্ন দেশে নারী জাগরণ দেখা দেয় এবং এর ফলে বিভিন্ন দেশে নারীকে পুরুষের তুল্য রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধি : এই ভয়াবহ যুদ্ধে নিরর্থক নৃশংসতা দেখে বিশ্ববাসীর মনে আন্তর্জাতিক প্রীতি ও মনোভাব দেখা দেয়। ফলে জাতিসংঘ বা লীগ অফ নেশন্স্ নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। বিশ্বে শান্তি রক্ষা করা ও যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব গঠনে জাতিসংঘ ব্রতী হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিকতার সাফল্য দাবী করতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে যুদ্ধ দ্বারা দেশের ও জগতের মঙ্গল সাধন করা যায় না। কারণ এই যুদ্ধের শুভ ফলাফলগুলি আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যায় যে যুদ্ধ যাতে আর না সংঘটিত হয় সেদিকেই সকলের দৃষ্টি। শুভ ফলাফলগুলি বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার জন্যই দেখা দেয়। এগুলিকে বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ফল বলা যেতে পারে।

জাতীয়তাবাদের সাফল্য : এক জাতীয় লোক এক রাষ্ট্রে স্বাধীন ভাবে বাস করবে, জাতীয়তাবাদের এইটেই মূল প্রতিপাদ্য ও লক্ষ্য। ভিয়েনা কংগ্রেসে এটিকে মানা হয় নি। কিন্তু প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যেরূপ পুনর্গঠিত হল তাতে ঐ নীতি যথাসাধ্য মেনে নেওয়া হল।

জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপন : অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ভেঙে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া এই তিনটি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের পত্তন হল। রাশিয়ার দাসত্ব বন্ধন হতে মুক্তি ও পূর্ণ স্বরাজ পেল ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া। ১৯১৯-এর মানচিত্রে জারশাসিত রাশিয়ার বদলে দেখা দিল সোভিয়েটতন্ত্রী রাশিয়া। রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তে নতুন করে দেখা দিল পোল্যাণ্ড। আঠারো শতকে পোল্যাণ্ডের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া তিনবার পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ করে দেশটির বিলোপ ঘটায়। প্যারিস বৈঠকে পোল্যাণ্ডের পুনর্জন্ম হল। বলকান অঞ্চলে পুরানো সার্ভিয়া রাষ্ট্রটি বর্ধিত হয়ে যুগোশ্লাভিয়া নামে দেখা দিল, সার্ব, ক্রোট ও স্লোভেন জাতির বাসভূমি রূপে এই রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হল। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, রুমানিয়া ও গ্রীসের আয়তন বেড়ে গেল। জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, রাশিয়া ও তুরস্কের আয়তন কমে গেল। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আইরিস ফ্রি স্টেট (বর্তমানে আয়ার) নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হল।

অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া

পোল্যাণ্ড

যুগোশ্লাভিয়া

Q. 19. Write what you know about the Peace Conference in Paris.

Ans. **প্যারিসে শান্তি সম্মেলন :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্যারিসে শান্তি সম্মেলন আহূত হয়। এতে ৩২টি দেশ যোগদান করে। পরাজিত শত্রুদের সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার দেওয়া হয় নি। চুক্তিপত্রগুলির খসড়া তৈরী হয়ে যাবার পর ঐগুলিতে স্বাক্ষর দেবার জন্য তাদের

ইউরোপ
১৯২০
নরওয়ে
সুইডেন
ফিনল্যাণ্ড
এস্তোনিয়া
ল্যাটভিয়া
সোভিয়েট
রাশিয়া
লিথুয়ানিয়া
মেমেল
ডেনমার্ক
উত্তর শ্লেসউইগ্
গ্রেট বৃটেন
ড্যানজিগ
পূর্ব প্রাশিয়া
করিডর
পোল্যাণ্ড
হল্যাণ্ড
বেলজিয়াম
জার্মানী
ইউপেন- ম্যালমেডী
উঃ সাইলেসিয়া
গ্যালিসিয়া
লুক্সেমবার্গ
সার
চেকোশ্লোভাকিয়া
বেসারাবিয়া
আলসাস্-লোরেন
ফ্রান্স
সুইজারল্যাণ্ড
অষ্ট্রিয়া
হাঙ্গেরী
ট্রানসিলভানিয়া
রুমানিয়া
দক্ষিণ টাইরল
যুগোশ্লাভিয়া
বুলগেরিয়া
স্পেন
ইটালী
আলবেনিয়া
গ্রীস
তুরস্ক
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের চারটি রাষ্ট্রকে যে সকল অঞ্চল হারাইতে হয়
জার্মানী—
অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী-
বুলগেরিয়া-
রাশিয়া —
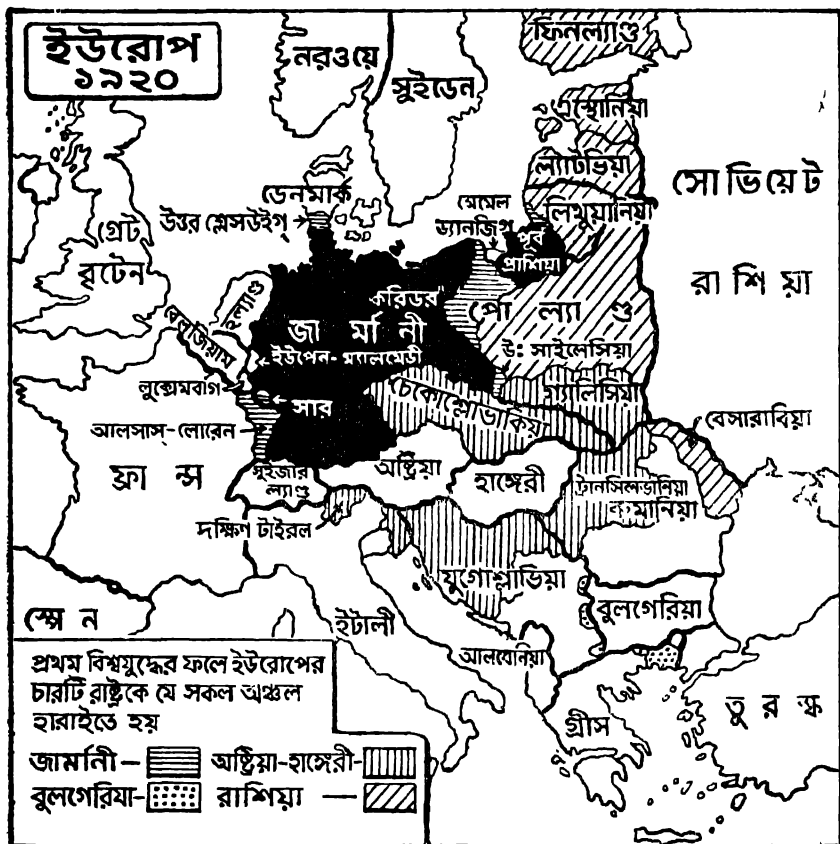
উপস্থিত থাকতে বলা হয়। সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসন, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনশো এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লেণ্ডোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এঁরাই ছিলেন শান্তি সম্মেলনের কর্ণধার।

প্রধান চারিজন

শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। পরাজিত শত্রুর প্রতি করুণা এবং রাষ্ট্রসংঘ-এর পরিকল্পনা নিয়ে আসেন উইলসন। জাপান চীনে বিশেষ সুবিধা যাতে পায় তার জন্য যোগদান করে। লাভের বাঁটোয়ারা এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করবার জন্য বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইটালী উপস্থিত হল।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

উইলসনের ১৪ দফাকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধ-লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল সত্য কিন্তু প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ঐগুলি গ্রাহ্য করা হল না। এক উইলসন ছাড়া সকলেই স্বার্থপর ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির দ্বারা পরিচালিত হলেন।

উইলসন ছিলেন অত্যন্ত আদর্শবাদী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও তিনি আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। যুদ্ধশেষে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্থির করলেন শান্তি চুক্তিতে তাঁর ১৪ দফা পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যার ফলে রাষ্ট্রগুলি আর গোপন চুক্তি করবে না, নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য হবে, জলপথে অবাধ বিচরণ করা সম্ভব হবে সকলের পক্ষে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হবে। উইলসনের ইউরোপের তৎকালীন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ধারণা ছিল না বলেই তিনি যুদ্ধশেষে এইরূপ আদর্শ প্রচার করেছিলেন। প্যারিসে গিয়ে তিনি যখন অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বুঝতে পারলেন তাঁর সঙ্গে লয়েড জর্জ, ক্লিমেনশো প্রভৃতির মনোভাবের কত পার্থক্য। ফলে উইলসন তাঁর মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। এ হতেই বোঝা যায় উই· সন কূটনীতিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিদ্‌দের সমকক্ষ ছিলেন না।

উইলসনের আদর্শবাদ

উইলসনের আদর্শবাদের ব্যর্থতা

ৃটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁর প্রখর ছিল। শান্তি সম্মেলনে তিনি প্রধান স্থান অধিকার করেছিলেন। শান্তি চুক্তি রচনার ব্যাপারে র অবদান বেশী ছিল।

ড জর্জ

ফ্রান্সের প্রতিনিধি ক্লিমেনশোকে 'বাঘ' বলা হত। রাজনীতিতে তাঁর অভিজ্ঞতা

ছিল প্রচুর। প্যারিস সম্মেলনে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি করা। তিনি চাইলেন জার্মানীকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং ফ্রান্সের হাতে তুলে দিতে হবে কয়লা, লৌহ ইত্যাদি খনিগুলি।

ক্লিমেনশো

ইটালীর প্রতিনিধি অর্লেণ্ডো সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও অভিজ্ঞ রাষ্ট্রবিদ ছিলেন। শান্তিচুক্তির ফলে ইটালী কি করে লাভবান হবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্যারিস সম্মেলনে যোগ দেন।

অর্লেণ্ডো

প্যারিস সম্মেলনে দুটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শের বা নীতির সংঘাত দেখা দিল। এক দিকে ন্যায় ও শান্তির ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্গঠন এবং অপর দিকে শক্তিসাম্য, পরাজিত শত্রুকে শক্তিহীন করার ইচ্ছা এবং বিজয়ী শক্তিবর্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য। পরিশেষে স্বার্থপর ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিটিরই জয় হল।

বিপরীত আদর্শের সংঘাত

Q. 20. How was Germany affected by the provisions of the Treaty of Versailles? *Or* Review the clauses of the Treaty of Versailles so far as they concerned Germany.

Ans. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই এবং ঐ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর। মিত্রশক্তিবর্গ পরাজিত রাষ্ট্রগুলির সহিত যে সকল শান্তি সন্ধি সম্পাদন করে তাদের মধ্যে ভার্সাই শান্তি সন্ধি সর্বপ্রথম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

১৯১৯ সালের ২৮শে জুন মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানীর সহিত ৪৪০টি অনুচ্ছেদ-সম্বলিত ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর করে। প্রথম মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলে জার্মানীকে এই সন্ধি অনুসারে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

ভার্সাই চুক্তিপত্র

জার্মানীকে আলসাস্ লোরেন ফ্রান্সকে দিয়ে দিতে হয়। পোসেন এবং পশ্চিম প্রাশিয়া এই দুইটি অঞ্চল পোল্যাণ্ড জার্মানীর নিকট হতে পেল। জাপানকে জার্মানী কিয়াও-চৌ দিতে বাধ্য হল। উত্তর শ্লেসউইগ, ইউপেন, ম্যালমেডি এবং মরেসনেটে গণভোট গ্রহণ করা হল। তার ফলে উত্তর শ্লেসউইগ ডেনমার্ক লাভ করল এবং অবশিষ্ট অঞ্চলগুলির জনগণ বেলজিয়ামের সঙ্গে সংযুক্তির প্রস্তাবের পক্ষে রায় দিল। উত্তর সাইলেশিয়ার কিছু অংশের জনগণ গণভোটের দ্বারা পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত সংযুক্ত

চুক্তিপত্রের শর্তগুলি

হতে চাইল। ডানজিগ জার্মানী হারাল এবং তা জাতিসংঘের সংরক্ষণাধীনে একটি স্বাধীন শহর হিসেবে বিবেচিত হতে থাকল। মিত্রশক্তিবর্গ মেমেল জার্মানীর নিকট থেকে কেড়ে নিল। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, ইজিপ্ট, মরক্কো, সাইবেরিয়া, চীন ও শ্যাম দেশে জার্মানী যে সকল বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত তাও বন্ধ করে দেওয়া হল। জার্মানীর যে সকল উপনিবেশ ছিল সেগুলির শাসন পরিচালনা ভার গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম এবং নিউজিল্যাণ্ডকে দেওয়া হল। অবশ্য স্থির হয় যে ঐ সকল অঞ্চল ম্যানডেট হিসেবে জাতিসংঘের অধীনে থাকবে।

জার্মানীর ভৌমিক ক্ষতি

ঔপনিবেশিক ক্ষতি

ভার্সাই চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে সামরিক শক্তিতে বিশেষ দুর্বল করে দেওয়া হয়। জার্মানীর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ১ লক্ষে নির্দিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারেও জার্মানীর উপর কঠোর বাধা আরোপ করা হল এবং ঐ সকল জিনিস জার্মানী আমদানী ও রপ্তানী করতে পারবে না স্থির হয়। বাধ্যতামূলক সার্বজনীন সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা জার্মানী করতে পারবে না। সামরিক অফিসারদের ২৫ বৎসরের জন্য এবং সাধারণ সৈন্যকে ১২ বৎসরের জন্য নিয়োগ করা যাবে। জার্মানীর নৌবাহিনীও এই চুক্তির দ্বারা বিশেষভাবে হ্রাস করা হল। স্থির হল যে জার্মানী ৬টি যুদ্ধজাহাজ, ৬টি ডেষ্ট্রয়ার, ৬টি ছোট ক্রুজার এবং ১২টি টর্পেডো নৌকা রাখতে পারবে। কোন ডুবোজাহাজ রাখতে পারবে না। নৌবাহিনীর জন্য ১৫,০০০-এর বেশী লোক নিয়োগ করা চলবে না। জার্মানী যাতে ভার্সাই চুক্তি মেনে চলে সেই উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনী রাইন নদীর পশ্চিম দিকে জার্মানীর যে ভূখণ্ড ছিল তা দখলে রাখল। জার্মানী চুক্তি মানতে থাকলে ঐ সৈন্যবাহিনী ক্রমে ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে বলে স্থির হল। রাইন নদীর বাম পার্শ্বস্থ অঞ্চল এবং দক্ষিণ পার্শ্বেরও কিছু অঞ্চল নিরস্ত্রীকৃত (demilitarised) হল। কাইজার এবং অন্যান্য যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইবুনেল গঠনের ব্যবস্থা করা হল। ভার্সাই চুক্তিতে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত শর্তগুলি পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য একটি কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় জার্মানীকে বহন করতে হবে বলে বলা হয়।

সামরিক বাধানিষেধ

এই চুক্তির ফলে অর্থনৈতিক বিষয়েও জার্মানীকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। আলসাস্ লোরেনের লৌহ ও পেট্রোলিয়াম সম্পদ থেকে জার্মানীকে বঞ্চিত হতে হয়। সার অঞ্চলে প্রচুর কয়লা সম্পদ আছে এবং ঐ অঞ্চলের কয়লাখনিগুলি

ফ্রান্সকে দেওয়া হয়। স্থির হয় যে ১৫ বৎসর পর গণভোটের দ্বারা যদি ঐ অঞ্চলের জনগণ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তাহলে জার্মানীকে সার অঞ্চলের কয়লাখনিগুলি ক্রয় করতে হবে। জার্মানী ও লুক্সেমবার্গের মধ্যে বিশেষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তাহা বাতিল করে দেওয়ায় জার্মানীর অসুবিধা হয়েছিল।

অর্থ নৈতিক ক্ষতি

জাতিসংঘ পরিষদের মতামত ভিন্ন জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়াকে সংযুক্ত করা চলবে না। এছাড়া যুদ্ধের জন্য জার্মানী এই চুক্তি অনুসারে মিত্র-শক্তিবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হল। ডানিয়ুব, এল্‌ব (Elbe) নীমেন, ওডার এবং রাইন নদীগুলিকে আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে স্বীকার করা হল।

অন্যান্য বাধানিষেধ

পরিশেষে বলা যায় যে ভার্সাই সন্ধি অনুসারে জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করতে হয়। এর দ্বারা জামানীকে যুদ্ধের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। তার ফলে জার্মানগণ প্রথম হতেই চুক্তিটিকে একটি অন্যায় চুক্তি বলে মনে করতে থাকে।

যুদ্ধের জন্য জার্মানীই দায়ী

Q. 21. Write short notes on : (a) Treaty of St. Germain (b) Treaty of Trianon (c) Treaty of Neuilly and (d) Treaty of Sevres.

Ans. (a) Treaty of St. Germain :

১৯১৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মিত্রশক্তিবর্গ অস্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট জার্মেনেব শান্তি সন্ধি সম্পাদন করে। সেণ্ট জার্মেন-এর সন্ধি দ্বারা ঘোষণা করা হল যে অষ্ট্রোহাঙ্গেরীয়ান রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে এবং পরিবর্তে অস্ট্রিয়াতে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। যুদ্ধের জন্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী দায়ী থাকায় অস্ট্রিয়াকে মিত্রশক্তিবর্গকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেহেতু জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার নতুন সরকারদ্বয় এই দুটি রাষ্ট্রের মিলনের পক্ষপাতী ছিল সেইজন্য এই চুক্তির দ্বারা স্থির হল যে, এই দুটি দেশকে পরস্পরের সহিত মিলিত হতে দেওয়া হবে না। অস্ট্রিয়া এমন কোন কাজ করতে পারবে না যার ফলে তার স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে। অস্ট্রিয়ার নাম জার্মান-অস্ট্রিয়া হতে পরিবর্তন করে নাম দেওয়া হল অস্ট্রিয়া প্রজাতন্ত্র।

অস্ট্রিয়ার সাথে সেণ্ট জার্মেনের সন্ধি

সন্ধির শর্তগুলি

এই চুক্তি অনুসারে অস্ট্রিয়া ইটালীকে দক্ষিণ টাইরোল, ট্রেন্‌টিনো, ট্রিয়েস্ট, ইস্ট্রিয়া এবং ডালমাসিয়ার নিকটবর্তী কতকগুলি দ্বীপ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এই প্রসঙ্গে

উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ টাইরোলে প্রায় ২½ লক্ষ জার্মান ভাষাভাষী লোক থাকা সত্ত্বেও এটি ইটালী লাভ করে, কারণ গোপন চুক্তি অনুসারে এটি ইটালীর প্রাপ্য ছিল। বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, নিম্ন অষ্ট্রিয়ার এক অংশ (part of lower Austria) এবং অষ্ট্রিয়ার সাইলেশিয়া—এই সকল অঞ্চল লইয়া চেকোশ্লোভাকিয়া নামক এক নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। পোল্যাণ্ডকে অষ্ট্রিয়ান গ্যালিসিয়া দেওয়া হল। শিল্প-প্রধান তেসনেনের উপর পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া উভয় রাষ্ট্রই দাবী করল। শেষ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলটি দুই ভাগে বিভক্ত করে ঐ দুই রাষ্ট্রকে দেওয়া হল। রুমানিয়া পেল বুকোভিনা, বসনিয়া হার্জিগভিনা এবং ডালমাশিয়ার উপকূল ও দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া নামে এক নতুন রাষ্ট্র গঠিত হল।

এই চুক্তির অবশিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি ভার্সাই চুক্তির বিভিন্ন শর্তের অনুরূপ। ইউরোপের বাইরে অষ্ট্রিয়া যে সকল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত এই চুক্তির দ্বারা তা হতে অষ্ট্রিয়া বঞ্চিত হল। ক্ষতিপূরণ দিতেও অষ্ট্রিয়া স্বীকৃত হল। অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারেব ব্যবস্থা করা হল। এ ছাডা চেকোশ্লোভাকিয়াকে অষ্ট্রিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ট্রেন চালাবার অনুমতি দেওয়া হল। অষ্ট্রিয়ার নৌবাহিনী তুলে দেওযা হল এবং সৈন্য সংখ্যা ৩০,০০০ নির্দিষ্ট করা হল।

(b) Treaty of Trianon :

১৯২০ সালের ৪ঠা জুন ট্রায়ানন প্রাসাদে মিত্রশক্তিবর্গ হাঙ্গেরীর সহিত ট্রায়ানন সন্ধি স্বাক্ষব করে। এই সন্ধি অনুসারে নতুন রাষ্ট্রের নাম হাঙ্গেরী করা হল, হাঙ্গেরিয়ান প্রজাতন্ত্র নয়। এই চুক্তির ফলে হাঙ্গেরীর নিকট হতে রুমানিয়া ট্রানসিলভানিয়া এবং টেম্‌স্‌ভরের অনেকাংশ পেল। যুগোশ্লাভিয়া, ক্রোসিয়া-শ্লাভোনিয়া এবং টেমসভরেব কিছু অংশ লাভ কবল, চেকোশ্লোভাকিয়া শ্লোভাকিয়া ও কার্পেথিয়ান পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ ও পূর্ব ভূখণ্ডের কিছু অংশ লাভ করে। পশ্চিম হাঙ্গেরী অষ্ট্রিয়াকে দেওয়া হল। হাঙ্গেরীর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ৩৫,০০০ নির্দিষ্ট করা হল এবং নৌবাহিনী প্রায় তুলে দেওয়া হল। হাঙ্গেরীকেও যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হল।

হাঙ্গেরীর সাথে ট্রাযাননের সন্ধি

শর্তাবলী

(c) Treaty of Neuilly.

নিউলির সন্ধি মিত্রপক্ষ এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে যুগোশ্লাভিয়া বুলগেরিয়ার নিকট হতে পশ্চিম

বুলগেরিয়ার চারটি ক্ষুদ্র অঞ্চল লাভ করে। গ্রীসকে পশ্চিম থে্স এবং ইজিয়ান উপকূলের কিছু অঞ্চল দেওয়া হয়। বুলগেরিয়া তার সৈন্যসংখ্যা ২০,০০০-এর অধিক বৃদ্ধি করতে পারবে না এবং অন্যান্য সামরিক কর্মচারীর সংখ্যা ১৩,০০০-এর অধিক বৃদ্ধি করা চলবে না। এছাড়া বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতেও বাধ্য করা হয়।

বুলগেরিয়ার সাথে নিউলির সন্ধি শর্তাবলী

(d) **Treaty of Sevres :**

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট মিত্রপক্ষ তুরস্কের সহিত সেভরের সন্ধি সম্পাদন করে। এই সন্ধি অনুসারে তুরস্ক, ইজিপ্ট, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপলিটানিয়া, মরক্কো এবং টিউনিসিয়ায় সকল অধিকার হারাল এছাড়া আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপোটামিয়া এবং সিরিয়ার উপরও তুরস্ক তার অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হল। স্মার্না ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া মাইনর অস্থায়িভাবে গ্রীসের শাসনাধীনে রাখা হল। গ্রীস ইজিয়ান সাগরস্থ কতকগুলি দ্বীপ এবং পূর্ব থে্স তুরস্কের নিকট হতে লাভ করে। রোড্স্ ও ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য ভবিষ্যতে ইটালী ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে দান করবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

তুরস্কের সাথে সেভরের সন্ধি

তুরস্ক আর্মেনিয়াকে স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকার করল। প্রকৃত পক্ষে আনাটোলিয়া (এশিয়া মাইনর) এবং ইউরোপের এক ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত তুরস্ককে অবশিষ্ট সকল ভূখণ্ড পরিত্যাগ করতে হল। এমন কি আনাটোলিয়ার উপরও ফ্রান্স ও ইটালী প্রভাব বিস্তারের অধিকার একটি চুক্তির দ্বারা লাভ করে। তুরস্কের সুলতান মহম্মদের প্রতিনিধিগণ এই সন্ধি স্বাক্ষর করলেন বটে কিন্তু সন্ধির বিরুদ্ধে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে অন্দোলন অরম্ভ হয় এবং শেষ পর্যন্ত এটি লুসেনের সন্ধির দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

লুসেনের সন্ধির দ্বারা সেভরের সন্ধির পরিবর্তন (১৯২২)

Q. 22. Give a critical estimate of the Versailles Treaty. How far will it be true to say that the treaty of Versailles contained the germs of the Second World War ?

Ans. ভার্সাই সন্ধিকে দুই দিক হতে সমালোচনা করা হয়েছে। একদিকে জার্মানগণ ও তাঁদের সমর্থকবৃন্দ এবং অপরদিকে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ এটির সমালোচনা করেছেন। প্রথমে আমরা জার্মানগণ কর্তৃক অনীত অভিযোগগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনার দুটি দিক

প্রথমতঃ, জার্মানগণ বলে থাকেন যে এই সন্ধি নীতির দিক হতে সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, এটি পরাজিত রাষ্ট্রের প্রতি অত্যন্ত কঠোর শর্তাদি আরোপ করেছে। এই অভিযোগের উত্তরে বলা যায় যে, যেহেতু বিজিত রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করতে হয় সেজন্য ঐ সকল রাষ্ট্রের নিকট এইরূপ চুক্তি অন্যায় বলে মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে হিংসা ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে সুস্থ ও শান্ত পরিবেশে কোন চুক্তি সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। অতএব জার্মানীর উপর যে বিজেতা রাষ্ট্রগুলি কঠোর শর্তাদি আরোপ করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। জার্মানী জয়লাভ করলে জার্মানীও অনুরূপ কঠোর শর্তাদি পরাজিত রাষ্ট্রগুলির উপর আরোপ করত। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রতিবাদ করবার কোন নৈতিক অধিকার নাই। জার্মানী ১৯১৭ সালে রাশিয়ার সহিত যে ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধি এবং রুমানিয়ার সহিত যে বুখাবেস্টেব সন্ধি সম্পাদন করেছিল তার দ্বারা জার্মানী ঐ দুই দেশের উপর আরও বেশী কঠোর শর্ত আরোপ কবেছিল।

জার্মান দৃষ্টিভঙ্গীতে ভার্সাই সন্ধি

পরাজিত শত্রুর প্রতি মিত্রশক্তি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন নাই

মতটির বিরুদ্ধে অভিমত

দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর অপর একটি অভিযোগ হচ্ছে যে এই সন্ধি সম্পাদনের সময় জার্মনীর কোন মতামত লওয়া হয় নি। কেবলমাত্র খসড়া চুক্তির উপর জার্মান প্রতিনিধিদের মতামত লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়েছিল। এছাড়া এই চুক্তিটি গ্রহণ করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল। কারণ জার্মানীকে বলা হয় পাঁচ-দিনের মধ্যে এই চুক্তি গ্রহণ না করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পুনরায় শুরু করা হবে। এই অভিযোগের উত্তরে বলা যায় যে সাধারণতঃ যুদ্ধের পর যখন কোন শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা হয় তখন পরাজিত রাষ্ট্রের মতামত লওয়া হয় না। তবে এটি সত্য যে এই চুক্তি সম্পাদনের সময়ে জার্মানীর প্রতিনিধিদের প্রতি সাধারণ ভদ্রতাও প্রদর্শন করা হয় নি।

সন্ধিটি জার্মানীব উপর চাপিযে দেওয়া হয

তৃতীয়তঃ জার্মানগণ বলেন যে এই সন্ধি সম্পাদনের সময়ে সকল ক্ষেত্রে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতি মেনে লওয়া হয় নাই। যেমন পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় অনেক জার্মান থেকে যায়। এর উত্তরে বলা যায় যে, সকল ক্ষেত্রেই ঐ নীতি কার্যকরী করা সম্ভব নয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য বিজেতা রাষ্ট্রগুলি ঐ সকল রাষ্ট্রের সহিত কতকগুলি চুক্তি সম্পাদন করেছিল।

সন্ধিটি নিজস্ব নীতিই ভঙ্গ করে

চতুর্থতঃ, জার্মানগণ বলেন যে ক্ষতিপূরণের জন্য জার্মানীর নিকট হতে যে অর্থ দাবি করা হয় তা জার্মানীর পক্ষে দেওয়া অসম্ভব ছিল। এই অভিযোগ অস্বীকার করা চলে না। তবে এর উত্তরে বলা যায় যে পরবর্তী কালে ঐ অর্থের পরিমাণ একাধিকবার হ্রাস করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের পর হতে জার্মানী ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

এখন এ চুক্তির বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা যে সব অভিযোগ করে থাকেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ এই সন্ধিকে এমন কতকগুলি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছিল যা কখনই বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্যকর করা চলে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নীতির কথা উল্লেখ করতে পারি। এই নীতিকে গ্রহণ করার ফলে একদিকে যেমন কতকগুলি পুরান সমস্যার সমাধান হয়েছিল আবার অপরদিকে কতকগুলি নতুন সমস্যার ও সৃষ্টি হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ, এই সন্ধির দ্বারা বিজেতা রাষ্ট্রগুলি নিজেদের উপর কতকগুলি বিশেষ দায়িত্বে অর্পণ করে। কিন্তু যেহেতু সবগুলি দায়িত্ব পালনের সম্ভাবনা খুবই অল্প ছিল অতএব এই সব দায়িত্ব গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কখনই উচিত হয় নি। এই দায়িত্বগুলি পালন না করার ফলে জার্মানী বিজেতা রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে প্রচার করবার সুযোগ লাভ করে।

তৃতীয়তঃ এই সন্ধির বিরুদ্ধে অপর এক অভিযোগ হল যে, এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অর্থ নৈতিক শর্তগুলি অনেক ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন জার্মানীকে তার অধিকাংশ বাণিজ্য জাহাজ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিজেতা রাষ্ট্রগুলিকে দিতে হয়েছিল, এর ফলে একদিকে যেমন জার্মানীর জাহাজ শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করে আবার অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের জাহাজ শিল্পে মন্দা দেখা দেয়।

চতুর্থতঃ বলা হয় যে এই সন্ধির দ্বারা বিজেতা রাষ্ট্রগুলি জার্মানীতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য যে সব অবস্থার প্রয়োজন সে সব অবস্থা জার্মানীতে ছিল না। চুক্তি প্রণেতাদের প্রথমে জার্মানীতে ঐ সকল অবস্থার সৃষ্টি করা উচিত ছিল এবং তার পর গণতন্ত্র চালু করার চেষ্টা করতে হত।

পঞ্চমতঃ এই সন্ধির ফলে জার্মানীর সন্নিকটে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ভবিষ্যতে জার্মানীর সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য শক্তিশালী ও

বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল। এর ফলে পরবর্তী কালে জার্মানীর পক্ষে বিভিন্ন রাজ্য দখল করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা খুব সহজেই করা যায়। কারণ সমালোচকরা পশ্চাৎ দৃষ্টির সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। ভার্সাই সন্ধির পর যে যে ঘটনা ঘটেছিল, অনেক সমালোচক মনে করেন ভার্সাই সন্ধিই সেইগুলির জন্য দায়ী। কিন্তু এটি আর যাই হক, পক্ষপাত- শূন্য দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন নয়।

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়—জার্মান-দৃষ্টিতে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভার্সাই সন্ধির সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তির উদ্দীপক। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর শোচনীয় অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী এই ভার্সাই সন্ধি। এটিকে একটি উৎপীড়ন করার কক্ষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কক্ষ হতে জার্মানরা কেবলমাত্র যুদ্ধের দ্বারা বের হতে পারে মনে করা হল। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে জার্মানদের এই অভিসন্ধি-মূলক সমালোচনা একেবারেই ভিত্তিহীন। কারণ ভার্সাই সন্ধিকে উৎপীড়নমূলক বলার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, উৎপীড়নের প্রধান অস্ত্র ছিল ক্ষতিপূরণ। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ ত জার্মানরা শোধ করেনি, জার্মানী আমেরিকার নিকট হতে যতটা ঋণ পেয়েছিল তার অনেক কম ক্ষতিপূরণ হিসেবে মিত্রশক্তিদের দিয়েছিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হতে জার্মানী আর কোন ক্ষতিপূরণ দেয়নি। আরও মজার ব্যাপার যে, জার্মানী যা ঋণ নিয়েছিল তাও কখনো শোধ করেনি। দ্বিতীয়তঃ, 'জামানী যুদ্ধের জন্য দায়ী'। শর্তটি জার্মানরা যে ভাবে সমালোচনা করেছেন সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। 'যুদ্ধের জন্য দায়ী' শর্তটি অপমানজনক নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু এটিকে একটি জাতির ইতিহাসে চিরস্থায়ী ক্ষত স্বরূপ মনে করা উগ্র জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক হলেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর দায়িত্ব যখন আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি, তখন জার্মানী যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কিছুটা দায়ী ছিল সেটা অনস্বীকার্য।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, ভার্সাই সন্ধিটি কতকগুলি অবাস্তব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিজেতা রাষ্ট্রগুলি তাদের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়। জার্মানীতে গণতন্ত্রের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি না করে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা ধাঁচে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়। চুক্তিটির অর্থনৈতিক শর্তগুলি ভবিষ্যতে বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, নবগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে ভবিষ্যতে জার্মান আক্রমণের হাত হতে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হয়নি।

ভার্সাই সন্ধি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হচ্ছে এই চুক্তিটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী। বলা হয়ে থাকে যে এই চুক্তি জার্মানীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এত বেশি কঠোর শর্তাদি আরোপ করে যে তা জার্মানীর পক্ষে মেনে চলা অসম্ভব ছিল এবং একারণেই জার্মানী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই মতটি মেনে নেওয়া অসম্ভব। কারণ আমরা জানি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন কারণ ছিল। তবে ভার্সাই সন্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম একটি কারণ।

একমাত্র কারণ নয়